দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত

শ্রী[illegible] চরণ চক্রবর্তী, এম্.এ. বি,টি,
অধ্যাপক—আনন্দ মোহন কলেজ।
ময়মনসিংহ।

ভারতবর্ষ

সচিত্র মাসিক পত্র

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ
গ্রন্থাগার
সংখ্যা: ২১৫৮

সপ্তবিংশ বর্ষ

প্রথম খণ্ড

আষাঢ়—অগ্রহায়ণ—১৩৪৬

সম্পাদক—

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ ‖ শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক—
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
—২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—

ভারতবর্ষ

সূচীপত্র

সপ্তবিংশ বর্ষ—প্রথম খণ্ড ; আষাঢ়-অগ্রহায়ণ—১৩৪৬

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

অনুকর্ষ (উপন্যাস)—শ্রীমতী নিরুপমা দেবী ৯০৮
অন্ধতার কারণ ও তাহার নিবারণ (সচিত্র)—
ডাঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় ৭৪২
অপরাধতত্ত্বে নারীর স্থান (প্রবন্ধ)—শ্রীপঙ্কজকুমার মুখোপাধ্যায় ২৩০
অসীমের সীমা (কথানাট্য)—শ্রীশরদিন্দু সেনগুপ্ত ১৪৩
আকবার সাহেবের ব্যাঘ্রশিকার (সচিত্র)—
শ্রীহীরালাল দাশগুপ্ত ৭২৬
আগমনী (কবিতা)—শ্রীমতী শোভা দেবী ৭৬১
আত্মনির্ভর (কবিতা)—রসরাজ অমৃতলাল বসু ৯৪০
আদিশূর কর্তৃক পঞ্চব্রাহ্মণ আনয়ন (ইতিহাস)—
ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ৮৩৮
আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দুধর্ম্ম (প্রবন্ধ)—ডঃ মেঘনাদ সাহা ৩৭
আনন্দ (কবিতা)—শ্রীমানকুমারী বসু ৫৭৬
আবহমান (কবিতা) শ্রীঅমল মুখোপাধ্যায় ৯৪০
আল্পনা ও পিঁড়িচিত্র (সচিত্র প্রবন্ধ)—শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ ৩৬৫
আষাঢ় (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ১৭
আষাঢ়ে (কবিতা)—কাদের নওয়াজ ১৬৪
আস্তিক (দর্শন)—ডাঃ আশুতোষ শাস্ত্রী ১৭
ইউরোপের চিত্রশিল্পে রেনল্ড্স্ ও গেন্সব্রো (সচিত্র)—
শ্রীজিতেন্দ্রকুমার নাগ ৩৬১
ইতিহাসের উপর রান্নাঘরের প্রভাব (প্রবন্ধ)—শ্রীসুবলচন্দ্র ভড় ৯৩২
১৯৪৯ (গল্প)—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার ৮২৬
উপনিবেশ-আবদার (প্রবন্ধ)—শ্রীতারানাথ রায়চৌধুরী ২৯০
একটি গ্রাম (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ৬৪৭
একটি ময়ূর (গল্প)—শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী ১০০
একরাত্রির ইতিহাস (গল্প)—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র কুশারী ৯৮২
একা (কবিতা)—শ্রীদিলীপ দাশগুপ্ত ৩৯৪
এমনি গহন রাতে কেহ কি ভাবিবে বসে ! (কবিতা)—
শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ৩৬
এ্যাণ্ড ফ্রেণ্ড্স্ (গল্প)—শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদার ৬৮৩
ও তনু-মঞ্জরী (কবিতা)—শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল ৫৭
ও যে মোর ফুলের নির্ঝর (কবিতা)—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ৬৪০
কবি ও কাব্য (কবিতা)—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসাক ৫৬৮
কবিতা (কবিতা)—শ্রীমতী গীতা দেবী আচার্য্যচৌধুরী ১৯১
করস্পর্শ (কবিতা)—শ্রীস্মৃতিশেখর উপাধ্যায় ৮৮০
কল্প-প্রিয়া (কবিতা)—শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ৭৩৪
কালরাত্রি (গল্প)—শ্রীসুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৫
কালিদাস (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ১৮৩
কালিদাসের কবিত্বগৌরব ও পুরাণকার (প্রবন্ধ)—
শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার ৫১০
কালিদাসের যুগে ভারতবর্ষ (প্রবন্ধ)—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন ১০৪
কেন (কবিতা)—শ্রীপরেশনাথ সান্যাল ৯০১
কেন ঘুম ভাঙা[illegible] না ? (কবিতা)—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ১৪২
কৃষ্ণচরিত্র (ব্যঙ্গচিত্র)—শ্রীসন্তোষ দে ৫৯২
কৃষি (প্রবন্ধ)—শ্রীসুরপতি জানা ২৯৫
ক্ষণিকা (কবিতা)—শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য ৯৫২
খেতাব বিভ্রাট (ব্যঙ্গচিত্র)—শিল্পী দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ৭৯০
খেলাধূলা— ১৬৬, ৩২৪, ৪৮৪, ৬৪৮, ৮১১, ৯৮৭
গান (কবিতা)—শ্রীরাখালদাস চক্রবর্ত্তী ৬২৮
গীতা ও বাইবেল (ধর্ম্ম)—শ্রীবিনোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৬১
গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন (দর্শন)—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ ৩৩৭
ঘরের কাব্য (গল্প)—শ্রীমতিলাল দাশ ৯৪১
ঘাটওয়ালা (গল্প)—শ্রীকাশীনাথ চন্দ্র ৩৭৩
ঘাত-প্রতিঘাত (উপন্যাস)—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ ১৫০, ২৩৮, ৪০৪
চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় (জীবনী)—শ্রীকমলাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৭
চিত্রা (কবিতা)—শ্রীকমলকৃষ্ণ মজুমদার ২৭১
চিরসুন্দর (কবিতা)—ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ৭৮৯
চেতন ও অচেতন (গল্প)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত ৮৯
চৈতন্যের গৃহত্যাগ (কবিতা)—শ্রীঅমল সেন ৯৩
ছত্রাক ও তাহার স্বজাতি (প্রবন্ধ)—শ্রীক্ষেত্রনাথ রায় ১২১
জগন্নাথদেবের অদ্ভুত দারুমূর্ত্তির পরিচয় (সচিত্র)—
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায় ৯১৯
জঙ্গম (উপন্যাস)—বনফুল ৮, ২২২, ৩৮৭, ৫৪৭, ৬৯৫, ৮৬৭
জাতিবিভাগ (প্রবন্ধ)—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ৫২১
জাপান (ভ্রমণ)—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৩৯৫, ৯৪৪
জাপানের শিক্ষানীতি (প্রবন্ধ) শ্রীগৌরচন্দ্র নাথ ২৫৮
জৈনগুরু মহাবীরের ধর্ম্মোপদেশ (ধর্ম্ম)—শ্রীপূরণচাঁদ শ্যামসুখা ৩৫
ঝরো ঝরো আজ ঝরিছে শাওন (কবিতা)—
শ্রীনিখিলেশ রুদ্রনারায়ণ সিংহ ৬১৩
ডাকঘর (প্রবন্ধ)—শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায় ৭৯
তবু (কবিতা)—শ্রীকমলরাণী মিত্র ৮৩৭
তুমি আর আমি (কবিতা)—শ্রীঅনুরাধা দেবী ৮০০
তুরস্কের নবজন্ম (রাজনীতি)—শ্রীসুধাংশুকুমার বসু ৯৭৩
৩রা জুলাই (ইতিহাস)—শ্রীজনরঞ্জন রায় ২৯২
তোমারে দিয়েছি ব্যথা (কবিতা)—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৩০
তোমারে বাসিব ভাল (কবিতা)—শ্রীদুর্গাদাস ঘোষাল ১২০
দুর্গোৎসব (চতুরঙ্গ)—শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৭৬২
দেবগড় (ইতিহাস)—শ্রীঅদ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৮৮
দৃষ্টিশক্তির স্বাস্থ্য (প্রবন্ধ)—ডাঃ সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় ৪৬৩
ধরণীকুমার বসু (কবিতা)—শ্রীদিলীপকুমার রায় ৩২৩
নববর্ষা (কবিতা)—শ্রীসুনীলবরণ রায়চৌধুরী ৫৪৪
নহে সে ত বসুধার মৃন্ময়ী কায়া (কবিতা)—শ্রীসমরেন্দ্র দত্তরায় ৮৯৫
নাগরিকা (উপন্যাস)—শ্রীচরণদাস ঘোষ ৬৭, ১৯৬, ৪৩৩, ৫৩৭, ৭১২
নারীশিক্ষা সম্বন্ধে আবেদন—শ্রীবীণাপাণি দেবী ৮৯৬
নিখিল প্রবাহ (প্রবন্ধ)—শ্রীক্ষেত্রনাথ রায় ৩০৫, ৪৬৯, ৬২০, ৭৬৯, ৯৬৯

নির্ভীক (কবিতা)—শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্ত্তী ৪৫১
নিশিকান্ত করকমলে (কবিতা)—সৌম্য ৪৭৮
নূতন-পথে (কবিতা)—শ্রীশচীন্দ্রলাল রায় ২৭৫
পদ্মবন (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ৩৪৯
পথে যাদের ঘর (গল্প)— শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৫৩
পল্লী (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ৮৮৭
পাগলের রোজনামচা (গল্প)—শ্রীকমলাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৪৭
পান্থ (গল্প)—শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ৫৬৫
পুতুল খেলা (কবিতা)—শ্রীশশাঙ্ককুমার পাত্র ২৬২
পোলাণ্ডের কথা (রাজনীতি)—শ্রীশিশির সেন ৬২৯
পৃথিবী ছাড়িয়ে (গল্প)—শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল ১০৯
পিতৃজীবন (কবিতা) শ্রীকালিদাস রায় ৯৬৫
প্রতিবাদ—স, চ, ১১৯
প্রতিবাদের উত্তর—শ্রীক্ষেত্রনাথ রায় ১১৯
প্রতীক্ষা (গল্প)—শ্রীমাধবলাল ঘোষ ৫৬০
প্রলয় বরাভয় (কবিতা)—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ৭৭
প্রলয়ের বাঁশী (কবিতা) শ্রীনকুলেশ্বর পাল ৯০১
প্রলয়ের সূচনা (রাজনীতি)—শ্রীসুধাংশুকুমার বসু ৮০১
প্রশ্ন (কবিতা)—শ্রীকমলপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৪১
গ্রহবিশন (কবিতা)—শ্রীঅচ্যুত চট্টোপাধ্যায় ৬৬৯
প্রাচীন ইউরোপীয় সভ্যতা (প্রবন্ধ) শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী ৪৯৭
প্রাচীন ভারত (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায় ৩৬৪
প্রাচীন ভারত (ইতিহাস)—ডঃ বিমলাচরণ লাহা ১৯২
প্রেম ও কবিতা (গল্প)—শ্রীনরেন্দ্র দেব ৮৪৮
বাংলা পুঁথিতে বানান ও লিপি কৌশল (অনুশাসন)—
শ্রীনারায়ণ রায় এম-এ ৯৬৬
বঙ্কিম সাহিত্যে প্রেম (প্রবন্ধ)—রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র ৬৭৮
বঙ্গভাস্কর্য্যে সূর্য্যমূর্ত্তি (সচিত্র)—শ্রীবীরেন্দ্রমোহন সান্যাল ৫৯৬
বঙ্গীয় কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিক মূল্য (ইতিহাস)—
ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ৬৫৭
বন্দী (কবিতা)—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ৪৬২
বর্ষা নেমেছে সন্ধ্যাবেলা (কবিতা)—শ্রীবিশ্বনাথ রায়চৌধুরী ৪৪৮
বাঙ্গলা গদ্যের ইতিহাস (প্রবন্ধ)—শ্রীক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ ২৭২
বাদল-বাসর (কবিতা)—শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী ৬৬
বানর-সমস্যা সমাধান (ব্যঙ্গচিত্র)—শ্রীগঞ্জিকাসেবী ৯৫৩
বারিদবরণ (নাটিকা)—শ্রীঅশোক সেন ৩৪১
বাংলার লোক-সঙ্গীত (প্রবন্ধ)—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ ৫৮
বিপিন ডাক্তার (গল্প)—শ্রীমণীন্দ্র দত্ত ৯২৯
বিপিনচন্দ্র পাল (জীবনী)—শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব ৯৫৯
বিপ্লব (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ৫২০
বেড়ার আড়াল (কবিতা)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী ৬২৫
বিরহ (কবিতা)—শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল ৬৮২
বিরহিনী (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায় ৬১৯
বিস্ময় (কবিতা)—শ্রীঅমিয়মোহন বসু ২৩৭
বিহ্বল (কবিতা)—শ্রীমৃণালকান্তি দাশ ২৮০
বেতার বা রেডিও (বিজ্ঞান)—শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্য ২৮১
বের্লিনে একসপ্তাহ (সচিত্র ভ্রমণ)—
রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র ৩৭[illegible], ৬১৪
বেহিসাবী (গল্প)—শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী ৭৭৫
বৈরাগ্য (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায় ৭৮৪
ব্রহ্মর্ষি শ্রীশ্রীসত্যদেব (জীবনী)—শ্রীভুবনমোহন দাশ ৭৯৯
ব্রহ্মসূত্রের কোন্ ভাষ্য ব্যাস-সম্মত (দর্শন)—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ ৮১৭
ব্যথার পূজা (কবিতা)—শ্রীকনকভূষণ মুখোপাধ্যায় ৮৬৩
ব্যথায় পূজা (গল্প)—শ্রীনিত্যহরি ভট্টাচার্য্য ৮৯৭
ভগবান শঙ্করাচার্য্য ও অদ্বৈতবাদ (দর্শন)—
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ১
ভাঙ্গাবাড়ীর ইতিহাস (গল্প)—শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত ৫০
ভাদরে (কবিতা)—কাদের নওয়াজ ৫৯৯
ভারতীয় সঙ্গীত (প্রবন্ধ)—শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৩৫০
ভূস্বর্গ চঞ্চল (সচিত্র ভ্রমণ)—
শ্রীদিলীপকুমার রায় ২৫, ২০৯, ৪১৭, ৫২৬, ৭৫২
মরণে জাগরণ (কবিতা)—শ্রীসুভদ্রা রায় ৭৫১
মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম (জীবনী)—
শ্রীহরপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ৭৮৫
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য (জীবনী)—
শ্রীঅবনীনাথ রায় ২৬৩
মহাশয় (গল্প)—শ্রীনরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত ৬৪১
মহাশান্তি (কবিতা)—শ্রীকালিদাস রায় ২৪৬
মাদ্রাজ ও দক্ষিণভারত (সচিত্র ভ্রমণ)—
ডঃ বিমলাচরণ লাহা ৭০৫
মীর্ণা (কবিতা)—শ্রীগৌতম সেন ৩৮৬
মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায় (জীবনী)— ৬২৬
মুমূর্ষু পৃথিবী (উপন্যাস)—
শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ১৩১, ২৯৮, ৪৫৫, ৬০০
মুসোলিনীর দিগ্বিজয় (রাজনীতি)—শ্রীসুধাংশুকুমার বসু ১৩৭
মেঘদূতের কবি (কবিতা)—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী ২৯৭
মোহমুক্তি (নাটক)—
শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০২, ৬৭০, ৮৮৮
যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (জীবনী)—
শ্রীকমলাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৫২
যশোহরের অখ্যাতনামা কবি গঙ্গারাম দত্ত (প্রবন্ধ)—
শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪৭
যবনিকার অন্তরালে (গল্প)—শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় ৫১৮
যাদুবিদ্যা ও বাঙালী (প্রবন্ধ)—যাদুকর পি, সি, সরকার ৫৪৫
যুদ্ধ ও প্রগতি (প্রবন্ধ)—শ্রীসুবোধরঞ্জন রায়চৌধুরী ৫৫০
যুযুৎসু কৌশল (সচিত্র)—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু ২৭৬
রতনের দিদি (গল্প)—শ্রীরাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ২৬৭
রহস্যময়ী (গল্প)—শ্রীগৌতম সেন ৭৩৫
রাগিনীর পথে (কবিতা)—শ্রীজ্যোতির্মালা ৬৭৭
রাঙারাখী (কবিতা)—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ৮২৫
রায় সাহেবের চিঠি (গল্প)—শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত ৪৪৯
রূপায়ৎ (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ৭৮০
শাটী (প্রবন্ধ)—শ্রীপ্রমথনাথ ঘোষ ১১৬
শরত-সখী (কবিতা)—শ্রীবিমলাশঙ্কর দাশ ৮৬৬
শরতে (কবিতা)—শ্রীগৌরগোপাল বিদ্যাবিনোদ ৭৭৪
শারদা হিল্লোল (কবিতা)—শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ৬৩৩
শিশু-চৈতন্য ও ফ্রয়েড (প্রবন্ধ)—শ্রীজনরঞ্জন রায় ৯২৭
শ্রাবণের দীঘি (কবিতা)—কাদের নওয়াজ ৩১৬
'শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান' সম্বন্ধে বক্তব্য (আলোচনা)—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীফণিভূষণ তর্কবাগীশ ৫৬৪, ৬৩৩, ৮৮১
শ্রীমাকড়সা (গল্প)—শ্রীযামিনীমোহন কর ৩৫০
সঙ্গীত বিকাশ (প্রবন্ধ)—শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল ৯৩৪
সনেট্ (কবিতা)—শ্রীআশুতোষ সান্যাল ৩৫৬
সর্পের গ্রহণশক্তি (প্রবন্ধ)—ডাঃ বারজেস্ বারমেট্ ৭৮১

সমুদ্র সৈকতে (কবিতা) শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী ৩৭৮
সমুদ্রের খেলা (কবিতা)—শ্রীবিমলকৃষ্ণ সরকার ২২১
সাড়া (কবিতা)—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ৯৩৩
সাধু সালবেগ (প্রবন্ধ)—শ্রীজনরঞ্জন রায় ১২৭
সামাজিক ও দাম্পত্য স্বাস্থ্যবিজ্ঞান (প্রবন্ধ)—
ডাঃ সুবোধ মিত্র ৮৫৭
সাময়িকী— ১৫৪, ৩১৭, ৪৭৯, ৬৩৪, ৮০৮, ৯৭৭
সাহিত্য-সংবাদ— ১৭৬, ৩৩৬, ৪৯৬, ৬৫৬, ৮১৬, ৯৯২
সিক্তা (কবিতা)—শ্রীইলারাণী মুখোপাধ্যায় ৪১৫
সিঙ্কের পাঞ্জাবী (গল্প) শ্রীবামাদাস চট্টোপাধ্যায় ১৬৫
সেরাইকেলা ভ্রমণ (সচিত্র)—শ্রীকাননগোপাল বাগচী ৯০২
সৌম্যেন্দ্র করকমলে (কবিতা)—নিশিকান্ত ৪৭৮
স্পেন-বিপ্লবের পটভূমিকা (রাজনীতি)—শ্রীসুধাংশুকুমার বসু ৩১১
স্বর্গ (কবিতা)—শ্রীসুরেশ্বর শর্ম্মা ৯৩৩
স্বপ্ন (কবিতা)—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৫৯১
স্ব-ভাব ও স্ব-ধর্ম্ম (দর্শন)—শ্রীঅরবিন্দ ১৭৭, ৪৪২
স্বরলিপি—জগৎ ঘটক, রবীন্দ্রমোহন বসু, শ্রীমতী সাহানা দেবী,
শ্রীদিলীপকুমার রায় ২৩, ২০৭, ৪৩১, ৫৩৫, ৭০৩, ৮৬৫
হয় ত (গল্প)—শ্রীগৌতম সেন ২৫৩
হরিহরছত্রে (ভ্রমণ)—শ্রীপ্রতুলচন্দ্র ঘোষ ৯৪
হবো আমি সাবধান (কবিতা)—শ্রীদেবনারায়ণ গুপ্ত ২৫৭
হে সমুদ্র, হে অনন্ত (কবিতা)—শ্রীজ্যোতির্ম্ময় ভট্টাচার্য্য ৯১৬

চিত্র সূচী—মাসানুক্রমিক

আষাঢ়—১৩৪৬

কাশ্মীরে মেঘের খেলা ... ২৫
ঝিলমে তরণী-উৎসব ... ২৬
গুলমার্গের রাস্তা ... ২৭
নিশার বাগ ... ২৮
চেনারবাগ ও শঙ্করাচার্য্য পাহাড়ে মন্দির ২৯
তানমার্গ ... ৩১
মোহরাঙ্কিত করিবার যন্ত্র ... ৮১
উইলিয়াম ডাকওয়ালার সময় হইতে
প্রচলিত মোহরের চিত্রাবলী ... ৮১
হরকরা ডাক লইয়া রওনা হইতেছে... ৮২
একজন প্রাচীন পিয়ন ... ৮২
একজন প্রাচীন স্ত্রী-পিয়ন ... ৮৩
১৬৫৩ খৃঃ জোন ম্যানলেকে সরকার
ডাকঘরের কাজ ইজারা দেওয়ায় তাঁহাদের
মধ্যে যে লেখাপড়া হইয়াছিল তাহার
কিয়দংশের নকল ... ৮৩
ডাক বহনে প্রথম রেলগাড়ী ... ৮৪
লণ্ডন-বার্মিংহাম রেলপথে ব্যবহারের জন্য
প্রথম নির্ম্মিত ডাকগাড়ী ... ৮৪
পি এণ্ড ও কোম্পানীর প্রথম জাহাজ ৮৫
জাহাজ হইতে ডাক নামানো ... ৮৫
জাহাজের ডাক মিলানো ... ৮৫
রেলে ডাক বোঝাই দেওয়া ... ৮৬
ডাক কর্ম্মচারীদের পদানুসারে
পোষাকের পার্থক্য ... ৮৬
প্রথম পোষ্টাল ইউনিয়নের গৃহ ... ৮৭
বার্লিন পোষ্টাল মিউজিয়াম ... ৮৭
জনতার রূপ—সোনপুর মেলা ... ৯৭
মহেন্দ্র ঘাট—পাটনা ... ৯৭
হরিহরনাথের মন্দির ... ৯৮
সোনপুর মেলা ... ৯৯
বিষাক্ত ব্যাঙের ছাতা ... ১২১
ছত্রাকের দেহ ... ১২২
মৃগ-শৃঙ্গ ছত্রাক ... ১২২
বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের আহার্য্য ছত্রাক ... ১২২
মাটির তাড়া ... ১২৩
আহার্য্য ছত্রাক ... ১২৩
লাইকোর্পাডন বংশের বৃহৎ ছত্রাক ... ১২৩
শৃঙ্গ ছত্রাকের বিষ নাই ... ১২৩
ব্রাকেট ছত্রাক ... ১২৪
এগারিকস বংশের ছত্রাক ... ১২৫
বৃক্ষবাসী ওসটার ছত্রাক ... ১২৫
বৃক্ষবাসী বিচিত্র বর্ণের ছত্রাক ... ১২৫
জুর কর্ণ ... ১২৬
গাছের পাতায় এক জাতীয় ছত্রাক ... ১২৬
সাধু সালবেগের সমাধি ... ১২৭
ইতালীর সাম্রাজ্য (মানচিত্র) ... ১৩৭
স্পেনের অবস্থান (মানচিত্র) ... ১৩৯
অরুণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১৬২
বিজনবালা ঘোষ দস্তিদার ... ১৬৩
কে ভট্টাচার্য্য ... ১৬৬
জি কার্ভে ... ১৬৬
কে দত্ত ... ১৬৬
বেণীপ্রসাদ ... ১৬৬
কিংসলি ... ১৬৬
নুরমহম্মদ ... ১৬৬
মুর্গেশ ... ১৬৭
আব্বাস ... ১৬৭
এস মিত্র ... ১৬৭
মোহিনী ব্যানার্জী ... ১৬৭
প্রেমলাল ... ১৬৮
ইষ্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়গণ ... ১৬৮
কালীঘাট ক্লাবের খেলোয়াড়গণ ... ১৬৯
দিল্লীর বেঙ্গলী হাইস্কুলের ছাত্রবৃন্দ ... ১৬৯
তালুকদার ... ১৭০
জন ... ১৭০
গাউস ও সাবুর ... ১৭১
আস্‌ডেয়ান টিমের ক্যাপটেন হুইটোন
কাপ নিচ্ছেন ... ১৭১
চ্যাম্পিয়ন হরবল সিং ... ১৭১
বক্সিং টুর্ণামেণ্টের প্রতিযোগিগণ ... ১৭২
কিংস্‌লে কেনার্‌লে ... ১৭২
আর্ম্মষ্ট্রং ও রোডারিক ... ১৭৩
এম সি এস কাপ বিজয়ী ... ১৭৩
দিল্লী বেঙ্গলী স্কুলের বি শ্রেণীর
চ্যাম্পিয়নশিপ বিজয়ী ছাত্রবৃন্দ ... ১৭৪
দিল্লী বেঙ্গলী হাই স্কুলের ছাত্রবৃন্দের
কাঠিনৃত্য ... ১৭৫
নিউ দিল্লী বেঙ্গলী হাইস্কুলের ছাত্রদের
কাঠ হুইল কসরৎ ... ১৭৫

দ্বিবর্ণ চিত্র

১। প্রকৃতি
২। নয়নের মণি

৩। মন্দিরদ্বার
৪। সবদেবতার আদরের ধন
৫। নিত্যকালের তুই পুরাতন
৬। শকুনির স্বর্গ
৭। ঝড়ের পূর্বে

বহুবর্ণ চিত্র

১। সূর্য্যোদয় (গণ্ডা পর্ব্বতে)
২। ঋষ্যশৃঙ্গ
৩। তুষারগিরি
৪। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

শ্রাবণ—১৩৪৬

ডালহ্রদ ... ২০৯
উলার হ্রদ ... ২১০
নরওয়ের ফিওর্ড ... ২১১
" " ... ২১২
নিশারবাগ ... ২১৩
" ... ২১৩
শালিমার বাগ ... ২১৪
গুলমার্গ ... ২১৫
পাহাল গাঁ ... ২১৬
১১৬নং প্যাঁচের ১ম চিত্র ... ২৭৬
" " ২য় " ... ২৭৬
১১৭নং " ১ম " ... ২৭৬
" " ২য় " ... ২৭৭
১১৮নং " " ... ২২৭
১১৯নং " ১ম " ... ২৭৭
১১৯নং " ২য় " ... ২৭৭
১২০নং " ১ম " ... ২৭৮
" " ২য় " ... ২৭৮
১২১নং " ১ম " ... ২৭৮
" " ২য় " ... ২৭৯
১২২নং " ১ম " ... ২৭৯
" " ২য় " ... ২৭৯
১২৩নং প্যাঁচ ... ২৮০
১২৪নং " ... ২৮০
বেতার—১ম চিত্র ... ২৮১
" ২য় " ... ২৮২
" ৩য় " ... ২৮৩
" ৪র্থ " ... ২৮৪
" ৫ম " ... ২৮৬
" ৬ষ্ঠ " ... ২৮৭
" ৭ম " ... ২৮৭
" ৮ম " ... ২৮৮
মাছের দেহ হইতে জোঁকের রক্ত শোষণ ৩০৫
টাইগার বিট্‌লের শিকার আক্রমণ ... ৩০৫
পাইকের খাদ্য ভক্ষণ ... ৩০৬
ড্রাগন ফ্লাই পতঙ্গ ও তাহার শিকার ৩০৭
কাঁকড়ার সুদৃঢ় দাড়ায় মাছের আত্ম-সমর্পণ ৩০৮
কচ্ছপের নিকট হইতে শিকারের
আত্মরক্ষার ব্যর্থ চেষ্টা ... ৩০৯
মাতা টেরাপিন শীকারকে প্রলোভন
দেখাইতেছে ... ৩১০
শ্রীশান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় ... ৩২২
শ্রী এন্ জি দত্ত ... ৩২২
কুমারী বাণী ঘোষ ... ৩২২
শ্রীউপেন্দ্রনাথ দে ... ৩২২
শ্রীসুশীলকুমার রায় ... ৩২৩
রামবল্লভ মন্দন ... ৩২৩
আর গ্রাণ্ট ... ৩২৪
জর্জ হেডলে ... ৩২৪
ষ্টোলমেয়ার ... ৩২৫
সি, বি, ক্লার্ক ... ৩২৫
আর্থার উড্ ... ৩২৫
ইংলণ্ড ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজদলের প্রথম টেষ্ট
খেলায় হেডলে বোলার রাইটের একটি
বল বাউণ্ডারীতে পিটে উইকেটের
সামনে পড়ে গেছেন ... ৩২৬
মিচেল ভেরিটির বলে ই কিলিককে
স্লিপে লুফছেন ... ৩২৭
সাটক্লিফ ... ৩২৭
ও'রেলী ... ৩২৮
বল আটকাতে গিয়ে ডেসরেমঁ।
ভূতলশায়ী হয়েছেন ... ৩২৮
নিকলস্ ১৪৬ রাণ পূর্ণ করছেন ... ৩২৮
কুইন্‌স ক্লাব টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপ ফাইনালে
ক্রীড়ারত গাউস মহম্মদ ... ৩২৯
মার্কেল ... ৩২৯
উইলিয়াম টার্ণে উইম্বলডন টেনিস
ফলাফলের বোর্ড প্রস্তুত করছেন ৩৩০
যন্ত্র সাহায্যে টেনিস বল পরীক্ষা
করা হ'চ্ছে ... ৩৩০
আম্পায়ার সীটের নিম্নভাগে ঠাণ্ডা
রাখবার যন্ত্র ... ৩৩০
আন্তর্জ্জাতিক ফুটবল খেলায় ভারতীয়
ও ইউরোপীয় খেলোয়াড়গণ ৩৩১
মোহনবাগান ও ক্যামেরোনিয়ান্সের খেলায়
রাসেল একটি বল রক্ষা করছেন ৩৩২
কালীঘাটের গোলরক্ষক একটি অব্যর্থ
গোল রক্ষা করছেন .. ৩৩৩
মহিলাদের ক্রিকেট খেলায় কুমারী
হাউড ব্যাট করছেন ... ৩৩৪
গ্রেগারী ক্যাচ নিয়ে ক্রমকে আউট
করেছেন ... ৩৩৫
ওয়েট চ্যাম্পিয়ান আর্ম্মষ্ট্রং ... ৩৩৬

দ্বিবর্ণ চিত্র

১। নদীর বাঁক
২। চাঁদিনী রাতি
৩। দুষ্ট বুদ্ধি
৪। খুদে পণ্ডিত
৫। আনন্দের আতিশয্যে
৬। সান্ধ্য সৌন্দর্য্য
৭। পেশোয়ারে দেশগৌরব সুভাষচন্দ্রের
অভ্যর্থনা
৮। মাহেশে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা

বহুবর্ণ চিত্র

১। কালরাত্রি
২। মৎস্য শিকার
৩। মনসার গান
৪। আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য

ভাদ্র—১৩৪৬

লক্ষ্মীর পিঁড়ি ... ৩৬৫
পূজা-পার্ব্বণের নক্সা ... ৩৬৬
লক্ষ্মীপূজা ... ৩৬৭
পিঁড়ির নক্সা ... ৩৬৭
জলচৌকির নক্সা ... ৩৬৮
অন্নপ্রাশনের পিঁড়ি ... ৩৬৯
বিবাহে বরের পিঁড়ি ... ৩৬৯
সম্প্রদানে ক'নের পিঁড়ি ... ৩৭০
হাতে পো কাঁখে পো ... ৩৭১

খুন্তিলতা ও কদলীলতা ... ৩৭২
আমেরিকার পুরাতন সভ্যতার মৃৎশিল্পে আলঙ্কারিক চিত্র ... ৩৭২
জার্মান অপেরায় হিটলার ও তাঁর পারিষদবর্গ ... ৩৭৯
বের্লিন গির্জা ... ৩৭৯
সরকারী অপেরা—বের্লিন ... ৩৮০
জার্মানী পার্লিয়ামেণ্ট, বিসমার্কের প্রতিমূর্ত্তি ৩৮০
ফ্রেডারিক দি গ্রেট—উণ্টার ডেন লিণ্ডেন ৩৮১
আমাদের স্বস্তিক সোজা ... ৩৮১
ওদের স্বস্তিক বাঁকা ... ৩৮১
ব্রাণ্ডেনবুর্গ ফটক ... ৩৮১
বের্লিনের বিজয়স্তম্ভ ... ৩৮২
শার্লটেনবুর্গ দুর্গ ... ৩৮৩
অজ্ঞাত সৈনিকের সমাধি—অভ্যন্তর ৩৮৩
অজ্ঞাত সৈনিকের সমাধি—রক্ষীর দল ৩৮৪
প্রভা দেবী, উমা, ধরণীকুমার ... ৪১৯
শিলডে ধরণীকুমার ... ৪২১
য়েলেন স্কেল ... ৪৬৫
মাকড়সার জাল ... ৪৬৯
লক্ষদানপটু মাকড়সার জাল ... ৪৭০
গৃহবাসী মাকড়সা ... ৪৭১
বাগানবাসী মাকড়সা ... ৪৭১
গোপনীয় স্থানে শিকারের অপেক্ষায় মাকড়সা ... ৪৭২
মাকড়সা ও তাহার ডিম্বের থলি ... ৪৭২
মাকড়সা তাহার জালের প্রথম সূতা বয়ন করিয়াছে ... ৪৭৩
জালের কাঠামো শেষ হইলে উহাকে ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া গাড়ীর স্পোকের আকারে সূতা বয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে ... ৪৭৩
চতুর্ভুজের মধ্যভাগে গাড়ীর চাকার স্পোকের আকারে সূতা বুনা শেষ করিয়া মাকড়সা জালের মধ্যস্থলে কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম লইতেছে ৪৭৩
জালের মধ্যস্থল হইতে চিত্রে বর্ণিত আকারে সূতা বুনিতে আরম্ভ করিয়াছে ... ৪৭৪
মাকড়সার সম্পূর্ণ তৈয়ারী জাল ... ৪৭৪
জলের তলদেশে দুইটি জলবাসী স্ত্রী-মাকড়সার যুদ্ধ ... ৪৭৪
জলবাসী মাকড়সা পশ্চাদ্ভাগের পায়ের সাহায্যে বৃহৎ জলবুদ্বুদ আনিতেছে ৪৭৫
জলবাসী মাকড়সার বাসগৃহ ... ৪৭৪
কাঁকড়া মাকড়সা শিকারের জন্য ফুলের পশ্চাৎভাগে অপেক্ষা করিতেছে ৪৭৬
কাঁকড়া মাকড়সা ও তাহার শিকার ৪৭৭
আলো তৈয়ারকারী মাকড়সার গৃহ ৪৭৭
১৯৩৯ সালের শীল্ড বিজয়ী পুলিশদল ৪৮৪
খুলনা ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন ... ৪৮৫
লীগ কাপ ... ৪৮৭
এম ব্যানার্জী ... ৪৮৭
এ রায় চৌধুরী ... ৪৮৭
বিমল মুখার্জী ... ৪৮৭
কে দত্ত ... ৪৮৭
দ্বিতীয় বিভাগের লীগ চ্যাম্পিয়ন স্পোর্টিং ইউনিয়ন ... ৪৮৮
ক্রাঙ্ক উলি কিংস স্কুলের ছাত্রদের ক্রিকেট শিক্ষা দিতেছেন ... ৪৮১
সি বি ক্লার্ক ... ৪৯০
হেডলে ... ৪৯০
গ্রাণ্ট ... ৪৯০
হার্ডষ্টাফ ... ৪৯১
বাউস ... ৪৯১
লর্ডস মাঠে দর্শকদের সুবিধার জন্য স্কোর কার্ড ... ৪৯১
হিউমান ... ৪৯২
ওয়েলার্ড ... ৪৯২
নিকলস ... ৪৯২
জেমস্ ল্যাংরিজ ... ৪৯২
ওয়্যাট ... ৪৯২
নিপিজ্ রেস ... ৪৯৩
কীটন ... ৪৯৪
গাউস মহম্মদ ... ৪৯৪
সাবুর ... ৪৯৪
জো লুইস ... ৪৯৪
উইম্বলডন প্রতিযোগিতা বিজয়ী রিগ ও বিজিত কুক ... ৪৯৫
কুস্তি প্রতিযোগিতা ... ৪৯৬

বহুবর্ণ চিত্র

১ পিঞ্জরে
২। পক্ষী-সংসার
৩। বারি-আহরণ
৪। যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিবর্ণ চিত্র

১। অমরনাথের পথ
২। মিলন-সন্ধ্যা
৩। হেথা দুইবেলা ভাঙা-গড়া-খেলা —অকূল সিন্ধুতীরে
৪। গঙ্গাবক্ষে সন্ধ্যা
৫। ১৯৩৯ সালের লীগচ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান

আশ্বিন—১৩৪৬

ঝিলম ও বজরা ... ৫২৯
শ্রীমতী দে-জায়া ও তাঁহার পোষা বাঘ ৫৩০
কাশ্মীরে সিন্ধু নদে তুষার দৃশ্য ... ৫৩১
গান্ধীজি, আব্দুল গফুর খাঁ প্রভৃতি ... ৫৩২
সীমান্ত গান্ধী ও তাঁহার ভ্রাতা ডাঃ খাঁ সাহেব ... ৫৩৩
ডালহুদ ও শঙ্করাচার্য্যের পাহাড় ... ৫৩৪
ব্লু বয় ... ৫৬১
ডাচেস্ অফ ডেভনসায়ার ... ৫৬১
হর্নেক ভগ্নীদ্বয় ... ৫৬২
শিল্পীর কন্যাদ্বয় ... ৫৬২
বিমল বয়স ... ৫৬৩
টমাস গেন্সব্রো ... ৫৬৩
সার বশুয়া রেণল্ডস ... ৫৬৪
গর্ভগৃহের আভ্যন্তরীণ মূর্ত্তি—দেবগড় ৬৮৮
আর একটি দ্বিতল মন্দির—দেবগড় ... ৫৮৮
দশাবতার মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ... ৫৮৯
জৈনমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ... ৫৮৯
দেবগড় উপত্যকায় বৃহৎ মন্দিরের পাষাণ নির্ম্মিত বাতায়ন ... ৫৮৯
দেবগড় উপত্যকার উপরস্থ দ্বিতল একটি মন্দির ... ৫৯০
বৃহৎ মন্দিরের সভামণ্ডপ ... ৫৯১
আয়ান ঘোষ লোকটা সুবিধার নহে ... ৫৯৩
চন্দ্রার নৃত্যচপলা মূর্ত্তির পাশে বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণের ফটো ছাপা হইল ... ৫৯৫
চতুর্ভুজ সূর্য্যমূর্ত্তি—মঙ্গলবাড়ী ... ৫৯৬
মার্ত্তণ্ড ভৈরব 'আন্ডা' ... ৫৯৬

ষড়ভুজ সূর্য্যমূর্ত্তি মহেন্দ্র ... ৫৯৭
দ্বিভুজ সূর্য্যমূর্ত্তি ঝেড়া ... ৫৯৮
জার্মানীর প্রমোদগৃহ ... ৬১৪
দুর্গ, গির্জা ও ফ্রেডারিকের মূর্ত্তি ... ৬১৪
বের্লিন—নতুন ধরণের রাস্তা, বেতার মাস্তুল ৬১৫
বের্লিনের টাউন হল ... ৬১৫
বিজয়স্তম্ভ ও ফ্রেল রঙ্গমঞ্চ ... ৬১৫
বের্লিনের অশ্বশালা ... ৬১৬
বের্লিনের রাজপ্রাসাদ ... ৬১৬
বের্লিনের একটি থিয়েটার ... ৬১৭
জার্মানীর জাতীয় যাদুঘর ... ৬১৭
আলেকজাণ্ডার প্লাজা (পার্ক) ... ৬১৮
জার্মানীর সরকারী দপ্তরখানা ... ৬১৮
পট্‌সড্যাম পার্ক—বের্লিন ... ৬১৯
ঘূর্ণায়মান ফাইল ... ৬২০
মাথার মাপ লইবার যন্ত্র ... ৬২০
কাচ অপসারণ যন্ত্র ... ৬২০
আবিষ্কারক জন্ এল্ ইয়ঙ্গ ... ৬২১
পেলিকেন 'এ্যাস্ টে' ... ৬২১
সুদৃশ্য মোটর যান ... ৬২১
শাকশব্জীর তৈয়ারী পুতুল ... ৬২২
রাশিয়ান ট্যাঙ্ক ... ৬২৩
সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ শব্দ শৃঙ্খল ... ৬২৩
শিশুদের গ্যাস মুখোস ... ৬২৩
সাধারণ পিঙ্গলবর্ণের গিরগিটিকে বিচিত্র বর্ণে রূপান্তরিত করা হয়েছে ... ৬২৪
অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ডাঃ টিউটা গিরগিটির ভাগ্য পরিবর্ত্তন করছেন ৬২৪
গিরগিটির ভ্রূণকে বৃহৎ আকারে দেখান হয়েছে ... ৬২৪
গাড়ীর চালে মাছধরা ছিপ ... ৬২৪
রবীন্দ্রনাথ ... ৬৩৯
হার্ডষ্টাফ ... ৬৪৮
জর্জ্জ হেডলে ... ৬৪৮
কন্সটাণ্টাইন ... ৬৪৮
হ্যামণ্ড ... ৬৪৯
এল হ্যাটন ... ৬৪৯
অফিস ইণ্টার-ন্যাসনালের ভারতীয় ও ইউরোপীয় খেলোয়াড়দল ৬৫০
পূর্ণচন্দ্র মেমোরিয়াল কাপ বিজয়ী বৌবাজার দল ... ৬৫০
সাত মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা বিজয়ী মণীন্দ্রকুমার চ্যাটার্জ্জী ... ৬৫১
ফিক্সড বোর্ড ডাইভিং বিজয়ী অজিত রায় ৬৫১
সাত মাইল সন্তরণে দ্বিতীয় মহাদেবচন্দ্র দাস ... ৬৫১
মদনমোহন সিংহ ... ৬৫১
দুর্গাদাস ... ৬৫১
১০০ মিটার সন্তরণে বালিকাদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকারিণী কুমারী সুখলতা পাল ... ৬৫৩
৪০০ মিটার রীলে রেস বিজয়ী ন্যাসনাল সুইমিং ক্লাব ... ৬৫৩
১১০ মিটার বিজয়ী দিলীপকুমার ... ৬৫৪
লে হাঁয়ার্স হাইজাম্প অনুশীলন করছেন ৬৫৪
রণভির সিং টেনিস খেলোয়াড়কে শিক্ষা দিচ্ছেন ... ৬৫৫
যুধিষ্ঠির সিং ... ৬৫৭
পঙ্কু সেন ... ৬৫৭

বহুবর্ণ চিত্র

১। সুরা ও কাব্যে এস আজ রচি বনতলে রূপলোক
২। গীতিকাব্য
৩। বর্ষার চাঁদিনী
৪। আচার্য্য মুরলীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিবর্ণ চিত্র

১। কাশ্মীরের মেষপালক
২। এই পড়লো
৩। উড়ো মেঘ
৪। শেষ রশ্মি
৫। অম্বুবাচী মেলা
৬। কলিকাতায় বাঁটোয়ারা বিরোধী সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত এম-এস-আনে বক্তৃতা করিতেছেন। বামপার্শ্বে স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ও স্যর নৃপেন্দ্রনাথ সরকার উপবিষ্ট।
৭। এম্পায়ার এয়ার ডে প্রদর্শনীতে আর-এফ-এ-র বোমা-নিক্ষেপক বিমানের ক্রীড়া প্রদর্শন। বিমানশ্রেণীকে মেঘের উপরে দেখা যাইতেছে।

কার্ত্তিক—১৩৪৬

তিরোবতুর মন্দির ... ৭০৫
মাইলাপুরের মন্দির ... ৭০৬
তানজোরের মন্দিরের গোপুরম্ ... ৭০৭
মাদুরার মীনাক্ষি মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ পুষ্করিণী ... ৭০৭
মাদুরার মীনাক্ষি মন্দিরের প্রবেশ-দ্বার ৭০৮
মীনাক্ষি মন্দিরে অভ্যন্তরের কারুকার্য্য ৭০৯
মাদুরা শহর হইতে দুই মাইল দূরে অবস্থিত মণ্ডপ, পুষ্করিণী ইত্যাদি ... ৭০৯
মাদুরার বিষ্ণু মন্দির ... ৭১০
সমুদ্রতটে মহাবলীপুরের মন্দির ... ৭১০
পক্ষীতীর্থ ... ৭১১
রামনাথ স্বামীর মন্দির—রামেশ্বর ... ৭১১
নবী আক্তার ... ৭২৯
হায়না ... ৭৩০
বন্য শূকর ... ৭৩১
ব্যাঘ্র ... ৭৩২
চিতা ... ৭৩৩
হরিণ ... ৭৩৩
ভারতে অন্ধতা নিবারণের সোপান ৭৪২
ট্যারা চোখ ... ৭৪৩
গ্লকোমা ... ৭৪৩
শর্ট-সাইটেড্‌নেস্ ... ৭৪৪
চোখ ফোলা ... ৭৪৪
দৃষ্টিহীনতা ... ৭৪৫
জন্মগত অন্ধ ... ৭৪৫
টীকা লও ... ৭৪৬
আনাড়ীকে চোখ দেখাইও না ... ৭৪৬
সোজা চাও ... ৭৪৭
শাড়ীর আঁচল দিয়া শিশুর চোখ মুছাইবে না ৭৪৭
পটকা বাজী হইতে সাবধান ... ৭৪৮
অন্যের ব্যবহৃত তোয়ালে দিয়া চোখ মুছিবে না ... ৭৪৯
ট্র্যাকোমা হইতে সাবধান ... ৭৫০
গ্লকোমা ... ৭৫১
ছানি ... ৭৫১
নৃত্যরতা এবা ... ৭৫৩
খেয়ালিনী উমা ... ৭৫৫
কৃষ্ণভক্ত কবি আবুল হাফিজ জলন্ধরী ৭৫৭
গফুর খাঁর পেশোয়ারি আতিথ্য ... ৭৫৯

ই এইচ, কাশবার্ন ... ৭৬৯
গার্নার লেমেহ্যান এবং ও'ডানাইলের ব্যবহৃত পেন্সিল ও হস্তাক্ষর ... ৭৬৯
দোকানদারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য পুরাতন মোটর হর্ন ... ৭৭০
যন্ত্র দ্বারা বৃক্ষের ক্লোরোফিলের ঘনীভূতকরণ পরীক্ষা ... ৭৭০
যন্ত্র সাহায্যে পরিপাক ক্রিয়া পরীক্ষা ৭৭০
মিঃ রোসাইরি জি বেলাঙ্গার টাইপ রাইটারে ছবি আঁকছেন ... ৭৭১
তাঁর আঁকা ছবি জর্জ্জ ওয়াশিংটন ... ৭৭১
সামুদ্রিক পীড়ার চিকিৎসা ... ৭৭১
সময় নির্দ্দেশক মোটর ... ৭৭২
কৃত্রিম চক্ষু সাহায্যে ক্ষীণ দৃষ্টিশক্তির দোষ অনুকরণ ... ৭৭২
ডান দিকের উপরে দৃষ্টিশক্তিহীন চক্ষু ৭৭২
গোলকটিকে ছাতার মত গুটিয়ে স্বচ্ছন্দে হাতে রাখা হয়েছে ... ৭৭৩
গুটান ছাতাটি গোলক আকার ধারণ করেছে ... ৭৭৩
আলোকসঞ্চারী থলের মধ্যে লাল মাছ ৭৭৩
ডান দিকের উজ্জ্বল আলোতে রোগীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করা শেষ হলে ডান দিকের যন্ত্রটিতে রোগীকে একটি তীরের গতি পরীক্ষা করতে দেওয়া হয় ... ৭৭৪
মিঃ বোনার্জ্জী মরনিংওয়াক করছেন ৭৯১
সামান্য দক্ষিণা লইয়া ছাত[illegible]ালা এমন একটি ব্যবস্থা করিয়া দিল ... ৭৯৩
আবার উভয়ে বলপ্রয়োগ করিলেন .. ৭৯৫
ব্রহ্মর্ষি সত্যদেব ... ৭৯৯
নাওমল ... ৮১১
গোপাল দাস ... ৮১১
পেলেষ্টাইন ফুটবল দল ... ৮১১
জো লুই ... ৮১২
ইণ্ডিয়ান স্কুল স্পোর্টস এসোসিয়েশনের সাধারণ বয়েজ স্কাউট ... ৮১২
মল্লযুদ্ধে রত মিচেল গিল ও নাজিম... ৮১২
ইউনিভার্সিটি বাচ প্রতিযোগিতায় বিত্তাসাগর কলেজ দল ... ৮১৩
ঢাকা বাচ প্রতিযোগিতায় জগন্নাথ ইণ্টার কলেজ দল ... ৮১৩
রিপন কলেজ ফুটবল দল ... ৮১৪
হেলন জ্যাকব ... ৮১৪
মার্ব্বেল ... ৮১৪
রিগস্ ... ৮১৪
তালতলা ইনষ্টিটিউট স্পোর্টসের এক লেংথ পিট সাঁতার (জুনিয়র) বিজয়ী প্রতীপ মিত্র ... ৮১৫
স্কটিস চার্চ কলেজ দল—মেয়েদের বাস্কেট ... ৮১৫
ইণ্টার-কলেজিয়েট বাস্কেট বল ... ৮১৫

দ্বিবর্ণ চিত্র

১। এবমুক্ত্বা সমুৎপত্য সারূঢ়া তং মহাসুরম্, পাদেনাক্রম্য কণ্ঠে চ শূলেনৈনমতাড়য়েৎ।
২। প্রকৃতির গান
৩। ব্রহ্মপুত্রে মৌসুমির বিক্রম
৪। রূপান্তর

বহুবর্ণ চিত্র

১। প্রেমের স্বর্গ
২। সাগরকূলে
৩। শারদোৎসব
৪। শিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম

অগ্রহায়ণ—১৩৪৬

জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি সেরাইকেলা ... ৯০২
হো-দের শ্মশানদিরি ... ৯০৩
সেরাইকেলায় নির্ম্মিত দড়ি ... ৯০৪
হো আদিবাসী সেরাইকেলা ... ৯০৫
ব্রহ্মময়ী মূর্ত্তি—ইউপুকুরে প্রাপ্ত ... ৯০৫
আগ্নেয় উৎপাতের ফলে আলোড়িত পাথর স্তম্ভ ... ৯০৬
কোল মেয়ে মাদুর বুনিতেছে ... ৯০৭
নদীতে বাঁধ দিয়ে মাছ ধরা ... ৯০৭
রথে জগন্নাথদেব—পুরী ... ৯২১
পুরীতে রথোৎসবের ভীড় ... ৯২২
পুরীর রথ ... ৯২৩
মার্কণ্ডেয় সরোবর ও মন্দির—পুরী ... ৯২৪
কপালমোচন শিবমন্দিরের বৃহৎ বৃষভ বাহন ... ৯২৫
নিম্নস্তরে কপালমোচন শিবমন্দির ... ৯২৬
মাটীর নীচে রেল ষ্টেশন—টোকিও ... ৯৪৫
ক্রিসন্থিমাম ফুল ... ৯৪৬
বাঁশের বেড়ার সম্মুখে জাপানী তরুণী ৯৪৭
ম্যাপেল ৯৪৭
চেরী ফুল ... ৯৪৮
টোকোনোমার বৃক্ষসজ্জা ... ৯৪৯
টোকোনোমার পুষ্পসজ্জা ... ৯৪৯
জাপানের পার্লামেণ্ট গৃহ ... ৯৫০
মন্দির দ্বার—টোকিও ... ৯৫১
রাজবাড়ীর তোরণ—টোকিও ... ৯৫২
স্ত্রী-পঙ্গপাল মাটির নিচে ডিম রাখছে ৯৬৯
পঙ্গপালের বিচিত্র সমাবেশ ... ৯৭০
পঙ্গপাল কঠিন মাটির উপর গর্ত্ত তৈয়ার করছে ... ৯৭১
পূর্ণবয়স্ক পঙ্গপাল ও তাহাদের ডিম... ৯৭১
পঙ্গপাল বিনাশের ফাঁদ ... ৯৭২
পঙ্গপালের ইন্দুর শিকার ... ৯৭২
অমর সিং ... ৯৮৭
বিজয় মার্চ্চেণ্ট ... ৯৮৭
এস ব্যানার্জি ... ৯৮৭
মানকাদ ... ৯৮৭
মেয়েদের বাস্কেট বলে ব্লু দল ... ৯৮৮
ন্যাসনাল সুইমিং স্পোর্টসের মিস ই সাণ্ডার্স কুমারী সুখলতা পাল, পার্ব্বতী দত্ত ... ৯৮৮
দক্ষিণ কলিকাতা সুইমিং এসোসিয়েসনের মিস্ এভেলিন সাণ্ডার্স ... ৯৮৯
মেয়েদের বাস্কেট বল প্রদর্শনী খেলায় বিজয়ী রেড্স দল ... ৯৮৯
মেয়েদের বাস্কেটবল প্রদর্শনী খেলায় ওয়াণ্ডার্স দল ৯৯০
ব্রাবোর্ণকাপ বিজয়ী ন্যাসনেল সুইমিং ক্লাব: ৯৯০
কমল বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৯৯০
অষ্টিন ... ৯৯১
রিগস ... ৯৯১
জ্যেকব্স ... ৯৯১
মার্ব্বেল ... ৯৯১
উইল্সমুডি ... ৯৯২

বহুবর্ণ চিত্র

১। লক্ষ্মীনারায়ণ
২। দীপান্বিতা
৩। অশোক সিংহলে বোধিবৃক্ষের চারা পাঠাইতেছেন
৪। বিপিনচন্দ্র পাল

দ্বিবর্ণ চিত্র

১। হে সম্রাট কবি, এই তব হৃদয়ের ছবি, এই তব নব মেঘদূত অপূর্ব্ব অদ্ভুত।
২। জেলে ডিঙ্গী
৩। বিমুগ্ধ বিস্ময়
৪। পরেশনাথের মন্দির—বেলগেছিয়া
৫। পরেশনাথের মন্দির—গৌরীবেড়ে

শিল্পাচার্য — শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

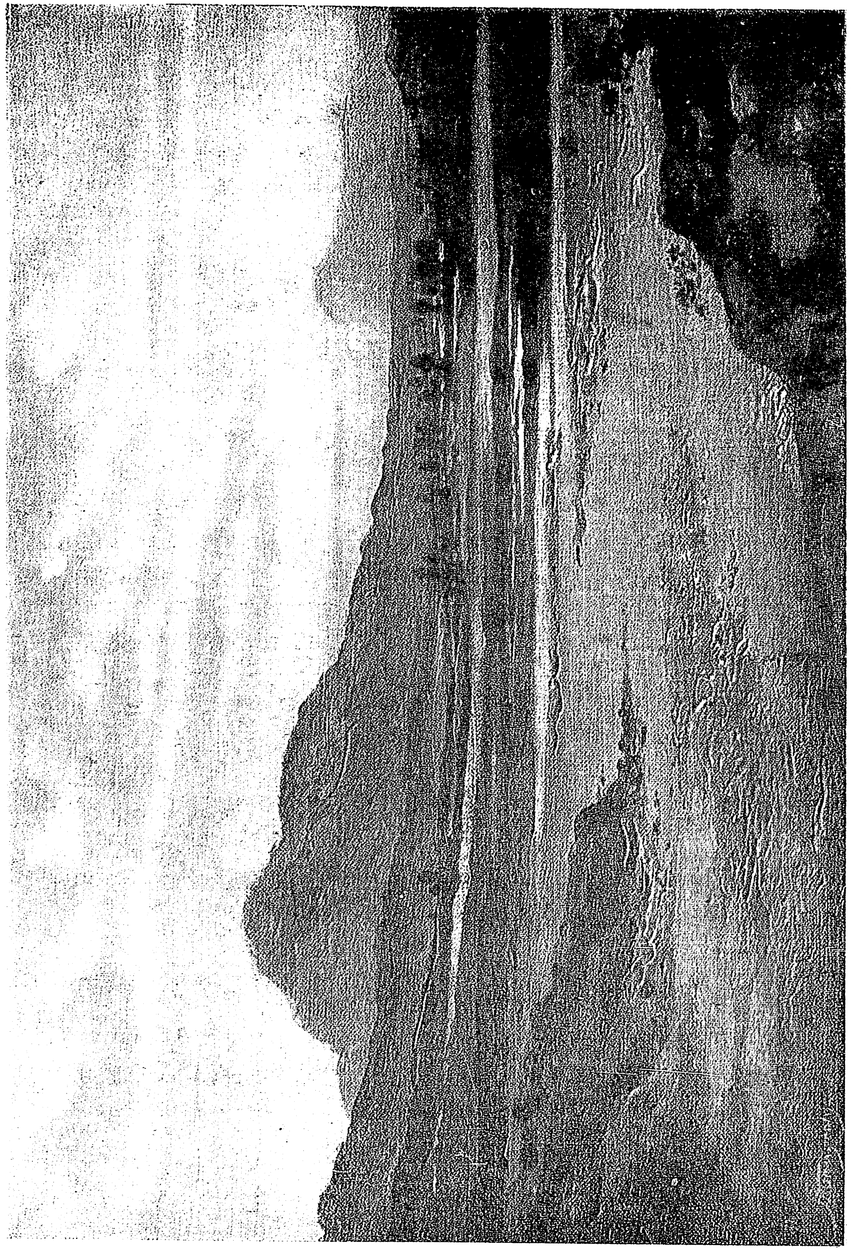

সূর্য্যোদয় (গঙ্গা পর্ব্বতে)

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

COLOURED ILLUSTRATION

শ্রীমোক্ষদা চরণ চক্রবর্তী, এম্ এ বি,টি,
অধ্যাপক — আনন্দ মোহন কলেজ।
ময়মনসিংহ।

আষাঢ়—১৩৪৬

প্রথম খণ্ড | সপ্তবিংশ বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ও অদ্বৈতমতবাদ

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

মানুষ আপাত-মনোরম জগতের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে ভাবে—ইহা কি সুন্দর, কি সুরম্য, আহা কত আরামের স্থান! এই জগতের জিনিষগুলি সব বুঝি চিরস্থায়ী! তাই সে—আমার পিতা, আমার মাতা, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার কন্যা, আমার বন্ধু, আমার ঘর, আমার বাড়ী, আমার জিনিষ, আমার দেশ প্রভৃতি কত প্রকারেই না, অহং মমরূপ বাসনা জালের সৃষ্টি করিয়া নিজেকে জড়ীভূত কচ্ছে তার ইয়ত্তা নাই। পিতামাতার স্নেহে মুগ্ধ হয়ে ভাবে পিতা-মাতার এই স্নেহ তার উপর নিশ্চয়ই চিরদিন সমান থাকবে; কিন্তু হায় জগতের এমনি নিয়ম—পুত্র যখনই পিতামাতার মতে মত দিতে না পারে—তাঁদের মতের বিরুদ্ধাচরণ করে—তখন যে পিতামাতা তাঁদের আদরের দুলালের জন্য নিজেরা কতদিন অনাহারে অনিদ্রায় থেকে সন্তানের কল্যাণ কামনা করেছেন, তাঁরাই আবার নিজ পুত্রের সমস্ত সুখসুবিধা উপেক্ষা করে, ত্যজ্যপুত্র করে, এমন কি সেই আদরের দুলালের কথা কাণে শুনতেও ইচ্ছা করে না—বরং বিরক্তি-বোধ করে। ইহাই জগতের রীতি। ইহাই মহামায়ার মায়া। যে স্ত্রী, পুত্র, কন্যা প্রভৃতির জন্য মানুষ কত কষ্ট, কত দুঃখ, কত লাঞ্ছনা সহ্য করছে, হায় অদৃষ্ট! তারাও আবার সুখ সুবিধার ব্যাঘাত দেখলে অমনি তাহাকে উপেক্ষা করে চলে যেতে সঙ্কোচবোধ করেনা। আজ যার আজ্ঞায় শত শত লোক চালিত হচ্ছে, দুদিন পরে তার কথায় কেহই কর্ণপাত করেনা। একদিন যে লক্ষপতি ছিল, যার দানে শত শত লোক জীবনধারণ করত, আজ সে ভিক্ষুক—পরের অন্নে জীবন ধারণ করে—ইহা আমরা প্রত্যহ দেখিতে পাই। কিন্তু এই বৈচিত্র্যময় জগতের পারে, যেথায় চিরশান্তি নিলয়, সমস্ত দুঃখের অবসান—সেখানে যেতে আমরা কয়জন আগ্রহ-শীল? ইহাই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মহামায়ার মায়া। এই

মহামায়ার মায়ায় যাহারা বদ্ধ তাহারাই মুগ্ধজীব; আর যাঁহারাই এই মহামায়ার কুহকরাশি ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহারাই মুক্ত—মহাপুরুষ, আচার্য্য বা ভগবান বলে পূজিত হয়েছেন।

মোহমুগ্ধ জীবের চেতনা আনিবার জন্য—আমাদের উদ্ধারের জন্য নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তস্বভাব—ভগবান স্বীয় কোন প্রয়োজন না থাকিলেও জীবের প্রতি করুণা-পরবশ হয়ে এই মর্ত্ত্যভূমে অবতীর্ণ হন। সার্দ্ধ ত্রয়োদশ শতাব্দী পূর্ব্বে ৬৪২ সম্বতে বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে পুণ্যভূমি এই ভারতবর্ষের কেরল প্রদেশে পূর্ণানদীতটে কালাড়ী নামক পল্লীতে দরিদ্র ব্রাহ্মণ শিবগুরুর গৃহে বিশিষ্টাদেবীর গর্ভে এমন একজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—যাঁহার জ্ঞানের আলোতে জগতের তমসাচ্ছন্ন বহু মানব পথের সন্ধান পাইয়াছেন, জীবনমরণরূপ এই প্রহেলিকার পারে যেতে সমর্থ হয়েছেন। তাই সেই বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমী আজ আমাদের হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার করে যেন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে—ভয় নাই, এই পুণ্য তিথিতে ভব-ভয়হরী ভবতারণ শঙ্কররূপে অবতীর্ণ হয়ে জগতের তাপ-ক্লিষ্ট মুগ্ধ মানবকুলকে মাভৈঃ বাণী শুনাইয়া গিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্কর যখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তৎকালে হিন্দুধর্ম্ম এই হিন্দুস্থানে এমন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল যে, যদি ভগবান্ শঙ্করের মত তীক্ষ্ণধী মহামানব এই ভারতবর্ষে আবির্ভূত না হতেন তাহা হইলে হয়ত আজ হিন্দুর অস্তিত্বই থাকিত কিনা সন্দেহ।

যাঁরা মাত্র পরদুঃখে কাতর হয়ে এই দুঃখ শোক তাপের নিলয় বহু বৈচিত্র্যময় জগতের মাঝে জীবের কল্যাণের জন্য আবির্ভূত হন, শাস্ত্র সেই পূর্ণকাম আপ্তকাম মহাপুরুষ-গণকেই অবতার নামে অভিহিত করেছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন—

নমে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্তএব চ কর্ম্মণি ॥৩।২২

হে পার্থ! ত্রিলোক মধ্যে আমার কর্ত্তব্য বলে কিছু নাই, কারণ আমার অভিষ্টদায়ক কিছু নাই। পাবারও কোন কিছু বাকী নাই, কিন্তু তবুও (লোকশিক্ষার নিমিত্ত) আমি কর্ম্ম করি।

ভগবান্ জীবের প্রতি করুণা করিয়া দেহ ধারণ করেন। নিজের কোন কামনা না থাকলেও তিনি যে অবতীর্ণ হন তাহাও তিনি গীতাতে বলিয়াছেন—

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥৪।৬

আমি জন্মমরণরহিত পরমাত্মা, প্রাণীগণের ঈশ্বর হয়েও তবু নিজ প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া নিজের মায়ার দ্বারায় দেহ ধারণ করি।

এবম্বিধ যে ভাগবতী তনু তাহাকেই শাস্ত্র অবতার নামে অভিহিত করে। অবতার শব্দের ব্যুৎপত্তি দেখলেও মনে হয় ইহাই সত্য। অব+তৃ ধাতু ঘঞ্ প্রত্যয়ে অবতার শব্দ সিদ্ধ হয়। অব পূর্ব্বক তৃ ধাতুর অর্থ অবতারণা করা বা নেমে আসা। পরম কারুণিক পরমেশ্বর বহুবার বহুরূপে অবতীর্ণ হয়ে, সন্ত্রস্ত, ভীত, মোহগ্রস্ত, পতিত মানবকুলকে উদ্ধার করেছেন। "তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসার সাগরাৎ।" মৃত্যুরূপ সংসার-সাগর হইতে আমিই তাহাদিগের উদ্ধার-কর্ত্তা। যুগে যুগে এই প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য ভগবান্ নানারূপে আবির্ভূত হয়ে আমাদিগকে পথ দেখিয়ে যান। ভাগবত বলে—ভগবানের অবতার অসংখ্য, 'অবতারাহ্যসঙ্খেয়া'।

ভগবান্ তথাগত বুদ্ধের বাণী ভুলে গিয়ে মানবগণ যখন ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দিহান হয়ে প্রচার করতে লাগল—ঈশ্বর নাই—সমস্তই ক্ষণিক, সমস্তই শূন্য প্রভৃতি মতবাদ নিয়ে বৃথা কোলাহল সৃষ্টি করতে লাগল, ভগবান্ বুদ্ধের ত্যাগ, তপস্যা, বৈরাগ্য, পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি ভুলে গিয়ে শুধু অনাচার, অত্যাচার, ব্যাভিচার প্রভৃতিতে দেশ সমাচ্ছন্ন হয়ে উঠল, এক ভগবান্ বুদ্ধের বাণী অবলম্বন করে বহু সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হ'লো, সকলেই নিজ নিজ মতানুযায়ী ভগবান্ বুদ্ধের বাণীর ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করল, তখন আবার জ্ঞানগুরু বিশ্বাধার বিশ্বপতি এই ধরাধামে আচার্য্য শঙ্কররূপে আবির্ভূত হলেন। শুকদেব চরিত্রে আমরা দেখতে পাই তিনি এই স্বার্থমলিনতাপূর্ণ ধরণীতে আসবেন না বলে মাতৃগর্ভেই থাকতে চেয়েছিলেন; কিন্তু জননীর প্রাণ-নাশের আশঙ্কায় যদিও ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইয়াই তপস্যার জন্য পলায়ন করিয়াছিলেন। ভগবান্ শঙ্করে আমরা দেখতে

পাই তিনি জীবের দুঃখে কাতর হয়ে এই অবনীতে অবতীর্ণ হয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁহার কার্য্য কত শীঘ্র সমাপন করিতে পারেন তাহার জন্য জন্মাবধি তাঁহার আপ্রাণ চেষ্টা ছিল; তাই তাঁর জীবনের ঘটনাবলী পাঠ করিলে আমাদিগকে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। ৭ বৎসর বয়সের মধ্যে সমস্ত বেদ-বেদান্ত পাঠ শেষ করিয়া দেখিলেন—ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ রূপ চারি প্রকার পুরুষার্থের মধ্যে মোক্ষই পরম পুরুষার্থ; শ্রুতির নির্দ্দেশ "ন স পুনরাবর্ত্ততে" মোক্ষপ্রাপ্ত পুরুষ জন্ম-মরণরূপ সংসারে আর পুনরাবর্ত্তন করে না অর্থাৎ সে আর ফিরে আসে না। অন্যান্য জন্মের কৃতকর্ম্মের ফল যেরূপ এই জন্মে ভোগ হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, ইহজন্মের পুণ্যফলে স্বর্গাদি লোকপ্রাপ্তি হইলেও তাহা বিনাশশীল; অতএব মোক্ষলাভের উপায় যাহা, তাহাই অন্বেষণ করিতে হইবে। যে পরম-পুরুষ পরমাত্মার প্রশাসনে সূর্য্য, চন্দ্র, দ্যুলোক, পৃথিবী, দিবা, রাত্রি, মাস, ঋতু, সম্বৎসর ঠিক ঠিক নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে, তিনিই সকলের মধ্যে অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থিত থেকে সকলকে পরিচালিত কচ্ছেন। তিনিই সর্ব্বনিয়ন্তা, তাঁকে যে না জেনে এই লোক ত্যাগ করে—সে কৃপণ, কর্ম্মফলের কৃতদাসস্বরূপ। আর যে ব্যক্তি তাঁকে জেনে এই লোক ত্যাগ করে, তিনিই ধন্য তিনিই ব্রাহ্মণ। সমস্ত বেদরাশি যে পরমপাদ লাভ করিবার নির্দ্দেশ দিতেছে, ঋষিগণ যাহা লাভ করিবার জন্য তপস্যায় জীবন অতিবাহিত করেন, যাহা পাইবার জন্য মানুষ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করে—আমিও সেই কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন করি না কেন?

ন্যাস এব অত্যরেচয়ৎ, ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশু। সন্ন্যাসের দ্বারাই জন্মমরণরূপ সংসার অতিক্রম করা যায়। একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়। অতএব আমিও এই সংসারে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করি না কেন? সংশয় নিশ্চয়ে পরিণত হইল, তিনি ঠিক করিলেন এ সংসার ত্যাগ করিতেই হইবে। কিন্তু কেমন করিয়া বৃদ্ধা জননীর অনুমতি পাইবেন তাহাই হইল সমস্যা। তিনি মনের আবেগ বেশীদিন চাপিয়া রাখিলেন না, একদিন জননীকে তাঁহার মনের ইচ্ছা জানাইলেন। মা সেই অষ্টম বৎসরের বালক শঙ্করের মুখে এই নিদারুণ কথা শুনিয়াও তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, তাই তিনি প্রথমে নানাভাবে প্রলুব্ধ করিয়া পুত্রকে সংসার ত্যাগের ও সন্ন্যাসের বাসনা হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু বয়সে শিশু হইলেও জ্ঞানবৃদ্ধ শঙ্করের সন্ন্যাসবাসনা বাধা পাইয়া বেশী শক্তিশালী হইল; যখন দিবানিশি এক চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন তখন একদিন মাতাপুত্র নদীতে স্নান করিতে গিয়াছেন, মাতা স্নান সমাপন করিয়া কূলে উঠিয়াছেন, শিশু শঙ্কর তখনও নদীতে, এমন সময় হঠাৎ এক ভীষণ কুম্ভীর আসিয়া বলপূর্ব্বক শঙ্করকে গভীর জলে লইয়া যাইতে লাগিল; তখন আচার্য্য শঙ্কর কি যেন এক দৈববুদ্ধির প্রেরণায় মাকে ডাকিয়া বলিলেন—মা, এখন যদি তুমি আমাকে সন্ন্যাসের অনুমতি দাও তাহা হলে দুষ্ট কুম্ভীর হয়ত আমাকে ত্যাগ করিবে। মা দেখিলেন—আচ্ছা, এখন ত ছেলে আমার কুম্ভীরের মুখ হইতে বাঁচুক—তা সন্ন্যাসের অনুমতি দিই না কেন? এইরূপ ভাবিয়া বিশিষ্টা দেবী পুত্রকে সন্ন্যাসের অনুমতি দিবামাত্র দুষ্ট কুম্ভীরও শঙ্করকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। মাতাপুত্রে পরম আনন্দিত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু ঘরে আসিয়াই শঙ্করের সেই ভীষণ আবদার, মা এখন আর বাধা দিতে সমর্থ হইলেন না। ইতিপূর্ব্বেই তিনি তাঁহাকে সন্ন্যাসের অনুমতি দিয়াছেন। অত্যন্ত দুঃখের সহিত তিনি সংসারের একমাত্র অবলম্বন সমস্ত গুণের আধারস্বরূপ একমাত্র পুত্রকে বিদায় দিবার সময় বলিলেন—আমি এতদিন যে আশা করিয়াছিলাম তাহা বৃথা হইল। আমি ভাবিয়াছিলাম অন্তিমকালে তোমার মুখ দেখিয়া সংসারের সকল জ্বালাযন্ত্রণা দুঃখকষ্টের অবসান করিব এবং তুমি আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবে, সে বাসনা আমার সফল হইল না। এই কথা শুনিয়াই আচার্য্য বলিলেন—আচ্ছা মা, আমি তোমার এই বাসনাসকল পূর্ণ করিব; পরন্তু তোমার অন্তিমকালে তোমার ইষ্ট সাক্ষাৎকার করাইব। এই কথা শুনিয়া মা বলিলেন, তুমি তখন কোথায় থাকিবে তার কি ঠিক আছে? পুত্র শঙ্কর অমনি বলিলেন, তুমি অন্তিমকালে স্মরণ করিবামাত্র আমি মুখে মাতৃস্তন্যের স্বাদ পাইব এবং তৎক্ষণাৎ তোমার নিকট উপস্থিত হইব। এই কথা শুনিয়া বিশিষ্টা দেবী কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিয়া প্রাণাধিক পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন। আচার্য্য শঙ্কর মায়ের অন্তিমকালে উপস্থিত হইয়া নিজ প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন।

জননীর নিকট বিদায় লইয়া আচার্য্য শঙ্কর নর্ম্মদা তীরে গুরু গোবিন্দপাদের আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। কিম্বদন্তি যে গুরু গোবিন্দপাদ আচার্য্য গৌড়পাদের শিষ্য ছিলেন এবং তিনি আচার্য্য শঙ্করের প্রতীক্ষায় দীর্ঘকাল সমাধিমগ্ন অবস্থায় নর্ম্মদা তীরে অবস্থান করিতেছিলেন। এমন সময় আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার সেই সুরম্য তপোবনে গিয়া কুটীরের দ্বার বন্ধ এবং গুরু গোবিন্দপাদকে সমাধিস্থ দেখিয়া একটু চিন্তিত হইলেন কিন্তু হতাশ হইলেন না। দৈবীমায়া প্রভাবে সহসা নর্ম্মদার বেগ এমন প্রখর হইল যে বন্যার মত বেগে তাহা গুরুদেবের আশ্রম ভাসাইয়া লইয়া যায়, তখন আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার তপপ্রভাবে নর্ম্মদাকে শান্ত করিলেন; তাহা দেখিয়া গুরু গোবিন্দপাদ ধ্যানে বুঝিতে পারিলেন, যিনি কলনাদিনী জাহ্নবীকে শিরে ধারণ করিয়াছিলেন তিনিই আজ শঙ্কররূপে আমার আশ্রমে আসিয়া প্রবলস্রোতা নর্ম্মদার বেগ শান্ত করিয়াছেন। তিনি যে মহাপুরুষের প্রতীক্ষায় এখনও শরীর রাখিয়াছেন তিনি আজ আশ্রমে স্বয়ং উপস্থিত জানিয়া ধ্যান হইতে উত্থিত হইয়া তিনি বাহিরে আসিলেন এবং শিষ্যকে কুশল প্রশ্ন করিলেন। শিষ্যকে সাদরে বরণ করিয়া তাঁহার আজীবন-লব্ধ জ্ঞান-রাশি এই মহামানবে ন্যস্ত করিয়া শিষ্যকে ভূর্ভুবঃ স্বঃ ত্রিলোক-ত্যাগী সন্ন্যাসী করিয়া আদেশ করিলেন—কাশীধামে যাইয়া অদ্বৈত মত প্রচার কর। আচার্য্য শঙ্কর গুরুদেবের আদেশে কাশীধামাভিমুখে গমন করিলেন। আচার্য্য শঙ্করকে বিদায় দিয়া গুরু গোবিন্দপাদ্ তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে জানিয়া নশ্বর শরীর ত্যাগ করিয়া অমরত্ব লাভ করিলেন।

তখন ভারতবর্ষে কোন ধর্ম্ম প্রচার করিতে হইলেই কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট তাহা প্রচার করিতে হইত। কারণ কাশীধামই ছিল ভারতীয় সভ্যতার ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র। ভারতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ জ্ঞানীগণ সকলেই তখন কাশীধামে বাস করিতেন। পণ্ডিতগণ জ্ঞানীগণ যে ধর্ম্ম বা মতবাদ মানিয়া লইতেন তাহা যে অচিরে বহুল প্রচারিত হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাই আচার্য্য গীতাভাষ্যের ভূমিকায় বলিয়াছেন "গুণাধিকৈর্হি গৃহীতোঽনুষ্ঠীয়মানশ্চ ধর্ম্মঃ প্রচয়ং গমিষ্যতি।" পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক গৃহীত এবং অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম বিস্তৃতি লাভ করে।

সমগ্র বেদের তাৎপর্য্য এবং তাঁহার গুরুর অনুভবরূপ অদ্বৈতমতবাদ প্রচারের দ্বারাই জীবের যথার্থ কল্যাণ হইবে ইহা অবধারণ করিয়া কাশীধামে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "নেহ নাশস্তি কিঞ্চন" "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ" "দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতির নির্দ্দেশ শঙ্কর জন-সমক্ষে প্রচার করিতে লাগিলেন। এখানে আসিয়াই বেদব্যাস কৃত বেদান্তসূত্র সকলের শারীরক ভাষ্য প্রণয়ন করিতে লাগিলেন। ঐকালে একদিন সূত্রকার বেদব্যাস আচার্য্য শঙ্করকে পরীক্ষা করিবার জন্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। একটি সূত্রের অর্থ শুনিয়া তাহার অন্য প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া বেদ-ব্যাস ভাষ্যকারের সঙ্গে বিচার আরম্ভ করিলেন। এই সূত্রের ব্যাখ্যা লইয়া উভয়ে কয়েকদিন পর্য্যন্ত বিচার করিয়াছিলেন; তাই ভাষ্যকার ঐ সূত্রের দুইটি ব্যাখ্যাই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। ভাষ্যকারের এই প্রতিভার পরিচয়ে ভগবান ব্যাসদেব এতই তুষ্ট হইয়াছিলেন যে তিনি নিজ পরিচয় জানাইয়া আচার্য্য শঙ্করের পরমায়ু ষোড়শ বর্ষকে দ্বাত্রিংশৎবর্ষ হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।

আচার্য্য শঙ্করের পরমগুরু গৌড়পাদাচার্য্য যে অদ্বৈত-বাদের সূচনা করিয়া যান, আচার্য্য শঙ্কর তাহারই পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। অবশ্য ব্যাসসূত্র নামে অভিহিত বেদান্ত-সূত্রগুলি বেদব্যাস রচিত স্বীকার করিলেও বর্ত্তমান কালে দ্বৈতবাদী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী সকলেই উহার উপর নিজ নিজ মতের পরিপোষক ভাষ্যটীকা প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন। বেদব্যাসরচিত বেদান্তসূত্রেই আমরা আচার্য্য বাদরি, কার্ষ্ণাজিনি, আত্রেয়, ঔড্ডলোমি, আশ্মরথ্য, কাশকৃৎস্ন—আরো অনেক আচার্য্যের নাম সেখিতে পাই তাঁহাদের মধ্যে কাশকৃৎস্নের মতই আচার্য্য শঙ্কর সমর্থন করিয়াছেন। অতএব আমরা নিঃসন্দেহে এ কথা বলিতে পারি যে, আচার্য্য শঙ্করে আসিয়া অদ্বৈত মত পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইলেও তৎপূর্ব্বে ঐ মতবাদের প্রভাব দেশে ছিল, তিনি অদ্ভুত কিছু একটা করিয়া যান নাই। শ্রুতির নির্দ্দেশ—তিনিই সকলের অন্তর্যামী অন্তরাত্মা, তিনি ছাড়া অন্য দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞাতা আর কেহ নাই। (১) এক মাত্র তিনিই সর্ব্বভূতে গূঢ়-

(১) নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ, নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ, নান্যদতোঽস্তি মন্তৃ, নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাতৃ।

রূপে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন। (২) এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সেই পরমাত্মাই। (৩) এক অদ্বিতীয় পরমাত্মাই বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইতেছে। (৪) দুইয়ের জ্ঞান হতেই ভয়, সন্দেহ, চিন্তা, ঘৃণা প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। (৫) এই আত্মাই ব্রহ্ম। (৬) একমাত্র তাঁহাকেই জেনে জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করে, অন্য পথ নাই। এই সকল শ্রুতিবাক্য সকল দেখিয়া তিনি নিশ্চয় করিলেন—এই সংসারে মৃত্যুর পারে যাবার একমাত্র উপায় তাঁর সাক্ষাৎকার করা। তুমিই সেই, তত্ত্বমসি, অহং ব্রহ্মাস্মি, অয়মাত্মা ব্রহ্ম এই বেদবাক্য-সকল হইতে সিদ্ধান্ত করিলেন—আমি মনুষ্য, দেবতা, যক্ষ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি জাতি নই, ব্রহ্মচারী, গৃহী, বাণপ্রস্থী, সন্ন্যাসী নই। মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার আমি নই। চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বাত্বক, বাক্‌পাণিপাদ পায়ু উপস্থ রূপ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় আমি নই। ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম রূপ পঞ্চভূত আমি নই। প্রাণ অপান ব্যান উদান সমান প্রভৃতি প্রাণ বর্গ আমি নই। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ আমি নই। সকল প্রকার ধর্ম্ম বর্জ্জিত প্রজ্ঞান স্বরূপ নিজ বোধরূপ। শ্রুতি যাহাকে বিধিমুখে নির্দ্দেশ না করিয়া নিষেধ মুখে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—আমি স্থূল সূক্ষ্ম নই, অণু মহৎ হ্রস্ব দীর্ঘ প্রভৃতি কোন ইতিবাচক নই। দৃক পদার্থ আত্মা, পারমার্থিক এক হইয়াও উপাধি ভেদে ঈশ্বর, জীব এবং সাক্ষী বলিয়া অভিহিত হই।

অহং মম রূপ অভ্যাসবশতঃ শুক্তিতে রজত ভ্রমের মত, রজ্জুতে সর্পভ্রমের মত, মরীচিকাতে জলভ্রমের মত—নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব পরমাত্মা নিজেকে যেন অশুদ্ধ, অজ্ঞ, বদ্ধ, দেহাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট বলে মনে করি। এই ভ্রম যে কবে কখন কেন আরম্ভ হয়েছে তাহার কিছু ঠিক নাই। ইহা অনাদি হইলেও সান্ত। স্বরূপের জ্ঞানের দ্বারাই এই ভ্রমের অবসান হইবে, তাহা একদিন নিশ্চয়ই হইবে। আলোক এলে অন্ধকার যেমন আপনি চলিয়া যায় সেইরূপ জ্ঞানের প্রভাবে এই ভ্রমজ্ঞান দূর হইয়া আমি স্বরূপতঃ যাহা তহাই থাকিব। এই আলো আবার আমি নিজেই; বেদ বলে স্বয়ং জ্যোতি এই পুরুষ, অপরের জ্যোতিতে ইহাকে জ্যোতিষ্মান্ হইতে হয় না। স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া নিজের মহিমায় নিজেই প্রতিভাত হইবে। শাস্ত্র এই অবস্থাকেই মোক্ষলাভ বলিয়াছে। বাস্তবিক ইহা কিছু অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি নয়। প্রাপ্ত বস্তুরই প্রাপ্তি, যেমন গলায় হার থাকা সত্ত্বেও হার বুঝি নাই বলিয়া গলায় হাত দিয়া হার খুঁজে, তারপর যখন হাত দিয়া দেখে যে হার ঠিক আছে—এই মোক্ষলাভ ও সেইরূপ প্রাপ্ত বস্তুরই প্রাপ্তি। কবির ভাষায় 'নয়নে বসন বাঁধিয়া আধারে মরি গো কাঁদিয়া' নয়নে বসন নিজেই বেঁধেছি নিজেই খুলিতেও পারি। কিন্তু কেন যে খুলিতেছি না তাহাই আশ্চর্য্য। নিজের স্বরূপের জ্ঞান হইয়া গেলেই মহামায়ার মায়া বা কুহকরাশি আর আমাদিগকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না।

এই মায়ার স্বরূপ সম্বন্ধে আচার্য্য শঙ্কর বলেন—

অব্যক্ত নাম্নী পরমেশ শক্তিরণাদ্যবিদ্যা ত্রিগুণাত্মিকা পরা।
কার্য্যানুমেয়া সুধিয়ৈব মায়া যয়া জগৎ সর্ব্বমিদং প্রসূয়তে॥

বিবেকচূড়ামণি ১১৪

এই অব্যক্ত ঐশ্বরীয় শক্তি—যাহাকে ঈশ্বর ও বলা যায় না, তাহা ছাড়া পৃথকও বলা যায় না—যাহা সত্ত্বঃ রজঃ তমরূপ ত্রিগুণাত্মিকা পরাপ্রকৃতি—যাহা অনাদি, সুধীগণ যাহাকে কার্য্যানুমেয়ারূপে অভিহিত করিয়াছেন—যাহার দ্বারা এই সমস্ত জগৎ—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে—এই অনির্ব্বচনীয়া অনাদি অবিদ্যার হাত হইতে মুক্তি পাইতে হইলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী স্মরণ করিতে হইবে—মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে। আমার অর্থাৎ পরমাত্মার যে শরণাপন্ন হয় সেই এই মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারে। আমাদের সেই ভবতারিণীর পূজক শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলিতেন—যাকে ভূতে পায় সে যদি জানে যে তাকে ভূতে পেয়েছে তাহলে ভূত চলে যায়। ছেলেরা যদি জানতে পারে যে এ আমাদের সেই হরে—তাহলে যতই মুখস পরে যাক্ না কেন তাতে আর তারা তাকে দেখে ডরায় না। মহামায়ার মায়া জানতে পারলেই মায়ার পারে চলে যেতে পারবে। বাসনা ত্যাগই একমাত্র উপায়। দাহ্য পদার্থের অভাবে যেমন

(২) একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ।
(৩) ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং।
(৪) দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি।
(৫) অয়মাত্মা ব্রহ্ম।
(৬) তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

অগ্নি নিজেই নির্ব্বাপিত হয়ে যায়, বাসনাক্ষয়ে জীব ও সেইরূপ মায়ার পারে যেতে পারে। মায়াযুক্ত জীবই মায়ামুক্ত হয়ে শিব হয়। এখন কি উপায়ে আমরা মায়ামুক্ত হইতে পারি তাহার নির্দ্দেশে আচার্য্য শঙ্কর বলেন—ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু—ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা—ইহ পরলোকের যাবতীয় ভোগের বাসনা ত্যাগ করা—শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধারূপ ষট্ সম্পত্তি, আর মুমুক্ষুত্ব এই সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তিই মায়ামুক্ত হইতে পারিবে, স্বরূপের উপলব্ধি করিতে পারিবে। তপস্যা দ্বারা যারা পাপমুক্ত হয়েছে, চিত্তের ত্রিবিধ দোষ নাশ করে অর্থাৎ শুভকর্ম্মের দ্বারা চিত্তের মলরূপ দোষ নাশকরে উপাসনার দ্বারা বিক্ষেপের শান্তি করে জ্ঞানের দ্বারা আবরণ ভঙ্গ করে প্রশান্তচিত্ত হয়েছে, ইহপরলোকের যাবতীয় পদার্থে বীতরাগ হয়েছে এবং যারা মুমুক্ষু তাদেরই আত্মজ্ঞান লাভে অধিকার। অর্থাৎ তারাই আত্মজ্ঞান লাভে যোগ্য।

আচার্য্য শঙ্কর মানুষ কিসে সমস্ত হিংসা, দ্বেষ, ভেদ, বিভেদ ভুলে নেয়ে এক পরমাত্মাই বিভিন্নরূপে প্রতীত হচ্ছে বুঝতে পারে—তার জন্য যতপ্রকার সহজ উপায় থাকা সম্ভব তাহা দেখাতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর নিজস্ব এই বিবেক-চূড়ামণি উপদেশসহস্রী আত্মানাত্মবিবেক প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে এবং দশোপনিষদ্‌ভাষ্য, গীতাভাষ্য, বেদান্তদর্শনের শারীরভাষ্য পড়লে মনে হয় বাক্যমনাতীত সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দের জ্ঞান করাইবার জন্য আচার্য্য শঙ্কর কি কঠোর পরিশ্রম না করেছেন। তিনি চাহিয়াছেন, শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি-মাত্রেই করামলকবৎ উহা প্রত্যক্ষ করুক।

সার্দ্ধ ত্রয়োদশ শতাব্দী পরে আজ আমরা তাঁর যতটুকু উপদেশ সংগ্রহ করিয়াছি তাহাতে মনে হয়, এই সমুদয় পুস্তকাবলী মঠসমূহে সযত্নে রক্ষিত ছিল। কারণ এই সমুদয় পুস্তকে মাত্র সন্ন্যাসাশ্রমোচিত উপদেশরাজীই নিবদ্ধ রহিয়াছে। তাহাতে আরো মনে হয়, তাঁর যে সকল গৃহস্থ ভক্ত ছিলেন তাঁদের জন্যও নিশ্চয়ই তিনি কিছু উপদেশ করিয়াছিলেন; কিন্তু সেগুলি লিপিবদ্ধ হয় নাই; অথবা তাহা বহু বৎসরের বহু বাধাবিঘ্নসঙ্কুল ব্যবধানে নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহা আর আমরা পাইতেছি না। তবে ত্রৈবর্ণিক গৃহস্থদের নিত্য পঞ্চমহাযজ্ঞ—ঋষিযজ্ঞ বেদাধ্যয়ন সন্ধ্যা-বন্দনা উপাসনাদি দেবযজ্ঞ—অগ্নি হোত্রাদি ভূতযজ্ঞ—বিশ্বদেবের উদ্দেশ্যে বলিদান, নৃযজ্ঞ—অন্নাদির দ্বারা অতিথিসৎকার, পিতৃযজ্ঞ—শ্রাদ্ধতর্পণাদি দ্বারা পিতৃপুরুষদের তুষ্টিবিধান—এগুলির আচরণ বহুপূর্ব্ব হতেই দেশে প্রচলন থাকিলেও বৌদ্ধবাদের প্রভাবে উহা অত্যন্ত ক্ষীণপ্রভ হয়েছিল; তিনি ঐগুলির পুনঃপ্রবর্ত্তন করিয়া হিন্দুধর্ম্মে পুনরায় প্রাণসঞ্চার করিলেন; তিনি স্ত্রী ও শূদ্রের বেদে অধিকার স্বীকার না করিলেও তাহারা যে পুরাণ স্মৃতি প্রভৃতির সাহায্যে জ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই বলিয়াছেন।

তিনি কর্ম্মকাণ্ডের এবং বৌদ্ধবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য এবং বেদান্তোক্ত নিতান্ত নির্ম্মল অদ্বৈতবাদ প্রচার করিবার মানসে ভারতবর্ষের চারিপ্রান্তে চারিটি মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। দক্ষিণে শৃঙ্গেরী মঠ, পশ্চিমে সারদা মঠ, উত্তরে যোশীমঠ এবং পূর্ব্বে গোবর্দ্ধন মঠরূপ চারিটি দুর্গ স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি যাহা যাহা চাহিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ সাধিত হইয়াছে—কর্ম্মকাণ্ড ও বৌদ্ধবাদের বিলোপ-সাধন এবং অদ্বৈতমতবাদের বিস্তার। তাহা হইলেও কিন্তু ঐ মঠচতুষ্টয় এখন আচার্য্যের পবিত্র স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। আমাদের সৌভাগ্য যে, এখনও তাহারা আমাদের নিকট আচার্য্যের কীর্ত্তিরূপে দণ্ডায়মান। কালের ভ্রূকুটিতে কত কত গিরিচূড়া ধ্বংস হয়ে গেলেও কিন্তু ঐগুলি ঠিক বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহা কি তাঁহার মহিমার প্রকৃষ্ট পরিচয় নয়?

তাঁহার এই অদ্বৈতবাদ প্রচারের ফলে অন্য সমস্ত মতবাদ কিরূপ দুর্দ্দশাপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহার দৃষ্টান্ত দিয়া পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, শৃগালগণ ততক্ষণই অরণ্যে কলরব করে যতক্ষণ না কেশরী গর্জ্জন করে। সিংহ গর্জ্জন করিলেই সমস্ত নীরব নিস্তব্ধ হইয়া যায়। তাঁহার এই মতবাদের মূলে উপনিষদের বাণীরূপ দৃঢ় ভিত্তি ছিল বলিয়াই বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত, ভেদাভেদ, নব্যন্যায় প্রভৃতি আধুনিক মতবাদ সকল বহু বাধা দিয়াও কিছুই করিতে পারে নাই। তাঁহার সেই অদ্বৈতবাদ হিমাচলের ন্যায় অচল অটল ভাবে অবস্থান করিতেছে। গঙ্গাধর শঙ্করের মস্তকস্থিত সুরধনী কোটী কোটী ত্রিতাপদগ্ধ নরনারীকে যুগযুগান্তর হইতে শান্তি দিতেছে। আর এই আচার্য্য শঙ্করের মস্তিষ্কপ্রসূত জ্ঞানের আলোও কত

যুগ হইতে মানবকুলকে পথ দেখাইতেছে এবং আর কতকাল দেখাইবে তাহা কে নির্ণয় করিবে? পাশ্চাত্যজড়বাদী দার্শনিকগণও আজ আচার্য্য শঙ্করের ব্যক্তিত্ব এবং তাঁহার এই অদ্বৈতবাদের মহত্ত্ব উপেক্ষা করিতে পারেন না, পরন্তু মানিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁর ঐ তীক্ষ্ণধারবিশিষ্ট চাকচিক্যময় ভাষ্যরূপ তরবারি যদি বৌদ্ধবাদ খণ্ডনে না নিয়োজিত হইত তাহা হইলে এই হিন্দুস্থান হয়ত বৌদ্ধস্থানেই পরিণত হইত। তাঁহার ঐ ভাষ্যরূপ জ্ঞানের বিমলপ্রভায় যদি বেদরূপ চিরশুভ্র গৌরীশঙ্করচূড়া উদ্ভাসিত না হইত তাহা হইলে কে জানে আজও ঐ বেদরূপ গৌরীশৃঙ্গ নৈশতমে আবরিত থাকিত কি না? সেই মহাযুগ সন্ধিক্ষণে যদি আচার্য্য শঙ্করের মত সুবিজ্ঞ নাবিক আসিয়া আমাদের এই জাতীয় অর্ণবপোতের কর্ণধার না হইতেন তাহা হইলে নিমজ্জমানপ্রায় জাতীয় তরণীর আর উদ্ধারের উপায় ছিল না। তাঁহার ভাষ্যের প্রশংসা করিতে গিয়ে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন—গঙ্গাপ্রবাহে মিলিত হইয়া যেমন নালার জলও পবিত্র হইয়া যায়, সেইরূপ তাঁহার ভাষ্যে মিলিত হইয়া আমার এই টীকাও পবিত্র হইয়া যাইবে। আজ মহামনা ভামতীকার বাচস্পতিমিশ্রের অনুবাদ করিয়া আমিও বলি—আজ এই মহাপুরুষের বিষয় লিখিয়া আমার হস্ত এবং লেখনী দুইই পবিত্র হইয়া গেল।

আষাঢ়

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

২

এলো নভে নবঘন, কাজ ফেলে রাখ্ গে,
কয়টা আষাঢ় দেখা আছে আর ভাগ্যে!
ফুটিছে মালতী কেয়া, ফুটিছে কদম্ব,
সমীরণে সুরভির এ কি পরিরম্ভ!
আগতে ও অনাগতে গণাগণি দৃশ্য
আঁখি ভরে দেখে নে রে অপরূপ বিশ্ব!

মরা নদী ভরা আজ, সবই প্রাণবন্ত,
বসুধার বসুধারা আজি অফুরন্ত,
যাহা ছিল আভাহীন, শুষ্ক ও সিক্ত
স্নিগ্ধ মধুর সব মমতায় সিক্ত,
যুগের আনন্দ যে করপুটে আন্‌ছে
গাত্র ভরিছে মম পুলক রোমাঞ্চে।

৩

হরিতে ধরার গ্লানি নাশিতে অমঙ্গল,
বরষে কোথায় হেন, আসে রে শ্যামল বল?
তৃণ হ'ল কুসুমিত, মূক পেলে ভাষ রে
চঞ্চল চরাচর! কি দেখিতে চাস রে?
ঝুলনেতে দেয় দোল, অফুটে ফুটায় রে
চেনা রবে যেন সবে ডাকিয়া উঠায় রে।
মেঘ দেখে থির থাকে হিন্দুর প্রাণ কি
জলধর চরণের মোরা যে আকাঙ্খী?
সজল জলদ শিরে রামধনু দীপ্তি
জুড়ায় নয়ন মন, বুকে আনে তৃপ্তি,
মোহিনী দিতেছে আনি অমিয়ার পাত্র,
লভিবি জীবন নব দরশন মাত্র।

জঙ্গম

'বনফুল'

প্রথম পরিচ্ছেদ

শঙ্কর তন্ময় হইয়া পথ চলিতেছিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। হ্যারিসন রোডে অসম্ভব রকম ভীড়। সেই ভীড় ঠেলিয়া শঙ্কর হাওড়া স্টেশনে চলিয়াছে। দ্রুতবেগেই চলিয়াছে। পাশের দোকানে একটা ঘড়ির দিকে চাহিয়া সে তাহার গতি-বেগকে আরও একটু বাড়াইয়া দিল। ট্রেনের আর বেশী সময় নাই! হস্টেলের ঘড়িটা নিশ্চয় 'স্লো' ছিল। ফুলের তোড়াটা ভাল করিয়া কাগজ দিয়া ঢাকিয়া আবার সে পথ অতিবাহন করিতে লাগিল। চারিদিকে যা ভীড়—ধাক্কা লাগিয়া তোড়াটা নষ্ট হইয়া না যায়।

নিউ মার্কেট হইতে ফুল কিনিতে গিয়া তাহার দেরীও হইয়া গেল—পকেটের সমস্ত পয়সাও শেষ হইয়া গেল। ট্রামের পয়সা পর্য্যন্ত নাই—হাঁটিয়া যাইতে হইতেছে। অথচ আজিকার দিনে সে উৎপলের সহিত শুধু হাতে দেখা করিতে পারে না ত! বাহিরের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত জনতার মত তাহার মনের মধ্যেও নানা চিন্তা আসিয়া ভীড় করিতে লাগিল। একদিন এই উৎপলই তাহার জীবনে সব ছিল। তাহার কৈশোর জীবনটা উৎপলময় ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কি ভালই বাসিত তাহাকে! এই জনতার মধ্যে পথ চলিতে চলিতেও অকস্মাৎ তাহার মনে সেই বিগত জীবনের একটি স্মৃতি ভাসিয়া আসিল! দীর্ঘ দশ বৎসরেও তাহা মলিন হয় নাই। কত কথা বিস্মৃতির অতলে তলাইয়া গিয়াছে কিন্তু এই ছবিটুকু শঙ্করের অন্তরে অকারণে এখনও সজীব হইয়া আছে। একদিন দুপুরে টিফিনের সময় উৎপল স্কুলের পিছনদিককার বারান্দায় বসিয়া পা দুলাইয়া দুলাইয়া পেয়ারা খাইতেছিল এবং একফালি রোদ আসিয়া তাহার লাল ডোরা-কাটা জামায় পড়িয়া সর্ব্বাঙ্গে একটা আলো-ছায়ার রহস্য-সৃজন করিয়াছিল—এই ছবিটুকু শঙ্করের মনে কেমন করিয়া যেন এখনও অমলিন রহিয়াছে। আর একদিনের কথাও মনে আছে। সেদিন উৎপলের জন্মতিথি উৎসব। তাহার কপালে ও গালে চন্দনবিন্দুর সমারোহ। উৎপলের বোন শৈল আসিয়া শঙ্করের পরামর্শ চাহিল—দাদার জন্মদিনে নূতন রকম কি উপহার দেওয়া যায়।

"এই গ্যান্ঢঅ—গ্যান্ঢঅ—"

শঙ্করের চিন্তাস্রোত ব্যাহত হইল।

ফিরিয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। কাহাকেও দেখিতে পাইল না। ভণ্টুর গলা বলিয়া মনে হইল। ভণ্টুই নিশ্চয়। কারণ 'গ্যান্ঢ' শব্দটির এবং এই জাতীয় আরও নানা বিচিত্র শব্দের সৃষ্টিকর্ত্তা ভণ্টুই। নিজের মনের ভাবকে স্বরচিত নানারূপ অদ্ভুত শব্দ সৃষ্টি করিয়া প্রকাশ করা ভণ্টুর একটা বিশেষত্ব। অভিধান বহির্ভূত এই সকল শব্দের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়াই শঙ্কর ভণ্টুর প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হয়।

শঙ্কর এদিক ওদিক চাহিয়া কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। আবার চলিতে সুরু করিবে এমন সময় আবার ডাক আসিল—

"চাম্ গ্যান্ঢঅ—"

শঙ্কর এবার পিছু ফিরিয়া দেখিল হ্যারিসন রোডের একটি অতি সঙ্কীর্ণ গলির অন্ধকারে ভণ্টু দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

গোলগাল মুখটিতে একমুখ হাসি, বাঁ হাতে বাইসিকেল, ডান হাতে ছোট একটা প্যাকেট। নিতান্ত ছোটও নয়, মাঝারি গোছের। শঙ্কর আগাইয়া যাইতেই ভণ্টু তাহাকে বলিল—"বাইকটা একবার ধর ত—এই প্যাকেটটা বাঁধি পেছন দিকে—"

বিস্মিত শঙ্কর বাইকটা ধরিয়া বলিল—"তুই এখানে হঠাৎ?"

"দাড়ি কিনতে এসেছিলাম।"

ভণ্টুর চোখ দুটিতে হাসি উপচাইয়া পড়িল।

শঙ্কর আরও বিস্মিত হইয়া বলিল—"দাড়ি?"

"দাড়ি! চরম লদ্‌কালদ্‌কি।"

"এই এক পুঁটুলি দাড়ি!"

"জটাও আছে! জটিল লদ্‌কালদ্‌কি!"

শঙ্কর বলিল—"তুই আজকাল কলেজে যাস না কেন? থিয়েটারে ঢুকেছিস না কি?"

ভণ্টু কিছু না বলিয়া নিপুণভাবে প্যাকেটটি বাইকের পিছন দিকে বাঁধিতে লাগিল। বাঁধা শেষ হইবার পূর্ব্বেই শঙ্কর বলিল—"তাড়াতাড়ি শেষ করে নে ভাই। আমাকে হাওড়া স্টেশনে যেতে হবে। উৎপল বিলেত যাচ্ছে আজ—জানিস না?"

"তাই না কি? লদ্‌কালদ্‌কি করতে যাচ্ছিস বুঝি তুই! যা—আমার আজ আর সময় নেই। আটটার মধ্যে দাড়ি না পৌঁছলে প্যান্থার আমাকে খেয়ে ফেলবে—"

"প্যান্থার কে?"

"ছোটবাবু—"

"ছোটবাবু কে?"

"আরে গাড়োল, আমি যে আপিসে চাকরি করছি সেই আপিসের ছোটবাবু। ইয়া চোয়াল, ইয়া লাল চোখ চাম লদ্! থিয়েটারে ভারি ঝোঁক। প্যাস্থার রসিক আছে। যাক্, চললাম ভাই আমি। উৎপলকে বলে দিস বিলেত যাচ্ছে যাক্—দক্‌চে না যায়। চললাম—দেরি হয়ে যাচ্ছে আমার।"

ভণ্টু বাইকে সওয়ার হইল।

শঙ্করের বিস্ময় কাটে নাই।

সে বলিল—"তুই চাকরিতে ঢুকেছিস না কি? কিচ্ছু জানি না ত। পড়াশোনা ছেড়ে দিলি?"

"আসচে বছর আবার সুরু করা যাবে।"

ভণ্টু বাইকে চড়িয়া জনতার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল।

শঙ্কর ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। ভণ্টুদের অবস্থা সচ্ছল নয়। হয়ত দারিদ্র্যের জন্যই বেচারার পড়াটা হইল না। ভণ্টুর সহিত তাহার প্রথম পরিচয়ের কথা মনে পড়িল। বেঁটে মোটা আড়ময়লা বুকখোলা জামাপরা হাস্যমুখ ভণ্টুকে সে যেদিন প্রথমে ক্লাসে দেখিয়াছিল সেদিন তাহাকে ভারি অদ্ভুত মনে হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল ভারি নোংরা ছেলেটা। এখনও ভণ্টু তেমনি নোংরাই আছে। কিন্তু আর ত তাহাকে তেমন খারাপ লাগে না। শঙ্কর ভণ্টুর অন্য পরিচয় পাইয়াছে। তাহাদের বাড়ীতেও সে গিয়াছে কয়েকবার।

হাওড়ার পুলের উপর দ্রুতপদে হাঁটিতে হাঁটিতে শঙ্করের মনে পড়িতে লাগিল উৎপলের কথা নয়, ভণ্টুর কথা। তাহার হঠাৎ মনে হইল, ভণ্টুর বাবা তাহাকে একদিন যাইতে বলিয়াছিলেন। নানা রকম গোলমালে তাহার যাওয়া হয় নাই। বেলেঘাটার এক অতি এঁদো গলির মধ্যে ভণ্টুর বাসা। যাওয়াই মুস্কিল। শঙ্কর ভাল করিয়া চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিত যে ভণ্টুর ওখানে না যাওয়ার কারণ ভণ্টুর বাসার দূরত্ব নহে। অন্য কারণ রহিয়াছে। উৎপলের বিবাহের পর হইতেই শঙ্কর ভণ্টুর ওখানে যাওয়া একপ্রকার ছাড়িয়া দিয়াছে। উৎপলের বিবাহ হইয়াছে প্রায় মাস দুই হইল। উৎপলের শ্বশুর বড়লোক এবং শ্বশুরেরই অর্থে উৎপল বিলাত চলিয়াছে। শঙ্কর কিন্তু মাতিয়া উঠিয়াছে এসব কারণে নয়—শঙ্করের মাতিবার কারণ উৎপলের স্ত্রী সুরমা। সুশ্রী, তন্বী, যুবতী, সুশিক্ষিতা। কথাবার্ত্তায়, আচার ব্যবহারে পোষাক পরিচ্ছদে সুরুচিসঙ্গত শোভন সৌষ্ঠব।

সকল বিষয়েই বেশ কেমন একটা যেন সহজ অনাড়ম্বর কমনীয়তা। এমন মেয়ে শঙ্কর ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখে নাই।

সে পাড়াগাঁয়ের মানুষ। মফঃস্বলের স্কুলে পড়িয়াছে। আই-এস-সি, বি-এস-সি-টাও মফঃস্বলের কলেজেই কাটিয়াছে।

সুরমার মত মেয়ের সংস্পর্শে সে জীবনে কখনও আসে নাই। তাহার মোহগ্রস্ত মন তাই উৎপলের বিলাত যাওয়াটাকে উপলক্ষ করিয়া সুরমাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়াই ঘুরিয়া মরিতেছিল। কিন্তু সে নিজে এ বিষয়ে সজ্ঞান ছিল না। এ বিষয়ে সে সচেতন হইয়াছিল অনেক পরে।

হাওড়া স্টেশনে শঙ্কর যখন পৌঁছিল তখন ট্রেন ছাড়িতে আর বেশী বিলম্ব নাই। মাত্র দশ মিনিট বুঝি বাকী ছিল। শঙ্কর দূর হইতেই দেখিতে পাইল উৎপল একদল নরনারী পরিবৃত হইয়া প্ল্যাটফর্মের উপরই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। শঙ্কর কাছাকাছি আসিতেই উৎপলও তাহাকে দেখিতে পাইল এবং বলিয়া উঠিল—"এই যে শঙ্কু, তুইও এসে পড়েছিস তা হ'লে। আমি ভাবছিলাম, তোর সঙ্গে বুঝি আর দেখাই হ'ল না। ওহো, একটা ভারি ভুল হয়ে গেছে। শ্লিপিং স্যুটটা বাক্সের ভেতরই থেকে গেছে। সুরমা বার করে ফেল না—ওই বড় স্যুটকেসটায় আছে। এখুনি ত দরকার হবে—"

সুরমা একটু ইতস্তত করিয়া গাড়ির কামরার মধ্যে গেল। ঠিক এই সময়টাতে বাক্স ঘাঁটাঘাঁটি করিবার ইচ্ছা ছিল না তাহার।

শঙ্কর কাগজের আবরণ খুলিয়া ফুলগুলি বাহির করিল। বড় বড় লাল লাল গোলাপ। দেখিলেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

উৎপল বিস্মিত সুরে বলিল—"এ সব কার জন্যে এনেছিস তুই? আমার জন্যে? উঃ এত সেন্টিমেন্টাল তুই! ফুল না এনে ভাল একটা সিগারেট কেস আনতিস যদি, কাজে লাগত। ফুল ত একটু পরেই শুকিয়ে যাবে। সুরমা অবশ্য খুব খুশি হবে। সুরমা, শঙ্কর কি কাণ্ড করেছে দেখ—"

সুরমা নামিয়া আসিয়া স্মিত মুখে ফুলগুলি লইল।

উৎপল বলিল—"বিছানার একধারেই রাখ এখন। পরে ঠিক ক'রে নিলেই হবে। সুরমাও যাচ্ছে আমার সঙ্গে বম্বে পর্য্যন্ত—"

শঙ্কর হাসিয়া বলিল—"ভালই ত।"

ছদ্ম গাম্ভীর্য্যভরে উৎপল কহিল—"তুমি কবি মানুষ, তুমি ত বলবেই। বিজ্ঞ শাস্ত্রকারগণ কিন্তু বলেছেন অন্য কথা। পথি নারী বিবর্জ্জিতা—"

শঙ্কর হাসিয়া উত্তর দিল—"নারীর বেলায় শাস্ত্রটা মানা সুবিধের স্বীকার করি। তবে বিলেত যাবার মুখে শাস্ত্র আলোচনা ঠিক মানাচ্ছে না। থাম তুই—"

গাড়ীর ভিতর ফুলগুলি গুছাইয়া রাখিতে রাখিতে সুরমা শঙ্করের কথাগুলি মন দিয়া শুনিতেছিল। এই কথায় তাহার মুখে একটি স্নিগ্ধ হাসির আভা ছড়াইয়া পড়িল। সে গাড়ি হইতে নামিয়া আসিয়া বলিল—"অনেক ধন্যবাদ আপনাকে শঙ্করবাবু। সত্যিই গোলাপগুলো লাভ্‌লি। আপনার রসবোধকে প্রশংসা না ক'রে পারলাম না।"

শঙ্কর উত্তরে শুধু হাসিল।

"উৎপলবাবু, আপনার বন্ধুদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন না? বিলেত যাচ্ছেন, এসব আদব-কায়দাগুলো শিখুন—"

উৎপল গাড়ির কামরায় ঢুকিয়া টিফিন কেরিয়ারটা লইয়া কি যেন করিতেছিল। এই কথা শুনিয়া নামিয়া আসিল। যিনি কথাগুলি বলিলেন তিনি একজন মহিলা। বয়স প্রায় পঁচিশ হইবে! পরিপাটিরূপে সুসজ্জিতা। কোথায় কি পরিলে এবং না পরিলে তাঁহাকে মানাইবে এ জ্ঞান যে তাঁহার আছে তাহা একবার তাঁহার দিকে তাকাইলেই বোঝা যায়। তাঁহার সঙ্গে আরও দুইজন তরুণী ছিলেন। তাঁহাদের বয়স আরও কম। একজনের বয়স বছর কুড়ি এবং আর একজনের বছর আঠারো।

উৎপল নামিয়া আসিয়া কহিল—"হ্যাঁ, আলাপ করিয়ে দেব বই কি। আমি বিলেত চললাম, আপনাদের ফাই-ফরমাস খাটবার মত একজন কাউকে দিয়ে যেতে হবে ত। এইবার আসুন, আদব-কায়দামত আপনাদের পরস্পর পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি হলেন শঙ্করসেবক রায়—আর ইনি হচ্ছেন মিসেস মিত্র। প্রফেসার বিশ্বেশ্বর মিত্রের স্ত্রী। আমাদের ইউনিভার্সাল মিষ্টি দিদি। আর ওই যে উনি—যিনি ও দিকে মুখ ফিরিয়ে মুচকি মুচকি হাসছেন—উনি হচ্ছেন মিষ্টিদিদির মাসতুতো বোন। ওঁর নাম হচ্ছে মিসেস রায়। ওঁর স্বামী দিল্লীতে চাকরি করেন। ডাক নাম ওঁর সোনাদিদি—আর ওঁর পাশে যিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তিনি হলেন মিস্ মিত্র। বেথুনে বি-এ পড়ছেন। ওঁর ডাক নাম হচ্ছে রিনি। আর আপনারা সবাই শুনে রাখুন, আমার এই বন্ধুটি একটি অসাধারণ মেধাবী ছাত্র—ক্লাসের মধ্যে দল পাকাতে ওস্তাদ—সব দলেই পাণ্ডাগিরি করা চাই। তা ছাড়া, পরোপকারী এবং সর্ব্বোপরি কবি—"

শেষের কথাটা শুনিয়া সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

উৎপল তাহার পর দণ্ডায়মান পুরুষ দুইটির দিকে ফিরিয়া বলিল—"আর এই দুটি হচ্ছেন আমার বড় কুটুম্ব। এ দুজনকে তুই দেখিসনি শঙ্কু। এঁরা দুজনেই আজ সকালে

এসে পৌঁছেচেন। বিয়ের সময়ও আসতে পারেননি এঁরা—এত এঁদের পড়ায় মন! ইনি হচ্ছেন অশোক, আর উনি হচ্ছেন প্রবীর। দুজনেই ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েন রুড়কিতে।"

শঙ্কর সকলকেই নমস্কার করিল।

শঙ্কর এবং উৎপল একসঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়াছিল। তাহার পর কিন্তু উভয়ের ছাড়াছাড়ি হয়।

উৎপল কলিকাতায় চলিয়া আসে—শঙ্কর মফঃস্বলের কলেজে যায়। সেইজন্য উৎপলের কলিকাতাবাসী পরিচিতদের সহিত শঙ্করের পরিচয় ছিল না। এতগুলি অপরিচিতা তরুণীর মধ্যে শঙ্কর চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অস্বস্তিকর নীরবতা!

মিষ্টিদিদি নীরবতা ভঙ্গ করিলেন।

সুমিষ্ট হাসিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার কবিতার বই কোন বেরিয়েছে না কি?"

"না, কোন কবিতাই ছাপা হয় নি আমার।"

ইহা শুনিয়া সোনাদিদি আগ্রহের সুরে বলিলেন, "নিয়ে আসবেন আপনার কবিতা একদিন আমাদের বাড়ীতে। এত ভাল লাগে আমার কবিতা! বিশেষ যে কবিতা ছাপা হয় নি। আসবেন একদিন? দিদি, ওঁকে চায়ে আসতে বল না একদিন।"

মিষ্টিদিদি বলিলেন—"কবিতার নাম নেই শুনেছে অমনি সোনার মন উস্‌খুস্ করছে। আসবেন আপনি শঙ্করবাবু একদিন। তা না হ'লে জ্বালিয়ে মারবে ও আমাকে।"

শঙ্কর বলিল—"হ্যাঁ, যাব একদিন। ঠিকানাটা কি আপনাদের?"

মিষ্টিদিদি ঠিকানা বলিলেন।

শঙ্কর উৎপলকে জিজ্ঞাসা করিল—"তোর বাবা, মা, শ্বশুর, শাশুড়ী কাউকে দেখছি না যে—"

"বাবা মা বর্দ্ধমানে দেখা করবেন, আর সুরমার বাবা মা উঠবেন আসানসোল থেকে। শ্বশুর মশায়কেও এইবার কাজে জয়েন্ করতে হবে ত।"

উৎপলের শ্বশুর বম্বেতে চাকুরি করিতেন।

ঢন্ ঢন্ করিয়া ট্রেন ছাড়িবার ঘণ্টা হইল।

উৎপল ও সুরমা গিয়া ট্রেনে উঠিয়া বসিল।

উৎপল বলিল—"তুইও একটা বিয়ে করে চলে আয় বিলেতে—বুঝলি শঙ্কর?"

তাহার পর কণ্ঠস্বর একটু নীচু করিয়া বলিল—'শোন্, রিনি মেয়েটিকে কেমন লাগছে তোর? বিয়ে কর্ না ওকে। প্রফেসার মিত্র বলছিলেন যে ভাল পাত্র পেলে বিলেতে পাঠাবেন।"

"চুপ কর তুই—"

গার্ডের হুইস্‌ল্ বাজিল।

ট্রেন চলিতে সুরু করিল।

সুরমা হঠাৎ জানালা দিয়া মুখ বাহির করিয়া শঙ্করকে বলিল—"চিঠি লিখবেন আমায় বম্বেতে। মিষ্টিদির কাছে ঠিকানা আছে। লিখবেন ত?"

শঙ্কর ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি দিল।

ট্রেনের গতি-বেগ বাড়িল। উৎপল জানালা দিয়া ঝুঁকিয়া যথারীতি রুমাল নাড়িতে লাগিল।

যতক্ষণ রুমাল দেখা গেল সকলেই সেইদিকে তাকাইয়া রহিলেন। ক্রমশ রুমালও অদৃশ্য হইয়া গেল।

মিষ্টিদিদি তখন শঙ্করকে বলিলেন—"এইবার আমরাও যাই চলুন। আপনি থাকেন কোথায়?"

"হস্টেলে।" হস্টেলের ঠিকানা সে দিল। "চলুন না নাবিয়ে দিয়ে যাই আপনাকে। গাড়ি আছে আমাদের সঙ্গে।"

"ধন্যবাদ। কিন্তু আমি এখন হস্টেলে ফিরব না। আর এক জায়গায় যেতে হবে আমাকে।"

"যাবেন কিন্তু আমাদের বাড়ীতে। ভুলবেন না।"

"যাব।"

মিষ্টিদিদিরা চলিয়া গেলেন।

উৎপলের শ্যালক দুইটিও তাঁহাদের গাড়ীতে উঠিল।

সকলে চলিয়া গেলে শঙ্কর খানিকক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সমস্ত মনটা যেন ফাঁকা হইয়া গেল। মনে হইল ভণ্টুর বাড়ী যাই। ভণ্টু হঠাৎ পড়া ছাড়িয়া চাকুরিতে ঢুকিল কেন? ভণ্টুর বৌদিদির মুখখানা একবার মনে পড়িল। এত রাত্রে ভণ্টুর বাড়ী হাঁটিয়া যাওয়াও মুস্কিল। কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় যে পরিচিত টিকিট কলেকটারবাবুটির অনুগ্রহে শঙ্কর বিনা মাশুলে প্ল্যাটফর্মে ঢুকিয়াছিল তিনি আসিয়া বলিলেন—"এইবার আপনি বাইরে যান, সার। আর একখানা ট্রেন ইন্ করবে এক্ষুনি। আমার ডিউটিও ওভার হ'ল।"

শঙ্কর বাহিরে চলিয়া আসিল।

বাহিরে আসিয়াই তাহার চোখে পড়িল কিছুদূরে কতকগুলি লোক কি একটা বস্তুকে ঘিরিয়া কোলাহল করিতেছে। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য শঙ্করও আগাইয়া গেল। গিয়া দেখিল, একটি রমণী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে এবং সেই মূর্চ্ছিতা রমণীটির মাথা কোলে করিয়া লইয়া আর একটি নারী বিলাপ করিতেছে। তাহাদের ঘিরিয়া কৌতূহলী জনতা দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছিল। দুই মিনিটের মধ্যে কয়েকটা মতামত শঙ্করের কানে গেল।

একজন বৃদ্ধ গোছের ভদ্রলোক মাথা নাড়িয়া বলিতেছিলেন—"মৃগি রোগ, বড় সঙীন ব্যাধারাম মশাই। ভালোর মধ্যে এই—ছোঁয়াচে নয়।"

একটি পাতলা লম্বা গোছের ভদ্রলোক তাঁহার অপেক্ষাও পাতলা ও লম্বা একটি ভদ্রলোকের কানে কানে ঘাড় উঁচু করিয়া বলিতেছিলেন—"টেনেছে—জোর টেনেছে—বুঝলে খুড়ো, দেখেই বুঝেছি আমি!"

খুড়ো কিছু না বলিয়া জিহ্বার প্রান্তটুকু তির্য্যকভাবে বাহির করিয়া বাম চক্ষুটি ছোট করিলেন। তাহা দেখিয়া পুলকিত ভাইপো খুড়োর পৃষ্ঠদেশে একটি চপেটাঘাত করিয়া সমস্ত দন্তগুলি বিকশিত করিয়া ফেলিলেন। মোটা গোছের একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোকও মূর্চ্ছিতা নারীটির সম্বন্ধে চিন্তিত হইয়াছেন দেখা গেল। তাঁহার থিয়োরি কিন্তু অন্য রকম। তিনি বলিতেছিলেন—"তারকেশ্বরে ধন্না দেওয়া কি সোজা ব্যাপার! সমস্তদিনের কঠোর উপবাস।"

শঙ্কর দেখিল মেয়েটির যাহাই হইয়া থাকুক, অবিলম্বে উহাকে জনতার চাপ হইতে উদ্ধার না করিলে দমবন্ধ হইয়াই মারা যাইবে।

সে সোজা ভীড় ঠেলিয়া ভিতরে চলিয়া গেল ও বলিষ্ঠ দুই বাহু দ্বারা অজ্ঞান মেয়েটিকে তুলিয়া লইয়া অপর মহিলাটিকে বলিল—"আসুন, এঁকে কলের কাছে নিয়ে যাই। মাথায় মুখে জল দেওয়া দরকার আগে।" শঙ্করের সপ্রতিভ ভাব দেখিয়া সকলে মনে করিল, শঙ্কর বোধ হয় ইহাদের নিজেদের লোক। সুতরাং জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।

কলের কাছে লইয়া গিয়া চোখেমুখে জল দেওয়াতে মেয়েটির জ্ঞান হইল। জ্ঞান হইলে সে অসম্বৃত বেশবাস ঠিক করিয়া লজ্জিত হইয়া মাথার কাপড় টানিয়া দিল। শঙ্কর দেখিল মেয়েটি অল্পবয়সী। সতেরো আঠারোর বেশী হইবে না। অপর মহিলাটি বয়স্থা। তিনি বলিলেন—"বেঁচে থাকো তুমি বাবা। মেয়ের ফিটের ব্যারাম আছে। তুমি না থাকলে কি যে বিপদ হত আজ আমার!"

শঙ্কর বলিল—"আপনারা কোথা যাবেন?"

"আমরা কলকাতাতেই যাব বাবা।"

"আপনাদের একটি গাড়ি ঠিক ক'রে দিই তা হ'লে?"

"তাই দাও—"

শঙ্কর তাহাদের জন্য একটি ঘোড়ার গাড়ি ঠিক করিয়া দিল। বয়স্থা মেয়েটি শঙ্করকে আর এক দফা আশীর্ব্বাদ করিয়া শেষে বলিল—"তুমি একদিন যেও আমাদের ওখানে বাবা। যাবে?"

"কোন্‌খানে থাকেন আপনারা?"

"কেরানীবাগানে। ১৮নং কেরানী বাগান। যেও একদিন, কেমন?"

"যাব।"

তরুণীটি চকিতে একবার শঙ্করের দিকে তাকাইয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

ঘোড়ার গাড়ি চলিয়া গেল।

শঙ্কর বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল—কে ইহারা। ওই যুবতী নারীটির শরীরের ভার কি লঘু। জীবনে ইতিপূর্ব্বে সে আর কোনদিন কোন যুবতী নারীর শারীরিক ঘনিষ্ঠতা লাভ করে নাই। কত অক্লেশে সে মেয়েটিকে দুই হাতের উপর তুলিয়া কলের কাছে লইয়া আসিল। তাহার কোন সঙ্কোচ হইল না ত। ওই যে অপরা মহিলাটি ছিলেন, তিনিও ত কোন আপত্তির কারণ দেখিলেন না ইহাতে। মহিলাটি মেয়েটির কে হন? মেয়েটি কি বিবাহিতা?

এইরূপ নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে শঙ্কর আবার হাওড়ার পুল পার হইতে লাগিল। তাহার অন্তরের নিভৃত কন্দরবাসী কাহার যেন ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে। কিসের যেন বিসর্পিত সঞ্চরণ সে সর্ব্বাঙ্গে অনুভব করিতে লাগিল। অদ্ভুত সে অনুভূতি।

হস্টেলে ফিরিয়া দেখিল, ভণ্টু তাহার অপেক্ষায় কমনরুমে বসিয়া আছে। তাহাকে দেখিয়া হাসিমুখে বলিল—"ঘোর জালে পড়ে ফের এসেছি ভাই?"

"কি হ'ল?"

"ভীম জাল!"

"মানে?"

"মানে, মেজকাকা ফিরে এসেছে।"

ভণ্টুর মেজকাকা সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন।

শঙ্কর বিস্মিত হইয়া বলিল—"তাই না কি?"

"একেবারে থলথলে কান্ত! মেজকাকার চেহারা যদি দেখিস এখন। ইয়া লদ্‌লদে ভুঁড়ি, মুখময় দাড়ি গোঁফ, গেরুয়া লুঙ্গি—জমজমাট ব্যাপার!"

শঙ্কর বলিল—"তাই না কি?"

তাহার পর একটু থামিয়া বলিল—"ভালই ত হয়েছে, মেজকাকা ফিরে এসেছেন। ভীম জাল বলছিস কেন?"

ভণ্টু হাসিয়া বলিল—"মেজকাকা চাকরিটা যদি পায় তবেই না ভালো? সেই জন্যেই ত তোর কাছে এসেছি ভাই। তুই একটু বোস সায়েবকে যদি অনুরোধ করিস, ঠিক হয়ে যাবে। চাকরি না হলেই ভীম জাল। আমার পক্ষে একা ম্যানেজ করা শক্ত। তার ওপর শুনছি মেজকাকা আজকাল খাঁটি গব্যঘৃত ছাড়া ব্যবহারই করেন না অন্য কিছু। গুরুর আদেশ নেই—"

শঙ্কর শুনিয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

তাহার পর বলিল—"তুই পড়া ছেড়ে চাকরিতে ঢুকলি কেন হঠাৎ? তোকে তখন জিগ্যেসই করা হয় নি। বিষ্ণুবাবু কেমন আছেন আজকাল?"

"দাদাকে নিয়েই ত মুস্কিল। দাদার আবার জ্বর সুরু হয়েছে। ডাক্তার বললে, সমুদ্রের ধারে কোথাও চেঞ্জে পাঠাতে। সেই জন্যে বাধ্য হয়ে আমাকে চাকরি নিতে হ'ল। পেয়েও গেলাম একটা। কি করি বল্। দাদার হাফ্ পে-তে ছুটি। সংসার ত চালাতে হবে। তার ওপর মেজকাকা এসে হাজির হয়েছেন। বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখি তিনি পদ্মাসনে বসে প্রাণায়াম করছেন। গভীর গাড্ডায় পড়ে গেছি ভাই। তুই উদ্ধার না করলে আর উপায় নেই। বোস সায়েবকে তুই যদি একটু বলিস, ঠিক মেজকাকার চাকরিটা হয়ে যাবে। যাবি এখন? এই সময় বোস সায়েব বাড়িতে থাকে।"

"এখুনি?"

"দেরি ক'রে লাভ কি?"

"এখন ভাই রাত হয়ে গেছে। নটা বেজে গেছে বোধ হয়। এখন এত রাত্রে হস্টেল থেকে চলে যাওয়া ঠিক নয়। এই মাসেই আরও দুবার আমি রাত্রে ছুটি নিয়েছি। কাল যাওয়া যাবে।"

"আচ্ছা।"

ভণ্টু কেমন যেন বিমর্ষ হইয়া পড়িল।

সে যেন আশা করিয়া আসিয়াছিল, শঙ্কর এখনই তাহার সহিত বোস সায়েবের বাড়ি যাইবে।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব।

হঠাৎ ভণ্টু বলিল, "গোটা চারেক পয়সা দিতে পারিস?"

শঙ্করের পকেটে যাহা কিছু ছিল ফুল কিনিতেই ফুরাইয়া গিয়াছিল। পকেটে একটি পয়সাও ছিল না।

বলিল, "কাছে ত নেই ভাই।"

"ওপর থেকে নিয়ে আয়।"

"কি করবি পয়সা নিয়ে?"

"কিছু খাব। সেই বেলা নটায় দুটি ভাত খেয়ে আপিসে বেরিয়েছিলাম। তারপর থেকে গ্লাস তিনেক জল ছাড়া আর কিছু খাই নি। পেটে এ রকম আগুন জ্বলচে যে, ফায়ার ব্রিগেড ডাকলেই হয়। যা, চট্ ক'রে নিয়ে আয় চারটে পয়সা—"

শঙ্কর উপরে গিয়া ভণ্টুকে পয়সা আনিয়া দিল।

ভণ্টু চলিয়া গেল।

শঙ্করও উপরে যাইতেছিল, এমন সময় একটি চাকর আসিয়া প্রবেশ করিল।

"শঙ্করবাবু এখানে থাকেন?"

"হ্যাঁ আমিই। কি চাই?"

"চিঠি আছে।"

"কই দেখি—আমার নামে?"

চাকর একখানি পত্র তাহার হস্তে দিল। খামের উপর অপরিচিত নারী হস্তের লেখা।

চিঠি খুলিয়া পড়িল।

শঙ্করবাবু,

নমস্কার। কাল বিকেল পাঁচটায় আমাদের বাড়িতে ছোটখাটো একটা টি-পার্টি আছে। আপনাকে আসতে

হবে। পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করলাম। কাল সমস্ত দিন হয়ত আপনি কলেজে থাকবেন, কোথায় আপনাকে খবর দেব, তাই এখুনি জানিয়ে দিলাম। আসতে ভুলবেন না কিন্তু। সোনা বলছে, আপনার কবিতার খাতাও যেন আনেন। খাতা আনুন আর নাই আনুন, নিজে কিন্তু নিশ্চয় আসবেন।

মিষ্টিদিদি

শঙ্করের সমস্ত অন্তরটা কেমন যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। চাকরটার দিকে ফিরিয়া সে বলিল—"আচ্ছা যাব।"

ভৃত্য চলিয়া গেল।

কমন রুমটায় শঙ্কর খানিকক্ষণ নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কেন যে সে দাঁড়াইয়া রহিল তাহা সে নিজেও বলিতে পারিত না। সে কি ভণ্টুর কথা ভাবিতেছিল? মিষ্টিদিদির কথা? আজ সকালে বাবার পত্র পাইয়াছিল যে তাহার মায়ের পাগ্‌লামি এত বাড়িয়াছে যে তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে হইয়াছে। তাহার উন্মাদিনী মায়ের কথাই সে কি ভাবিতেছিল? হাওড়া স্টেশনের সেই মূর্চ্ছিতা যুবতীটির কথা? না, কিছুই ত নয়। জ্ঞাতসারে সে কিছুই ভাবিতেছিল না। তাহার চমক ভাঙিল যখন টং টং করিয়া ঘড়িতে নটা বাজিল। সে তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ফিরিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ভণ্টুর বৌদিদি বসিয়া কুটনো কুটিতেছিলেন।

রান্নাঘর সংলগ্ন একটি সঙ্কীর্ণ বারান্দা, এইমাত্র ধোওয়া হইয়াছে। জল এখনও শুকায় নাই। সেই ভিজা বারান্দার উপরই একখানি পিঁড়ির উপর বসিয়া বৌদিদি তরকারি কুটিতেছিলেন। নিকটেই তাঁহার নবম বর্ষীয়া কন্যা বসিয়া আলুর খোসাগুলি জড়ো করিতেছিল। সেগুলিরও একটি তরকারি হইবে। খোসা চচ্চড়ি ভণ্টুর প্রিয় খাদ্য। রোজ তাহা হওয়া চাইই।

বারান্দা হইতে পা বাড়াইলেই যে ভূমিখণ্ড পদস্পর্শ করে তাহাকেই উঠান বলিতে হয়। বাড়ির মধ্যে একমাত্র ওই স্থানটুকুতে দাঁড়াইলেই মাথার উপর আকাশ দেখা যায়। এই সঙ্কীর্ণ-পরিসর প্রাঙ্গণে তিনটি বালক—তাহার মধ্যে দুইটি একেবারে শিশু, খেলা করিতেছিল। আর একটি বছর এগারোর বালক হাঁটু গাড়িয়া দুই কান ধরিয়া সম্মুখস্থ মোড়ায় রক্ষিত উপক্রমণিকা হইতে শব্দরূপ মুখস্থ করিতেছিল। তাহার পড়া হয় নাই বলিয়া ভণ্টু তাহাকে শাস্তি দিয়াছে। বৌদিদিকে দেখিয়া বোঝা দুষ্কর যে তিনি পাঁচটি সন্তানের জননী। তাঁহার মুখখানি এত কচি যে আবার তাঁহার বিবাহ দিয়া আনা যায়। বৌদিদিকে সুন্দরী হয়ত কেহ বলিবে না, কারণ তাঁহার রঙ্ কালো। এত কালো যে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলিয়া চালাইবার চেষ্টাও হাস্যকর হইবে। কিন্তু রঙে কি আসে যায়? বৌদিদির হাসিমাখা গোলগাল ঢলঢলে মুখখানিতে, ডাগর চোখ দুটিতে, তাম্বুলরঞ্জিত পাতলা ঠোঁট দুটিতে যে শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা সকলকেই মুগ্ধ করিবে। যাহাকে করিবে না, তাহার রূপ দেখিবার চোখ নাই। বৌদিদি কুটনো কুটিতে কুটিতে কন্যা ফনতিকে আদেশ করিলেন, "ফনতি, আমার জন্যে একখিলি পান সেজে নিয়ে আয় ত আগে। দোক্তাও আনিস একটু—"

ফনতি চলিয়া গেল।

পানের রঙে বৌদিদির ঠোঁট দুইটি সর্ব্বদা টুক্‌টুক্ করিতেছে। একবেলা না খাইয়া বরং বৌদিদির চলিতে পারে, কিন্তু পান না হইলে তাঁহার একদণ্ড চলা মুস্কিল। ওইটুকুই তাঁহার জীবনের একমাত্র সখ—যাহা তিনি বজায় রাখিতে পারিয়াছেন। জীবনের কত সখই ত পূর্ণ হয় নাই, আর হইবেও না বোধ হয়। পানের সরঞ্জামকে কেন্দ্র করিয়া তাই তাঁহার নানারূপ আয়োজন। নানারকম টুকিটাকি জিনিসে তাঁহার পানের বাটাটি পরিপূর্ণ। ভাজা মশলা, কমলা লেবুর শুকনো খোলা, চুয়া-সুগন্ধি দোক্তা, এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, মৌরি, রকমারি পানের মশলা, নিখুঁত চুণ, ভিজে ন্যাকড়ায় জড়ান পান, মিহি করিয়া কাটা সুপারি, ভাল খয়ের—অতি নিপুণভাবে তিনি পানের বাটাটিতে গুছাইয়া রাখিয়াছেন। এই পিতলের বাটাটি কিনিয়া দিয়াছিল বলিয়াই শঙ্কর ঠাকুরপোর উপর বউদিদি এত প্রসন্ন। ভণ্টু ঠাকুরপোর এই বন্ধুটি বেশ মানুষ।

ভণ্টুর ক্রুদ্ধস্বর শোনা গেল।

"এই তোর পড়া হল, নিয়ে আয় দেখি—"

খানিকক্ষণ পরেই সপাসপ বেতের শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে

বালক-কণ্ঠের আর্ত্তনাদ। মার এবং আর্ত্তনাদ সমানবেগেই খানিকক্ষণ চলিল। তাহার পর আবার সমস্ত চুপচাপ। বালক আবার ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া সুরু করিল—নরঃ, নরৌ, নরাঃ—

বৌদিদি অবিচলিতভাবে তরকারি কুটিয়া যাইতে লাগিলেন। পুত্রের এতাদৃশ নির্য্যাতনে তাঁহার কোন বিকারই লক্ষিত হইল না। এ সব তাঁহার গা-সওয়া হইয়া গিয়াছিল।

হঠাৎ পাশের ঘর হইতে দরাজ কণ্ঠে আদেশ আসিল—"বৌমা, চায়ের জল চড়াও, আটটা বাজল।"

তাহার পরই একটি বৃদ্ধ ধীরে ধীরে পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইল। দীর্ঘাকৃতি ঈষৎ-কুব্জ দেহ, গৌরবর্ণ, গোঁফ দাড়ি কামানো, শুকচঞ্চু নাসা, চক্ষু দুইটিতে তীক্ষ্ণদৃষ্টি। পুরু লেন্সের চশমা পরা। হস্তে একখানি খবরের কাগজ—বঙ্গবাসী। তিনি আসিয়া দাঁড়াইতেই বৌদিদি উঠিয়া তাঁহার কানের কাছে গিয়া চুপি চুপি বলিলেন, "ডালটা নাবিয়েই চায়ের জল চড়িয়ে দিচ্ছি। বেশী দেরি নেই আর।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "আচ্ছা—"

সুরটা যেন অপ্রসন্ন।

বৃদ্ধ ভণ্টুর পিতা। কানে কম শোনেন। বহুকাল হইতে বিপত্নীক। চায়ের দেরি আছে শুনিয়া তিনি ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন এবং তামাক সাজিতে বসিলেন। ভোর তিনটায় তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়। তখন হইতে সুরু করিয়া রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত চা এবং তামাক লইয়া থাকেন। অবসর মত সাপ্তাহিক বঙ্গবাসী পাঠ করেন। বৃদ্ধ চলিয়া গেলে ভণ্টু আসিয়া দর্শন দিল। কৌতুকপূর্ণ চক্ষু দুইটি বৌদিদির মুখের উপর স্থাপন করিয়া সে প্রশ্ন করিল, "বাকু কি বলছিলেন?

বৃদ্ধ বাকু?

ভণ্টুর ভাষায় বাকু মানে বাবা।

বৌদিদি হাসিয়া বলিলেন, "বাকুর আর কি অন্য কথা আছে এখন? আটটা বেজে গেছে, চা চাই।"

ভণ্টু গা দোলাইয়া দোলাইয়া বলিতে লাগিল, "বা কুর কুর কুর কুর—"

বৌদিদি মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিলেন। "তুমি থামো ঠাকুরপো, এখুনি হয়ত এসে পড়বেন!" ভণ্টু ও বৌদিদি সমবয়সী। বৌদিদি যখন বধূরূপে এ বাটীতে আসিয়া প্রথম প্রবেশ করেন তখন তাঁহার বয়স এগারো। ভণ্টুরও বয়স তখন এগারো। তখন হইতেই দুইজনে এক সংসারে এক সঙ্গে মানুষ হইয়াছে। ছেলেবেলায় দুইজনে মারামারি পর্য্যন্ত করিয়াছে। এখনও কথায় কথায় ইহাদের মনান্তর ও ভাব হয়। বাড়ীর গুরুজনস্থানীয় সকলের সম্বন্ধে ইহারা নিভৃতে যে সব আলোচনা করে তাহা শুনিলে বিস্ময় হয়। মনে হয়, গুরুজনদের প্রতি বুঝি এতটুকু শ্রদ্ধা ভালবাসা ইহাদের নাই। শ্রদ্ধার কথা বলিতে পারি না, কারণ শ্রদ্ধা জিনিসটা গুরুজনদেরও অর্জ্জন করিতে হয়, কিন্তু ভালবাসায় ইহারা কাহারও অপেক্ষা কম নয়। বৃদ্ধ বাকুর সামান্য সুখ সুবিধার জন্য ইহারা বহু কৃচ্ছ্রসাধন করিতে প্রস্তুত, করিতেছেও। বৃদ্ধ বাকুও বৌমাকে ছাড়িয়া কখনও কোথাও থাকেন নাই। থাকিতে পারেনও না।

বৌদিদি বলিলেন, "বাকুর তামাক ফুরিয়েছে, এনো আজ।"

"এই ত পরশু তামাক এনেছি—"

"কি জানি, বাবাজী আসার পর থেকে বাবা ভয়ানক ঘন ঘন তামাক খাচ্ছেন।"

বলিয়া বৌদি ফিক্ করিয়া হাসিয়া মুখে কাপড় দিলেন। বাবাজী মানে ভণ্টুর মেজকাকা।

ভণ্টু পকেট হইতে ব্যাগ বাহির করিয়া বলিল—"এই নাও আমার আজ আফিস থেকে ফিরতে দেরি হবে। শণ্টুকে দিয়ে তামাকটা আনিয়ে নিও ওই মোড়ের দোকানটা থেকে। বাবাজীর জন্যে ঘি-ও আনিও কিছু। গাওয়া ঘির সঙ্গে অন্য ঘি-ও একটু মিশিয়ে চালাও না—"

বৌদিদি মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "কাল চালিয়ে ছিলাম একটু—"

"আর এই নাও একস্ট্রা দু-আনা। একটু ভালো মাছ আনিয়া শণ্টুকে খেতে দিও। রাগের মাথায় বড্ড মেরেছি ছেলেটাকে। কাল ঘি খেয়ে কি বললে বাবাজী? ধরতে পারে নি?"

বৌদিদি মুখে কাপড় দিয়া হাসি চাপিতে চাপিতে বলিলেন, "পারে নি আবার! বললেন, মানুষের অধর্ম্মাচরণের

চোটে গাইগুলো পর্য্যন্ত বিগড়ে গেছে। গাওয়া ঘিয়ে আর সে রকম গন্ধই নেই!"

"বাবাজী একেবারে চাম চামাটু! ফিরবে কখন বাবাজী?"

"গুরু-ভাইদের কাছে গেছেন, শিগগির কি আর ফিরবেন?"

"রান্নার কত দেরী?"

"ডালটা নাবিয়েই তরকারিটা চড়িয়ে দিচ্ছি। ভাত হয়ে গেছে। খোসা চচ্চড়ি ও-বেলা খেও, কেমন?"

"আচ্ছা।"

দুয়ারে কড়া নড়িল।

পিওন চিঠি দিয়া গেল।

ভণ্টু চিঠিখানি পড়িয়া বলিয়া উঠিল, "লুদুর লুদুর—"

বৌদিদি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার চিঠি?"

"লুদুর, লুদুর—"

রান্নাঘর হইতে একটা পোড়া-গন্ধ ছাড়িল।

বৌদিদি শশব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"ওই যাঃ, ডালটা বুঝি পুড়ল! ফনতি পোড়ারমুখিকে সেই যে একটা পান সাজতে বলেছি—যুগযুগান্ত কাটাচ্ছে মুখপুড়ি তাই নিয়ে—"

তিনি তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে চলিয়া গেলেন।"

ভণ্টু বলিল—"ফনতিকে ত কান ধরে উঠোনে দাঁড়িয়ে থাকতে বলেছি। পায়ে পা ঠেকে গেছল, পেন্নাম করে নি।"

বৌদিদি কোন উত্তর দিলেন না।

ভণ্টু পত্রখানি পুনরায় পড়িতে লাগিল।

বৌদিদি রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলে ভণ্টু প্রশ্ন করিল—"ডাল 'গন্' ?"

"'গন্' কেন হবে। ফেনটা উথলে উনুনে পড়েছিল। ওটা কার চিঠি?"

"মোমবাতি আবার বিয়ে করেছে। এক পুলিশ অফিসারের মেয়েকে। বিয়ে করে সি. আই. ডি. হয়েছে। লুদুর, লুদুর।"

বৌদিদি সবিস্ময়ে বলিলেন—"আবার বিয়ে করলে মৃণ্ময় ঠাকুরপো?"

ভণ্টু গম্ভীরভাবে বলিল, "এ বউটাও পালাবে।"

বৌদিদি বলিলেন, "আচ্ছা বউটার কোন খবরই পাওয়া গেল না, নয়? মৃণ্ময় ঠাকুরপো কিন্তু খুব ভালবাসত তাকে, যাই বল তোমরা!"

"লুদুর লুদুর—"

ভণ্টু ভঙ্গীভরে শরীরের উপরার্দ্ধ নাচাইতে লাগিল।

বৌদিদি হাসিয়া ফেলিলেন।

"ভালবাসত না?"

"নিশ্চয়, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বউ পালাবার এক বছর না যেতে যেতেই আবার বিয়ে করলে।"

বৌদিদি মুচকি হাসিয়া বলিলেন, "পুরুষরা সব পারে। তোমাদের অসাধ্য কিছু নেই।"

"লুদুর, লুদুর!"

"সত্যি, ভারি আশ্চর্য্য লাগছে কিন্তু—"

হাসিয়া বৌদিদি আবার রান্নাঘরে ঢুকিলেন।

ভণ্টু হাঁকিল—"এই ফনতি, পান দিয়ে যা মা-কে।"

ফনতি পান লইয়া আসিল।

বাকু আবার একবার তাগাদা দিলেন। "বৌমা, ডাল নাবল তোমার!"

বৌদিদি রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া বাকুকে বলিতে গেলেন যে চায়ের জল চড়ানো হইয়াছে, আর অধিক বিলম্ব নাই। তাঁহার চোখে মুখে হাসি।

ভণ্টু একটি ময়লা লুঙ্গি পরিয়া তেল মাখিতে বসিল।

(ক্রমশঃ)

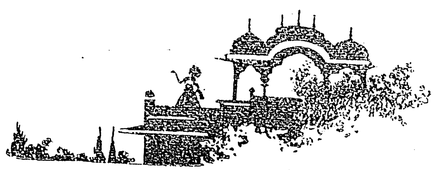

আস্তিক ও নাস্তিক দর্শন

ডক্টর আশুতোষ শাস্ত্রী এম্-এ, পী-এইচ্-ডী, পী-আর-এস্

পৃথিবীর সমস্ত সভ্য জাতির মধ্যেই তাঁহাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুরূপ দার্শনিক পরীক্ষার প্রেরণা দেখিতে পাওয়া যায়। জীব ও জড় প্রকৃতির অন্তস্তত্ত্ব বা জীবাতিগ ও বিশ্বাতিগের জিজ্ঞাসা বুদ্ধিমান মানুষ মাত্রেরই স্বাভাবিক। এইরূপ জিজ্ঞাসার ফলে জিজ্ঞাসু যে সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করে তাহাই হইল তাঁহার দর্শন। আর যিনি সত্যদ্রষ্টা —তিনিই ঋষি। সত্যের যথার্থ সাক্ষাৎকার তর্কের সাহায্যে হয় না। তাহা হয় অন্তর্দৃষ্টি বা 'বোধি'র সাহায্যে। একজন বুদ্ধিমান তার্কিক তাঁহার প্রতিভাবলে যে তর্কের অবতারণা করেন অন্য কোনও তীক্ষ্ণধী তার্কিক তাহার দোষ ও অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করেন। এইরূপে তৃতীয় বুদ্ধিমান আবার দ্বিতীয় বুদ্ধিমানের যুক্তিজাল ছিন্ন করেন। সুতরাং তর্কের শেষ কোথায়? এই জন্যই তর্ক দ্বারা সত্য-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা দুরাশা মাত্র।(১) কিন্তু তাহা বলিয়া দার্শনিক চিন্তা জগতে তর্ককে বাদ দিলেও তো চলে না। তর্ক ও বিচারই দর্শনশাস্ত্রের প্রাণ। এই জন্যই দর্শন শাস্ত্রের অপর নাম মননশাস্ত্র। শ্রুতি ও মননকে আত্মদর্শনের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মার্জ্জিত বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম বিচারশক্তির সাহায্যে যে সত্য-জিজ্ঞাসার পথ সুগম হয় ইহা তো কোন দার্শনিকই অস্বীকার করেন না, তবে তর্কের সাহায্যে সত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে দুরাশা বলিব কেন? ইহার উত্তরে বলা যায় যে তর্কের উদ্দেশ্য, গতি ও প্রকৃতি বিভিন্ন। কেহ সত্যজিজ্ঞাসু হইয়া তর্ক করে। কেহ জিগীষার বশে নানা প্রকার ছল ও অসত্তর্কের সাহায্যে প্রতিপক্ষকে নিরস্ত করিবার জন্যই তর্ক-জাল বিস্তার করে। কেহ বা শুধু তর্কের জন্যই তর্ক করে। এইরূপ ক্ষেত্রে প্রথমশ্রেণীর তার্কিকের তর্কপদ্ধতির মূলে সত্যের প্রেরণা থাকায় ঐরূপ তর্ককে দার্শনিক পরীক্ষার অনুকূল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়, কিন্তু অপরাপর তার্কিকগণের তর্কের মূলে সত্যজিজ্ঞাসা না থাকায় ঐরূপ শুষ্ক তর্ক দার্শনিক পরীক্ষার উপযোগী নহে বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। শ্রুতি ও আচার্য্যের উপদেশে ভারতীয় দর্শনে আমরা যেখানে তর্কের নিন্দা শুনিতে পাই তাহা ঐরূপ অসত্তর্ক বা শুষ্ক তর্ক সম্বন্ধেই প্রযোজ্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। নতুবা মননশাস্ত্রের প্রাণই তর্ক, দার্শনিক তাহা বাদ দিবেন কিরূপে? তর্কের এই বিভিন্ন রূপ তর্করহস্যবিদ্ নৈয়ায়িকগণ আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। তাঁহারা তর্কের বিভিন্ন স্বরূপ বুঝাইবার জন্য (ক) তর্ক (খ) বাদ (গ) জল্প (ঘ) বিতণ্ডা—এই চারটি তার্কিক পরিভাষার প্রয়োগ করিয়াছেন। তন্মধ্যে তর্ক ও বাদের মূলে তত্ত্ব-নির্ণয়ের প্রেরণা থাকায় ঐরূপ তর্ক দার্শনিকের অবলম্বনীয়; জল্প ও বিতণ্ডার মূলে সত্যের প্রেরণা না থাকায় ঐরূপ কুতর্ক সত্যজিজ্ঞাসুর সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।(২) কিন্তু তর্ক যতই সূক্ষ্ম, গভীর ও নির্দ্দোষ হউক না কেন তাহা দ্বারা যে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় তাহা পরোক্ষ সত্য, তর্কের দ্বারা সত্যের প্রত্যক্ষ হয় না। সার্ব্বভৌম সত্যের সাক্ষাৎ পরিচয় পাইতে হইলে আমাদিগকে বুদ্ধিলোকের ঊর্দ্ধে প্রজ্ঞালোকে চলিয়া যাইতে হয়। বুদ্ধিলোকে হয় সত্যের বিচার, প্রজ্ঞালোকে হয় সত্যের সাক্ষাৎকার। এই সাক্ষাৎকার তর্কলভ্য নহে, অপ্রতর্ক্য, ইহা সাধনালভ্য। সাধনার ফলে প্রজ্ঞানেত্র উন্মীলিত হইলেই সত্যের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশিত হয়। বুদ্ধির ভূমি হইতে প্রজ্ঞার ভূমি সম্পূর্ণই স্বতন্ত্র। বুদ্ধির যুগ ভাষ্যকার ও টীকাকারের যুগ। এই যুগে আমরা দেখিতে পাই বিচারশক্তির অপূর্ব্ব লীলা, ভারতীয় দার্শনিক প্রতিভা এখানে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। রাশি রাশি গ্রন্থমালা

(১) আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রে (২।১।১১) তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা তর্ক যে সুপ্রতিষ্ঠিত নহে তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

শ্রুতিও বলিয়াছেন—নৈষা তর্কেন মতিরপনেয়া।

(২) তর্ক, বাদ প্রভৃতি বিভিন্ন তর্কপ্রণালীর বিশেষ বিবরণের জন্য ন্যায়সূত্র ও বাৎস্যায়নভাষ্য (১।১।৪০—৪২) দ্রষ্টব্য।

নূতন নূতন চিন্তার সম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছে। খণ্ডন ও মণ্ডনে বাণীর পাদপীঠ ভরিয়া উঠিয়াছে। তর্ক কোলাহলে এই যুগ মুখরিত। এই কোলাহলের মধ্যে বোধির বাণী অস্ফুটই থাকিয়া যায়। জিগীষুর সদম্ভ আস্ফালনই হৃদয় অধিকার করে। কিন্তু একথাও এখানে অস্বীকার করিলে চলিবে না যে বাদপ্রতিবাদের মধ্য দিয়াই দার্শনিক সাহিত্য পুষ্টিলাভ করিয়াছে। তর্কের আলোকচ্ছটায় তত্ত্বজিজ্ঞাসার পথ যত সুগম করা যাইতে পারে ভারতীয় দার্শনিকগণ তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। তবে সেই নিশিতবুদ্ধিভেদ্য-তর্কারণ্যে প্রবেশ করিয়া অক্ষত হৃদয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করা অনেকের ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠে না। তর্কের কণ্টকবনে জ্ঞানকুসুমের বিকাশ হয় না; সুতরাং মনে রাখিতে হইবে যে কুলিশকঠোর তর্কাহবেই দর্শনচিন্তার পরিণতি নহে। ভারতীয় দর্শন একদিকে যেমন তর্কবিজ্ঞান, অপর দিকে ইহা শাশ্বত শান্তিনিদান অধ্যাত্মবিজ্ঞান। বিচার, তর্ক ও সাধনার মধ্য দিয়া আত্মদর্শন ও আত্মমুক্তিই দর্শনের চরম লক্ষ্য। নিরাবিল আনন্দই দার্শনিকের একমাত্র কাম্য। সেই আনন্দের মাপকাঠী প্রত্যেক দার্শনিকের বিভিন্ন হইলেও ভারতীয় দার্শনিকগণ সকলেই আনন্দের সন্ধানে ব্যস্ত। দেহাত্মবাদী চার্ব্বাক হইতে আরম্ভ করিয়া বেদান্তী পর্য্যন্ত প্রত্যেক দার্শনিকই তাঁহার স্বীয় দর্শনচিন্তার অনুকূল আত্মিক সুখ ও মুক্তির সন্ধান দিয়াছেন। সমস্ত দার্শনিক চিন্তাপ্রবাহই মহামানবের মুক্তিসাগরে ছুটিয়া চলিয়াছে। তর্ক ও বিচার জীবের মুক্তি অভিযানে পাথেয় হিসাবেই ভারতীয় দার্শনিকগণ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাই ভারতের অধ্যাত্মশাস্ত্রের বিশেষত্ব। এই বিশেষত্বের জন্যই ভারতীয় দর্শন পৃথিবীর অন্যান্য দর্শন হইতে স্বতন্ত্র। প্রাচ্যের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি তাহার নিজস্ব সম্পদ। ভারতীয়-ঋষির অধ্যাত্ম বিজ্ঞান এই সম্পদের মূল। সত্য সর্ব্বতোমুখ। ঋষির জ্ঞাননেত্রে সর্ব্বতোমুখ সত্যের যে মুখ যে ভাবে প্রতিভাত হইয়াছে তাহাই ক্রমে বিভিন্ন দর্শনাকারে পরিণতি লাভ করিয়াছে। এইজন্যই দার্শনিক রাজ্যে নানা মতবাদ ও প্রস্থানভেদের সৃষ্টি।

ভারতীয় দর্শনের ঐ সকল বিভিন্ন প্রস্থানের বিবরণ মাধবাচার্য্যকৃত সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত সংগ্রহগ্রন্থে মাধবাচার্য্য (১) চার্ব্বাক (২) বৌদ্ধ (৩) জৈন (৪) রামানুজ (৫) মাধ্ব (৬) পাশুপত (৭) শৈব (৮) প্রত্যভিজ্ঞা (৯) রসেশ্বর (১০) পাণিনীয় (১১) ন্যায় (১২) বৈশেষিক (১৩) সাংখ্য (১৪) যোগ (১৫) পূর্ব্বমীমাংসা ও (১৬) উত্তরমীমাংসা বা বেদান্ত এই ষোলটি বিভিন্ন দর্শনের প্রতিপাদ্য সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই ষোলখানি দর্শনের মধ্যে ষড়্-দর্শনই পরবর্ত্তী কালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এখন প্রশ্ন এই যে ষড়্দর্শন বলিয়া আমরা কোন্ ছয়খানি দর্শনকে গ্রহণ করিব? জৈন পণ্ডিত হরিভদ্রসূরি তৎকৃত ষড়্দর্শন সমুচ্চয়ে ষড়্দর্শন বলিয়া (১) বৌদ্ধ (২) ন্যায় (৩) সাংখ্য (৪) জৈন (৫) বৈশেষিক ও (৬) মীমাংসা এই ছয় দর্শনকে গ্রহণ করিয়াছেন (৩) এবং ইহাদেরই সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখা যায় যে তিনি সাংখ্য শব্দে সাংখ্য ও পাতঞ্জল এই উভয় দর্শনকে এবং মীমাংসা শব্দে পূর্ব্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা এই উভয়বিধ মীমাংসাশাস্ত্রকে গ্রহণ করিয়াছেন। ফলে তদীয় ষড়্দর্শনসমুচ্চয়ে সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব্ব মীমাংসা, উত্তর মীমাংসা - বৌদ্ধ ও জৈন ভারতের এই আটটী প্রসিদ্ধ দর্শন ষড়্দর্শন বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগে পণ্ডিত জিনদত্তসূরি তৎকৃত বিবেকবিলাস নামক গ্রন্থে এবং ঐ শতকেরই মধ্যভাগে জৈন পণ্ডিত মালাধারী শ্রীরাজশেখরসূরি তদীয় ষড়্দর্শনের ব্যাখ্যায় হরিভদ্রসূরির পূর্ব্বোক্ত মতের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন (৪)। হরিভদ্রসূরির ষড়্দর্শন সমুচ্চয়ই দর্শনের আদি সংগ্রহ গ্রন্থ। সম্ভবতঃ তাঁহার গ্রন্থ হইতেই ষড়্দর্শন কথাটি জৈনসম্প্রদায়ে বিশেষ

(৩) বৌদ্ধং নৈয়ায়িকং সাংখ্যং জৈনং বৈশেষিকং তথা।
জৈমিনীয়ঞ্চ ষড়্বিধানি দর্শনানামমুন্যহো॥
ষড়্দর্শন সমুচ্চয়—৩য় কারিকা।

(৪) জৈনং সাংখ্যং জৈমিনীয়ং যোগং (=ন্যায়শাস্ত্র)
বৈশেষিকং তথা।
সৌগতং দর্শনান্যেবং নাস্তিকং ন তু দর্শনম্॥
—মালাধারী রাজশেখরকৃত ষড়্দর্শনসমুচ্চয়, ১ম পৃষ্ঠা, যশোবিজয়-গ্রন্থমালা বেনারস্।

প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং পরে অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায় ইহা গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহাদের ষড়্দর্শনের বিবরণ হরিভদ্রসূরির প্রদত্ত বিবরণের অনুরূপ নহে। বর্ত্তমান সময়ে ষড়্দর্শন বলিলে আমরা ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা ও বেদান্ত এই ছয়খানি দর্শনকেই বুঝি। জৈনদর্শন ও বৌদ্ধদর্শন এখন আর ষড়্দর্শনের অন্তর্ভূত নহে। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে ও বিশ্বেশ্বরতন্ত্রের অন্তর্গত গুরু-গীতায় গৌতম, কণাদ, কপিল, পতঞ্জলি, জৈমিনি ও ব্যাসের দর্শনকে ষড়্দর্শন বলা হইয়াছে। (৫) নৈষধ চরিতের টীকাকার নারায়ণ তাঁহার প্রকাশনামক টীকায় (নৈঃ ১৭।৩৬) ষড়্দর্শনের কথা বলিতে গিয়া পূর্ব্বোক্ত ষড়্দর্শনেরই নাম করিয়াছেন। এই ছয়-দর্শনকে আস্তিক দর্শন বলা হইয়া থাকে। এই মতানুসারে জৈন ও বৌদ্ধ-দর্শন নাস্তিক-দর্শন।

এখন প্রশ্ন এই যে দর্শনের আস্তিক্য ও নাস্তিক্যের মাপকাঠি কি? কি যুক্তিবলে আস্তিক ও নাস্তিক-দর্শনের ঐরূপ সীমারেখা অঙ্কিত হইয়া থাকে? আস্তিক ও নাস্তিক শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে যাঁহারা পরলোক, কর্ম্ম ও কর্ম্মফলের অস্তিত্ব স্বীকার করেন তাঁহারা আস্তিক, আর যাঁহারা তাহা মানেন না তাঁহারাই নাস্তিক। দ্বিতীয়তঃ যাঁহারা ঈশ্বর বা বেদ মানেন না তাঁহারাও নাস্তিক। (৬)

(৫) গৌতমস্য কণাদস্য কপিলস্য পতঞ্জলেঃ।
ব্যাসস্য জৈমিনেশ্চাপি দর্শনানি ষড়েব হি॥
রঘুনন্দন কৃত দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ত্বধৃত হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রবচন।
This verse is also quoted in the গুরুগীতা।

(৬) "অস্তি নাস্তি দিষ্টং মতিঃ"—পাণিনি সূত্র—৪।৪।৬০ ও মহাভাষ্য দ্রষ্টব্য।
পরলোকঃ অস্তীতি যস্য মতিরস্তি স আস্তিকঃ, তদ্বিপরীতো নাস্তিকঃ—কাশীপ্রকাশিত কাশিকা, ২৫৭ পৃষ্ঠা।
অস্তি পরলোক ইত্যেবং মতির্যস্য স আস্তিকঃ। নাস্তীতি মতির্যস্য স নাস্তিকঃ। সিদ্ধান্তকৌমুদী।
পরলোক ইত্যভিধানা-স্বভাবাল্লব্ধম্।—শব্দেন্দুশেখর Vol II. পৃঃ ২৮৭ (কাশীপ্রকাশিত)।
নাস্তিকঃ পরলোকতৎসাধনাদ্যভাববাদী।
তৎসাক্ষিণ ঈশ্বরস্য অসত্ত্ববাদী চ॥

নাস্তিক শব্দের উক্ত ত্রিবিধ অর্থের মধ্যে যদি প্রথম অর্থ গ্রহণ করিয়া বলা যায় যে যাঁহারা পরলোক, কর্ম্ম বা কর্ম্মফল মানেন না তাঁহারাই নাস্তিক, তবে জৈন ও বৌদ্ধ-দর্শনকে কোনমতেই নাস্তিক বলা যায় না। কারণ অন্যান্য আস্তিক-দর্শনের ন্যায় জৈন ও বৌদ্ধদর্শনেও কর্ম্ম, অদৃষ্ট ও পুনর্জন্ম স্বীকৃত হইয়াছে। জৈন-দার্শনিকগণ বলেন যে কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা আমরা কর্ম্ম করিয়া থাকি; ঐ কর্ম্ম সূক্ষ্ম অদৃষ্টরূপে আত্মাতে সঞ্চিত হয় এবং আত্মার উপর একটী পাপ-পুণ্যের ছাপ আঁকিয়া দেয়। ইহারই নাম আত্মার 'কর্ম্মলেপ'। অতীত জীবনের অনাদিকাল সঞ্চিত ঐ কর্ম্মলেপের ফলে জীবের 'কর্ম্ম শরীরের' সৃষ্টি হয়। কর্ম্ম জীবকে জন্মমৃত্যুর আবর্ত্তে টানিয়া নেয় এবং স্বস্ব কর্ম্মানুযায়ী সুখদুঃখ ভোগ করায়। জৈন দার্শনিকগণ ইহলোক ও পরলোকগামী স্থির-আত্মা স্বীকার করেন। বৌদ্ধ দার্শনিকগণের মতে বাসনার মূলোচ্ছেদই নির্ব্বাণ। যতদিন বাসনার মূলোচ্ছেদ না হইবে ততদিন জীবন-প্রবাহের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া অনন্ত দুঃখভোগ অবশ্যম্ভাবী। ইহলোক পরলোকগামী স্থির আত্মা না থাকিলেও অনাদি-বাসনা-বশতঃ যে জীবন-প্রবাহ তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে নির্ব্বাণের পূর্ব্ব-মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তই উহা অবিরাম গতিতে ছুটিয়া চলিবে। সে চিরপ্রবহমান জীবন-স্রোতের গতিপথে জন্ম, মৃত্যু, জন্মান্তর প্রভৃতি এক একটী স্তর মাত্র। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ এইরূপে পুনর্জন্ম ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে যাঁহারা ঈশ্বর মানেন না তাঁহাদিগকে যদি নাস্তিক বলা যায়, তবে কপিলের সাংখ্যদর্শন নাস্তিক দর্শন হইয়া দাঁড়ায়; কেননা মহর্ষি কপিল সাংখ্য-দর্শনে ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই। জৈমিনির মীমাংসাদর্শনেও ঈশ্বর স্বীকৃত হয় নাই; সুতরাং বৈদিক কর্ম্মমীমাংসা ও নাস্তিক দর্শনই হইয়া পড়ে। অতএব দেখা যাইতেছে যে যাঁহারা ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা ও বেদান্ত এই ষড়্দর্শনকে আস্তিক দর্শন এবং জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনকে নাস্তিক-দর্শন বলেন তাঁহারা বেদ প্রামাণ্যের

নাস্তিক্যং বেদনিন্দাঞ্চ দেবতানাঞ্চ কুৎসনম্। ভীমাচার্য্য কৃত-ন্যায়কোষ-নাস্তিক শব্দ দ্রষ্টব্য।
"নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ"—মনুসংহিতা।

ভিত্তিতেই আস্তিক ও নাস্তিকদর্শনের সীমারেখা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। 'নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ' এই মতের অনুসরণ করিয়া তাঁহারা বলেন যে, যাঁহারা বেদ মানেন তাঁহারাই আস্তিক, আর যাঁহারা বেদ মানেন না বেদের নিন্দা করেন তাঁহারা নাস্তিক, তাঁহাদের দর্শনই নাস্তিক দর্শন। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটী মাত্র প্রমাণ স্বীকার করেন, তৃতীয় শব্দপ্রমাণ ও শব্দময় বেদের প্রামাণ্য তাঁহারা স্বীকার করেন না এবং কোন কোন বৌদ্ধগ্রন্থে বেদের নিন্দাই শুনিতে পাওয়া যায়; (৭) এই জন্যই বৌদ্ধদর্শনকে নাস্তিক দর্শন বলা হইয়া থাকে। জৈন দার্শনিকগণ শব্দপ্রমাণ স্বীকার করিলেও "বেদ যাহা বলিয়াছেন তাহাই সত্য" এইরূপ বেদ প্রামাণ্য অঙ্গীকার করেন নাই, সুতরাং তাঁহাদের দর্শনও নাস্তিক দর্শন।

এখানে আপত্তি হইতে পারে যে বৌদ্ধদর্শন প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটী মাত্র প্রমাণ মানে, শব্দ প্রমাণ মানে না, সুতরাং তাহা যেমন নাস্তিক দর্শন হইল সেইরূপ বৈশেষিক দর্শনও প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই প্রমাণদ্বয়ই মানিয়াছে, শব্দ প্রমাণ মানে নাই—অতএব বৈশেষিকদর্শন বৌদ্ধদর্শনের ন্যায় নাস্তিক দর্শন হইল না কেন? উহা আস্তিক দর্শন বলিয়া গণ্য হইল কিরূপে? এই আপত্তির উত্তরে আস্তিক দার্শনিকগণ বলেন যে বৈশেষিক দর্শন শব্দপ্রমাণ স্বতন্ত্রভাবে না মানিলেও (প্রকারান্তরে শব্দপ্রমাণ স্বীকার করিয়া) বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। বৌদ্ধদর্শনের মত বেদকে অপ্রমাণ বলেন নাই; এই জন্যই বৌদ্ধদর্শন নাস্তিক, আর বৈশেষিকদর্শন আস্তিক দর্শন বলিয়া পরিগণিত হইল। বৈশেষিকদর্শন শব্দপ্রমাণ মানেন নাই অথচ শব্দময় বেদের প্রামাণ্য মানেন ইহার অর্থ কি? বৈশেষিক শব্দপ্রমাণ মানেন না ইহার অর্থ—তাঁহার মতে শব্দ অপ্রমাণ নহে তবে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের ন্যায় উহা একটী স্বতন্ত্র তৃতীয় প্রমাণও নহে। শব্দপ্রমাণ বৈশেষিকের মতে অনুমানেরই অন্তর্ভূত, অনুমানেরই একটী প্রকার ভেদ মাত্র। ইহা শব্দে অনুমান, বৈশেষিকের মতে অনুমান প্রমাণ দ্বারাই 'শব্দ-অনুমানের' উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে; সুতরাং শব্দকে একটী স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া মানিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। শব্দপ্রমাণের উক্তরূপ তাৎপর্য্যই মহর্ষি কণাদ বৈশেষিক-সূত্রে "অনুমান প্রমাণ দ্বারাই শব্দপ্রমাণ ও ব্যাখ্যা করা গেল" (এতেন শাব্দং ব্যাখ্যাতম্ বৈঃ সূত্র) এই উক্তি দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। প্রাচীন ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ প্রভৃতিও শব্দ, উপমান প্রভৃতি প্রমাণকে অনুমানের অন্তর্ভূত করিয়াছেন (শব্দাদীনামপ্যনুমানে ইন্তর্ভাবঃ)। শব্দপ্রমাণ তাহা হইলে বৈশেষিকের মতে দাঁড়াইল গিয়া একরকম অনুমান। এই শাব্দ-অনুমানের প্রয়োগবাক্য বা আকারটী কিরূপ তাহা সূত্রকার কণাদ বা ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ কেহই স্পষ্টতঃ বলেন নাই। বৈশেষিক মতে শব্দ ও অর্থের মধ্যে কোনরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি নাই। নৈয়ায়িকগণের ন্যায় বৈশেষিকগণও শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি খণ্ডন করিয়াছেন। অতএব কোন শব্দ শুনিয়া তাহা হইতে কোন অর্থের অনুমান করাও সম্ভব হয় না। এইজন্যই শব্দ-অনুমানের প্রয়োগবাক্য বা হেতুসাধ্য নির্দ্দেশ করা দুরূহ। সূত্রকার কণাদ বা ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ শব্দ-অনুমান প্রক্রিয়া প্রদর্শন না করিলেও শ্রীধরভট্ট প্রভৃতি পরবর্ত্তী বৈশেষিক আচার্য্যগণ অনেক যুক্তিতর্কের সাহায্যে বৈশেষিকের শাব্দ-অনুমান প্রণালী সমর্থন করিয়াছেন। প্রমাণরহস্যবিৎ মহর্ষি গৌতম কিন্তু কণাদের এই শাব্দ-অনুমান অনুমানেরই প্রকারভেদ এই মত সমর্থন করেন নাই। অধিকন্তু তিনি তাঁহার ন্যায়-দর্শনের দ্বিতীয়াধ্যায়ে কণাদমত খণ্ডন করিয়া শব্দকে স্বতন্ত্র একটি তৃতীয় প্রমাণ বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। (৮) মহর্ষি গৌতম বলেন যে আমরা জীবনে কখনও প্রত্যক্ষ করি নাই

(৭) যে তু সৌগতসংসারমোচকাগমাঃ কস্তেষু প্রামাণ্যমার্য্যোঽনুমোদতে।

বৌদ্ধশাস্ত্রে হি বিস্পষ্টা দৃশ্যতে বেদবাহ্যতা।
জাতিধর্ম্মোদিতাচার পরিহারাবধারণাৎ।

ন্যায়মঞ্জরী, ২৬৫ পৃষ্ঠা

মহাজনশ্চ বেদানাং বেদার্থানুগামিনাং চ পুরাণধর্ম্মশাস্ত্রাণাং বেদাবিরোধিনাঞ্চ কেষাঞ্চিদাগমানাং প্রামাণ্যম্ অনুমন্যতে, ন বেদবিরুদ্ধানাং বৌদ্ধাদ্যাগমানাম্। ন্যায়মঞ্জরী, ২৬৫ পৃষ্ঠা

শান্তরক্ষিত কৃত তত্ত্বসংগ্রহ –

(৮) শব্দোঽনুমানমর্থস্যানুপলব্ধেরনুমেয়ত্বাৎ॥ ন্যায়সূত্র ২।১।৪৯
আপ্তোপদেশসামর্থ্যাচ্ছব্দার্থসম্প্রত্যয়ঃ।২।১।৫২
২।১।৫০, ২।১।৫১ ন্যায়সূত্র দ্রষ্টব্য

বা প্রত্যক্ষ করিতে পারিব না; এইরূপ দেবতা, স্বর্গ, পরলোক প্রভৃতি অনেক অপ্রত্যক্ষ পদার্থেরও জ্ঞান শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐরূপ অপ্রত্যক্ষ বস্তুর জ্ঞান অনুমানের সাহায্যে উৎপন্ন হইতে পারে না, কেননা অনুমান করিতে হইলে অন্ততঃ কোন না কোন স্থানে হেতু ও সাধ্যের একত্র অবস্থান বা ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষ করা একান্তই আবশ্যক। যে সকল বস্তু চিরদিন অপ্রত্যক্ষই থাকিবে তাহাদের কোন এক স্থলেও প্রত্যক্ষ হওয়া সম্ভব নহে। ফলে ব্যাপ্তি-জ্ঞানাদির অভাববশতঃ অনুমানও হইতে পারে না এবং অনুমানের সাহায্যে অপ্রত্যক্ষ বস্তুর বোধও হইতে পারে না। আপ্ত মহাপুরুষগণের উক্তি হইতেই আমরা ঐ সকল অপ্রত্যক্ষ বস্তুকে সত্য বলিয়া মানিয়া লই। কেননা যাহা আমাদের অপ্রত্যক্ষ, তাহাও মহাপুরুষগণের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। আপ্ত মহাপুরুষের বাক্য শুনিয়া যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহাই শব্দপ্রমাণ। ইহা অনুমান নহে, অনুমান হইতে পৃথক্—ইহা একপ্রকার বিভিন্ন জাতীয় জ্ঞান। (৯) শব্দ-প্রমাণ যে অনুমান নহে তাহার আরও কারণ এই যে, শব্দ-জ্ঞান যখন আমাদের প্রত্যক্ষ হয় তখন 'শব্দ শুনিয়া বুঝিলাম' এইরূপেই উহা প্রত্যক্ষ হয়, শব্দ দ্বারা অনুমান করিলাম এইরূপে প্রত্যক্ষ হয় না। শব্দ-প্রমাণ অনুমান হইলে শেষোক্তরূপে সেই জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত। অতএব বলিতেই হইবে যে শাব্দবোধ অনুমান নহে তাহা পৃথক্ একটি তৃতীয় প্রমাণ। গৌতম ও কণাদের বিচারের ফলে দেখা যাইতেছে যে নৈয়ায়িকগণও শব্দপ্রমাণ মানেন, বিশেষ এই যে নৈয়ায়িকগণ শব্দপ্রমাণকে অনুমান প্রমাণ হইতে স্বতন্ত্র একটী ভিন্ন জাতীয় প্রমাণ মানেন। বৈশেষিক-গণ শব্দপ্রমাণকে অনুমান হইতে ভিন্নজাতীয় পৃথক্ প্রমাণ বলিয়া মানেন না, অনুমান প্রমাণেরই একপ্রকার শাখা বলিয়া মানেন। কোনও প্রাচীন বৈশেষিক সম্প্রদায় কিন্তু শব্দপ্রমাণকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়াই স্বীকার করেন। এই সম্প্রদায়ের মতে শব্দপ্রমাণ অনুমানের অন্তর্ভুক্ত নহে, ইহা পৃথক্ তৃতীয় প্রমাণ; প্রত্যক্ষ অনুমান ও শব্দ এই প্রমাণত্রয়ই বৈশেষিকের স্বীকার্য্য। প্রশস্ত-পাদ ভাষ্যের ব্যোমবতী বৃত্তিতে ব্যোমশিবাচার্য্য এই মত বিবৃত করিয়াছেন। (১০) হরিভদ্রসূরিকৃত ষড়্‌দর্শন সমুচ্চয়ের টীকাকার গুণরত্নসূরি তাঁহার টীকায় ব্যোমশিবাচার্য্যের মত সমর্থন করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যকৃত বলিয়া কথিত সর্ব্বসিদ্ধান্তসংগ্রহেও বৈশেষিক দর্শনকে স্পষ্টতঃ প্রমাণত্রয়-বাদী বলা হইয়াছে। (১১) ব্যোমশিবাচার্য্যের আলোচনা দেখিলে বুঝা যায় যে এই ব্যাখ্যা ব্যোমশিবাচার্য্যের স্বকপোল কল্পিত নহে। ইহা ও এক গুরুপরম্পরাগত সাম্প্রদায়িক মত। এই মতানুসারে শব্দকে স্বতন্ত্র তৃতীয় প্রমাণ বলিয়া মানিয়া নিলে বৈশেষিক সূত্রকার কণাদের "অনুমান প্রমাণ দ্বারাই শব্দই প্রমাণ ব্যাখ্যা করা হইল" (এ তেন শাব্দং ব্যাখ্যাতম্) এই উক্তি কেমন করিয়া সমর্থন করা যায়? তারপর প্রাচীন ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ "শব্দাদীনামপ্যনুমানে ইন্তর্ভাবঃ" বলিয়া স্পষ্টতঃ শব্দপ্রমাণকে যে অনুমানের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন তাহাই বা কেমন করিয়া সঙ্গত হয়? প্রশস্তপাদভাষ্যের টীকাকার ব্যোমশিবাচার্য্য তদীয় বৃত্তিতে 'শব্দাদীনাম্' এই ভাষ্যোক্তির ব্যাখ্যায় 'শব্দাদি' পদটী 'অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি' করিয়া "শব্দ আদিতে যাহার" এই বলিয়া উপমান প্রভৃতি প্রমাণকে গ্রহণ করিয়া উপমান প্রভৃতি প্রমাণকেই অনুমানের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, শব্দপ্রমাণকে অনুমানের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই; স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়াছেন। প্রত্যক্ষ, অনুমান, শব্দ, উপমান, অর্থাপত্তি প্রভৃতি প্রমাণ গণনায় উপমান প্রমাণের পূর্ব্বে শব্দপ্রমাণ থাকায় "শব্দ আদিতে যাহার" বলিয়া "শব্দাদি" পদে উপমানকেও অবশ্য গ্রহণ করা যায়, কিন্তু দ্রষ্টব্য এই, ইহাই কি প্রশস্তপাদভাষ্যের মর্ম্ম? প্রশস্তপাদভাষ্য কণাদকৃত বৈশেষিক-দর্শনের প্রাচীন ভাষ্য, সূত্রকার কণাদ অনুমান প্রমাণের দ্বারাই শব্দপ্রমাণ ব্যাখ্যা করিলেন।

(৯) স্বর্গঃ অপ্সরস ইত্যেবমাদেরপ্রত্যক্ষস্যার্থস্য ন শব্দমাত্রাৎ সম্প্রত্যয়ঃ কিন্তর্হি আপ্তৈরয়মুক্তঃ শব্দঃ ইত্যতঃ স প্রত্যয়ঃ। ন্যায়ভাষ্য ২।১।৫২

নন্বয়ং শব্দমাত্রাৎ স্বর্গাদীন্ প্রতিপদ্যতে কিন্তু পুরুষবিশেষাভিহিতত্বেন প্রমাণত্বং প্রতিপদ্য তথাভূতাচ্ছব্দাৎ স্বর্গাদীন্ প্রতিপদ্যতে, ন চৈবমনুমানে। তস্মান্নানুমানং শব্দ ইতি। ন্যায়বার্ত্তিক ২।১।৫২

(১০) ব্যোমবতীবৃত্তি, কাশী সংস্করণ, ৫৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১১) ত্রিধা প্রমাণং প্রত্যক্ষমনুমানাসমাবিতি।
ত্রিভিরেতৈঃ প্রমাণৈস্তু জগৎকর্ত্তাবগম্যতে।

সর্ব্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ, বৈশেষিক দর্শন;
ষড়্‌দর্শন সমুচ্চয়ের গুণরত্নসূরিকৃত টীকা দ্রষ্টব্য।

সূত্রকারের উক্তির সহিত প্রশস্তপাদভাষ্যের উক্তির সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে ‘শব্দাদি’ পদটী দ্বারা শব্দপ্রমাণকেই আদিতে ধরিতে হয় এবং তাহা হইলে ব্যোমশিবাচার্য্যের ব্যাখ্যাকে কষ্টকল্পনা বলিয়াই গ্রহণ করিতে হয়। ভাষ্যের স্বারসিক অর্থ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ ব্যোমশিবাচার্য্যের ব্যাখ্যা যে প্রশস্তপাদের সম্মত নহে তাহা মনে করিবার আরও একটী কারণ এই যে, শব্দকে তৃতীয় পৃথক্ প্রমাণ মানাই যদি প্রশস্তপাদের অভিপ্রেত হইত তবে প্রমাণের গণনায় তিনি শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করেন না কেন? এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর প্রশস্তপাদভাষ্যে বা ব্যোমবতীবৃত্তিতে পাওয়া যায় না। আর এক কথা, শব্দ স্বতন্ত্র তৃতীয় প্রমাণ হইলে সূত্রকার কণাদ যে অনুমানের দ্বারা শব্দ প্রমাণের ব্যাখ্যা করিলেন (এতেন শাব্দং ব্যাখ্যাতম্) তাহার সঙ্গতি রক্ষা হয় কিরূপে? ব্যোমশিবাচার্য্য তাঁহার বৃত্তিতে কণাদ সূত্রের কোন তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন নাই। সুতরাং ব্যোমশিবাচার্য্যের ব্যাখ্যা সূত্রকার ও ভাষ্যকারের অনুমোদিত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। তবে তাঁহার বৃত্তি আলোচনা করিলে অনুসন্ধিৎসু পাঠক একথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে প্রাচীন বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও সম্প্রদায় শব্দ-প্রমাণকে স্বতন্ত্র তৃতীয় প্রমাণ হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। (১২) পরবর্ত্তীকালে এই মত বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে নাই। আমরাও এই মতের পক্ষপাতী নহি। এইমত প্রদর্শন করার তাৎপর্য্য এই যে যাঁহারা বৈশেষিক দর্শন শব্দপ্রমাণ মানে না, সুতরাং বৈশেষিকদর্শন ও নাস্তিক দর্শন বলিয়াই গণ্য এইরূপ ভ্রান্তমত প্রচার করেন —তাঁহাদিগকে অঙ্গুলিসঙ্কেতে দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে বৈশেষিকগণ কেবল অনুমানের প্রকারভেদ বলিয়াই শব্দ প্রমাণ সমর্থন করিয়াছেন এমন নহে। কোনও সম্প্রদায় শব্দপ্রমাণকে অতিরিক্ত তৃতীয় প্রমাণ বলিয়াও সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অতএব বৈশেষিক দর্শনকে শব্দ প্রমাণ মানে নাই বলিয়া নাস্তিকদর্শন বলা নিতান্তই অসঙ্গত।

পরম-আস্তিক বৈশেষিক যে পরমেশ্বরের বেদময়ী বাণীকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেন তাহা আমরা কণাদের সূত্র হইতেই জানিতে পারি। মহর্ষি কণাদ “তদ্‌বচনাদ্ আম্নায়স্য প্রামাণ্যম্” “এই সূত্রে স্পষ্ট বাক্যেই আম্নায় বা বেদের প্রামাণ্য অঙ্গীকার করিয়াছেন। বৈশেষিক দর্শনের কিরণাবলী টীকায় আচার্য্য উদয়ন উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় ‘তৎ’ শব্দদ্বারা পরমেশ্বরকে গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে পরমেশ্বর রচিত বলিয়াই বেদ প্রমাণ (তেন ঈশ্বরেণ প্রণয়নাৎ)। ন্যায়কন্দলীরচয়িতা শ্রীধরভট্টের মতে তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণই বেদের কর্ত্তা, পরমেশ্বর বেদের কর্ত্তা নহেন, সুতরাং সূত্রের ‘তৎ’শব্দদ্বারা তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণের কথাই বলা হইয়াছে। সত্যদ্রষ্টা মহর্ষিগণের উক্তি বলিয়াই বেদ প্রমাণ। উদয়নাচার্য্য ও শ্রীধরাচার্য্যের সূত্রব্যাখ্যা আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইলেও ইহার মধ্যে বাস্তবিক বিরোধ নাই। কেন না, পরমপিতা পরমেশ্বরই মহর্ষিগণের হৃদয়কন্দরে বেদজ্ঞানপ্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়াছেন। তাঁহার অনুগ্রহেই মহর্ষিগণ বৈদিক সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া বেদবাণী প্রচার করিয়াছেন। এইজন্যই শাস্ত্রে কোথায়ও পরমেশ্বরকে বেদের কর্ত্তা বলা হইয়াছে, কোথায়ও মহর্ষি-গণকে বেদের কর্ত্তা বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে সূত্রস্থ ‘তৎ’ শব্দদ্বারা যদি পূর্ব্বসূত্রোক্ত ধর্ম্মশব্দকে গ্রহণ করা যায় তাহা হইলেও কণাদের মতে বেদ যে ঈশ্বর প্রণীত তাহাই বুঝা যায়। বৈশেষিক দর্শনের ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রারম্ভে বেদের প্রামাণ্য সমর্থন করিতে গিয়া মহর্ষি কণাদ বলিয়াছেন যে লৌকিক বাক্যগুলি যেমন বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ স্বীয় বুদ্ধির সাহায্যে রচনা করেন সেইরূপ বৈদিক বাক্যসমূহও কোন তত্ত্বজ্ঞ মনীষী কর্ত্তৃক অসামান্য প্রজ্ঞাবলেই রচিত হইয়া থাকিবে। কারণ লৌকিক ও বৈদিক উভয়প্রকার বাক্যেরই রচনাভঙ্গী তুল্যরূপ; কিন্তু কে সেই মনীষী যাঁহার অপূর্ব্ব মনীষার আলোকপাতে বৈদিক-মার্গ ও ধর্ম্মপথ আলোকিত হইতে পারে? নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণের মতে বেদ রচয়িতা পরমেশ্বরেরই নিত্য বিভূতি। যে বস্তু ইহলোক ও পরলোকে আমাদের কল্যাণ সাধন করে তাহারই নাম ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের প্রতিপাদক বলিয়াই বেদ প্রমাণ। কিন্তু তাহার এই প্রামাণ্যের মূলে রহিয়াছে শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা পরমেশ্বরের নিত্য-প্রজ্ঞা। বেদ সেই ঐশী প্রজ্ঞারই প্রকাশ। শ্রীভগবানের বেদার্থ-বিষয়ক প্রজ্ঞা নিত্য। এইজন্যই ন্যায়বৈশেষিকদিগের মতে শব্দরাশি অনিত্য হইলেও শব্দময় বেদ নিত্য সত্য পরমব্রহ্ম।

বৈশেষিকদর্শনে এইরূপ নিঃসন্দিগ্ধভাবে বেদের প্রামাণ্য সমর্থিত হইলেও কোন কোন বিশিষ্ট পণ্ডিত বৈশেষিক দর্শনকে নাস্তিকদর্শন বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকেন। ইহা কি সত্যের অপলাপ নহে? সুধী পাঠক বিচার করিবেন।

(১২) ব্যোমবতী বৃত্তি, ৫৭৭—৫৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সঙ্গীত

কথা, সুর ও স্বরলিপি—জগৎ ঘটক

গান

আজি সহসা এলো বরষা
এলো ঘন বরিষণে।
এলো রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্ নূপুর পায়ে,
বাদল সমীরণে॥

এলো কে বিরহিণী পথ-হারা
নয়নে ঝরে অঝোর-ধারা,
আঁধার পথে চলে অভিসারে—
চমকে চপলা ক্ষণে ক্ষণে॥

আজ প্রথম আষাঢ় দিনে বাদল সাঁঝে—
কোন্ বিরহীর বীণা
তারি স্মরণে বাজে।

আজি সে-সকরুণ তানে
কি ব্যথা তারি বুকে আনে,
কাহারে চাহি’ একা কেঁদে মরে—
পূবালি হাওয়ায় মনে মনে॥

[পনা না নর্সা -া]
মা মা III পা পর্সা না -র্সা | -া -া -ণণা -পা I মপা জ্ঞমা পণা মপা | পর্সা -া -া -া I
আ জি স হ ০ সা ০ ০ ০ ০ ০ ০ এ ০ লো ০ ব ০ র ০ ষা ০ ০ ০ ০

I ণা -ণণা ণপা -া | মপা মজ্ঞা রা সা I ন্সা -রগজ্ঞা রা -া | -া -া {সা সা I
এ ০ ০ লো ০ ঘ ০ ন ০ ব রি ষ ০ ০ ০ ণে ০ ০ ০ এ লো

I প্া -সা প্া -সা | রা -সা রা -া I রা রমা মপধা মপা | মজ্ঞা -া } -া -া I
রি ম্ ঝি ম্ রি ম্ ঝি ম্ নূ পু র ০ ০ পা ০ য়ে ০ ০ ০ ০

I রা রণা ধা ণা | পা ধা পমা -া III
বা দ ০ ল স মি র ণে ০

পা পা II { মা -পা পণা মপা | পনা না না -র্সা I নর্সা -র্রা নর্সা -া | -া -া -া -া I
এ লো কে ০ বি০ র০ হি০ নী প থ হা০ ০ রা ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা সর্রা র্রা র্রা | র্রর্মর্জ্ঞা -া -র্রর্রা -র্সা I র্সা র্সনা র্সা র্সণা | ণপা ণা -া -া } I
ন য় নে ঝ রে০ ০ ০০ ০ অ ঝো০ র ধা রা০ ০ ০ ০

I ণা ণর্সা ণর্সণা ণধা | ধপা -া -া -া I মপা -জ্ঞমা মপা -া | -া -া -া -া I
আঁ ধা০ র০০ প থে ০ ০ চ০ ০০ লে০০ ০ ০ ০ ০

I সরা সা রপা মপমা | মজ্ঞা -া -া -া I সা রা রমা মপা | পণা -ধণমা মপা -া I
অ০ ০ ভি০ সা০০ রে ০ ০ ০ চ ম কে চ প০ ০০ লা ০

I মপা -নর্সা র্রা র্রর্জ্ঞর্রা | র্সনা -র্সা -ণণা -পা II [ ]
ক্ষ০ ০০ ণে ক্ষ০০ ণে০ ০ ০০ ০

সা -া II পা পসা সা সরা | রণা রা রা সরা I রমা জ্ঞা -া -া | -া -া -া -া I
আ জ্ প্র থ ম আ০ ষা ০ ঢ় দি০ নে০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I সা রা রজ্ঞা রা | রসা -া -া -া I সা পা পা পা | পধা মা পা পধা I
বা দ ল০ সাঁ ঝে০ ০ ০ ০ কো ন্ বি র হী০ ০ র বী০

I ধর্সা ণা -া -া | -ধণধা -পা পধা ধমা I মপা পজ্ঞা জ্ঞসা জ্ঞমা | মপা -া -া -া I
ণা০ ০ ০ ০ ০০ ০ তা০ রি০ স্ম০ র০ ণে বা০ জে০ ০ ০ ০

I মা পা পণা মপা | পর্সা -া র্সা র্সা I নর্সা -র্রা নর্সা -া | -া -া -া -া I
আ জি সে০ স০ ক০ ০ রু ণ তা০ ০ নে ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা সর্রা র্রা র্রা | র্রর্মর্জ্ঞা -া -র্রর্জ্ঞর্রা -র্সা I র্সা -র্সনা র্সা র্রর্সা | ণা -া -ধণধা -পা I
কি ব্য থা তা রি০ ০ ০০০ ০ বু ০ কে আ নে ০ ০০ ০

I পা ধা ণা পধা | ধর্সা ণা ণা ণা I ণা -ধণধপা মা পা | মজ্ঞা -া -া -া I
কা হা রে চা০ হি০ ০ এ কা কেঁ ০০০ দে ম রে ০ ০ ০

I সা রা মা মপা | পণা -ধণা মা পা I মপা -নর্সা র্রা র্রর্জ্ঞর্রা | র্সনা -র্সা -ণণা -পা II II [ ]
পূ বা লি হাও হা০ ০০ ০ য়্ ম০ ০০ নে ম০ নে০ ০ ০০ ০

২১৪৮/ত্রি. ১০/৬/৭৭

ভূস্বর্গ চঞ্চল

শ্রীদিলীপকুমার রায়

পঞ্চম স্তবক

অমরেন্দ্রনারায়ণ!

পঞ্চম স্তবকের বাণটি আপনাকে হানবার সাইকলজি আছে। অর্থ বা উদ্দেশ্য আদৌ না থাকলেও যে-ভালোবাসাকে আমাদের শাস্ত্রে বলেছে অহেতুকী, এ তাই। এর আগে হীরেনকে যে-চিঠি লিখেছি তাতেও স্বার্থের যেন একটা ফিকে রঙ ধরেছে। ও একদা আমাদের বাংলা গানের বিরোধী ছিল—আজকাল খানিকটা বদলেছে (ভরসা হয়) বাংলা গান ক্রমাগত শুনে—তাই জেগেছিল একটা যেন আত্মপ্রসাদ। এ স্বার্থ নয় তো কী?

কিন্তু আপনি?
নহে নহে নহে বন্ধু।
তোমারি কাছে শিখেছি
যেন নতুন ক'রে নিত্য
কাহারে বলে স্বার্থহীন
প্রীতির আলো দীপ্ত
পেয়েছি এত তোমার
কাছে—কিন্তু গান-বন্ধু হে
চাহোনি কিছু—তোমারে
তাই বাখানিদান সিন্ধু যে।

তাছাড়া আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র আপনাকেই তুমি বলা আমার ভাগ্যে ঘ'টে ওঠে নি। এ পত্রে সম্বোধনের একটু বৈচিত্র্যের আমদানি হ'লই বা।

যদি বলেন—ক্ষুণ্ণ হ'য়ে—যে, ঐ যাঃ স্বার্থ তাহ'লে আছে, তাহ'লে ফের বলব যে—না একে স্বার্থ বলে না। পরমহংসদেব বলতেন: সব "আমি"-ই ভগবানের পথে অন্তরায়, কেবল "দাস আমি" হ'ল সহায়। লৈখিক জগতে রসবৈচিত্র্যের অভিমান হ'ল এই "দাস আমি"—ওকে স্বার্থ বলা যায় না। কারণ—

অমল রসের নির্ঝরে তাই, ঝরে যখন উছল প্রীতি
যায় ঢেকে সব বেসুর বিবাদ নিরভিমান হয় সে গীতি।
তোমারে তাই করি বরণ, সুহৃৎজনের মধ্যে তুমি
আরো আপন—নিত্য সরস করো বলে চিত্তভূমি।
জীবনটা নয় মরু কেন?—কারণ (আছে শাস্ত্রে লেখা)
আজও হেথায় সখা সখীর ওয়েসিসের মেলে দেখা।
ভেঁজে আলাপ এটুক—তোমায় শোনাই চিঠির রাগমালা
কবি গুণী দরদী শ্রোতা! ভাবতেও প্রাণ
হয় উজালা।

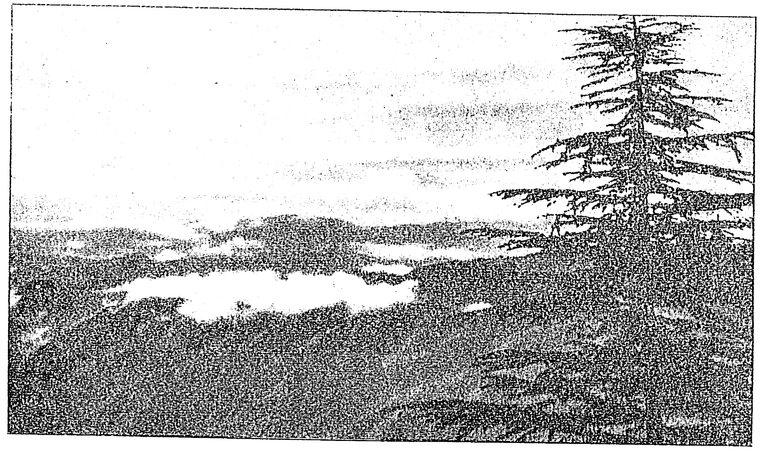

কাশ্মীরে মেঘের খেলা

মন-বাগানে একেকটি ফুল ফোটে আমরণ সাধনায়
তোমার মাঝে রচল বিধি ফুলের মেলা অজস্রতায়—
নাম তার কী?—"ঢেউ জাগানো"—কারণ, তোমার
কাছে এলে
গান কবিতা হয় যে উধাও কৃতজ্ঞতার পাখা মেলে।

* *

আপনার সঙ্গে কথা কইতে আরো আনন্দ হয় দেখে যে

প্রায়ই আপনার সঙ্গে মতে মেলে না অথচ পথেও মেলে, রথেও। দেখুন, এ সম্পর্কে একটা কথা আমার মনে হয়—এই সুযোগে ব'লে নিলে রোখে কে?

বাল্যকাল থেকে "শুনে" আসছি: "মতান্তরে মনান্তর হবে কেন?" কিন্তু "দেখে" আসছি ঠিক উল্টোটা: কি না, মতান্তরই হ'ল মনান্তরের প্রথম ধাপ; থুড়ি, ভিৎ বনেদ—যাকে বাংলা ভাষায় বলে ফাউণ্ডেশন-স্টোন। আলডুস কোথায় যেন লিখেছেন যে যদি—

যদুবাবুর ভালো লাগে শ্যামবাবুকে, মনে হয়—সে কবি,
মধুবাবু ফেলল ব'লে—"ব্যর্থ কবি"-ই শ্যামের হায় পদবী,
অম্‌নি রে ভাই দেখতে পাবি যদু-মধুর নেই আর চলাচলি,
স্নেহের গলাগলির মাঝে দিল হানা মতের দলাদলি।

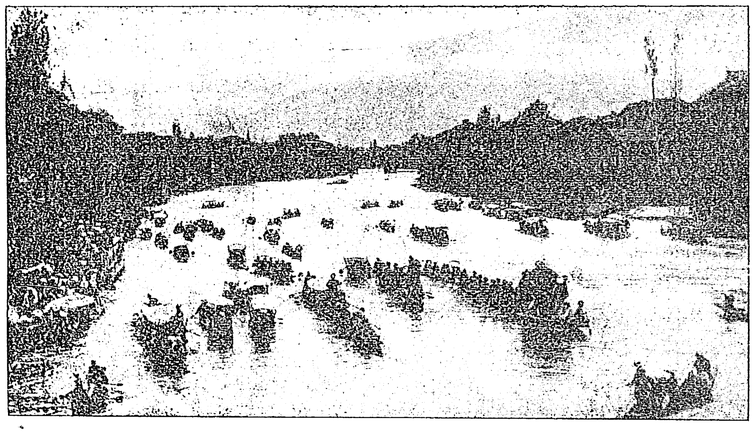

ঝিলমে তরণী উৎসব

কথাটার মধ্যে যে অনেকখানিই সত্য আছে একথা কে না মানবে বলুন? সেদিন এখানে রুদ্ধনিশ্বাসে জ্যোতির্মালা আমাকে বলল হার্ডির Two on a Tower পড়তে। প'ড়ে আমারও ভালো লাগল। জ্যোতি হাঁফ ছেড়ে বলল: "দাদা, যে বই ভালো লাগে—বন্ধুজনের কারুর সে বই ভালো না লাগলে আমার যা কষ্ট হয়—বলব কি?"

ভাবিয়ে দিলে ফের, যদিও মনে হ'ল কথাটা কত সত্যি। বিভূতিভূষণের "পথের পাঁচালি" আমার অত বেশি ভালো লেগেছে ব'লে সত্যিই আমি বন্ধু হারিয়েছি। সম্প্রতি ৺রাখাল সেনের "সপ্তপর্ণ" যৎপরোনাস্তি ভালো লেগেছে ব'লেও নিশ্চয় বাকি বন্ধুদের হারালাম ব'লে। বলবেন তাঁরা—এঃ, এমন বাজে বই প'ড়ে যে—দিলীপ এ হেন উচ্ছ্বসিত তাকে আর আমাদের মতন রসজ্ঞদের মাঝে কল্কে দেওয়া চলে না। শুনেছি আমার গান কারুর কারুর ভালো লাগে বলার দরুণও নাকি নানা আখড়ায় বন্ধুবিচ্ছেদ হয়েছে। তেম্‌নি ভীষ্মদেবের গান আমার খুব ভালো লাগে বলার দরুণ কত আত্মীয় ও বন্ধু যে আমার উপর বীতরাগ হয়েছেন! আরো কত দৃষ্টান্ত দিতে পারি। ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। জানেন তো ভিক্টর হুগোকে একজন এসে গদ্‌গদ সুরে বলেছিল: "ফরাসী ভাষায় দুজন বিরাট লেখক আছেন, এক ভিক্টর হুগো আর এক বালজাক।" তাতে হুগো শুধু বলেছিলেন: "কিন্তু বালজাক কেন? (Pourquoi Balzac ?)"

কিন্তু তবু মানবো রবীন্দ্রনাথের কথাই সত্য যে "মানুষের মানস-জগতে মতের অনৈক্য থাকবে, অথচ সেই অনৈক্য নিয়ে বিরোধ হবে না, সংঘাত হবে কিন্তু অপঘাত হবে না এইটেই হচ্ছে প্রার্থনীয়। মতের সম্বন্ধ না থাকলেও প্রীতির সম্বন্ধ থাকতে পারে, এটার দ্বারাই প্রীতির গৌরব প্রকাশ পায়।"

মানব—কেন না, আমাদের অন্তরের অতলে এ কথার সঙ্গে সায় আছে অন্তরতমের: তিনি প্রতিধ্বনি করেন (রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায়): "জিত মতামতে নয়, খ্যাতি অখ্যাতিতে নয়, জিত ভালোবাসায়—শক্তির রাজ্যে নয়—আনন্দের রাজ্যে।"

কিন্তু—ঐঃ—there is the rub—মানুষের প্রকৃতির গড়নই এই রকম যে, সে প্রায়ই প্রেমের চেয়ে শক্তিকে বেশি চায়। সবাই বলছি না—তবে অধিকাংশই। রাসেলের Power বইটিতেও সম্প্রতি তিনি এই নিয়েই সবচেয়ে দুঃখ করেছেন যে, "Of the infinite desires of man, the chief are the desires for power and glory."

মতভেদে আঘাত পায় মানুষ এই জন্যেই বেশি। প্রতি

মতবাদী যদি শক্তিধর পুরুষ হয় তবে স্বমতে অন্যকে টানতে না পারলে তার শক্তি পিপাসা মেটে না। দলাদলিরও গোড়াকার কথা এই আত্মমতপ্রতিষ্ঠা—আমারই ঠিক, ওরাই ভুল, এই-ই হ'ল প্রতি রোখালো মতবাদীর সাইকলজি।

কিন্তু এ ছাড়াও আরো একটা কারণ আছে মনে হয়। রুচির রাজ্য—বিশেষ ক'রে রসের ক্ষেত্রে—হ'ল ব্যথার রাজ্য যেহেতু প্রেমের রাজ্য। যেখানে মানুষ বেশি আনন্দ পায়, সেখানে তার মন সাড়া দেয় কৃতজ্ঞতার নৈবেদ্য সাজিয়ে। এ অর্ঘ্যদানে কেউ বাধা দিলে তাই মন আহত হয়—কাজেই পারে না এ-অনৈক্যকে "তুচ্ছ মতভেদ" বলে উড়িয়ে দিতে। আমার অনেক সময়েই মনে হয়েছে—নিজের ব্যথার তল পেতে গিয়ে—যে মতভেদের এদিকটার কথা সচরাচর লোকে তলিয়ে ভাবে না।—মতভেদ—(ফের বলি, বিশেষ ক'রে রসের জগতে)—হ'ল এই ভালোবাসার আপত্তি করা: যাকে আমি বলছি ভালোবাসার যোগ্য, তাকে আপনি বলছেন অযোগ্য। কোথায় ঘা পড়ে? প্রেমের দরদের ব্যথালোকে। তাই মানুষ সহজে ভুলতে পারে না। পরিণাম পুনরুক্তি মন্তব্য—যদুবাবু ও মধুবাবুর গলাগলির জায়গায় দলাদলির সূত্রপাত।

কিন্তু তবু বলবই বলব যে স্নেহ যদি গভীর হয় তবে মতভেদে বাজলেও মানুষ তাকে কাটিয়ে উঠে বুঝতে পারে যে স্নেহই বড়, মতভেদ অবান্তর। কিন্তু ও শিক্ষাটা জীবনের একটা মস্ত শিক্ষা—তারও বেশি, দীক্ষা—কেন না এখানে টান পড়ে আমাদের আত্মাভিমান নিয়ে—মানুষ শিখতে বাধ্য হয় এই চিরন্তন সত্যটি যে প্রতি বন্ধুর ব্যথাই শ্রদ্ধেয়—তাই তার রুচির সঙ্গে না মিললেও তাকে বলতে নেই তুমিই ভুল, আমিই ঠিক। শুধু বলতে নেই না, মনে করতেও নেই।

আপনার মধ্যে আছে এই আশ্চর্য গুণটি। আমার সঙ্গে বহু মতানৈক্য সত্ত্বেও তাই আপনার প্রতি স্নেহ আমার বিচলিত হয়নি। কিন্তু তাতে যতটা তৃপ্তি পেয়েছি তার চেয়েও গভীর তৃপ্তি পেয়েছি অন্তরের এই উপলব্ধিটি এ সূত্রে সায় পেয়েছে ব'লে যে "জিৎ মতামতে নয়—জিৎ ভালোবাসায়—শক্তির রাজ্যে নয়, আনন্দের রাজ্যে।"

* * * *

ঐ দেখুন:

কোন্ ঢেউ যে কখন কোন্ তটে গিয়ে ঠেকে! তবে আমার সাফাই রয়েইছে—ভূস্বর্গচঞ্চলে আমি সব জবাবদিহির হাত থেকেই ছুটি নিয়েছি। তবু কাশ্মীরের প্রসঙ্গে ফিরি—মন বলছে

ঘরের ছেলে ফিরবে কবে ঘরে?
কাশ্মীরেরি গল্পে এসো ফিরে
পেলে সেথায় কত কী অন্তরে।
এঁকে ফোটাও স্মৃতিচারণ-তীরে।

হুঁ। ফিরি—সেই অপরূপ সৌন্দর্য্য রাজ্যের তীরে।

* * * *

এর আগের স্তবকে বলেছি তন্দ্রা-পরিবারের কথা। আরো দু-চারটে কথা বলাই চাই এঁদের সম্বন্ধে। কারণ

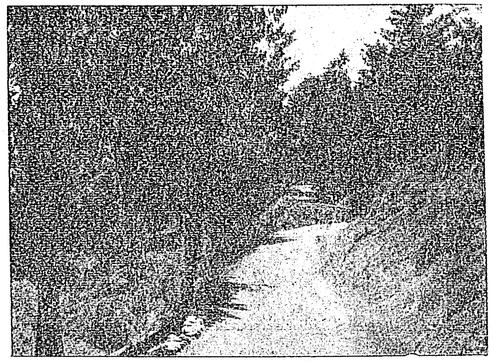

গুলমার্গের রাস্তা

এ-কথা শুনতে ব্যক্তিগত হ'লেও এর ক্ষেত্রব্যাপক, কাজেই ঔৎসুক্যও সাধারণ।

তন্দ্রা দেবীর নাম যাকে বলা যায় মিস্‌নোমার—ভুল খেতাব। এ ধরণের অতন্দ্র মহিলা জীবনে কমই দেখেছি। মনে পড়ে, প্রথম দিন তাঁর বজরায় যখন আমি ও ধরণীদা "পর্বতের চূড়ার মতন সহসা প্রকাশ" হ'লাম তন্দ্রা দেবী খালি পায়ে একটা কিমোনো প'রে অশ্রান্ত লিখে চলেছেন। ওখানে শ্রমিকদের একটা সঙ্ঘ করার জন্যে তিনি উঠে প'ড়ে লেগেছেন। ধরণীদাকে দেখতে দেখতে পটিয়ে নিলেন।

মানুষের নানা মূর্ত্তি নানা লোকের কাছে প্রকাশ পায়। গীতায় বলেছেন শ্রীকৃষ্ণদেব:

যে যে-রূপে চায় আমাদের পূজিতে
সেইরূপে তারে দরশ দিই।
যে যে-ভাবে চায় অর্থ সঁপিতে
সে-ডালিও সেইভাবেই নিই।

ধরণীদাকে আমরা পূজেছিলাম সঙ্কটতারণরূপে, মহামহিম ভ্রমণকাণ্ডারীরূপে। সেই রূপেই তাঁকে পেয়েছিলাম। তন্দ্রা দেবী তাঁকে চাইলেন শ্রমিকদের দুঃখমোচক না হোক শোকশ্রোতারূপে। ধরণীদা শুনছেন তো শুনেই চলেছেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিনের পর দিন। শ্রমিকদের কত দুঃখ—তন্দ্রা দেবী কত সভা করছেন—কত কী লিখছেন—কত বেশি শ্রমে কত কম কাজ হচ্ছে নানা লোকের বিরুদ্ধাচরণে। আর অপরাজেয় অদ্বিতীয় শ্রোতা ধরণীদা শুনছেন বিগলিত-হৃদয়ে যেমন জনমেজয় শুনতেন বৈশম্পায়নের কাছে

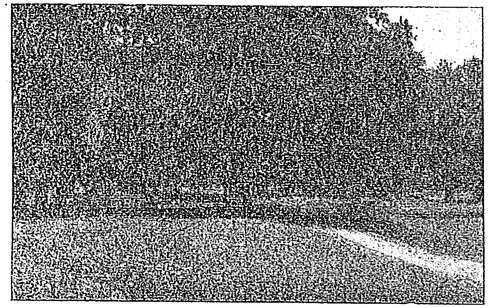

নিশার বাগ—মোগল স্থাপত্য

মহাভারত, যেমন ধৃতরাষ্ট্র শুনতেন সঞ্জয়ের কাছে কুরু-ক্ষেত্রের কাহিনী, যেমন পরীক্ষিৎ শুনতেন শুকদেবের কাছে ভাগবৎ। সে শোনার বহর দেখে থেকে থেকে প্রভাদি যে প্রভাদি—তিনিও ঝঙ্কার দিয়ে বলতেন আমাকে : "দেখ তো ভাই দিলীপ

আমরা এসেছি বেড়াতে এখানে
ওঁর যেন নেই খেয়ালও হায়!
খাবার নিয়ে যে ঠায় ব'সে আছি
একথাও ওঁকে বোঝানো দায়।
পরোপকারটা ভালো বটে মানি :
র'য়ে স'য়ে—যদি হামেশা ছোটে
শ্রমিকের দুখ ঘোচাতে কর্তা
ধনিক-গৃহিণী রাগে যে ফোটে।
যখনকার যা তখনকার তা
এসেছি বেড়াতে, ভালো রে ভালো!
জগৎজোড়া এ হাহাকারে ভাই
সভার পিদিমে কণিকা আলো।
জেলে কী যে হবে?—কথা কথা কথা!
হায় রে পুরুষে বুঝিবে কবে?
শাহারা মরুতে দুটো নলকূপে
গঙ্গা জাগে কি মহোৎসবে?

প্রভাদির কথা আমার মনে ধরেছিল ব'লেই বললাম এত কথা। মানি ধরণীদা স্বভাব-পরোপকারী এবং শাস্ত্রে বলে স্বভাবো নাতিরিচ্যতে—কি-না স্বভাব যায়না ম'লে। কিন্তু র'য়ে স'য়ে। নাঃ বন্ধুবর, মেয়েরা যে রিয়ালিস্ট এ কথা প্রভাদির সঙ্গে মিশে আরো বুঝেছিলাম। কারণ, তন্দ্রা দেবী দরদী পেয়ে তাঁর হেফাজতে ছিল যত যুগপুঞ্জিত শ্রমিকদের দুঃখের ঝুলি, যন্ত্রণার বস্তা—সবই চক্ষের নিমেষে দিলেন উজাড় ক'রে। ধরণীদা! ধরণীদা! ও ধরণীদা! আর ধরণীদা! বেচারি ম্লানমুখে শুনছে তো শুনছেই—

আহা কত লোক খেতে যে পায় না—
তাদেরি তো কথা অমৃত সমান
শুনিতে রক্ত গরম হৃদয় নরম—
তাইতো শুনে পুণ্যবান্।

কারণ, বাস্তবিক কাশ্মীরি শ্রমিকদের দুঃখ, সে কি একটা? একদিন মাত্র আমি শুনেছিলাম একটুখানি উপক্রমণিকা তন্দ্রা দেবীর কাছে। তাইতেই মনে হ'ল—হয় বিষ খাই, না হয় ঝিলমে ঝাঁপ দেই—এত দুঃখ শোনার দুঃখ সওয়ার চেয়ে আত্মহত্যা কম দুঃখের।

কিন্তু ঠাট্টা যাক্। তন্দ্রা দেবীর এই সব কাজ করার অক্লান্তি দেখে আমি সত্যই মুগ্ধ হয়েছিলাম। ওঁর লেখনী-চালনায় ওদের দুঃখের বেশি লাঘব হ'ত এ ভেবে নয়—এতে ক'রে তন্দ্রা দেবীর মহত্ত্বের পরিচয় পেতাম ব'লে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অবাক লাগত দেখতে—ও জাতের কর্মিষ্ঠতা। ভাবুন বন্ধুবর, ভাবুন। প্রায় পঁয়ষট্টি বৎসরের

বৃদ্ধা—দিনরাত কলম ধ'রে আছেন। কী? না, সভা-সমিতি প্রবন্ধ আবেদন এই সব লিখে ওদের শ্রমিকদের দুঃখ ঘুচিয়ে তবে জলগ্রহণ করতে হবে। সোজা কথা নয়। এ আমি তো পারিই না—আপনিও বোধ হয় পারেন না—মনে হয় প্রভাদির জ্ঞানগর্ভ কথা : "শাহারা মরুতে দুটো নলকূপে গঙ্গা কি জাগে মহোৎসবে?"

* * * *

কিন্তু না জাগুক। এ ধরণের অক্লান্ত কর্মের ফলে তন্দ্রা দেবীর মুখে বড় একটি সুন্দর আভা ফুটে উঠেছিল। সেদিন "মাদাম ক্লেয়ার" ব'লে একটি খ্যাতনামা উপন্যাস পড়ছিলাম। শ্রীমতী ক্লেয়ার এ গ্রন্থের না য়ি কা—এক আশি বৎসরের বুড়ি। তাতে গ্রন্থকার লিখেছেন এক জায়গায় যে, যৌবনে রূপ থাকে অনেকেরই, কিন্তু রূপের সব চেয়ে মনোহর পরিণতি হয় যৌবন পেরুলে—যখন ফোটে মুখে জ্ঞান ও কর্মের ফল : "the character."

সত্যি কথা। তন্দ্রা দেবীকে দেখলে একথা যেন আরো বেশি ক'রে মনে হ'ত। তাঁর কমনীয় মুখে ছাপ পড়েছিল তাঁর পরহিতব্রতের—তাঁর নিরলসতার, উৎসাহের, একটা আদর্শের মোহানায় দিনের পর দিন জীবনতরী বেয়ে চলার। এ-বস্তু সংসারে বিরল। তন্দ্রা দেবীকে তাই শ্রদ্ধা না ক'রেই পারা যেত না : তাঁর চেষ্টায় খুব বেশি ফল ফলছিল ব'লে না—নিজের কাজটুকু তিনি নিখুঁৎ করে নিষ্পন্ন করছিলেন ব'লে। দিনের পর দিন এভাবে কোনো নীরস কাজ করতে করতে আমরা তা থেকে লাভ করি একটা মস্ত রহস্যের চাবি : যে, নিষ্ঠার ফলে জীবনের বহু মরুভূমিতেও মেলে সরোবরের দিশা। তন্দ্রা দেবীদের অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। আমাকে বলতেন তাঁদের পারিবারিক কথা। সে সব বলার আমার অধিকার নেই। কিন্তু তা থেকে প্রত্যক্ষ জীবনের নবভাষ্যে শিখেছিলাম ফের এই পুরোণো সত্যটি যেন নতুন ক'রে যে, মানুষের প্রাণ যখন বলে আমি হার মানব না—তখন তাকে হার মানায় সাধ্য কার? আধ্যাত্মিক জীবন বলতে তো শুধু নাক টিপে প্রাণায়াম বা চোখ বুঁজে ধ্যান বোঝায় না—বোঝায়, আত্মিক সত্যের কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে বাস্তব নিয়তিকে বলতে পারা :

যত কেন তুমি হানো ব্যথা, যত
আনো না নিরাশা—মানি না আমি
তুমি যত দেবে বিষ—আমি করি
অমৃত-মন্ত্র দিবসযামী।

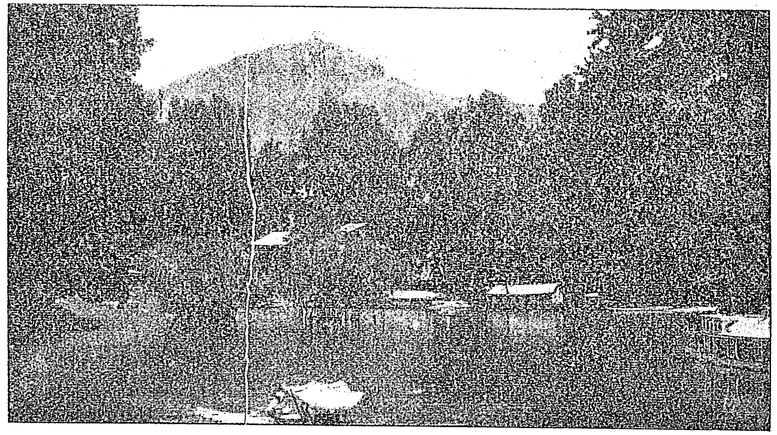

চেনার বাগ ও শঙ্করাচার্য্য পাহাড়ে মন্দির

তন্দ্রা দেবীর নানা কবিতাদিতেও তাঁর এই সাহস ও নিষ্ঠার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হ'তাম। এ-শ্রেণীর মানুষ সংসারে বেশি দেখা যায় না—বৃদ্ধ বয়সেও স্বপরিবারের স্বগোষ্ঠীর বাইরের জগতের কথা এত ভাবা কম কথা নয়, কি বলেন? ওদের দেশের সভ্যতার মন্দ দিক আছে অগুন্তি, কিন্তু এখানে দেখতে পাই একটি বড় সুন্দর বিকাশ—এই বহু-মানবের জন্যে জীবনকে নিয়োজিত করা একান্ত নিষ্ঠায়, কর্মিষ্ঠতায়, উৎসাহে, আদর্শবাদে।

* *

সত্যি, আমার যে কত সময়ে মনে পড়ে তন্দ্রা দেবীর এই অপরাজেয় উৎসাহের কথা! এক সময়ে এঁরা ছিলেন

ধনী—এখন অবস্থা অতি সামান্য। কাশ্মীরের শীতেও সত্যি সত্যি কষ্ট হয়, কেন না এখানে বিলেতের উত্তাপ-বিধায়ক সাজসরঞ্জামের অভাব। কিন্তু তা সত্ত্বেও এঁরা সপরিবারে নদীবক্ষেই গত শীত কাটিয়েছেন, হয়ত এ-শীতও কাটাবেন। এ-ধরণের দারিদ্র্যকে দেখলে সমীহ আসে। কারণ এ হ'ল স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্য। এঁর স্বামী—তাঁর কথা পরে লিখব—জন ফোল্ড্স্ এখন দিল্লীতে ভারতীয় রেডিয়ো অর্কেস্ট্রস গঠন করছেন। এদেশে এসেছেন তিনি ভারতীয় সঙ্গীতকে "তর্জমা" করতে। কিন্তু তাঁর কথা যথাপর্য্যায়ে। আপাতত বলি তন্দ্রা দেবীর কথা।

* *

ভুলব না তাঁর মুখের শান্তশ্রী। ভুলব না তাঁর ঘরময়-ছড়ানো কাগজপত্র, স্তূপীকৃত ফাইল, প্রবন্ধ, বই। ব্যস্। শুধু পঠন-পাঠন সভা-সমিতি এই সব নিয়েই আছেন। এসব থেকে এদেশে আয় হয় খুবই কম—কোনো মতে দিন গুজরান হয় মাত্র। তবু তাইতেই ইনি তুষ্ট। ছেলে প্যাট্রিক আঁকে, মেয়ে দুটি গৃহকর্ম দেখে, পোষ্যপুত্র উইলিয়াম এটা ওটা সেটা করে। পালিতপুত্রকে তন্দ্রা দেবী নিজের ছেলের চেয়ে একটুও কম ভালোবাসেন না। উইলিয়ামের জন্যে তাঁর মাতৃ হৃদয়ের উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ নিত্যই চোখে পড়ত। ভালো লাগত আরো বেশি। কি জানি কেন, নিকটাত্মীয়ের জন্যে স্নেহ উৎকণ্ঠার আতিশয্য আমাকে খুব মুগ্ধ করে না। যে-স্নেহ বিধাতার কাছ থেকে পাওয়া, প'ড়ে-পাওয়া সে-স্নেহের নবজন্ম হয় নি—তাই সে "দ্বিজ" নয়। বড় স্নেহ হ'ল সে-ই যাকে মানুষ নিজে থেকে সৃজন করে। স্ত্রীপুত্রকন্যা—এদের প্রতি স্নেহকে বড় জোর বলা যায় "বেশ"—কেন না, এর ভারা ব'ন প্রকৃতিদেবী স্বয়ং। কিন্তু অনাত্মীয়ের প্রতি স্নেহকেই বলব বেশি সুন্দর—কারণ সেখানে মানুষ স্রষ্টা। রবীন্দ্রনাথের কবিতা কানে বাজে যখন তিনি বলছেন ভগবানকে :

আর সকলেরে তুমি দাও
শুধু মোর কাছে তুমি চাও
দিয়েছ আমার পরে ভার
তোমার স্বর্গটি রচিবার।

আপনি একটি পত্রে যে লিখেছিলেন যে, আত্মীয়ের ভালোবাসার চেয়ে অনাত্মীয়ের ভালোবাসা স্নেহ প্রেমের শ্রেষ্ঠতর বিকাশ—যেহেতু আত্মীয়ের ভালোবাসার পিছনে প্রায়ই দাবি হয় অত্যন্ত বেশি মুখর। একথায় আমার মনের আরো সায় আছে। আমার জীবনে সবচেয়ে বড় দান হয়ে এসেছে—বন্ধুর ভালোবাসা—আত্মীয়ের নয়। আত্মীয়ের নাবালক ভালোবাসার দ্বিজত্ব লাভ ঘটে কেবল তখনই, যখন আত্মীয় তার আত্মীয়তার দাবি ভুলে বন্ধুত্বের পৈতে নেয়। অর্থাৎ যেখানে আত্মীয় প্রিয় হয়, আত্মীয় ব'লে না—বন্ধু ব'লে।

কিন্তু যাক—যা বলছিলাম। উইলিয়ামকে তন্দ্রা দেবী যে এত যত্নে রাখতেন তার আরো একটা কারণ ছিল। বলেছি ওর দেহে হ'ত বৈদেহী আবির্ভাব। এ নিয়ে বেশি লিখতে মানা—কারণ এখনো এসব নিয়ে বেশি লেখার সময় আসে নি—লোকে সহজেই ভুল বোঝে। কেবল এইটুকু বলি : উইলিয়ামের দেহকে এজন্যে অনেক বেগ পেতে হ'ত। তাই তাকে একটু বেশি রকম তদারক করতে হ'ত। কিন্তু ওর মধ্যে দিয়ে তন্দ্রা দেবী অনেক জ্ঞানের কথা শুনতেন—তাই স্নেহের সঙ্গে শ্রদ্ধাও ছিল যথেষ্ট। এসব কথা থেকে তিনি লাভ করেছিলেনও কম না। শুধু জ্ঞানলোকেই নয়, প্রত্যক্ষলোকেও তিনি যথেষ্ট সহায়তা পেতেন প্রায়ই : যথা, অনেক সঙ্কট অসুখেও উইলিয়ামের মধ্যে আবির্ভূত এই সব শক্তি তাঁকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু সে যাই হোক, তিনি যে এই অসহায় যুবককে এত স্নেহ ও শ্রদ্ধা করতেন ও নিজে দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও একে আশ্রয় দিয়েছিলেন এতে আমার তৃপ্তির অন্ত ছিল না। কারণ বলেছি, আমার বরাবরই মনে হয় যে ভালোবাসার সবচেয়ে বড় বাণী হ'ল পরকে আপন করা, সবচেয়ে বড় দীক্ষা হ'ল স্বার্থ ও সুখের মায়া কাটানো।

তাছাড়া আত্মীয়দের আত্মীয়তা সম্বন্ধে আমার একটা কথা কত সময়েই যে মনে হয়েছে! আত্মীয় স্নেহাস্পদকে ভালোবাসে অনেক ক্ষেত্রেই, কিন্তু বোঝে কত কম ক্ষেত্রে বলুন তো? কারণ আত্মীয়তার মধ্যে আছে অতিপরিচয়ের একটা উদ্ধত অভিমান। অবশ্য এর ব্যতিক্রম আছে। কিন্তু সচরাচর অনাত্মীয়ের সঙ্গেই যে অন্তরঙ্গতা হয় বেশি এ কথা বোধ হয় অস্বীকার করা চলে না। হওয়ার একটা

গূঢ় কারণ আছে। মানুষ স্বভাবস্রষ্টা। যে-জিনিষ তার কাছে পড়ে-পাওয়া তাতে তার স্বস্তি থাকতে পারে কিন্তু তৃপ্তি নেই। আত্মীয় স্নেহ, আত্মীয় মমতা হ'ল প'ড়ে-পাওয়া জিনিষ—অনেকটা ইনস্টিংটিভ। এতে খুব বেশি ডুবে থাকে যে সব মানুষ তারা শ্রেষ্ঠ মানুষের নমুনা নয়। শ্রেষ্ঠ মানুষ বলব তাকেই—যে ভালোবাসা অর্জন করে তার সহজ আত্ম-দানে সেবায় পরহিতৈষণায়। অন্য ভাষায়, যে ভালোবেসে ভালোবাসায়, ধ্বনি দিয়ে সৃষ্টি করে প্রতিধ্বনি। নীড়কে ভালো না বাসে কে? কিন্তু বাইরে যে ঘর বাঁধতে পারে তারই নাম স্রষ্টা। আমাকে ভুল বুঝবেন না : যে-স্নেহ ইন্স্টিংটিভ মালমশলায় ঠাশা তার সঙ্গেও আমার কোনো বিবাদ নেই। এ-ও আমি বলি না যে, ঘরকন্নায় তার দাম নেই। খুবই আছে। এখানে আমি ঝোঁক দিচ্ছি স্নেহের মুক্তির দিকটায়। যে-স্নেহ যে-ভালোবাসা সাধে কিন্তু বাঁচে না, ধরা দেয় কিন্তু চাপ দেয় না, বাঁচায় কিন্তু আগলায় না—এক কথায়, যে-স্নেহের বাতি ধরে আত্ম-দান, আত্মসুখ নয়—সেই স্নেহই বড়। যে স্নেহের মধ্যে হিতৈষণার অনুপাতে প্রত্যাশা কম, দাক্ষিণ্যের অনুপাতে বাধ্যবাধকতা কম—সেই স্নেহই বেশি শুদ্ধ বেশি পবিত্র। আর এর চরম পরিণতি হ'ল অহৈতুকী প্রেমে যার মন্ত্র নিষ্কামনা, যে বলে (দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষায়) :

"ভালোবাসো নাহি বা বাসো তারো অভিলাষী
আমরা শুধু ভালোবাসি ভালোবাসি ভালোবাসি।"

আর এই প্রীতিই হ'ল সৃজনী প্রীতি—অর্থাৎ এই স্নেহেই স্নেহ জাগে। এখানে যে আপনার সঙ্গে আমার মতৈক্য রয়েছে এতে আমি বড় খুশি।

* *

তন্দ্রা দেবীর মেয়ে মেরিও বড় চমৎকার। ছেলেমানুষ—ষোড়শী। ওর ভাই প্যাট্রিকের মতনই মন টানে। এর একটা প্রধান কারণ এই যে, মেরির মুখেও একটি চমৎকার ভাব আছে—যার গোড়াকার কথা হ'ল sensitiveness. এ শব্দটির বাংলা নেই। অভিমানী বললে ঠিক sensitive বোঝায় না। স্পর্শকাতর? না, ও হ'ল touchy কথাটিরই যথার্থ অনুবাদ। Mary has a sensitive face বাংলায় এর তর্জমা হওয়া শক্ত। তাই ইংরাজি বর্ণনাটিও মঞ্জুর করুন লক্ষ্মীটি! সেন্সিটিভ শব্দটিও।

মেরির সেন্সিটিভ স্বরূপটির মাধুর্য ফুটেছে প্রধানত দুটি কারণে মনে হয়। এক, অল্প বয়সে সে অনেক দুঃখের মধ্যে দিয়ে গেছে। ওদের জীবনের নানা কাহিনী শুনতে শুনতে হৃদয় উঠত আর্ত হ'য়ে। ষোল বছরের মেয়ে এত

জ্ঞানমার্গ

বোঝে—এত সেন্সিটিভ জীবনের নানা ছোঁয়াচ সম্বন্ধে! এ কথাটিকে অবশ্য ভুল বুঝবেন না। দুঃখ পেলেই যে মানুষ ফুলটি হ'য়ে ফুটে ওঠে, এমনতর সেন্টিমেন্টাল কথা আমি কবিত্বের খাতিরেও উচ্চারণ করব না। একটি মহিলাকে মনে পড়ে যিনি স্বামী সন্তান সব হারিয়ে অসহ্য দুঃখে বিলেত গিয়ে অসার জীবনযাপন সুরু করলেন। সংসারে বহু মানুষই দুঃখ পায়। অনেকের বিকাশে দুঃখ আসে সহায় হ'য়ে, কিন্তু অনেকে আবার কিছুই শেখে না। ইংরাজিতে বললে বলা যায় : "They take life as they find it." ব্যস্ চুকে বুকে গেল। দুঃখ এদেরকে অন্তর্মুখী করে না—আরো ধাওয়া করায় বাইরের দিকে—সান্ত্বনা খোঁজায় অবান্তর আমোদ প্রমোদের উঞ্ছবৃত্তিতে।

পরমহংসদেবের উপমা মনে পড়ে : "উট কাঁটা ঘাস খায়—খেয়ে মুখ দিয়ে দরদর ক'রে রক্ত পড়ে, তবুও সেই কাঁটা ঘাসই খাবে।"

মেরি এ-জাতের মেয়ে নয়! কিন্তু তার প্রধান কারণ ওর আধার। গড়পড়তা আধার যে নয়, তা ওকে একবার দেখলেই বলা যায়। সহজে কথা বলে না—ভারি চাপা মেয়ে। একদিন হঠাৎ তন্দ্রা দেবী বললেন : "মেরি ভারি চমৎকার কবিতা লেখে, জানো স্বামীজি?" আর যাবে কোথায়—আমি বললাম : "শুনি শুনি।"

তন্দ্রা দেবী হেসে বললেন : "ও মেয়ে আমাকেও সহজে দেখাতে চায় না ওর কবিতা, তোমাকে দেখাবে?"

নিরাশ হ'লাম। কিন্তু সেইজন্যই তৃষ্ণা জাগল আরো বেশি। একদিন মেরির সঙ্গে গেলাম বেড়াতে। অনেক কথা হ'ল। ও অনেক কথা বলল। উত্তরে আমি যা ভালো বুঝলাম বললাম। মেরি কেমন যেন আর্দ্র হ'য়ে উঠল। তার পরে রাজি হ'ল ওর কবিতা দেখাতে। কয়েক দিন বাদে দিল আমাকে ওর সে দুটি কবিতা যা আমাকে বেশি স্পর্শ করেছিল। শুনুনই না। কারণ এ কবিতা-যুগলের মধ্যে দিয়ে ওর কিশোরী হৃদয়ের স্বপ্ন ও বেদনা উঠেছে ফুটে। আপনার স্বভাবদরদী হৃদয়ের তারে এর সুর নিশ্চয় বেজে উঠবে। এ দুটি পড়বার সময় মনে রাখবেন, ষোলো বছরের একটি মেয়ে লিখেছে। আরো আশ্চর্য, ও বলত : আজকাল ওর মনে হয়—এ-আস্তিক্য-বুদ্ধি ওর মনে যে আলো নিয়ে ফুটেছিল সে আলো সত্য কি না কে জানে? কিন্তু শুনুন আগে প্রথমটি এই :

Thy will be done,
For we'll never shun ;
Our banner strong will fly :

When sinks the sun,
Its duty done,
And death is stalking by :

Thy will shall stay,
Though all away,
In terror stark have fled :

We, dauntless, grim,
Would even swim
The ocean of the dead :

Thy will, O Lord,
By gun or sword,
By life or death we'll show :

Each human thing
Beggar to king
That we alone do know.

The truth which lasts,
And free from castes,
But one thing does demand :

The strength to share,
And follow where
Thy wisdom will command.

এটি ও লিখেছিল বছর দুই আগে, অর্থাৎ—চোদ্দ বছর বয়সে।

জানি না আপনাদের এ-কবিতাটি তেমন ভালো লাগবে কি না। কিন্তু আমার কাছে এ কবিতাটির দাম আরো এইজন্যে যে, এ কবিতাটি মেরি আমাকে শুনিয়েছিল একটি চেনার গাছের তলায় ঘাসের উপর ব'সে গোধূলির আলোয়। সূর্য তখন পাটে নেমেছে। ওর কণ্ঠে প্রথম তিনটি চরণ শুনতে শুনতে বুকের মধ্যে এক অপূর্ব ভক্তিভাব জেগে উঠেছিল। মনে হয়েছিল যুগে যুগে এমন কত অন্তরেই না নিরাশার চরম মুহূর্তে বাস্তবের পরাজয়ের ধ্বংসস্তূপে বেজে উঠেছে অপরাজেয় আত্মার জয়ধ্বনি :

যাই তুমি চাও—করব মোরা
ছাড়ব না নাথ, ছাড়ব না
চলব তোমার উড়িয়ে ধ্বজা
হারব না নাথ, হারব না।

মনে পড়ে—সেদিনের কথা আরো বেশি ক'রে সেদিনের পটভূমিকায়। চায়ের কলরব সাঙ্গ হ'লে বলল সবাই—চলো যাই নৌকায়। হ'ল না যাওয়া। সুবিধাই হ'ল, মেরিকে বললাম বেড়াতে বেড়াতে : "মেরি, ভোলোনি তো?"

ও স্নিগ্ধ হেসে বলল : "না স্বামীজি, দাঁড়ান।"

কাছেই ওদের বজরা। গেল দৌড়ে। মনে রাখবেন একেবারে বালিকা। ওদের দেশের ষোলো বছরের মেয়ের মনের গড়ন জানেন তো—সচরাচর আমাদের দেশের দশবার বছরের মেয়েদের মতন হয় (অবশ্য ব্যতিক্রম আছে); সেদিন ও

শাড়ি পরেছিল আমাদের সম্মানার্থে। যখন ছুটে গেল এমন সুন্দর দেখাচ্ছিল ওর কোমল মুখখানি হৈমন্তী সূর্যের অস্তরাগে! শাড়ি পরলে ওদের কী যে সুন্দর দেখায়!

পায়ের কাছে চলেছে সর্পছন্দিনী ঝিলম কুলুকুলু ধ্বনিতে। অদূরে শঙ্করাচার্য পাহাড়ের চূড়ায় শিবের মন্দিরের উপর পড়েছে গলানো সোনার আলো। একরাশ চেনার গাছ এপারে—ওপারে দীর্ঘকায় ঋজু পপ্‌লার। কেউ কোথাও নেই। একটা গাছের নিচে বসলাম।

মেরি এল। খাতা এনেই ওর সে কী সঙ্কোচ। একেবারে বাইরের লোককে কবিতা ও কক্ষনো দেখায় নি। বলল : "স্বামীজি, কবিতা লিখতে এক সময়ে এত ভালো লাগত!"

"আজকাল লাগে না?"

"লাগে, তবে মনে হয় কী হবে লিখে?"

বুঝলাম, এখানে ওর একটা গভীর বেদনা আছে। কারণ একথা ব'লেই ওর মুখচোখ রাঙা হ'য়ে উঠল। ও তাড়াতাড়ি পড়ল এটি, পরে আরো কয়েকটি। আমি বললাম : "মেরি, একটি অনুরোধ আছে।"

"কী?"

"কবিতা লেখা তুমি ছেড়ো না। এ-শক্তি ভগবান্ যাকে-তাকে দেন না। তাই যাকে দেন, তার কাছে আশা করেন যে সে তাঁর এ-দানকে অবহেলা করবে না।"

"স্বামীজি," বলল ও সকুণ্ঠে, "আপনি গান গান—সবাই চায় শুনতে। আমরা যে নগণ্য। শুনবে কে?"

"এমন কথা বলতে নেই। শ্রীঅরবিন্দ আমাকে একবার লিখেছিলেন যে লাখে একজনও ভালো কবিতা লিখতে পারে না। এমন সব ভাব এমন সহজ আবেগে যার হাত দিয়ে বেরোয় সে নগণ্য নয়। এ-ও তুমি নিশ্চয় জেনো যে, হৃদয় থেকে গান গাইলে কবিতা লিখলে লোকে শুনবেই। তা ছাড়া কেউ না শুনলেই বা কি? আমার এক প্রিয় কবির একটি গান আমার মনে পড়ে :

মিছে তুই ভাবিস মন!
তুই গান গেয়ে যা গান গেয়ে যা আজীবন
পাখিরা বনে বনে গাহে গান আপন মনে
(ওরে) নাই বা যদি কেহ শোনে
তুই গেয়ে যা গান অকারণ।"...

কী? উচ্ছ্বাসপনা? কিন্তু বিশ্বাস করুন বন্ধুবর, এ-কথার পিছনে কোনো আতিশয্যই আমার নেই। তাছাড়া, কি জানেন? আমার মনে হয় যে আমাদের জীবনযাত্রার একান্ত গদ্যময় ঘর্ঘর আমাদের অন্তরের সুরটিকে ফুটতে দিতে চায় না। আমার কবি-বন্ধু হারীনের একটি কথা আমার প্রায়ই মনে পড়ে। সে প্রায়ই বড় কবিত্বময় ভাষায় কথা কইত কেম্ব্রিজে। একদিন এমনি অস্ত-সন্ধ্যায় বলেছিল আমাকে মাঠে বেড়াতে বেড়াতে : "আমি ভেবে পাই নে দিলীপ, মানুষ কেন আলাপে কথাবার্তায় কবিত্ব করতে ডরায়। ঐ দেখ, সূর্য অস্ত যাচ্ছে রাঙা সোনার স্বপ্নলোকে। একথা মুখে বললে কেন লোকে বলে কাব্যি? যদি মুখে না-ই বলতাম মনের সঙ্গে যখন কথা কইতাম তখন তো এই ভাষাই বেরুত ছন্দের মৃত্যলোকে।"

এ-কথা আমিও বহুবার অনুভব করেছি। আমার "রঙের পরশ" উপন্যাসে লিখেওছি। সুন্দর ক'রে কথা বলা যে কত সুন্দর, রবীন্দ্রনাথের কথা যে-ই শুনেছে সে-ই জানে।

তাছাড়া আমার আরো মনে হয় একটা কথা এই সম্পর্কে। যতদূর মনে হয়, এডোয়ার্ড কার্পেণ্টার বুঝি তাঁর Towards Democracy-র ভূমিকাতেই লিখেছেন যে কত ভালো কবিতা ঘরের মধ্যে লেখা যায় না—লিখতে হয় মাঠে-ঘাটে—যেখানে তাদের সহজ পরিবেশ।

আমি এজন্যে লজ্জিত নই যে, মেরির সঙ্গে ঝিলমের তটে এ-ধরণের কথা আমার কখনো কখনো হ'ত। আমার লজ্জা এইখানে যে, এ-ধরণের কথা কাশ্মীরে প্রায়ই হ'ত না। দৈনন্দিন ঘরোয়া কথা বলার সুযোগ কোথায় না মেলে? কিন্তু কাশ্মীরের মতন পরিবেশ জগতে ক'টা মিলবে—যেখানে সুন্দরের উদ্বোধন হয় এত সহজে—কী কথায়, কী গানে, কী কাব্যে? শ্রীঅরবিন্দকে লিখেছিলাম একথা। উত্তরে তিনি আমাকে লেখেন : "তোমার সঙ্গে আমি একমত—কাশ্মীরের মতন সুন্দর দেশ আমিও কখনো দেখি নি এবং অশ্রান্ত কল্লোলিনী ঝিলমের উপরে ব'সে কবিতা লেখার গভীর আনন্দের তুলনা যে এ-জগতে কমই মেলে, এ-ও আমি জানি। কেবল আমার দুঃখ এই যে, গাইকবার এমন দেশে এসেও করতে চাইতেন বক্তৃতা—তা আবার আমাকে দিয়েই লিখিয়ে নিয়ে। তবে—to each his Eden."

সত্য কথা। কিন্তু সেই জন্যেই তন্দ্রা-পরিবারের কাছে আমি এত কৃতজ্ঞ। প্যাট্রিকের সঙ্গে যে কত সুন্দর সুন্দর কথা হ'ত চিত্রকলা সম্পর্কে, তন্দ্রা দেবীর সঙ্গে সঙ্গীত নিয়ে, উইলিয়ামের সঙ্গে (তার আবিষ্ট অবস্থায়) নানা বিষয়ে, মেরির সঙ্গে কবিতা নিয়ে, জীবনের নানা বেদনা নিয়ে। বিশেষ ক'রেই মুগ্ধ হয়েছিলাম এত অল্প বয়সেই ওর হৃদয়ের অসামান্য পরিণতি দেখে। ওর মধ্যে শুধু কবি নয়—ভাবুকও বাস করে। এ-ভাবুকের একটু পরিচয় দেওয়াই চাই—যেহেতু আপনি জানেন আমি কাব্যের ভাবের দিকটাও চাই—শুধু এস্থেটিক কবিতায় আমার মন ভরে না। (মেরির ষষ্ঠ ও অষ্টম লাইনের মিল ক্ষমণীয়):

No longer is perception dead
  No more a narrow space,
To prehistoric era's lead
  That we may calmly trace,
A thousand million billion years
  And feel not overcome,
By all the wonders, hopes and fears
  Of them whose life is done.

Uncounted ages pass away,
  Unmeasured time is lost,
Mightiest empires lose their sway,
  But till the humans last :
Yea, humans who from time unknown
  To time unknown will be :
A moving, fighting, changing mass
  Of grim uncertainty.

A finer world, a greater life
  Of peacefulness and love,
Would be if every living thing
  Would hark to the above.
But yet, as always has been in
  The past, and always will :
No living, learning creature stays
  To listen to the still.

Deep countless nights and endless days
  And myriad moods of wild
Life's ever-changing consciousness
  From the sage unto the child,
From icy mountain regions
  To the lonely sun-baked waste,
From marvel sky to marvel earth :
  O puny men, make haste !

Become as God intended :
  Calm in every way,
To learn and watch for wisdom
  The change from night to day.

ওদের কথা এত বললাম ব্যক্তিগতভাবে ওদেরকে আমার কতখানি ভালো লেগেছে শুধু সেই কথাটুকু জানাতেই নয়। বললাম, কেন না, আমি সত্যি মনে করি, বিদেশী বিদেশিনীকে ভালো ক'রে না জানলে, তাদের স্নেহ-প্রীতি না পেলে চরিত্রের সম্পূর্ণতা হয় না। অবশ্য আমি উপর উপর সুশীল বা সামাজিক আলাপের কথা বলছি না, বলছি ওদের মনের পরশ পাওয়ার কথা। তাই যখন দেখি বিদেশীকে কেউ প্রাণপণে এড়িয়ে চলেন তখন দুঃখ পাই। গেটে বলতেন কোনো বিদেশী ভাষাই যে জানে না সে নিজের মাতৃভাষাও জানে না। কথাটা বন্ধুত্ব সম্বন্ধেও সমান খাটে। বিদেশীর বন্ধুত্ব যে পেতে চায় না, তার স্বাদেশিক বন্ধুত্বের মধ্যেও কোথাও না কোথাও খাদ আছে ব'লে আমার সন্দেহ হয়। অবশ্য সুযোগ না হওয়ার কথা আলাদা। আমি বলছি সেই শ্রেণীর মনের কথা, যারা প্রীতির ক্ষেত্রে স্বাজাত্যবোধকে খুব বড় ক'রে ধরে। আমার মনে হয়, এ বড় লজ্জার কথা; কেন না, আধুনিক মানুষের একটা মস্ত গৌরবই যে তার অবচেতনায় স্বাজাত্যবোধের ঘোর খানিকটা কেটে এসেছে—যে পরকে আপন করতে উৎসুক তাকেই আমি পুরো মানুষ বলি, যে শুধু আপন জনকে নিয়ে থাকে তার চরিত্রের সম্পূর্ণতা হয় নি।

বিদেশী বিদেশিনীকে সত্যি আপনার মনে করতে পারার মধ্যে এই মনোহর সত্য দীক্ষাটি আছে যে, স্নেহ-প্রীতির কাছে বাইরের সংস্কৃতির দুস্তর ব্যবধানও অবান্তর হ'য়ে দাঁড়ায়। একথা আমি অস্বীকার করি না যে, স্বদেশী ভাষায় কথাবার্তা কওয়া সহজও বটে, তাতে আরামও বেশি। কিন্তু তাই ব'লে এ কথা মানব না যে, এ-আরামটাএকটা মস্ত কিছু। বস্তুত ভাষার আংশিক ব্যবধান বা আড়াল সত্ত্বেও যে স্নেহের প্রীতির সহজ লেনদেনে বিদেশী সুহৃৎ স্বদেশীয় বন্ধুর মতনই আপন হ'য়ে উঠতে পারে—অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠতে পারে এ-অভিজ্ঞতা যার না হয়েছে সে এ জীবনের একটা মস্ত আনন্দরস থেকেই বঞ্চিত রয়ে গেল।

তন্দ্রা দেবী ও তাঁর পরিবারস্থ সকলের কাছেই তাই আমার কৃতজ্ঞতার অবধি নেই। দিনাতিপাতে তাঁদের স্মৃতি হয়ত ঝাপসা হ'য়ে আসবে, কিন্তু তাঁদের আতিথ্যে সাহচর্যে কাব্যে শিল্পে বিশেষ ক'রে তাঁদের সহজ অযাচিত স্নেহদানে আমি যে লাভ করেছি তার হিসেব যদি হারিয়েও যায় তবু তার রস আমার জীবনে একটি পরম সম্পদ হয়েই থাকবে। ইতি।

জৈনগুরু মহাবীরের ধর্ম্মোপদেশ

শ্রীপূরণচাঁদ শ্যামসুখা

(আলোচনা)

গত মাঘ (১৩২৫) সংখ্যক ভারতবর্ষে ডক্টর শ্রীবিমলাচরণ লাহা মহাশয় একটী সুচিন্তিত ও গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে মহাবীরের ধর্ম্মোপদেশ সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। ডক্টর লাহা মহাশয় জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের যে বিশদ অনুশীলন করিতেছেন তাহা এই প্রবন্ধে পরিস্ফুট হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অনবধানতাবশতঃ উক্ত প্রবন্ধে কয়েকটী অসঙ্গতি থাকিয়া গিয়াছে, তাহাই বর্ত্তমান আলোচনায় প্রদর্শিত হইতেছে।

এই প্রবন্ধে ১৭৮ পৃষ্ঠায় শেষের দিকে পাঁচটী অস্তিকায়ের নাম দেওয়া আছে, যথা:—ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কাল, আকাশ এবং আত্মা। কিন্তু এই পাঁচটী দ্রব্যের মধ্যে "কাল" অস্তিকায় নহে।—ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, আকাশ, পুদ্গল ও জীব (আত্মা) এই পাঁচটী দ্রব্য অস্তিকায়। 'অস্তিকায়' শব্দের অর্থ 'যাহার অবয়ব প্রদেশের প্রচয় অর্থাৎ সমূহ দ্বারা নির্ম্মিত।' সূক্ষ্মতম অবিভাজ্য অংশকে 'প্রদেশ' বলে। যে সকল দ্রব্য এইরূপ বহু প্রদেশের সমষ্টি তাহাদিগকে 'অস্তিকায়' বলে। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও জীব (আত্মা) দ্রব্য এরূপ অসংখ্য প্রদেশের সমষ্টি এবং আকাশ অনন্ত প্রদেশের সমষ্টি তজ্জন্যই ইহাদিগকে অস্তিকায় বলা হয়। 'পুদ্গল' অর্থাৎ জড়দ্রব্যও 'অস্তিকায়'। পুদ্গলের মধ্যে পরমাণু কেবল একটী মাত্র অবয়ববিশিষ্ট; কিন্তু দুই পরমাণুর অনু হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য সমস্ত বৃহত্তর পুদ্গল-স্কন্ধ (জড়দ্রব্য) সংখ্যেয়; অসংখ্যেয় বা অনন্ত পরমাণুর সমষ্টি বলিয়া ইহাকেও 'অস্তিকায়'—পুদগলাস্তিকায় বলা হয়। কাল দ্রব্য সম্বন্ধে দুইটী মত আছে। এক মতে 'কাল' দ্রব্যই নহে, ইহা কল্পিত দ্রব্য মাত্র। অন্য মতে 'কাল' দ্রব্য হইলেও তাহা কেবল মাত্র এক প্রদেশাত্মক—বহু প্রদেশের সমষ্টি নয়।—কালের সূক্ষ্মতম অবিভাজ্য অংশকে 'সময়' বলা হয়। এইরূপ প্রত্যেক 'সময়' পৃথক পৃথক রূপে কাল দ্রব্য এবং তজ্জন্য ইহা 'অস্তিকায়' নহে। এ স্থলে ইহা বলা আবশ্যক যে, ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তিকায়, আকাশাস্তিকায়, পুদ্গলাস্তিকায় এবং কাল এই পাঁচটী দ্রব্য অচেতন; একমাত্র জীবাস্তিকায়ই চেতন। একমাত্র পুদ্গল দ্রব্যই (জড়পদার্থ) রূপী. অর্থাৎ—যাহার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ আছে। অন্য পাঁচটী দ্রব্যের অবয়ব থাকা সত্ত্বেও অরূপী।

১৬৯ পৃষ্ঠায় 'ক্রিয়াবাদ' সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, "জৈনধর্ম্মের মধ্যে ক্রিয়াবাদই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।" কিন্তু ক্রিয়াবাদ জৈনধর্ম্মের সিদ্ধান্ত নহে। কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতও জৈনধর্ম্মকে ক্রিয়াবাদ বলিয়াছেন কিন্তু বস্তুতঃ তাহা ঠিক নহে। ক্রিয়াবাদ, অক্রিয়াবাদ, বিনয়বাদ, অজ্ঞানবাদ প্রভৃতি মত সকল মহাবীরের মত হইতে পৃথক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে[১]। সূত্রকৃতাঙ্গে যে স্থলে অক্রিয়াবাদ, অজ্ঞানবাদ, বিনয়বাদ প্রভৃতির বর্ণনা আছে সেই স্থলে ক্রিয়াবাদও একটী পৃথক মত স্বরূপে বর্ণিত হইয়াছে[২]।

১৮০ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় কলমের নিম্নের দিকে 'লেশ্যা'য় যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ভাব পরিস্ফুট হয় নাই।—বিশেষ "প্রাণীদিগকে ছয়টী রঙের অনুপাতে শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে"—উক্তিটী ঠিক নয়। ছয়টী লেশ্যায় নাম যথা:—কৃষ্ণ, নীল, কাপোত, তেজঃ, পদ্ম ও শুক্ল। জৈন সিদ্ধান্তে এই ছয়টী লেশ্যার অনুপাতে প্রাণীদিগকে ভাগ করা হয় নাই, কিন্তু কোন্ কোন্ প্রাণীর মধ্যে কোন্ কোন্ লেশ্যার বাহুল্য তাহাই বলা হইয়াছে। নরকের জীবের মধ্যে প্রথম তিন লেশ্যা, পশুদের ও মনুষ্যদের মধ্যে ছয়টী লেশ্যার মধ্যে যে-কোন লেশ্যার ব্যক্তি পাওয়া যায়। আজীবকগণ ছয়টী রঙের অনুপাতে মনুষ্যজাতিকে বিভক্ত করিতেন। বোধহয় আজীবক মতের সহিত জৈন মত মিশ্রিত হইয়া এইরূপ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।—মানসিক অধ্যবসায়ের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া কর্ম্ম বর্গনার[৩] অনন্তানন্ত সূক্ষ্ম পুদগলস্কন্ধ যখন আত্মার সহিত মিলিত হয় তখন অধ্যবসায়ের তারতম্যতা অনুসারে ঘনতম, ঘনতর, ঘন, মন্দ, মন্দতর ও মন্দতম রূপে কর্ম্মপুদ্গল উপস্থিত হয়। এই অবস্থাকে কৃষ্ণাদি রঙের সদৃশ বলিয়া এতদ্রূপ নাম-করণ করা হইয়াছে। এইরূপে কর্ম্ম পুদগলের আগমনকে লেশ্যা বলা হয়—

১৮১ পৃষ্ঠায় প্রথম প্যারাতে "মনঃ পর্য্যায়" জ্ঞানের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহাতেও কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক।—এই জ্ঞান "অপরের মনের গতি আলোচনা করিয়া লাভ হয়" ইহা ঠিক নহে। কিন্তু এই জ্ঞান লাভ করিলে 'অপরের মনের সমস্ত পর্য্যায় অর্থাৎ সমস্ত বিভিন্ন ভাব জানিতে পারা যায়' এবং তজ্জন্য ইহাকে মনঃ পর্য্যায় জ্ঞান বলে।

"মহাবীরের ধর্ম্মের সংক্ষিপ্তসার" শীর্ষক প্যারাগ্রাফের মধ্যে যে স্থলে "ইহা (আত্মা) সকল বিষয় জানে, সকল বস্তু দেখিতে পায়, সুখলাভ করিতে ইচ্ছা করে…" ইত্যাদি লিখিত হইয়াছে সে স্থলে ইহা পরিষ্কার করিয়া দেওয়া উচিত যে, আত্মা যে অবস্থায় সকল বিষয় জানে এবং সকল বস্তু দেখিতে পায় সে অবস্থায় ইহা সুখলাভের ইচ্ছা করিতে বা

(১) সূয়গড়াঙ্গ ১।৬।২৭

(২) সূয় গড়াঙ্গ ১।১২।১১

(৩) যে বিশেষ প্রকারের অতি সূক্ষ্ম পুদগল কর্ম্মরূপে আত্মার সহিত মিলিত হয় তাহাকে কর্ম্ম বর্গণায় পুদগল বলে।—

দুঃখকে ভয় করিতে, মিত্রবৎ বা শত্রুবৎ কার্য্য করিতে এবং তাহাদের ফল ভোগ করিতে পারে না। কারণ যে আত্মা যখন সমস্ত দেখিতে ও জানিতে পারে তখন তাহার মুক্ত অবস্থা, সে তখন সুখ, দুঃখ প্রভৃতি সমস্ত অবস্থার অতীত। যে অবস্থায় আত্মা সুখাদির অভিলাষ করে সে অবস্থা সংসারী অবস্থা, তখন সে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী হইতে পারে না।

আরও কয়েক লাইন পরে লেখা হইয়াছে "যে সকল ভিক্ষু অথবা গৃহস্থ তপস্যা ও আত্মসংযম আচরণ করিয়া মুক্তিলাভ করে তাহারা স্বর্গগামী হয়।" এ স্থলে ছাপার ভুল হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয় নতুবা যিনি জৈন শাস্ত্রের এত গভীর অনুশীলন করিয়াছেন তিনি মুক্তিলাভ করিয়া স্বর্গগামী হন এরূপ লিখিতে পারেন না। নরক যেমন দুষ্কৃতির ফল, স্বর্গও সেরূপ সুকৃতির ফল। পুণ্যকর্ম্ম সঞ্চিত হইলে স্বর্গলাভ হয়। জৈনদর্শনে স্বর্গলাভ চরম উদ্দেশ্য নহে কিন্তু মুক্তিলাভ চরম উদ্দেশ্য। স্বর্গ ও নরক তির্য্যক লোকের (পৃথিবীর) ন্যায় সংসারী জীবের পরিভ্রমণের স্থানমাত্র। পাপকর্ম্মের আতিশয্যে নরকগামী এবং পুণ্যকর্ম্মের আতিশয্যে স্বর্গগামী হয়। কিন্তু সম্পূর্ণ শুভাশুভ কর্ম্মের বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত দর্শন, অনন্ত আনন্দের অধিকারী হওয়া মুক্তির অবস্থা—ইহার পরে সংসারে অর্থাৎ স্বর্গ, নরক বা তির্য্যকলোকে কোন স্থানে ফিরিয়া আসা সম্ভবপর নহে।

১৮৪ পৃষ্ঠায় "মোক্ষ" অধ্যায়ে দ্বিতীয় প্যারাতে "পুগ্‌গল" শব্দের অর্থ "ব্যক্তি" (ব্রাকেটের মধ্যে) করা হইয়াছে। জৈন শাস্ত্রে 'পুগ্‌গল' শব্দের অর্থ "জড় পদার্থ"। বৌদ্ধশাস্ত্রে এই শব্দের অর্থ 'ব্যক্তি'। বোধ হয় ভ্রমক্রমে জৈনশাস্ত্রের ব্যাখ্যায় বৌদ্ধশাস্ত্রের অনুসরণ করা হইয়াছে। এ স্থলে ঐ শব্দের অর্থ হইবে 'জড়'—'ব্যক্তি' নহে।

আরও কয়েক স্থলে কিছু কিছু অসঙ্গতি আছে কিন্তু সে সমস্ত তত্ত্ব প্রয়োজনীয় না থাকায় আলোচনার বিষয়ীভূত করা হইল না।

এমনি গহন রাতে কেহ কি ভাবিবে বসে !

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

তন্দ্রাতুর ক্লান্ত আশা, অন্তরের পাদপীঠে পড়িয়াছে ঘন যবনিকা।
অনন্ত স্তব্ধতা মাঝে একটি বিষণ্ণগীতি সঞ্চরিছে মোর অশ্রুলোরে,
যে ছিল প্রাণের প্রিয় সে আজ নাহিক বক্ষে, বাণী তার হ'ল স্বপনিকা,
বহুদূর প্রবাসীর পথের সন্ধান কেহ কহিল না কোনদিন মোরে।
দিগন্তের শূন্যপথে চেয়ে আছি, অন্তরের বিহঙ্গেরা নিদ্রিত কুলায়,
ভ্রাম্যমান ছায়াসম এ জীবন-মরীচিকা মূর্ত্ত রহে নিখিলের প্রাণে।
বাঁধিনু যে সুরে বীণা সে সুর হারায়ে গেছে, বীণা কাঁদে পথ-নিরালায়,
এই বিশ্বে একে একে যায় সব হারাইয়া নাহি ফিরে আমারি আহ্বানে।

আকাশে অতন্দ্র তারা, নিম্নে শ্যামশষ্পদল, অন্ধকার স্থাবর জঙ্গমে,
গভীর রহস্যভরা স্পন্দন তরঙ্গ ওঠে নিখিলের আয়ুস্রোতো মুখে,
সে তরঙ্গে কত চিত্ত ভেসে গেছে কোন্ দূর আনন্দের সাগর-সঙ্গমে,
পশ্চাতে মেখলাসম হংসবলাকার শ্রেণী উড়ে গেছে অসীম কৌতুকে।
নিশীথ গহন রাতি, পশিছে শ্রবণে কত দূরাগত শ্রুতি-বিভীষিকা,
কুঞ্জতরু-বীথিকায় কত আসে খদ্যোতিকা মিশে যায় দিগন্তের পারে,
তিমির গুণ্ঠনতলে চঞ্চল সমীরে কাঁপে কক্ষ-কেন্দ্রে শুভ্র দীপ শিখা,
স্বপনে জাগিছে কত অনাগত কল্পনার পদধ্বনি মৌন অন্ধকারে।

আমিও হারায়ে যাবো—জীবন চলিয়া যাবে, মোর ভগ্ন পান্থশালা মাঝে
এমনি গহন রাতে কেহ কি ভাবিবে বসে মোর প্রাণ কোথা মিশিয়াছে !

আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দুধর্ম্ম

অধ্যাপক শ্রীমেঘনাথ সাহা ডি-এসসি, এফ-আর-এস

(২)

"বিজ্ঞান ও চৈতন্য"

সমালোচক অনিলবরণের মতে "বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরা নাকি বলিয়াছেন যে বিশ্বজগতের পশ্চাতে একটা বিরাট চৈতন্য আছে ; যদিও উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকেরা এই চৈতন্যের অস্তিত্বে বিশ্বাসবান্ হন নাই।" যেহেতু ডাক্তার মেঘনাদ বিশ্বজগতের পশ্চাতে চৈতন্য স্বীকার করেন নাই (যদিও কোথায় অস্বীকার করিয়াছি তাহা সমালোচক কোথায়ও দেখান নাই) সুতরাং তিনি উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক। এই সম্বন্ধে তিনি Napoleon ও Laplace সম্বন্ধীয় একটি গল্পের উল্লেখ করিয়াছেন।

সমালোচক কোথাও চৈতন্যে বিশ্বাসবান্ বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকের নামধাম বা তৎপ্রণীত পুস্তকাদির উল্লেখ করেন নাই। সুতরাং তাঁহার সহিত বিচার, অনেকটা হাওয়ার সাথে লড়াই। তিনি Napolean-Laplace সম্বন্ধীয় গল্পটি ইংরেজী তরজমায় পড়িয়াছেন, কাজেই পরের মুখে ঝাল খাইলে যাহা হয়, গল্পের প্রকৃত মর্ম না বুঝিয়া তাহার অপব্যাখ্যা করিয়াছেন। আসল গল্পটি এই—Laplace তাঁহার সুবিখ্যাত Mecanique Celeste গ্রন্থে গ্রহসমূহের এবং চন্দ্রের গতির সূক্ষ্মভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং প্রমাণ করেন যে গতিতত্ত্ব (Dynamics) ও মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি দিয়া পর্য্যবেক্ষিত সমস্ত গ্রহগতির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হয়। তিনি যখন এই গ্রন্থ Napoleonকে উৎসর্গ করিবার অনুমতির প্রার্থী হন তখন Napoleon রহস্য করিয়া বলেন Mons. Laplace, you have so well described and explained the mechanics of heavenly bodies, but I find that you have nowhere mentioned the Creator. Laplace উত্তর দেন—"Monseigneur, je n'avais pas besoin de tel hypthese." "Sire, I had not the necessity of such a hypothesis."

Laplaceর এই মন্তব্য সম্বন্ধে নানারূপ ভুল ধারণা হইয়াছে। যদি পূর্ব্বের context না জানা থাকে তাহা হইলে মনে হইবে যে Laplace ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু মন্তব্যটিকে তাহার contextএর সহিত ধরিতে হইবে! Laplaceএর সময়ে তর্ক উঠিয়াছিল যে গ্রহউপগ্রহাদির গতি ব্যাখ্যার জন্য গতিতত্ত্ব ও মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি যথেষ্ট কিনা। বাস্তবিক পক্ষে তাৎকালিক পর্য্যবেক্ষণের ফলে গ্রহউপগ্রহাদির গতি এত জটিল প্রতীয়মান হইয়াছিল যে অনেক পণ্ডিত মনে করিতেন যে যদিও গতিতত্ত্ব ও মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা স্থূলভাবে গ্রহাদির পথের ব্যাখ্যা মিলে, বাস্তবিক সূক্ষ্মভাবে ব্যাখ্যা সম্ভবপর নয়। অনেকে মনে করিতেন যে মধ্যে মধ্যে কোনও অদৃশ্য হস্তের প্রভাবে (unseen agency) গ্রহগতির সামঞ্জস্য সাধিত হয়। কিন্তু Laplace প্রমাণ করিলেন যে মাধ্যাকর্ষণ ও গতিতত্ত্বই যথেষ্ট, কোনও অদৃশ্য শক্তির অস্তিত্ব কল্পনার প্রয়োজন নাই। তাই তিনি Napoleonকে উক্তরূপ জবাব দিয়াছিলেন। ইহা হইতে তিনি "ঈশ্বর আছেন বা না আছেন" তৎসম্বন্ধে কোন স্পষ্ট মত প্রকাশ করিয়াছিলেন এরূপ ধরিয়া লওয়া অত্যন্ত অসঙ্গত হইবে। বাস্তবিকই প্রকৃত বৈজ্ঞানিকেরা যে বিষয় লইয়া গবেষণা করেন, তাহার বাহিরে কোন বিষয়ে তাঁহারা যদি কিছু বলেন্, তাহাকে যুক্তি ও তর্কের পরীক্ষা দিয়া যাচাই করিয়া নিতে হইবে। Sir J. J. Thompson বলিয়াছেন যে যদি কোন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন বিশেষ মত প্রকাশ করেন, সেই মত তাঁহার পরিবার বা সমাজপ্রদত্ত শিক্ষা হইতে সঞ্জাত মনে করিতে হইবে ; তাঁহার এই মত যদি বিজ্ঞান-সঙ্গত প্রমাণপ্রয়োগসহ উপস্থাপিত না হয়, তাহা হইলে নেহাৎ ব্যক্তিগত মত বলিয়াই গণ্য করা হইবে। অর্থাৎ এই মতের উপর উক্ত বৈজ্ঞানিকের ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব চাপান অন্যায় হইবে। কাজেই কোনও বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যদি ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসবান্ হন এবং তজ্জন্য তিনি যদি নিছক

বিশ্বাস ব্যতীত বিজ্ঞানের স্বীকৃত প্রমাণাদি উপস্থিত না করেন, তাহা হইলে সেই মতের উপর কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করা অসঙ্গত হইবে।

সুতরাং বিংশ শতাব্দীর কোন বৈজ্ঞানিক বিশ্বজগতের পশ্চাতে বিরাট চৈতন্য আছে এবং কি প্রমাণে তিনি এইরূপ বলিয়াছেন, তাহার সবিশদ্ বর্ণনা না পাইলে সমালোচকের অবান্তর বাগাড়ম্বরের প্রতিবাদ করিতে যাওয়া নিরর্থক। সমালোচকের লেখা দৃষ্টে মনে হয় যে তিনি একজন God-drunk লোক এবং বোধহয় ঈশ্বরকে উপলব্ধি করারও দাবী করেন। আমার সেরূপ সৌভাগ্য হয় নাই,হইলে সুখী হইব।

আমাদের বক্তৃতার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল যে "God is a subjective creation of the human mind" অর্থাৎ প্রত্যেক যুগে এবং প্রত্যেক দেশেই লোকে নিজেদের মন হইতে "ঈশ্বরের স্বরূপ" কল্পনা করিয়া নেয়। সুতরাং এই সব "মনগড়া ঈশ্বরের" প্রকৃতি বিভিন্ন হয় এবং ঈশ্বরের ধারণা সেই জাতি বা ব্যক্তিবিশেষের মনোভাব মাত্র ব্যক্ত করে। ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রমাণসঙ্গত কোন objective ধারণা এ পর্য্যন্ত কেহ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাত্", সাংখ্যকারের এই উক্তি বোধহয় একালেও চলে।

সমালোচক মনে করেন যে ভগবানে অচলা ভক্তি ব্যতীত ধর্ম্ম হইতে পারে না। তিনি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছেন। এই সমস্ত ধর্ম্মে ভগবানের বা সৃষ্টিকর্ত্তার স্থান কোথায়? অথচ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া মানবজাতির একটা প্রকাণ্ড অংশের মনোবৃত্তি, রীতিনীতি, সমাজ সংগঠনের মূলভিত্তি গঠন করিয়াছে! এখনও চীন ও জাপান দেশে বৌদ্ধমতের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ। ভারতে অবশ্য পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মকে অভিভূত করিয়াছে; কিন্তু অনেকের মতে তাহাই ভারতের অধঃপতনের মূল কারণ। বর্ত্তমানে রুষিয়া দেশ সম্পূর্ণ Godless এবং তাহারা গত ২০ বৎসরের মধ্যে আত্মপ্রত্যয়শীল হইয়া যেরূপভাবে দেশের সর্ব্ববিধ বস্তুতান্ত্রিক উন্নতিসাধন করিয়াছে, জগতের ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। সুতরাং ভগবানের দোহাই ছাড়া ধর্ম্ম বা সভ্যতা গড়িয়া উঠিতে পারে না, পৃথিবীতে সভ্যতার বিকাশ সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিলে এই মত সমর্থন করা চলে না।

"প্রাচীনেরা ভাবিতেন যে পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্র··· নিয়ন্ত্রিত করেন।"

আমার বক্তৃতার উক্ত অংশের সমালোচনায় সমালোচক অনর্থক বাগ্‌জাল বিস্তার করিয়া হিন্দু জ্যোতিষ সম্বন্ধে আমি অনভিজ্ঞ এবং হিন্দু জ্যোতিষে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জ্যোতিষের সমস্ত তত্ত্বই নিহিত আছে এই কথা বলিতে চাহিয়াছেন। এই ধারণা কত ভ্রমাত্মক তাহা ক্রমশঃ দেখাইতেছি।

"প্রাচীনেরা মনে করিতেন যে পৃথিবী বিশ্বজগতের কেন্দ্র" —আমার এই মন্তব্যের সমালোচক অপব্যাখ্যা করিয়াছেন। contextএর সহিত মিলাইয়া দেখিলে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে পৃথিবী যে বিশ্বজগতের জ্যামিতিক কেন্দ্র তাহা আমি কোথাও বলি নাই। বলবার উদ্দেশ্য যে প্রাচীনকালে এই ধারণা ছিল—"এই পৃথিবীই বিশ্বজগতে শ্রেষ্ঠ জিনিষ"। সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা পৃথিবীস্থ জীবের বিশেষতঃ মানুষের কোনও বিশেষ প্রয়োজনবশতঃই ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট হইয়া সৃষ্ট হইয়াছে এই ধারণা অনেক ধর্ম্মেই বলবতী ছিল।

"তারকাগুলি ধার্ম্মিক লোকের আত্মা"

প্রাচীনকালের সমস্ত দেশেই এই ধারণা ছিল, এমন কি এই বেদপ্রবুদ্ধ দেশেও। গ্রীস দেশের সমস্ত পৌরাণিক কাহিনী মোটের উপর এই বিশ্বাস-প্রণোদিত। তারকাগুলির নামেও ইহার পরিচয়। মহাভারতেও এই বিশ্বাসের পরিচয় আছে। যথা বনপর্ব্বে (৪২ অধ্যায়ে) অর্জ্জুন যখন অস্ত্রলাভার্থ মাতলির সহিত রথে স্বর্গে প্রয়াণ করিতেছেন, তখন তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে মাতলি বলিতেছেন ঃ—

হে পার্থ! তুমি ভূমণ্ডল হইতে এই সমস্ত তারকা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছ। পুণ্যশীলেরা সুকৃতি ফলে তারকারূপে স্ব স্ব স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন।

সুতরাং উপরিউক্ত মন্তব্যে আমি কোন মনগড়া কথা বলি নাই বা হিন্দুশাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা করি নাই। বর্ত্তমান জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে তারকাগুলি এক একটি সূর্য্যমণ্ডল, এবং বর্ত্তমান লেখকের গবেষণায় (Saha's Theory of Ionisation) তাহাদের রাসায়ণিক উপাদান, তাপমান, প্রাকৃতিক অবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হইয়াছে। মোটের উপর সূর্য্য হইতে তাহাদের বিভিন্নতা

কেবল তাপক্রম এবং ওজন ও পরিমাণজনিত। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের এই সমস্ত আবিষ্কার সত্য ধরিয়া লইলে পৌরাণিক ধ্রুব উপাখ্যান (বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণ), অগস্ত্যোপাখ্যান, প্রজাপতির কন্যাসক্তি, দক্ষযজ্ঞ—এক কথায় সমস্ত Puranic Mythologyর ভিত্তি ভূমিসাৎ হয় এই আমার বক্তব্যের সারমর্ম্ম।

সমালোচক বলিয়াছেন ঃ—

"গ্রহগণ মানুষের অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রণ করে—এ কথাটা কি শুধু প্রাচীন দর্শনের কথা? আধুনিক বৈজ্ঞানিক ইউরোপে কি কেহ এ কথা বিশ্বাস করে না?"

আমি কোথাও দর্শনের কথা বলি নাই, লোক প্রচলিত মতের কথাই বলিয়াছি। সম্ভবতঃ সমালোচক অস্বীকার করিবেন না যে আমাদের দেশে এখনও শতকরা ৯৯ জন লোক পঞ্জিকা ও ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাসবান্। ইউরোপে কেহ কেহ বিশ্বাস করে—কিন্তু তাহাদের অনুপাত কত? সম্প্রতি "Britain by Mass-observation" শীর্ষক Penguine Seriesএ প্রকাশিত পুস্তকে উক্ত হইয়াছে যে ইংলণ্ডে পুরুষের মধ্যে শতকরা ৫ জন ফলিত জ্যোতিষে পূর্ণ আস্থাবান্, ১৫ জন আংশিক এবং ৮০ জন লোকে মোটেই বিশ্বাস করে না। স্ত্রীলোকের মধ্যে শতকরা ৩৩ জন পূর্ণ বিশ্বাস করে, ৩৩ জন আংশিক বিশ্বাস করে এবং বাকী ৩৩ জন মোটেই করে না। এই সমস্ত তথ্য বহু গবেষণার ফলে সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে শতকরা ৯৯ জন পুরুষ এবং ১০০ জন স্ত্রীলোক ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করে। এখনও তথাকথিত শুভদিন না হইলে, কোষ্ঠী না মিলিলে বিবাহ হয় না! পঞ্জিকা কথিত শুভদিন না দেখিয়া অধিকাংশ লোকের বিদেশ যাত্রা হয় না। হাঁচি, টিকটিকি ও পাঁজি সমস্ত হিন্দুজীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। বিলাতের দু'চার জন দুর্ব্বলমস্তিষ্ক লোকে ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করে, এই তর্কে আমাদের সর্ব্বজনব্যাপী কুসংস্কারের ন্যায্যতা বা উপকারিতা প্রমাণ হয় না। আমার বিশ্বাস যে হাঁচি, টিকটিকি ও পঞ্জিকায় অন্ধবিশ্বাস জাতীয় জীবনের দৌর্ব্বল্যের দ্যোতক। এতদ্দেশে প্রচলিত পঞ্জিকা যে ভুল গণনা দ্বারা পরিচালিত এবং অর্দ্ধসত্যাত্মক কুসংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত ইহা মৎ সম্পাদিত Science and Culture পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধে তাহা দেখান হইবে।

Hindu Astronomy সম্বন্ধে আমি কোন মন্তব্যই প্রকাশ করি নাই; অথচ সমালোচক অযাচিত মন্তব্য করিয়াছেন "ডক্টর মেঘনাদ সাহা এখানে Astronomy ও Astrology এই দুই এর মধ্যে গোলমাল করিয়াছেন।" কোথায় গোলমাল করিয়াছি এবং কোথায় আমি হিন্দু Astronomyর উপর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি, তিনি দেখাইয়া দিলে বাধিত হইব।

লেখক হিন্দু-জ্যোতিষ সম্বন্ধে আমাকে অনেক জ্ঞান দান করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি বোধ হয় মোটেই জ্ঞাত নন যে আমি হিন্দু জ্যোতিষ (Astronomy) আজীবন অধ্যয়ন করিয়াছি এবং ভারতে জ্যোতিষ বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আমার কিছু ধারণা আছে। সুতরাং সমালোচকের হিন্দু জ্যোতিষ সম্বন্ধে ধারণা যে প্রায়শঃ অমূলক ও বিরাট অজ্ঞতা প্রসূত তাহা দেখাইতে প্রয়াসী হইলাম।

সমালোচক অনিলবরণ ও হিন্দু জ্যোতিষ

সমালোচক ভারতবর্ষের লেখকদিগকে জানাইয়াছেন যে এই দেশে সূর্য্য যে সৌরজগতের কেন্দ্র এই মত জানা ছিল এবং গ্যালিলিওর বহু পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে জানা ছিল যে পৃথিবী সচল হইলেও স্থির বলিয়া মনে হয়, সুতরাং ইউরোপীয় বিজ্ঞান নূতন কিছুই করে নাই ইত্যাদি।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের তুলনামূলক আলোচনা করিতে হইলে প্রথম দরকার কালজ্ঞান। কোনও বিশেষ আবিষ্কার কোন লোক বা কোন জাতি প্রথম করিয়াছে, এই তর্ক উঠিলে প্রথম দেখিতে হয় যে কোন সময়ে উক্ত লোক বা জাতি এই বিশেষ আবিষ্কার দাবী করিয়াছে এবং তাহা কতটা প্রমাণসহ। সমালোচক অনিলবরণ কালের পৌর্ব্বাপর্য্য কিছুমাত্র বিচার করেন নাই। এই বিষয়ে তাঁহার কতটা অধিকার আছে জানি না। যদি অধিকার না থাকে, এই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাওয়া তাঁহার পক্ষে দুঃসাহসের কাজ। সুতরাং তাঁহার অবগতির জন্য ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিতে হইল।

জ্যোতিষশাস্ত্রের বিশেষ সুবিধা এই যে ইহাতে মিথ্যা বা মনগড়া কল্পনার স্থান নাই। কারণ জ্যোতিষে গ্রহনক্ষত্র বা কালগণনা সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রত্যক্ষ ঘটনার উল্লেখ করিতে

হয়, জ্যোতিষে সাধারণ জ্ঞান থাকিলেই ঐ সমস্ত ঘটনার সময় নিরূপণ করা যায়। সুখের বিষয় ভারতীয় জ্যোতিষের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ব্যতীত ভারতীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে পরলোকগত মহারাষ্ট্র-পণ্ডিত শঙ্করবালকৃষ্ণ দীক্ষিত, মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। সমালোচক 'দেব ভাষায়', ভারতীয় ভাষায় এবং ইংরেজী ভাষায় রচিত এই লেখকদের গ্রন্থ পাঠ করিলে ভারতীয় জ্যোতিষ (Astronomy) সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা কত ভ্রান্ত বুঝিতে পারিবেন। বর্ত্তমান লেখক এই সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন এবং এই সম্বন্ধে সমস্ত মৌলিক পুস্তকের জ্ঞান আছে বলিয়া দাবী করেন।

এই সমস্ত পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে ভারতীয় জ্যোতিষের ক্রমবিকাশের তিনটি স্তর আছে—

১। বেদকাল (খৃঃ পূঃ ১৪০০ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী)

২। বেদাঙ্গ জ্যোতিষকাল (খৃঃ পূঃ ১৪০০ শতাব্দী হইতে ৪০০ খৃঃ অব্দ)

৩। সিদ্ধান্ত কাল (৪০০ খৃঃ অব্দ হইতে ১২০০ খৃঃ অব্দ)

বেদকালের জ্যোতিষ অতি সাধারণ রকমের এবং বহু স্থলেই অর্থ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। তদপেক্ষা উন্নততর বেদাঙ্গ জ্যোতিষের কালগণনা প্রণালী 'মহাভারতে' অনুসৃত হইয়াছে (বিরাটপর্ব, ৫২ অধ্যায়)। মহাভারতের সঙ্কলনকাল দীক্ষিতের মতে (এবং যাহা এখন সর্ব্ববাদিসম্মত) ৪৫০ পূঃ খৃঃ অব্দ হইতে ৪০০ খৃঃ অব্দ। সমালোচক যদি প্রমাণ চাহেন তাহা দেওয়া যাইবে। এই 'মহাভারতে' কুত্রাপি সপ্তাহ,বার, রাশিচক্রের (যাহা বর্ত্তমান পঞ্জিকারএকটী প্রধান অঙ্গ) উল্লেখ নাই। মহাভারতে কোথাও পৃথিবীর গোলত্ব, আবর্ত্তনবাদ বা সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণবাদের উল্লেখ নাই; বরঞ্চ যে সমস্ত মতের উল্লেখ আছে তাহা উক্ত সমস্ত মতবাদ হইতে সম্পূর্ণ অন্যরকমের (ভীষ্মপর্ব, ৬ অধ্যায়) (বনপর্ব, ১৬২ অধ্যায়)। মহাভারতে পৃথিবীকে সমতল বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, সুমেরু উহার কেন্দ্র স্থলে অবস্থিত এবং পৃথিবী যতটা প্রসারিত, সুমেরু প্রায় ততটা উঁচু এবং সূর্য্য সুমেরুর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া দিবারাত্রি ঘটায়, এইরূপ বর্ণিত আছে। সুতরাং ধরা যাইতে পারে যে মহাভারত সঙ্কলনকালের অর্থাৎ ৪৫০ পূঃ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে ভারতে পৃথিবীর গোলত্ব বা আবর্ত্তনবাদ, অথবা সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণবাদ জানা ছিল না।

বেদাঙ্গ জ্যোতিষের কালগণনা প্রণালী বর্ত্তমান সময়ের তুলনায় অত্যন্ত স্থূল ও অশুদ্ধ। এই গণনাপ্রণালীই একটু পরিবর্ত্তিত হইয়া খৃষ্টের কিছু পর পর্য্যন্ত "পৈতামহ সিদ্ধান্ত" নামে প্রচলিত ছিল এবং ইহাই পরবর্ত্তীকালে 'পিতামহ ব্রহ্মা' প্রণীত বলিয়া স্বীকৃত হয়। অন্যান্য সিদ্ধান্তের তুলনায় এই প্রাচীন সিদ্ধান্ত কতদূর অশুদ্ধ, ৫৫০ খৃঃ অব্দে প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী বরাহমিহির লিখিত নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে তাহার ঠিক ধারণা হইবে। বরাহমিহির তাঁহার সময়ে প্রচলিত পাঁচখানা সিদ্ধান্তের সারমর্ম্ম তাঁহার পঞ্চ-সিদ্ধান্তিকা নামক করণ গ্রন্থে বর্ণনা করেন এবং উক্ত পঞ্চসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তুলনামূলক মন্তব্য প্রকাশ করেন।

"পৌলিশ রোমক বাশিষ্ঠাসৌরপৈতামহাস্তু সিদ্ধান্তাঃ।
পঞ্চভ্যো দ্ব্যাবাদ্যৌ ব্যাখ্যাতৌ লাটদেবেন।
পৌলিশকৃতঃ স্ফুটোঽসৌ তস্মাসন্নস্তু রোমকপ্রোক্তঃ।
স্পষ্টতরঃ সাবিত্রঃ পরিশেষৌ দূরবিভ্রষ্টৌ।"

এই শ্লোকের অর্থ যে বরাহমিহিরের সময় (৫৫০ খৃঃ অব্দে) পাঁচখানা সিদ্ধান্ত প্রচলিত ছিল—পৌলিশ বা পুলিশ, রোমক, সৌর, বাশিষ্ঠ ও পৈতামহ। তন্মধ্যে প্রথম দুইখানির লাটদেব ব্যাখ্যা করেন; এই দুইখানির মধ্যে পৌলিশ-সিদ্ধান্ত স্ফুট অর্থাৎ শুদ্ধ, রোমক সিদ্ধান্ত তাহার আসন্ন অর্থাৎ তদপেক্ষা অশুদ্ধ; সর্ব্বাপেক্ষা শুদ্ধ সূর্য্য-সিদ্ধান্ত, কিন্তু অবশিষ্ট দুইখানি, বাশিষ্ঠ ও পৈতামহ সিদ্ধান্ত "দূরবিভ্রষ্ট" অর্থাৎ অত্যন্ত অশুদ্ধ।

এই মন্তব্যটি তলাইয়া বুঝিতে হইবে। নাম দৃষ্টে প্রমাণ যে রোমক ও পৌলিশ-সিদ্ধান্ত বিদেশ হইতে আনুমানিক ৪০০ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষে আনীত হয়। ইহার প্রমাণ চাহিলে দেওয়া যাইবে। বাস্তবিকপক্ষে পৌলিশ-সিদ্ধান্ত Paulus of Alexandria (376 A. D.)র জ্যোতিষ গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত। বাকী রহিল সর্ব্বাপেক্ষা শুদ্ধ সূর্য্য-সিদ্ধান্ত; কিন্তু ইহাও যে বিদেশ হইতে ধার করা তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে আধুনিক সূর্য্যসিদ্ধান্তের প্রারম্ভে বলা হইয়াছে—

অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্ত-জগদাধারমূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ॥ ১॥
অল্পাবশিষ্ট তু কৃতে ময়নামা মহাসুরঃ।
রহস্যং পরমং পুণ্যং জিজ্ঞাসুর্জ্ঞানমুত্তমং॥ ২॥
বেদাঙ্গমগ্র্যমখিলং জ্যোতিষাং গতিকারণং।
আরাধয়ন্ বিবস্বন্তং তপস্তেপে সুদুশ্চরং॥ ৩॥
তোষিতস্তপসা তেন প্রীতস্তস্মৈ বরার্থিনে।
গ্রহাণাং চরিতং প্রাদান্ময়ায় সবিতা স্বয়ম্॥ ৪॥

শ্রীসূর্য্য উবাচ

বিদিতস্তে ময়া ভাবস্তোষিতস্তপসা হ্যহম।
দদ্যাং কালাশ্রয়ং জ্ঞানং গ্রহাণাং চরিতং মহৎ॥ ৫॥
ন মে তেজঃ সহঃ কশ্চিদাখ্যাতুং নাস্তি মে ক্ষণঃ।
মদংশঃ পুরুষোহয়ং তে নিঃশেষং কথয়িষ্যতি॥ ৬॥
ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে দেবঃ সমাদিশ্যাংশমাত্মনঃ।
স পুমান্ ময়মাহেদং প্রণতং প্রাঞ্জলিস্থিতম্॥ ৭॥
শৃণুষ্বৈকমনাঃ পূর্ব্বং যদুক্তং জ্ঞানমুত্তমং।
যুগে যুগে মহর্ষীণাং স্বয়মেব বিবস্বতা॥ ৮॥

সত্যযুগের কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে, ময়নামক মহাসুর পরমপুণ্যপ্রদ, রহস্য, বেদাঙ্গশ্রেষ্ঠ, সমস্ত গ্রহদিগের গতি-কারণরূপ উত্তম জ্ঞানলাভে জিজ্ঞাসু হইয়া দুশ্চর তপস্যাদ্বারা সূর্য্যদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। ২-৩

শ্রীসূর্য্যদেব বরার্থী ময়াসুরের তপস্যায় পরম প্রীত হইয়া তাহাকে গ্রহজ্ঞানবিষয়ক জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং অধিষ্ঠিত হইলেন। ৪

সূর্য্য বলিলেন, হে ময়! আমি তোমার মনোগত ভাব অবগত হইয়াছি এবং তোমার তপদ্বারাও তুষ্ট হইয়াছি; অতএব আমি তোমাকে গ্রহদিগের স্থিতি চলনাদি প্রতিপাদক জ্যোতিষশাস্ত্র উপদেশ করিতেছি; কিন্তু কেহই আমার তেজ সহিতে পারে না এবং আমারও ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করিবার অবকাশ নাই যে, তৎসমস্ত তোমার নিকট প্রকাশ করিব; অতএব আমার অংশসম্ভূত এই পুরুষ তোমার অভিপ্রেত বিষয়সকল অবগত করাইবে। ৫-৬

এই বলিয়া সূর্য্যদেব নিজ অংশসম্ভূত পুরুষকে ময়ের নিকট তাহার অভিপ্রেত বিষয়ে বর্ণনে আদেশ করিয়া তথা হইতে অন্তর্দ্ধান হইলেন। সূর্য্যাংশের পুরুষও কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত প্রণত ময়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ময়! সূর্য্যদেব যুগে যুগে মহর্ষিদিগের যে জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধীয় উত্তম জ্ঞান কীর্ত্তন করিয়াছিলেন তাহা বলিতেছি; এক মন হইয়া শ্রবণ কর। ৭-৮

সূর্য্যসিদ্ধান্তের কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে আছে যে ময়াসুর ব্রহ্মাকর্ত্তৃক শাপগ্রস্ত হইয়া রোমকপুরে যবনরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং তথায় সূর্য্যের আরাধনা করিয়া জ্যোতিষের জ্ঞান প্রাপ্ত হন এবং ময়াসুরের নিকট হইতে মহর্ষিগণ কাল ও জ্যোতিষজ্ঞান লাভ করেন। সূর্য্যসিদ্ধান্তের শেষ অধ্যায়ে এইরূপভাবে পরিসমাপ্ত করা হইয়াছে।—

ইত্যুক্ত্বা ময়মামন্ত্র্য সম্যক্ তেনাভিপূজিতঃ।
দিবমাচক্রমেঽর্কাংশ প্রবিবেশ সমণ্ডলম্॥
ময়োঽথ দিব্যং তজ্জ্ঞানং জ্ঞাত্বা সাক্ষাদ্বিবস্বতঃ।
কৃতকৃত্যমিবাত্মানং মেনে নির্ধূতকল্মষম্॥
জ্ঞাত্বা তমৃষয়শ্চাথ সূর্য্যলব্ধবরং ময়ং।
পরিবব্রুপেত্যাথো জ্ঞানং পপ্রচ্ছুরাদরাত্॥
স তেভ্যঃ প্রদদৌ প্রীতো গ্রহাণাং চরিতং মহৎ।
অভ্যদ্ভূতং লোকে রহস্যং ব্রহ্মপস্মিতম্॥

বঙ্গানুবাদ।—

এইরূপ ময়কে উপদেশ করিয়া, বাংময় দ্বারা পূজিত হইয়া সূর্য্যের অংশস্বরূপ পুরুষ সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করিলেন।

স্বয়ং সূর্য্যদেব হইতে এই দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া ময় নিজকে কৃতার্থ এবং নিজকে পাপ বিনির্ম্মুক্ত মনে করিতে লাগিলেন।

পরে ময় সূর্য্যদেবের নিকট বরপ্রাপ্ত হইয়াছে জানিয়া ঋষিগণ তাঁহার নিকট আগমন করিয়া সম্মানসহকারে বিদ্যার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

ময় আনন্দিত হইয়া ঋষিদিগকে গ্রহাদির গুহ্য এবং আশ্চর্য্য ব্রহ্মবিদ্যাতুল্য মহাবিদ্যা দান করিয়াছিলেন।

(বিজ্ঞানানন্দ স্বামীকৃত সূর্য্যসিদ্ধান্তের
অনুবাদ হইতে গৃহীত)

এই পৌরাণিক গল্পের নীহারিকার ভিতর দিয়া সত্যের অনুসন্ধান করিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে সূর্য্যসিদ্ধান্তে যে জ্যোতিষিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা পশ্চিম-

দেশবাসী অসুরদিগের অর্জ্জিত জ্ঞান। হিন্দু পণ্ডিতগণ অসুরগণের নিকট হইতে তাহা শিক্ষা করেন। এই অসুরগণ কে?

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত সূর্য্যসিদ্ধান্তের ভূমিকায় বলিয়াছেন যে সূর্য্যসিদ্ধান্তের গণনাপ্রণালী ৪০০ খৃঃ অব্দ হইতে ১০০০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে পরিবর্ত্তিত এবং স্ফুটতর (more correct) হইয়াছে। মূল সূর্য্যসিদ্ধান্তের সহিত Babylonian Astronomyর ঐক্য আছে। সূর্য্যসিদ্ধান্তের প্রারম্ভিক শ্লোক তাহারই দ্যোতকমাত্র। সুতরাং সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত জ্ঞানের উৎপত্তি কোন পশ্চিমদেশীয় নগরে, ভারতে নয়—এই জ্ঞান প্রথমে অসুরেরা পর্য্যবেক্ষণ ও পর্য্যালোচন করিয়া বাহির করেন এবং অসুরদিগের নিকট হইতে আর্য্য-ঋষিরা শিক্ষা করেন। এই অসুরেরা রক্তমাংসের লোক, প্রাচীনকালে সমস্ত পশ্চিম এশিয়া জুড়িয়া তাঁহারা একটা মহান্ সভ্যতা গঠন করেন, যাহার কেন্দ্র ছিল Babylon, Ninevah, Ur ইত্যাদি Tigris ও Euphrates নদীদ্বয়ের উপর অবস্থিত নগরগুলি।

বর্ত্তমানকালের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রমাণ হইয়াছে যে প্রাচীন Babylon দেশে প্রথমে জ্যোতিষিক পর্য্যবেক্ষণ ও গণনার সম্যক উৎকর্ষ সাধিত হয়। তাহার কারণ বেবিলোনীয়গণ সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহনক্ষত্রকে দেবতা বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে এইসব গ্রহদেবতাগণ মানবের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া সুপ্রাচীন কাল হইতেই তাঁহারা গ্রহাদির গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। প্রায় খৃঃ পূঃ ২০০০ শতাব্দীতেও যে বেবিলনে গ্রহনক্ষত্রের পর্য্যবেক্ষণ হইত তাহার লিখিত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে (e. g. Venus Tables of King Amiza Dugga nearly 1900 B. C.)। ৫৫০ খৃঃ পূঃ অব্দে বেবিলনের স্বাধীনতা লুপ্ত হয়। কিন্তু তখন হইতে জ্যোতিষিক জ্ঞানের আরও উৎকর্ষ হয়। পরবর্ত্তী পারশীক (Achemenids) মেসিডোনীয় গ্রীক (Alexander and Seleucids) এবং পার্থিয়ানবংশীয় রাজাদের অধীনে বেবিলোনীয় জ্যোতির্ব্বিদগণ বহু নূতন আবিষ্কার করেন। তাঁহারাই প্রথমে সৌর ও চন্দ্রমাসের সামঞ্জস্য সাধনের জন্য ৩৮৩ পূঃ খৃঃ অব্দে প্রথম ১৯ বৎসরে ৭টী অধিমাস গণনার প্রণালী প্রবর্ত্তিত করেন (Metonic cycle)। বেবিলোনবাসী Kidinnu প্রায় ৪০০ পূঃ খৃঃ প্রথম অয়নচলন (Procession of Equinoxes) আবিষ্কার করেন। Babylon এ আবিষ্কৃত জ্ঞান ক্রমে পশ্চিমে গ্রীসদেশে, পূর্ব্বে পারশ্যের ভিতর দিয়া ভারতে ও চীন পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। অনেক জ্যোতিষিক আবিষ্কার যাহাকে পূর্ব্বে গ্রীসদেশ হইতে লব্ধ মনে করা হইত, বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে যে তাহার উৎপত্তি বাস্তবিকই Babylonএ। এই জ্যোতিষীরা সাধারণতঃ Chaldean নামে পরিচিত। এ দেশেও জ্যোতিষশাস্ত্র মুখ্যতঃ "শাকদ্বীপী" বা মগ (Magi) ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক আলোচিত হয় এবং নামদৃষ্টেই প্রমাণ শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া হইতে সমাগত। ইহাদের ভারতাগমন সম্বন্ধে কৌতূহলকর কাহিনী প্রচলিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহার উল্লেখ হইল না।

সুতরাং দেখা যায় যে ৫৫০ খৃঃ অব্দে যে পাঁচখানি সিদ্ধান্ত প্রচলিত ছিল তন্মধ্যে ভারতীয় প্রাচীন অর্য্য-ঋষিদিগের নিজস্ব ছিল মাত্র পৈতামহ, পিতামহ ব্রহ্মা প্রণীত বলিয়া খ্যাত। কিন্তু বরাহমিহির "পিতামহ ব্রহ্মাকে" ভাল কালজ্ঞানজ্ঞ বলিয়া Certificate দিয়া নাই, বরঞ্চ ৮০ খৃঃঅব্দে পিতামহ ব্রহ্মার জ্যোতিষের জ্ঞান সমসাময়িক ইংরাজি কৃষকদের জ্যোতিষজ্ঞান হইতে বিশেষ উন্নতস্তরের ছিল না ইহা বেশ জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে।

এই ভারতীয় নিজস্ব জ্যোতিষ যাহা ১৪০০ পূঃ খৃঃ অব্দ হইতে শককাল (৮০ খৃঃ অব্দ) পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল, তাহা কত অশুদ্ধ যে একটী সামান্য দৃষ্টান্তেই বোঝা যাইবে। এই সিদ্ধান্তমতে ৩৬৬ দিনে বৎসর হয় অর্থাৎ বৎসর গণনায় পিতামহ ব্রহ্মা প্রায় ১৮ ঘণ্টা ভুল করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহার বহু পূর্ব্বেই অর্থাৎ খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দী হইতেই Egyptian, Babylonian, এবং কিছু পরে Greek ও Romanগণ প্রায় ৩৬৫¼ দিনে যে বৎসর হয় তাহা জানিতেন। প্রথম খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত পঞ্চবৎসরাত্মক যুগগণনাপ্রথা এবং পাঁচ বৎসরে দুই অধিমাস গণনার প্রথা চলিত ছিল—তাহাতে পাঁচ বৎসরে প্রায় ৩½ দিনের ভুল হইত। অথচ খৃঃ পূর্ব ৪০০ অব্দে বেবিলোনে যে অধিমাস গণনাপ্রণালী প্রচলিত ছিল তাহাতে ১৯ বৎসরে

মাত্র ২½ ঘণ্টার ভুল হইত। সুতরাং ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয় যে ৮০ খৃঃ অব্দ ও ৪০০ খৃঃ অব্দের মধ্যে হিন্দু পণ্ডিতেরা পিতামহ ব্রহ্মার Authority সত্ত্বেও প্রাচীন গণনাক্রম পরিত্যাগ করিয়া গ্রীক্, রোমান্ ও Chaldean Astronomy অনুসারে গণনা আরম্ভ করিতে দ্বিধা করেন নাই। এই সময়ের পরে ভারতীয় জ্যোতিষের সম্যক্ উন্নতি হয় এবং ইহাই দীক্ষিতের "সিদ্ধান্তযুগ"। কিন্তু যদিও সিদ্ধান্তজ্যোতিষ পিতামহ ব্রহ্মার জ্যোতিষ হইতে অনেক উন্নতস্তরের, উহাকে Galileoর সমসাময়িক European জ্যোতিষের সমতুল্য মনে করা প্রলাপ বই কিছুই নয়। কারণ বলিতেছি—

এখন সমালোচক কর্ত্তৃক উদ্ধৃত পুরাণবচনের আলোচনা করা যাউক। প্রথমে দেখিতে হইবে যে পুরাণগুলি কোন সময়ের রচনা। পুরাণগুলি মহাভারতের পরবর্ত্তীকালে লিখিত একথা সম্ভবতঃ সমালোচক স্বীকার করিবেন। না করিলেও প্রমাণ দেওয়া কষ্টকর হইবে না। আমি ধরিয়া নিতেছি যে তিনি উহা স্বীকার করেন।

প্রায় সমস্ত পুরাণেই ভবিষ্যরাজবংশের বর্ণনাকালে অন্ধ্রদের বা আন্ধ্র ভৃত্য রাজাদের কথা আছে। অন্ধ্রদের পতন হয় প্রায় ২২০ খৃঃ অব্দে। অনেক পুরাণে গুপ্তরাজাদেরও কথা আছে। তাঁহাদের প্রাদুর্ভাবকাল ৩১৯ খৃঃ অব্দ। সুতরাং বলিলে ভুল হইবে না যে প্রাচীন পুরাণগুলি ১০০ খৃঃ অব্দ হইতে ৪০০ খৃঃ অব্দের মধ্যে বা পরে সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই সমস্ত পুরাণে যে সমস্ত জ্যোতিষিক বর্ণনা আছে, তাহাতেও দেখা যায় যে তাহারা সিদ্ধান্ত যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক এবং বেদাঙ্গজ্যোতিষের পরবর্ত্তী। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বেদাঙ্গজ্যোতিষ ৮০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল।

এখন হিন্দু জ্যোতিষের তথাকথিত উৎকর্ষতা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। (১)

পুরাণকার বলিয়াছেন যে—

সর্ব্বগ্রহাণামামেতেষামাদিরাদিত্যরুচ্যতে

এর অর্থ যে এই সমস্ত গ্রহের আদি আদিত্য অর্থাৎ সূর্য্য। কিন্তু 'পৃথিবী' যে গ্রহ তাহা পুরাণকার কোথায় বলিয়াছেন? হয়ত এই বাক্যে বলা হইয়াছে যে সূর্য্য অপর পাঁচটি গ্রহের (মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনির) কেন্দ্রস্থানীয়। কিন্তু তাহাই বা কোথায় স্পষ্ট বলা হইয়াছে?

ইউরোপে 'গ্যালিলিও' (১৫৬৪-১৬৪২ খৃঃ অব্দ) যে সর্ব্বপ্রথমে পৃথিবী 'চলমান' বলিয়াছেন, সমালোচক এই তথ্য কোথায় পাইলেন? তিনি বোধ হয় অবগত নহেন যে প্রথম Anaximander of Sparta প্রায় ৫৬০ পূঃ খৃঃ অব্দে পৃথিবীর আবর্ত্তনবাদ গ্রীসদেশে প্রচার করেন। হয়ত এই বাদ তাহার বহুপূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল কিন্তু সেরূপ কল্পনারও কিছু দরকার নাই। মোটের উপর পুরাণকার যদি উক্ত উদ্ধৃত বাক্যে পৃথিবীর আবর্ত্তনবাদ বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি তাহার প্রায় ৮০০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রীক পণ্ডিতদের মতবাদের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন মাত্র। লেখকের ভ্রান্তি নিরসনের জন্য এই বিষয়ের আরও বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে তিনটি বিষয়ের পর পর ধারণা করিতে হইবে—প্রথমে পৃথিবীর গোলত্ব ও নিরাধারত্ব; দ্বিতীয়তঃ নিজের মেরুরেখার চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর আবর্ত্তন—যাহাতে দিনরাত্রি হয়। তৃতীয়তঃ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে বার্ষিক প্রদক্ষিণ। প্রাচীন গ্রীসদেশে এই তিনটি বাদের কি রকম ভাবে পর পর উৎপত্তি হয়, তাহার সময়ানুযায়ী বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

Anaximander of Sparta	560 B.C.	ইনি গ্রীসদেশে প্রথমে, পৃথিবী যে নিজের মেরু-রেখার চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিতেছে এবং তজ্জন্য দিবারাত্র হয় এই মত প্রচার করেন।
		ইনি প্রথমে পৃথিবীর ব্যাসমাপেন। তাঁহার দেওয়া পরিমাণ বর্ত্তমানে জানা পরিমাণ

(১) cf. Surya Siddhanta আদিত্যো হ্যাদিভূতত্বাত্, প্রভূতা সূর্য্য উচ্যতে॥ XII 15, পুরাণ বাক্য সূর্য্য সিদ্ধান্ত হইতে গৃহীত নয় তো?

Eratosthenes of Alexandria	276-196 B.C.	অপেক্ষা বিশেষ তফাৎ নয়। পৃথিবী যে গোল এই মত বোধ হয়, আরও ঢের প্রাচীনকালেও পণ্ডিতদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।
Aristarchus of Samos	275 B.C.	ইনি প্রথম প্রচার করেন যে পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে নিজ নিজ কক্ষে ভ্রমণ করে। (২)

কিন্তু এই সমস্ত মত পাশ্চাত্যে গৃহীত হয় নাই। প্রায় ১৬০ খৃঃ অব্দে প্রসিদ্ধ গ্রীক পণ্ডিত Klaudius Ptolemy আলেকজান্দ্রিয়া নগরে প্রসিদ্ধ 'Syntaxis' গ্রন্থ রচনা করেন। এই পুস্তকে তিনি পৃথিবীর গোলত্ব অস্বীকার করেন নাই, পরন্তু বর্ত্তমান ভৌগোলিকগণ যেরূপ অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা দ্বারা পৃথিবীর উপর কোন স্থানের অবস্থান নির্ণয় করেন তিনিও সেইরূপ করিয়াছিলেন। কিন্তু Ptolemy পৃথিবীর আবর্ত্তনবাদ ও Aristarchus of Samos কর্ত্তৃক পরিকল্পিত সৌরজগতের সৌর কৈন্দ্রিকতা অথবা Heliocentric Theory of the Solar system মানেন নাই। প্রধানতঃ Ptolemyর বিরুদ্ধতায় প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইউরোপে Aristarchusএর মত ত্যক্ত হয়। প্রায় তেরশত বৎসর পরে ১৪৪৪ খৃঃ অব্দে Poland দেশীয় সন্ন্যাসী Copernicus পুনরায় এই মতবাদ প্রচার করেন যে পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে এবং সূর্য্য সৌরজগতের কেন্দ্রে নিশ্চল হইয়া বর্ত্তমান থাকে। (৩)

কিন্তু Copernicus প্রবর্ত্তিত মতও তৎকালীন ইউরোপে গৃহীত হয় নাই। শুধু যে 'পাদ্রীরা' এই মতের পরিপন্থী হন তাহা নয়, Tycho Brahe'র মত প্রসিদ্ধ জ্যোতিষজ্ঞ পণ্ডিত এই মত মানিতেন না। Tycho বলিতেন পৃথিবী বিশ্বজগতের কেন্দ্রে স্থির আছে এবং সূর্য্য ইহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে এবং অপরাপর গ্রহ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। Tycho Brahe'র মত সুবিখ্যাত জ্যোতিষী বৈজ্ঞানিক কারণেই Copernicusএর মতবাদ অস্বীকার করেন এবং এই মতবাদ ইউরোপেও সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইত, যদি Kepler না জন্মিতেন।

Kepler গ্রহগতি সম্বন্ধে তাঁহার সুপরিচিত তিনটী নিয়ম আবিষ্কার করিয়া সৌরজগতের 'পৃথিবী কেন্দ্রিকতা' বাদকে চিরকালের জন্য সমাধিস্থ করেন। তৎপর Galileo গতিতত্ত্ব ও Newton (1742-1727) মাধ্যাকর্ষণশক্তি আবিষ্কার করেন এবং Newton উভয়তত্ত্ব প্রয়োগ করিয়া গ্রহগণের গতির সম্যক্ ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

এখন সমালোচকের হিন্দু জ্যোতিষের উৎকর্ষের দাবী কতটা বিচারসহ তাহা আলোচনা করিয়া দেখাইতেছি। প্রথমেই দেখিয়াছি যে 'পৈতামহ সিদ্ধান্তের' কাল অর্থাৎ খৃঃ অব্দের ৮০ সন পর্য্যন্ত ভারতীয় নিজস্ব জ্যোতিষ বা কালগণনা প্রণালী অতিশয় অশুদ্ধ ছিল এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থে কুত্রাপি পৃথিবীর গোলত্ব, আবর্ত্তনবাদ ও সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণবাদ স্বীকৃত হয় নাই। আনুমানিক ১০০ খৃঃ অব্দের পরে বোধহয় উজ্জয়িনীর শক রাজাদের সময় হইতে (যাঁহারা পারশিক প্রভাবান্বিত ছিলেন) পাশ্চাত্য Chaldean ও Greek জ্যোতিষ ভারতে আসিতে আরম্ভ করে। তখন ভারতীয় জ্যোতিষিকগণ পৃথিবীর গোলত্ব, আবর্ত্তনবাদ ইত্যাদি স্থূলভাবে স্বীকার করিতে আরম্ভ করেন।

কিন্তু এই মতবাদ যখন বেবিলোনে ও গ্রীসদেশে প্রায় ভারতের প্রথম প্রচলিত মতের অন্যূন তিনশত বর্ষ পূর্ব্বেই প্রচলিত ছিল এবং যখন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে গ্রীক জ্যোতিষ সেই সময় ভারতে সম্যক্ প্রচারিত হইয়াছিল, তখন স্বীকার করিতে হইবে যে পৃথিবীর গোলত্ব, নিরাধারত্ব, আবর্ত্তন ও প্রদক্ষিণবাদ সম্বন্ধে যদি কিছু পরবর্ত্তীকালের হিন্দুপুরাণে বা জ্যোতিষে থাকে, তাহা বিদেশ হইতে ধার করা। পৃথিবীর গোলত্ব হিন্দু পণ্ডিতগণ চিরকালই স্বীকার করিয়াছেন, যদিও তাহাদের দেওয়া পৃথিবীর ব্যাস গ্রীকদের দেওয়া পরিমাণ হইতে বিশুদ্ধতর নয়। ভূভ্রমণবাদ সম্বন্ধে

(২) এই সমস্ত বিবরণ ও তারিখ Zinner কৃত Sternkunde নামক জার্ম্মান্ ভাষায় লিখিত পুস্তক হইতে নেওয়া হইয়াছে।

(৩) সমালোচক অনিলবরণ অজ্ঞতাবশতঃ Copernicusএর প্রাপ্য কৃতিত্ব Galileoকে দিয়াছেন।

প্রথম প্রামাণ্য উক্তি পাওয়া যায় কুসুমপুর অর্থাৎ পাটলীপুত্র নিবাসী আর্য্যভটের (জন্ম ৪৭৬ খৃঃ অব্দ) রচিত গীতিকাপাদে।

"অনুলোমগতির্নৌস্থঃ পশ্চাত্যচলং বিলোমগং যদবত্
অচলানি ভানি তদবৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াম্—"

ইহা পৃথিবীর আবর্ত্তন সম্বন্ধীয় মতবাদ, কোন প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষী সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণ সম্বন্ধে কোনওরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন কিনা তাহা আমার জানা নাই। আর্য্যভট্ট নিজে Epicyclic Theory দিয়া গ্রহগণের গতি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন—তাহাতে পৃথিবীকে সৌরজগতের কেন্দ্র বলিয়া ধরা হইয়াছে।

কিন্তু আর্য্যভটের ভূভ্রমণবাদ পরবর্ত্তী কোন হিন্দু জ্যোতিষী গ্রহণ করেন নাই। ব্রহ্মগুপ্ত, লল্ল, মুঞ্জাল, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি পরবর্ত্তীকালের সমস্ত খ্যাতনামা জ্যোতিষীই ভূভ্রমণবাদ খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। (বিশদভাবে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়কৃত আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ইউরোপে প্রাচীন গ্রীকদের ভূভ্রমণবাদের যে দশা হইয়াছিল, ভারতেও আর্য্যভটের ভূভ্রমণবাদেরও (যাহা সম্ভবতঃ গ্রীকদের নিকট হইতে ধার করা) সেই অবস্থা হয়। ভূভ্রমণবাদে আর্য্যভট পৃথিবীর দৈনিক আবর্ত্তন মাত্র বুঝিয়াছেন, তিনি অথবা কোন ভারতীয় পণ্ডিত যে পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে, এই মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর্য্যভটকে তর্কের খাতিরে Copernicusর সমতুল্য ধরিলেও এদেশে পরবর্ত্তীকালে Kepler, Galileo, Newtonএর জন্ম হয় নাই, একথা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে।

সিদ্ধান্ত জ্যোতিষকালে (৪০০-১১০০ খৃঃ অব্দ) ভারতে কালগণনার অনেক উন্নতি সাধন হয়। বৎসর ও মাসের পরিমাণ, গ্রহদিগের ভগণকাল হিন্দুপণ্ডিতেরা অধিকতর শুদ্ধভাবে নিরূপণ করেন। জ্যোতিষিক গবেষণা করিতে যাইয়া, তাঁহারা জ্যামিতি, ত্রিকোণ মিতি, বীজগণিতে অনেক মৌলিক আবিষ্কার করেন। কিন্তু এ সমস্ত আবিষ্কার Pre-renaissance যুগের ইউরোপীয় জ্যোতিষের সমতুল্য—এমন কি কোন কোন অংশে মধ্যযুগের আরব জ্যোতিষেরও সমতুল্য নয়। হিন্দু ও গ্রীকদের নিকট জ্যোতিষশাস্ত্র শিখিয়া মধ্যযুগের আরবগণ (৭০০-১৫০০ খৃঃ অব্দ) জ্যোতিষে বহু উন্নতি সাধন করেন। প্রায় ১৭৩০ খৃঃ অব্দে সম্রাট মহম্মদ সাহের আদেশে জয়পুররাজ সবাই জয়সিংহ ভারতে উন্নততর আরব জ্যোতিষের প্রচলন করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার আদেশে তৈলঙ্গ পণ্ডিত জগন্নাথ সংস্কৃত ভাষায় 'সিদ্ধান্তসম্রাট' নামক গ্রন্থ রচনা করেন, উহা Ptolemya Syntaxisএর আরব্য সংস্করণের (যাহা Almagest নামে বিখ্যাত) অনুবাদ মাত্র। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মানমন্দিরসমূহ মধ্যএশিয়া উলুঘবেগের মানমন্দিরের আদর্শে গঠিত।

জয়পুররাজ প্রাচীন ভারতীয় সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ পরিত্যাগ করিয়া আরব্য জ্যোতিষের প্রবর্ত্তন করিতে সচেষ্ট হন কেন? কারণ, সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের গণনা প্রণালী ৪০০ খৃঃ অব্দের পক্ষে প্রশংসনীয় হইলেও সম্পূর্ণ শুদ্ধ ছিল না এবং প্রায় ১৩০০ বৎসরের গতানুগতিকতার ফলে, উহা সম্পূর্ণ "দূরবিভ্রষ্ট" হইয়া পড়িয়াছিল। সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষকালের হিন্দু পণ্ডিতগণ মনে করিতেন যে অয়নচলন ক্রমান্বয়ে একদিকে নয়, খানিকদূর যাইয়া পেণ্ডুলামের গতির মত প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। সেইজন্য তাহারা সায়ন বৎসর (Tropical) গণনা না করিয়া নিরয়ন বর্ষ (Sidereal) গণনা করিতেন এবং এখনও করেন। এইজন্য এবং নিরয়ন বৎসরের পরিমাণে যে ভুল ছিল দুইএ মিলিয়া তাহাদের বৎসরমান প্রকৃত সায়নবর্ষ মান অপেক্ষা প্রায় ৩১৬ দিন বেশী হয় এবং প্রায় ১৪০০ বৎসরে হিন্দু বর্ষ মানে ভুল প্রায় ২৩ দিনে পৌঁছিয়াছি। হিন্দু পঞ্জিকায় ৩১শে চৈত্রকে মহাবিষুব সংক্রান্তি বলা হয়, কিন্তু বাস্তবিক মহাবিষুব সংক্রান্তি হয় ৭ই কি ৮ই চৈত্র। যদিও পৃথুদক স্বামী প্রায় ৮৫০ খৃঃ অব্দে স্পষ্ট করিয়া বলেন যে অয়নচলন একদিকেই হয়, তথাপি একাল পর্য্যন্ত দুই একজন ব্যতীত কোন হিন্দু জ্যোতিষীই বর্ষমানের সংস্কারের আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন নাই। বাস্তবিক পক্ষে ১২০০ খৃঃ অব্দের পর হইতে হিন্দু জ্যোতিষিক পণ্ডিতগণ বেহুলার মত মৃত সভ্যতার শব আলিঙ্গন করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন এবং বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত অতি ভুল পদ্ধতিতে বর্ষ গণনা করিতেছেন। মৎ-সম্পাদিত

'Science and Culture' পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটী প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি যে হিন্দুর তিথি ইত্যাদি গণনা, শুভ অশুভ দিনের মতবাদ, কতকগুলি মধ্যযুগীয় ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রচলিত হিন্দুপঞ্জিকা একটী কুসংস্কারের বিশ্বকোষ মাত্র।

সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ সম্বন্ধে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় জ্ঞানের কথঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইল। আশা করি সমালোচক আমার বিবরণে ভুল বাহির করিবেন, না হয় তাঁহার হিন্দুজ্যোতিষের উৎকর্ষ সম্বন্ধে অতিশয়োক্তি প্রত্যাহার করিবেন। সম্যক অধ্যয়ন ও বিচার না করিয়া অতীতের উপর একটা কাল্পনিক শ্রেষ্ঠত্ব আরোপ করা শুধু আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র এবং এরূপ 'আত্মপ্রবঞ্চকের' পক্ষে পরকে উপদেশ দিতে যাওয়া অমার্জনীয় ধৃষ্টতা।

সমালোচক পুনরায় বলিয়াছেন "এই বিশ্বজগতের পশ্চাতে এক বিরাট চৈতন্যশক্তি আছে, তাহা হইলে সূর্য্য চন্দ্র গ্রহাদির পশ্চাতেও সে শক্তি রহিয়াছে, অতএব এই সকলকে দেবতা বলিলে ভুল হয় না।"

এই মন্তব্য বিশ্বাসের কথা, যুক্তির কথা নয়। যাঁহারা Shamanismএ বিশ্বাস করেন, তাঁহারা সমালোচকের মত মানিয়া লইতে পারেন। আমি যুক্তিবাদী, যুক্তি মানিতে রাজী আছি, Shamanism মানিতে আমার কোনও আগ্রহ নাই। এইরূপ বিশ্বাস যদি সভ্যতার উৎকর্ষ প্রতিপন্ন করে, তাহা হইলে Mexico নিবাসী Aztecগণের মত সভ্যজাতি পৃথিবীতে জন্মে নাই, কারণ তাহারা সূর্য্যকে দেবতা বলিয়া মানিত এবং মনে করিত, যে পর্বে পর্বে নরবলি না দিলে সূর্য্যের ক্ষুধা মিটিবে না, সূর্য্যের শক্তি হ্রাস হইবে এবং তাপ বিকীরণের ক্ষমতা লোপ পাইবে, পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী আরম্ভ হইবে। সুতরাং পর্বে পর্বে তাহারা সূর্য্যের ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য সহস্র সহস্র নরবলি দিত।

সূর্য্যকে দেবতা মনে করা একটী প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধারণা মাত্র, এই যুগে সেই ধারণার কোন সার্থকতা নাই। এখন অতি সাধারণ শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকে ও জানে যে সূর্য্য পূজা করিলে গ্রীষ্মের আধিক্য বা অনাবৃষ্টি ইত্যাদি দূরীভূত হয় না। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রসাদে সূর্য্যের উত্তাপকে যন্ত্রযোগে সর্ববিধ কাজে লাগান সম্ভবপর এবং উহাতে মানুষের সর্ববিধ সুবিধা, যেমন শক্তি উৎপাদন refriegeration (শৈত্যোৎপাদন) air-conditioning, cooking, (রন্ধন), water-raising (জলোত্তোলন) ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন হয়। সুতরাং যাঁহারা সমালোচকের মত গ্রহাদিকে দেবতাজ্ঞান করেন, তাঁহারা শুধু একটী মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের মোহে নিমজ্জিত আছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা যাঁহারা যন্ত্রযোগে সূর্য্যের উত্তাপকে সর্ববিধ কাজে লাগাইতে সচেষ্ট আছেন, তাঁহারা অনেক উন্নতস্তরের জীব। বিশ্বজগতের পশ্চাতে চৈতন্যই থাকুন বা অচৈতন্যই থাকুন, তাহাতে মানবসমাজের কি আসে যায়, যদি সে "চৈতন্য" কোনও ঘটনা নিয়ন্ত্রণ না করেন অথবা কোনও প্রকারে সেই 'চৈতন্যকে' আমরা আমাদের উদ্দেশ্যের অনুকূলে চালিত না করিতে পারি? প্রাচীন Chaldean জ্যোতিষীরা মনে করিতেন যে গ্রহগুলি দেবতার প্রতীক এবং সেই দেবতারা মানবের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করে; এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা ফলিত জ্যোতিষ বা হোরাশাস্ত্র উদ্ভাবন করেন এবং কোষ্ঠী, গ্রহনক্ষত্রের অবস্থানজনিত ফলাফল গণনা করিতেন। ভারতে বৌদ্ধদের বাধা সত্ত্বেও তাহার উপর গ্রহপূজা আরম্ভ হয়। কিন্তু Chaldean সভ্যতার ধ্বংস ও ভারতীয় সভ্যতার অধঃপতন হইতে মনে হয় যে ফলিতজ্যোতিষ সম্পূর্ণ নিরর্থক। বর্ত্তমান বিজ্ঞানে ফলিত জ্যোতিষের কোন সার্থকতা উপলব্ধি হয় না।

(ক্রমশঃ)

জন্ম—১২ই কার্ত্তিক ১২৭৬ সাল

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

মৃত্যু—২রা কার্ত্তিক ১৩২৯ সাল

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

শ্রীকমলাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বহুদিন পূর্ব্বে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন: "বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতি ও ব্যাপ্তি সহকারে কেবল যে সমস্ত বাঙালীর হৃদয় অন্তরতম যোগে বদ্ধ হইবে, তাহা নহে—এক সময় ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতিকেও বঙ্গ-সাহিত্য আপন জ্ঞানান্ন বিতরণের অতিথিশালায়, আপন ভাবামৃতের সদাব্রতে আকর্ষণ করিয়া আনিবে।" কবির এই ভবিষ্যদ্বাণী সফলতা লাভ করিয়াছে। বঙ্গ-সাহিত্য ভারতবর্ষের মধ্যে স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে দাঁড়াইবার উপযুক্ত হইয়াছে। যাঁহাদের ঐকান্তিক সাধনার ফলে বাংলা সাহিত্যের এই সম্মান, তাঁহাদের মধ্যে ৺চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় অন্যতম।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৈতৃক বাসস্থান নদীয়া জেলায়। তাঁহার পিতামহ ব্যবসার্থ বহরমপুর খাগড়ায় বসবাস করিতেন। পিতামহ ৺রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মুর্শিদাবাদ ও কলিকাতায় রেশমের কুঠি ছিল। তৎকালে মুর্শিদাবাদী রেশমের ব্যবসা বর্ত্তমান কালের ন্যায় মৃত হইয়া উঠে নাই। চন্দ্রশেখরের পিতা ৺বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায় পিতৃ-ব্যবসায়ের দেখাশুনা করিতেন। সন ১২৫৬ সালের ১২ই কার্ত্তিক তারিখে মাতুলালয়ে চন্দ্রশেখর জন্মলাভ করেন। পিতার ইচ্ছা ছিল, পুত্রকে ইংরেজী শিক্ষা দেন; কিন্তু পিতামহ ইংরেজী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন। তিনি পৌত্রকে খাগড়া-নিবাসী পণ্ডিত ঠাকুরদাস বিদ্যারত্ন মহাশয়ের টোলে সংস্কৃত শিক্ষা লাভার্থে প্রেরণ করেন। তখন চন্দ্রশেখরের বয়স অনধিক আট বৎসর মাত্র। কিছুদিন পরে পিতা বিশ্বেশ্বর পুত্রকে ইংরেজী শিক্ষা দিবার সুযোগ পাইয়া বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলে তাঁহাকে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। কলিকাতাপ্রবাসী পিতামহ এই সংবাদ পাইয়া সাতিশয় অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হন এবং পুত্রের সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া দেন। তিনি চন্দ্রশেখরের পিতাকে বলিয়াছিলেন: "আমার কথা না শোনার ফল ভাল হইবে না।" বাস্তবিক ভবিষ্যতে পিতৃ-আজ্ঞা-লঙ্ঘনের ফল ভালও হয় নাই। চন্দ্রশেখর পঠদ্দশাতেই মদ্যপানে আসক্ত হন এবং আজীবন এই পানাসক্তির বশীভূত ছিলেন। মদ্যপানের বিষময় পরিণতি—বাতব্যাধিগ্রস্ত হইয়া সারাজীবন তাঁহাকে শারীরিক ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল।

ইংরেজী শিক্ষার সম্বন্ধে সেকালে অনেকেই বিরুদ্ধমত পোষণ করিতেন। কারণ তাঁহাদের ধারণা ছিল যে ইংরেজী শিক্ষার ফলে মানুষের নৈতিক অবনতি অবশ্যম্ভাবী। তবে ইংরেজী শিক্ষা না পাইলে চন্দ্রশেখর তাহার অমূল্য গদ্য-কাব্য 'উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম' রচনা করিতে পারিতেন কি-না তাহা বলা যায় না। তাঁহার লিখিত বিভিন্ন বিষয়ক জ্ঞান-সমৃদ্ধ প্রবন্ধাবলী বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করিতে পারিত কি-না তাহাও বলা সম্ভব নয়। ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই চন্দ্রশেখর বঙ্গবাসীকে বৈদেশিক বিভিন্ন বিষয়ের ভাব-ধারার সঙ্গে পরিচিত করাইতে পারিয়াছিলেন।

যথাকালে চন্দ্রশেখর কলেজিয়েট স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং উচ্চ শিক্ষা লাভার্থ কলিকাতায় প্রেরিত হন। কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে যথাকালে যোগ্যতার সহিত এফ-এ ও বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময়ে তাঁহাদের ব্যবসায়ে বহু ক্ষতি হওয়ায় অবস্থা খারাপ হইয়া যায় এবং চন্দ্রশেখরকে জীবিকা উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে হয়। প্রথমে বহরমপুর কলেজিয়েট স্কুলে এবং পরে রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলে তিনি শিক্ষকতা করেন। কিছুদিন শিক্ষকতা করার পর তিনি আইনের পরীক্ষা দেন এবং বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বহরমপুর জজ আদালতে আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিন্তু কার্য্য-শৈথিল্য ও অন্যমনস্কতার জন্য ওকালতীতে পসার করিতে পারেন নাই। অতঃপর তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় করিতে যান। সেখানেও তিনি একই কারণে সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই।

পাঠ্যাবস্থায় চন্দ্রশেখরের প্রথম বিবাহ হয়, মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জের সন্নিকটস্থ দেবীপুর গ্রামে। তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর গর্ভে একটি মাত্র পুত্র সন্তান হইয়াছিল, কিন্তু

মাত্র দুই বৎসর বয়সেই পুত্রটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহার অল্পকাল পরে তাঁহার প্রথমা পত্নীও মরধাম পরিত্যাগ করেন। প্রথমা পত্নীর বিয়োগের পর চন্দ্রশেখর তাঁহার অমর গদ্যকাব্য 'উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম' রচনা করেন। লালবাগ-মুর্শিদাবাদের গঙ্গাতীরে বসিয়া তিনি তাঁহার এই অক্ষয় কীর্ত্তি রচনা করিতেন। লালবাগের ৺গঙ্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এক কন্যার সহিত তাঁহার দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিবাহের ছয় মাস পরে তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীও লোকান্তরিতা হন। তাঁহার তৃতীয় এবং শেষ বিবাহ হয়, যখন তাঁহার বয়স ২৮ বৎসর। নদীয়া জেলার দেবগ্রাম নিবাসী ৺চণ্ডীদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত তাঁহার শেষ বিবাহ। এই স্ত্রীর গর্ভে এক কন্যা জন্মলাভ করে। সেই কন্যাটিও অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। চন্দ্রশেখরের মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার শেষ জীবন-সঙ্গিনীও পরলোকগমন করেন। 'উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম' রচয়িতার স্ত্রী-ভাগ্য আদৌ সুখপ্রদ হয় নাই।

কলিকাতায় অবস্থানকালে চন্দ্রশেখরের সাংসারিক অনটন বর্দ্ধিত হয়। আইন-ব্যবসায় তাঁহার পক্ষে অর্থকরী হয় নাই, সাহিত্য-সেবা সেকালে অবৈতনিক ছিল। সাহিত্যিক সম্মান পাইলেও অর্থ পাইতেন না। কাজেই সংসার চালাইবার জন্য তিনি চাকুরী গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার তৃতীয় পত্নীর এক পিতৃব্যের চেষ্টায় চন্দ্রশেখর মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের এষ্টেটে ম্যানেজার পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে পুণ্যশ্লোক মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী চন্দ্রশেখরের আর্থিক দুরবস্থার বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার সমুদয় ঋণ পরিশোধ করিয়া দেন এবং এই দুঃস্থ সাহিত্যিকের সমস্ত ভার গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বহরমপুরে ফিরাইয়া আনেন।

চন্দ্রশেখর তখন ওকালতী ছাড়িয়া সম্পূর্ণভাবে মহারাজের আশ্রিত। তাঁহাকে প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র তাঁহার সম্পাদকতায় 'উপাসনা' মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। চন্দ্রশেখর বঙ্কিম-মণ্ডলের একজন জ্যোতিষ্ক, বঙ্গদর্শনের লেখক ও সমালোচক, বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজে তাঁহার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। বঙ্কিমের তিনি শিষ্য, কাজেই উপাসনা বঙ্গদর্শনের আদর্শে সম্পাদিত হইতে লাগিল। তৎকালীন সাহিত্য-পত্রিকার প্রবন্ধ-গৌরব অভূতপূর্ব্ব, বর্ত্তমানকালে কোনও পত্রিকাই প্রবন্ধ-গৌরবে এত বেশী অগ্রসর হইতে পারে নাই। কিন্তু চন্দ্রশেখরের সাহিত্য-প্রতিভার কাছে রসিক সমাজ যতখানি আশা করিয়াছিল তেমন কিছু পায় নাই। তাঁহার রচনা কদাচিৎ প্রকাশিত হইত, কারণ সম্পাদনার কার্য্যে তিনি প্রবন্ধাদি নির্ব্বাচন ছাড়া বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেন না। তবে সমালোচনার অংশটি তিনি নিজে লিখিতেন। মহারাজা চন্দ্রশেখরের সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য তাঁহাকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি দিতেন এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেও চন্দ্রশেখর মহারাজের এই সাহায্য পাইয়া আসিয়াছেন। কয়েক বৎসর পরে 'উপাসনা'র সম্পাদন-ভার পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তে অর্পণ করিয়া চন্দ্রশেখর মুক্ত হন।

পঠদ্দশায় চন্দ্রশেখর 'মসলা-বাঁধা কাগজ' নামে যে পুস্তক রচনা করেন—তাহা অধুনা লুপ্তপ্রায়। বঙ্কিমচন্দ্র এই পুস্তকের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুস্তক—'কুঞ্জলতার মনের কথা', এই পুস্তকখানিও বর্ত্তমানকালে আর সহজপ্রাপ্য নয়। 'কুঞ্জলতার মনের কথা'য় চন্দ্রশেখর নর-নারীর প্রকৃতি, অধিকারভেদ ও স্বাতন্ত্র্য-বাদ লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন। কথোপকথনচ্ছলে নর-নারীর মনস্তত্ত্ব লইয়া এই পুস্তকখানি লিখিত।

তাহার পর অমর গদ্যকাব্য 'উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম' রচিত হয়। বঙ্গ-সাহিত্যে মাত্র এইখানিই তাঁর সুপ্রচারিত রচনা এবং এই পুস্তকখানিই তাঁহার নাম সাহিত্য-সমাজে অক্ষয় করিয়া রাখিবে। কাব্যে ৺অক্ষয়কুমার বড়ালের 'এষা' এবং গদ্য-সাহিত্যে 'উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম' সমপর্য্যায়ভুক্ত। প্রথমা পত্নী বিয়োগের পর শোকসন্তপ্ত লেখক তাঁহার হৃদয়োচ্ছ্বাস ভাষায় রূপান্তরিত করিয়াছেন। সাতটি প্রস্তাবে বিরচিত গ্রন্থখানির প্রত্যেক প্রস্তাবই এক একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ। বিশেষ করিয়া 'শ্মশানে' শীর্ষক উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের পঞ্চম প্রবন্ধটির ন্যায় সুন্দর প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যে আর আছে কি-না সন্দেহ।

বঙ্গদর্শনে তাঁহার 'সতীদাহ' নামীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "লেখকের লিপি-চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছি।" বঙ্কিমচন্দ্র কঠোর সমালোচক ছিলেন, অযাচিত প্রশংসা তিনি করিতেন না। পরে যখন বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে রাজকার্য্য ব্যপদেশে বাস করিতেন তখন

চন্দ্রশেখরের সহিত বঙ্কিম-মণ্ডলের প্রত্যেক সাহিত্য-রথীর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ ঘটে এবং উত্তরকালে চন্দ্রশেখর নিজেও সাহিত্য-সম্রাটের নবরত্নের একটি রত্নরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার ন্যায় বঙ্কিম-মণ্ডলের সাহিত্যিকগণও নিজেদের গণ্ডীর মধ্যে কালিদাস ইত্যাদি নামে পরিচিত হইতেন।

সমালোচনা করিতে চন্দ্রশেখরের বিশেষ কৃতিত্ব ছিল। 'যথার্থবাদং চরিতং হিতৈষীণাং'—সমালোচক হিসাবে তিনি এই বাণী মানিতেন। সেই সময়ে তাঁহার সম্পাদনায় 'মাসিক সমালোচক' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বহরমপুর হইতে প্রকাশিত হইত। তাঁহার সুযোগ্য সম্পাদন কৌশলে পত্রিকাখানি সুধী-সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তৎকালীন অনেক খ্যাতনামা লেখকের রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। এই সময়ে তাহার 'স্ত্রী-চরিত্র' এবং 'সারস্বত কুঞ্জ' নামক প্রবন্ধসঙ্কলন প্রকাশিত হয়। বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'রস-গ্রন্থাবলী' চন্দ্রশেখরের রচনা।

বাংলা সাহিত্যের সহিত যাঁহাদের সামান্য পরিচয়ও আছে, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় তাঁহাদের কাছে অপরিচিত নহেন্। তাঁহার সাহিত্য-সেবার বিষয় তাঁহারা ভালরূপই জানেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে কাশীমবাজার রাজবাটীতে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। এই সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন মহারাজা স্যর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর এবং সম্পাদক—চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়। প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মিলনের উদ্বোধন যে প্রধানত তাঁহাদের চেষ্টা ও যত্নে সম্ভব হইয়াছিল তাহা সাহিত্যসেবী মাত্রেই অবগত আছেন। সাহিত্য-সাধনা সৌখীন বৃত্তি নহে, সাহিত্য-সাধনা সুকঠিন ব্রত, চন্দ্রশেখর বিশেষভাবে তাহাই বলিতেন।

চন্দ্রশেখর সাহিত্যসেবীই ছিলেন। কখনও তিনি রাজনীতি বা সমাজনীতি লইয়া প্রকাশ্যে আত্মনিয়োগ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার রচিত সাহিত্যে, রাজনীতি ও সমাজ তত্ত্বজ্ঞানের গভীর পরিচয় পাওয়া যায়। ওয়ালেসের বিস্ষ্টিবাদ, ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ, স্পেন্সারের অজ্ঞেয়-বাদ, কোমতের প্রত্যক্ষবাদ, জন স্টুয়ার্ট মিলের হিতবাদ প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তদীয় প্রবন্ধাবলী তাঁহার সাক্ষ্য। সংস্কৃত শাস্ত্রে এবং ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রেও তাঁহার অধিকার ছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। ইংরেজী সাহিত্যের মত ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গেও তাঁহার পরিচয় ছিল। ফরাসী ভাষাও তিনি জানিতেন এবং ফরাসী বিদ্রোহ ও নেপোলিয়নের ইতিহাস তিনি ভালরূপে অনুশীলন করিয়াছিলেন।

আজীবন তিনি সাহিত্য-সেবায় মগ্ন ছিলেন। তাঁহার বাসগৃহে বহু পুস্তক ছিল এবং জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি লিখন পঠনে কাটাইতেন। নিজেও তিনি যেমন সংযম সহকারে সাহিত্য-সেবা করিয়া গিয়াছেন, তেমনি তিনি সাহিত্যেও সংযমের পক্ষপাতী ছিলেন। শেষ জীবনে 'বিবাহের উৎপত্তি ও ইতিহাস' শীর্ষক সুচিন্তিত গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনায় তিনি রত ছিলেন। এই প্রবন্ধের অধিকাংশ 'উপাসনা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু প্রবন্ধটি তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইলে প্রবন্ধটি বঙ্গ-সাহিত্যের অমূল্য রত্নরূপে পরিগণিত হইত।

সন ১৩২৯ সালের ২রা কার্ত্তিক রাত্রি প্রায় এগারটার সময় মাত্র তিন দিন জ্বরে শয্যাগত থাকার পর চন্দ্রশেখর ইহলোক হইতে চির-বিদায় গ্রহণ করেন (১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ)। জাহ্নবীতীরে যে শ্মশানে তাঁহার প্রথমা পত্নীর চিতাশয্যা রচিত হইয়াছিল, সেই শ্মশানেই চন্দ্রশেখরও তাঁহার শেষ শয্যা পাতিয়াছিলেন।

'উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম' গদ্যকাব্যের 'শ্মশানে' প্রবন্ধে চন্দ্রশেখর যাহা বলিয়াছেন তাহাই সত্য। মানুষ চলিয়া যায়, তাহার কীর্ত্তি বর্ত্তমান থাকে। চন্দ্রশেখর চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার অমর কাব্য 'উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম' তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

ভাঙ্গাবাড়ীর ইতিহাস

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

ইহাই নিয়ম। সৃষ্টির পরবর্ত্তী পর্য্যায় ধ্বংস। দু দিন আগে কিংবা দু দিন পশ্চাতে। কিন্তু এইখানেই সব শেষ হইয়া যায় না—পূর্ব্ব ইতিহাস থাকিয়া যায়। প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য দুই-ই। বর্ত্তমানে যাহা শুধু বিবর্ণ বিধ্বস্ত ইটের স্তূপ, তারও একসময় অঙ্গসৌষ্ঠব ছিল। পথ চলিতে চলিতে পথিক থমকিয়া দাঁড়াইত মুগ্ধ ঈর্ষান্বিত চোখে চাহিয়া দেখিত—গৃহস্বামীর রুচির তারিফ করিত, অর্থের হিসাব করিতে গিয়া অনর্থক সময়ের অপব্যবহার করিত। দেউড়ী, বাগান, দেশী-বিদেশী—ফুলের প্রাচুর্য্য, গ্রিক ভাস্কর-মূর্ত্তির ইতস্তত সন্নিবেশ, মহলের পর মহল, ঐশ্বর্য্যের উগ্র প্রকাশ। পুরুষানুক্রমে জমিদার। হিসাবে ভুল নাই—পরিবর্ত্তন তাই শ্রীবৃদ্ধির পথ ধরিয়াই অগ্রসর হয়; কিন্তু তারও একটা শেষ আছে। জমিদারীতে ঘুন ধরিল। যোগ করিতে বসিয়া দিনের পর দিন শুধু বিয়োগ করিয়াই চলে। সুযোগ এবং সুবিধাবাদীর দল এই সুযোগে তাহাদের অদৃষ্ট পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়। চৌধুরী বাড়ীর সাবেক দিনের কোলাহল হঠাৎ একদিন থামিয়া গেল। আজ তাহারা নিঃস্ব। ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অদৃষ্টলিপিও ঘুরিয়া চলিয়াছে। চলিবেও।

প্রবল প্রতাপান্বিত চৌধুরী বংশের শেষ অবশিষ্ট—বিমান। অন্নাভাব আর তীব্র আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান সে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছে—তাহা তাহার জীবনযাত্রার মূলধন।

ভাঙ্গাবাড়ীর একপ্রান্তে অপেক্ষাকৃত বাসোপযোগী অংশটিতে বিমানের সংসার। বাকী কতক অযত্নে অব্যবহার্য্য অবস্থায় পড়িয়া আছে, কতক বুনোপায়রা, কাঠবিড়ালি এবং সাপ-খোপের জন্য ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে কিন্তু একেবারে হাতছাড়া করে নাই। নইলে বর্ত্তমানের অভাব তাহার থাকিতনা। এই ভাঙ্গাবাড়ীর অতীত গৌরব এখনও বহুসহস্র টাকা মূল্যে ক্রয় করিবার মহাজনের অভাব নাই, কিন্তু বিমান তাহা চায় না। গৌরব যাইবে—টাকার বিনিময়ে—সে এ কাজ করিতে পারিবে না। মর্য্যাদাবোধ উদ্ধতভাবে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। ইহা লইয়াই বিজয়ার সহিত তাহার যত বিরোধ।

বিজয়া বলে, যদি কোন কিছুই করবে না, তবে সংসার চলবে কি ক'রে?

স্ত্রীর কথায় বিমানের ভ্রূক্ষেপ নাই। দিনের অধিকাংশ সময় সে তাহার পাঠাগারে বই লইয়া কাটাইয়া দেয়। আজও নিঃশব্দে বসিয়াছিল। সম্মুখে একখানি বই খোলা অবস্থায় থাকিলেও মন তার অতীত দিনের এক স্বপ্নরাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল—কত লোক জন, নায়েব-গোমস্তা, আত্মীয়-পরিজনে বাড়ী মুখর, চতুর্দ্দিকে কর্ম্মব্যস্ততা···

বিজয়ার কণ্ঠস্বর আর এক পরদা উচ্চে খেলিয়া গেল। আশ্চর্য্য লোক! কোন কথাই যদি কানে ঢোকে! দিনরাত বই নিয়ে থাকলেই কি চলবে?

বিমানের স্বপ্ন টুটিয়া যায়, সম্মুখে বিজয়া—জীবন্ত বাস্তব। বিমান একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, আমাকে কিছু বলছ নাকি বিজু?

বিজয়া ঈষৎ উত্তপ্ত কণ্ঠে কহিল, নইলে তৃতীয় ব্যক্তি আর কেউ আছে নাকি? পরে অপেক্ষাকৃত মৃদুকণ্ঠে কহিল, বলছিলাম কি, যদি সবটা না পার, কিছু ছেড়ে দিয়ে, চল এখান থেকে অন্য কোথাও চ'লে যাই। এখানে আমি আর টিঁকতে পারছি না।

বিমান অকস্মাৎ চমকিত হইল—মৃদু সংযত কণ্ঠে কহিল, তুমি কি ক্ষেপেছ বিজয়া। পিতৃপুরুষের ভিটা বিক্রি করব! অর্থের বিনিময়ে খোয়াব গৌরব—আর সম্মান! অত উতলা হ'চ্ছ কেন বিজু, চ'লে ত একরকম যাচ্ছেই।

বিজয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, তুমি থাম! যখনকার যা তখনকার তা। যখন ছিল তখন ছিল—এখন নেই, অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলো।

বিমান ম্লান হাসিয়া কহিল, মেয়েরা তা পারে। সকল অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলা তাদের স্বভাব, কিন্তু আমি পুরুষ বিজয়া। বিমান একটু থামিয়া পুনরায় কহিল,

তোমার কথাগুলো শুনলেও আমি কত দুঃখিত হই, তা কি তুমি বোঝ না? আমার পৌরুষে আঘাত লাগে। কেন তুমি ব্যস্ত হ'চ্ছ বিজয়া? কেন তুমি ভাবতে পার না, আবার আমাদের পূর্ব্বগৌরব ফিরে পাব? আবার তেমনই ক'রে নহবৎ বেজে উঠবে! পুণ্যাহের সময় নজরাণা নিয়ে তোমার বাড়ীর প্রাঙ্গণে প্রজাদের ভীড় লেগে যাবে, পরিবর্ত্তে তুমি কল্যাণী মূর্ত্তিতে তাদের মধ্যে আবির্ভূত হবে। যে হাতে গ্রহণ ক'রবে, সেই হাতে করবে বিতরণ। কথাটা ভাবতেও কত আনন্দ বিজয়া—

বিজয়া পুনরায় জ্বলিয়া উঠিল, ভাবতে অনেক কিছুই ভাল লাগে কিন্তু তাতে সংসার চলে না। চ'লে ত যাচ্ছে—এ কথা বলতে তোমার লজ্জা করে না, কিন্তু আমার করে। স্বামী হ'য়ে তুমি ব'সে ব'সে খাবে—আর স্ত্রী যেমন ক'রে হোক খাওয়াবে—এতে তোমার আত্মসম্মানে ঘা লাগে না, পৌরুষে আঘাত লাগে না?

বিমান সোজা হইয়া উঠিয়া বসে, সারা অন্তর তার তিক্ততায় ভরিয়া যায়। কতকটা রূঢ় কণ্ঠে সে বলে, তুমি খাওয়াচ্ছ? কিন্তু কি ক'রে শুনি? একটা তীক্ষ্ণ ভ্রূকুটি করিয়া সে পুনরায় কহিল, তোমাকে আমি সাবধান ক'রে দিচ্ছি বিজয়া, চৌধুরী বাড়ীর মানসম্মানে এতটুকু আঘাত লাগে এমন কাজ করবার তোমার কোন অধিকার নেই।

বিজয়ার আর সহ্য হইতেছিল না, সে-ও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গোক্তি করিল, সে কথা আমি ভুলব না।

বিমান উত্তেজিতভাবে বলিয়া চলিল, হ্যাঁ, কোন দিন সে কথা ভুলো না। যদি অসুবিধে মনে করো, তুমি বাপের বাড়ী চ'লে যেও, আমি বাধা দেব না।

সে কথা আমি জানি, বিজয়া কহিল। তার চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল। কষ্টে তাহা সম্বরণ করিয়া কতকটা শান্ত কণ্ঠে কহিল, বাবা তাঁর মেয়েকে দুমুঠো খেতে দিতে পারবেন; কিন্তু তাতে তোমাকে সকলে বাহাদুরী দেবে না, তোমার বা আমার গৌরবও কিছু বাড়বে না।

বিমান কহিল, সেও বরং আমার সহ্য হবে কিন্তু দোহাই তোমার, আমাকে দিনরাত উত্যক্ত ক'রো না।

বিজয়া আর একদফা কঠিন হইয়া উঠিল, কহিল, এ কথাটা সবিস্তার ক'রে ব'লে দিলেই হয়। তোমাকেও আজ একটা সত্য কথা বলছি, এই উঞ্ছবৃত্তি আমার আর ভাল লাগে না। দিনের পর দিন এ লাঞ্ছনা আমার অসহ্য হ'য়ে উঠেছে।

বিজয়া মুহূর্ত্তের জন্য থামিল, পরে কহিল, আমি না হয় চলে যাব, কিন্তু তারপরে তোমার চলবে কি ক'রে শুনি?

বিমান কহিল, সে ভাবনা আমার—তোমার কাছে বুদ্ধি নিতে কোন দিন যাব না—তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

তা আমি জানি—বিজয়া কহিল, তা হ'লে সুবুদ্ধি পেতে যে—

বিমান পুনরায় উষ্ণ হইয়া উঠিল, তোমার বাবা পেন্সন পান, সে কথা আমার জানা আছে—তোমার দাদা সরকারী চাকুরে, সে কথাও আমি ভুলিনি—

বিজয়ার দু চোখ জ্বলিয়া উঠিল। বিমান যে কি বলিতে চায় এ কথা সে চক্ষের পলকে উপলব্ধি করিল এবং আর একবার তীব্র প্রতিবাদ করিতে উদ্যত হইতেই বিমান ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

বিজয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। গত কয়েক বৎসর যাবৎ তাদের সংসারযাত্রা এই পথ ধরিয়াই চলিয়া আসিতেছে। স্বামীর এই নীরব নিস্পৃহতা সে কোন ক্রমেই সহ্য করিতে পারে না। এ বাড়ীর অতীত ঐশ্বর্য্যের সহিত তাহারও পরিচয় ঘটিয়াছিল, তখন সবেমাত্র ভাঙ্গন ধরিয়াছে—বাহিরে প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু, সে ভাঙ্গন যে কত বড় ভাঙ্গন, তাহা জানা গেল শ্বশুরের আকস্মিক তিরোধানে। জমিদারী নিলামে উঠিল। সেদিনের কথা আজও বিজয়া ভুলিতে পারে নাই—স্পষ্ট চোখের সম্মুখে ভাসিতেছে। বিমান আসিয়া তাহার সম্মুখে অত্যন্ত অপরাধীর মত মুখ করিয়া বলিয়াছিল, আমাদের সব গেল বিজু! এই সব যাওয়া যে কত বড় যাওয়া তাহা তখন না বুঝিলেও এখন সে বড় মর্ম্মান্তিকভাবেই অনুভব করিতেছে। কিন্তু সেদিনে সে স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিল, মিথ্যা চিন্তা ক'রো না—আবার হবে। তা ছাড়া, সংসার আমার, তার ভাবনা ভাবতে হয় আমি ভাবব—তখন সংসারের অভিজ্ঞতা তার ছিল না, কিন্তু আজ সে বুঝিতেছে···দীর্ঘ কয়েক

বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতায় সে বুঝিতে শিখিয়াছে···যাহা গিয়াছে তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না। নূতন করিয়া আরম্ভের দিন তাহাদের আসিয়াছে, কিন্তু বিমান এ কথাটা কিছুতেই বুঝিতে চাহে না। গোপনে সে পিত্রালয় হইতে হাতখরচার নাম করিয়া টাকা আনায়, ততোধিক সঙ্গোপনে একের পর এক গহনাগুলি বন্ধক রাখিতেছে। কিন্তু এইভাবে কত দিন চলিতে পারে! বিমানের কোন দিকে হুঁস নাই, দিনরাত শুধু বই লইয়া আছে—তাঁহার এই নির্লিপ্ততা সহজও নয় স্বাভাবিকও নয়। বিজয়া মাঝে মাঝে ভয় পায়। পদে পদে স্বামীকে আঘাত করে—যদি তার চেতনা হয়। কিন্তু মানুষের ধৈর্য্যেরও একটা সীমা আছে। বিমানের নীরবতা তার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, তদুপরি কটূক্তি।

ন্যাকামী···বড় বড় কথায় আর আকাশ-কুসুম স্বপ্ন-রচনায় যেন তার সংসার চলিতেছে। তা ছাড়া, এ কথাটা সে কিছুতেই বুঝিতে পারে না যে, পরিশ্রম করিয়া সংসার নির্ব্বাহ করায় মর্য্যাদাহানি হয় কেমন করিয়া।

শৈলর স্বামী চাকুরে···সামান্য চাকুরী করে। সপ্তাহ-অন্তে একবার করিয়া বাড়ী আসে, দুইদিন কাটাইয়া পুনরায় কর্ম্মস্থলে চলিয়া যায়। এই দুইটি দিনের ইতিহাস শৈল তাহা কে কত ছন্দে ব্যক্ত করে। শুনিতে তাহার ভাল লাগে। মনে মনে শৈলকে সে হিংসা করে। তাহার স্বামী এমনটি কেন হয় না? আত্মাকে পীড়ন করিয়া মিথ্যা মর্য্যাদাবোধের দোহাই দেওয়ায় আর যাহাই থাকুক পৌরুষ যে নাই, ইহা বিজয়ার দৃঢ় ধারণা; অথচ স্বামীকে কিছুতেই সে আয়ত্তে আনিতে পারিতেছে না।

বিমানের এক কথা, আজীবন যাহারা লোক খাটিয়ে এসেছে সেই বংশের ছেলে হ'য়ে আমি গোলামি করতে পারব না বিজয়া! আমার রক্তের প্রতিটি বিন্দু বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

একই কথার পুনরাবৃত্তিতে বিজয়ার বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছে, কিন্তু বিমান তেমনি অটল তেমনি স্থির। নিঃশব্দে শুনিয়া যায়, কখনও প্রতিবাদ করে, কখনও অন্যত্র প্রস্থান করিয়া দায় এড়ায়—কিংবা অনাবশ্যক খানিক চেঁচামেচি করিয়া ভাতের উপর রাগ করিয়া বসে।

শেষ পর্য্যন্ত বিজয়াকেই পুনরায় সুর নামাইতে হয়; না করিয়া উপায় কি। কিন্তু আজিকার ব্যাপারটার সমাপ্তি একটু নূতন ধরণের হইয়াছে। এমনি কটূক্তি বিজয়াকে বিমান কোন দিন করে নাই; বরং মাঝে মাঝে তাহাকে সস্নেহে কাছে বসাইয়া দর্শনশাস্ত্রের ভাল ভাল কথা শুনাইয়াছে, কখনও আশায় উত্তেজনায় ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়াছে, এমন দিন আমাদের থাকবে না বিজয়া। বিমান এ মাসে কখানা লটারির টিকেট কিনিয়াছে মুখে মুখে তাহার একটা ফিরিস্তি দিয়া যায়। বিজয়া কতক শোনে কতকটা শোনে না। বিমান থামিতে পারে না, কিন্তু উৎসাহে বিজয়ার সম্মুখে একটি কাগজের পুলিন্দা মেলিয়া ধরিয়া বলে, নূতন ধরণের বাড়ীর নকসা···বিমান কেমন একপ্রকার টানিয়া টানিয়া হাসিতে থাকে।

বিজয়ার মায়া হইত—উদ্যত তীক্ষ্ণ ভাষা সংযত করিয়া মৃদু গতিতে প্রস্থান করিত; কিন্তু ইদানিং তার মেজাজটাও কিছু নড়িয়া গিয়াছে।

আকাশে মেঘ সাজিয়া আসিয়াছে। হয় ত খানিক বৃষ্টি আসিবে। লাইব্রেরি-ঘরের দরজা জানালাগুলি বন্ধ করিয়া আছে। জল আসিলে সব ভিজিয়া একশেষ হইবে। বিজয়ার নিজের অজ্ঞাতে একটি নিঃশ্বাস পড়িল, ধীরে ধীরে সেই লাইব্রেরি-ঘরের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। দরজা-জানালাগুলি বন্ধ করিয়া দিয়া পুনরায় সে ফিরিয়া আসিল—এমনি করিয়া আর সে পারে না। বিজয়া অস্থির পায়ে খানিক এ-ঘর ও-ঘর করিল। ভবিষ্যতের নিরুপায় তার একখানি ক্ষীণ বিবর্ণ ছবি তাহার চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত চোখের সম্মুখে বিমানের ক্লিষ্ট মুখ সে দেখিতে পারিবে না, তার চেয়ে এখান হইতে সে চলিয়া যাইবে, যদি ইহাতে তাহার চৈতন্য হয়, যদি নিজের সম্বন্ধে একটু সজাগ হইয়া ওঠে, কিন্তু এ যুক্তিও মন মানিয়া লইতে চাহে না। এ আত্মভোলা লোক, উহাকে একলা কোথাও ফেলিয়া যাইবার কথা ভাবিতেও একটা করুণ অনুকম্পায় বিজয়ার সারা অন্তর পূর্ণ হইয়া ওঠে। ভবিষ্যতের চিন্তা তার ভাসিয়া যায় কিন্তু এ অনুভূতিও মুহূর্ত্তের জন্য, ভাঁড়ার-ঘরের নিঃস্ব লক্ষ্মীছাড়া মূর্ত্তি পুনরায় তাহাকে চঞ্চল করিয়া তোলে। আগামী কালের চিন্তায় তার সহজ কোমল বৃত্তিগুলি পর্য্যন্ত বিকাশ হইতে পারে না।

শেষ সম্বল হাতের কগাছা চুড়ি আর গলার একগাছা

হার। এদিকে যে একের পর এক তার অঙ্গ হইতে গহনাগুলি অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে সেদিকে বিমানের হুঁস্ নাই; শুধু মর্য্যাদাহানির আশঙ্কায় উদ্ব্যস্ত—কোন্ ছিদ্রপথ ধরিয়া তার পূর্ব্বপুরুষের অতীত গৌরব বিনষ্ট হইবে সেই দিকেই তার তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি অথচ স্ত্রী যে কেমন করিয়া বছরের পর বছর এই সংসারের ব্যয়ভার বহন করিয়া আসিতেছে—এ কথাটা একবারও ভাবিয়া দেখে না। এমন মানুষ লইয়া সংসার চলে কেমন করিয়া।

আজ সন্ধ্যার অন্ধকার কিছু পূর্ব্বেই নামিয়া আসিয়াছে। বাতাস নাই, গুমট মেঘ। বিজয়া পথের পানে চাহিয়া আছে। বিমান সকাল বেলা বাহির হইয়া গিয়াছে, এখনও ফেরে নাই। আহার্য্য পড়িয়া রহিয়াছে। বিজয়াও অভুক্ত।

নিজের ঘরে আসিয়া বিজয়া বাক্স-পেটরা টানিয়া নামাইল। দিনকয়েকের জন্য বাপের বাড়ীই সে যাইবে। বাহিরে বিদ্যুৎ চমকিল। হাতের চুড়িগুলি জ্বলিয়া উঠিল। বিজয়া মনে মনে হাসিল—এই সোনার চুড়িগুলিও তার পরম শত্রু। এগুলি যত দিন আছে তত দিন এ বাড়ীর মায়া সে কাটাইয়া উঠিতে পারিবে না। এখনও তাহারা একেবারে রিক্ত নয়, আরও কিছুদিন এই সংসারের ব্যয়ভার বহনে তাহারা সক্ষম। তারপর যে দিন তাহাদের চরম দুর্দ্দশার দিন আসিয়া দেখা দিবে—সেই দিন না হয় ভাবিয়া চিন্তিয়া নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিবে। এগুলি সঙ্গে লইয়া গিয়া কোথাও সে স্থির থাকিতে পারিবে না, বরং জানিয়া শুনিয়া নিজেই নিজের অশান্তির কারণ হইবে।

বিজয়া পুনরায় জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল—শৈলর স্বামী এই পথ ধরিয়া চলিয়াছে। আজ শনিবার। ওদের সবই নিয়মে বাঁধা। এখুনি হয় ত শৈল ছুটিয়া আসিয়া খবরটা জানাইয়া যাইবে। শৈলর আনন্দ-উজ্জ্বল মুখখানা তার চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল।

অভাব কার না আছে। ইহার জন্য বিজয়ার আফশোষ নাই। ঘটনাচক্রে পড়িয়া তাদের রথের চাকা না হয় অচল হইয়া পড়িয়াছে, তাই বলিয়া নির্ব্বিঘ্ন নিশ্চেষ্টতায় তার উদ্ধার সাধনার কল্পনা সে করিতে পারে না। চেষ্টা থাকিলে সান্ত্বনা পাওয়া যায়, কিন্তু বিমানের নীরব ঔদাসীন্য দিনের পর দিন তাহাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিতেছে। যদিও কর্ত্তব্যপালনে স্বামীর প্রতি তাহার অবহেলা নাই—

শৈল আসিয়া সত্য সত্যই উপস্থিত হইল। হাতে তার ফিকা রংয়ের একখানি শাড়ী, মুখে সলজ্জ হাসি। শৈল কহিল, নিয়ে এলেন ভাই, নতুন ডিজাইন বেরিয়েছে—কোলকাতায় নাকি একেবারে ছেয়ে গেছে।

বিজয়া একবার শৈলর হাতের শাড়ীখানার প্রতি চাহিয়া দেখিয়া বাহিরে দৃষ্টি রাখিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। শৈল বলিয়া চলিল, কি মানুষ ভাই···বলেন এখুনি চট্‌পট্ কাপড়খানা প'রে এসে আমার সাম্‌নে দাঁড়াও! কথা কি আর কানে যায়, না একটু সবুর সয়, একেবারে নাছোড়বান্দা।

শৈল একদফা খুশীর আবেগে হাসিয়া উঠিল। বিজয়ার একটি নিঃশ্বাস পড়িল।

শৈল বলিয়া চলিল, না প'রে উপায় আছে কি, কিন্তু তাতেও কি রেহাই পাবার জো আছে—বলে, খাসা মানিয়েছে। কাছে এসো। তারপর, বুঝতেই ত পারছ ভাই—মাগো মা, কি কাঙালপনা! শৈল টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

পুরুষের এই কাঙালপনার মধ্যেই যে নারীর কত বড় আত্মতৃপ্তি, শৈল তাহা অনুভব করিতে না পারিলেও বিজয়া তাহা বুঝিল। সম্ভবত সেইজন্যই বিজয়ার বুকের ভিতরটা অস্বাভাবিক দ্রুত তালে চলিতে লাগিল। এই দুই স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য-জীবনের ইতিহাস তাহাকে নীরবে শুনিয়া যাইতে হয়—ইহাতে কত বড় আঘাত যে বিজয়া পায় তাহা শৈলর বুঝিবার উপায় নাই। নিজেতেই সে মগ্ন, অপরের কথা ভাবিবার সময় এটা তার নয়, কিন্তু আজ সহসা শৈলকেও থামিতে হইল। বিজয়ার এ মূর্ত্তি তার কোন দিনও চোখে পড়ে নাই। সে একটু বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, তোমার হ'ল কি বিজুদি?

অকস্মাৎ বিজয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কোথা দিয়া যে কি হইল, শৈল ঠিক তাহা বুঝিয়া উঠিতে না পারিলেও কতকটা বিস্মিত এবং ব্যথিত কণ্ঠে কহিল, আমি কি তোমায় কিছু অন্যায় বলেছি বিজুদি?

বিজয়া নিজেকে কতকটা সামলাইয়া লইল, হাসিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া কহিল, দেখি তোমার শাড়ীখানা শৈল, চমৎকার পাড়টি কিন্তু। কত দাম নিলে ভাই? কাপড়খানা তোমায় বেশ মানাবে—

শৈল বিজয়ার এই হঠাৎ পরিবর্ত্তনে অনেকখানি বিস্মিত হইলেও সে ভাব গোপন রাখিয়া কহিল, ঠিক বলতে পারিনে ত। জিজ্ঞেস ক'রে কাল তোমায় জানাব।

বিজয়া কহিল, তাই জানিও।

ইহার পরে আর পূর্ব্বালোচনা চলিতে পারে না। শৈলকে বাধ্য হইয়া নীরব থাকিতে হইল, কিন্তু বিজয়ার চুপ করিয়া থাকা সম্ভব হইল না। শৈলকে ভর করিয়াই আজও তাহারা দাঁড়াইয়া আছে। চৌধুরীবাড়ীর তথাকথিত মর্য্যাদা শুধু ওরই সাহায্যে অক্ষুণ্ণ আছে···তাহাদের দুরবস্থার কাহিনী আজও দশজনার মুখে মুখে আলোচিত হইতেছে না শুধু শৈলরই আন্তরিকতায়। এ কথা বিজয়ার স্মরণ আছে। আজিকার রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে যে পুনরায় তাহাকে ওরই কাছে গিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইতে হইবে—

একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া বিজয়া কহিল, দিনকয়েক বাবার কাছ থেকে ঘুরে আসব ভাবছি; শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না, মনটাও ভারী খারাপ। বিজয়া থামিল। কথাটা যে সময়োপযোগী হয় নাই তাহাও সে বুঝিল। শৈল বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, কিন্তু কথা কহিল না।

বিজয়া পুনশ্চ কহিল, সত্যি আর পারিনে শৈল—এর চেয়ে একটা পুতুল নিয়ে দিন কাটান ভাল। দিব্যি নির্ব্বিঘ্নে লাইব্রেরি নিয়ে তার দিন কাটছে। কথা বলতে গেলে তর্ক তুলে নিজের মতবাদকে প্রাধান্য দেয়, কিন্তু ঐ বাজে মতবাদ ভাঙ্গিয়ে কি আর মানুষের দিন চলে? অথচ কথাটা আমি বলব কাকে। বিজয়া থামিল। শৈল নিরুত্তর।

বিজয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, সবই গেছে—থাকবার মধ্যে এই বসতবাড়ীখানি—একথা না জানে কে? তবু যে কেন এই মৃত আভিজাত্য আর বনেদি বংশের মর্য্যাদার ধুয়া ধ'রে আত্ম-নিপীড়ন তা আমার মাথায় আসে না। জেনে শুনে নিজেকে এমনি ক'রে প্রবঞ্চনা করার যে কি সার্থকতা তা আমি বুঝিনে।

বিজয়া একটু থামিল পুনশ্চ বলিয়া চলিল, কোথা দিয়ে যে কি হ'চ্ছে তা সবই তুমি জান। তুমিই বল ত শৈল, এই যে দিনের পর দিন নিজেকেও নিঃস্ব করছি, এতে কি একটুও ব্যথা আমি পাই না—পাই···কিন্তু নিত্য নতুন নতুন আশার কল্পনায় নিজেকে ছলনা করি—তা হ'লেও এ ভাবেই বা আর কত দিন চলতে পারে?

এতক্ষণে শৈল কথা কহিল, সেইজন্যেই বুঝি বাপের বাড়ী যাবার কথা বলছ?

ঠিক সেইজন্যই—বিজয়া কহিল, হয় ত এতে ওর চোখ ফুটতে পারে।

শৈল একথার কোন উত্তর দিল না, কিন্তু অধিকমাত্রায় ব্যস্তভাবে উঠিয়া পড়িয়া বলিল, কথায় কথায় বড্ড দেরী হ'য়ে গেল, উনি হয় ত পথ চেয়ে ব'সে আছেন।

শৈল আর দাঁড়াইল না—

বিজয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। মাথার মধ্যে তখনও শৈলর শেষ কথাটি ঘুরিয়া ফিরিতেছিল। শৈলর স্বামী তার পথ চাহিয়া বসিয়া থাকে—সপ্তাহে একটিনের ছুটির দিনে তার পাশে আসিয়া সহাস্যে দাঁড়ায়, হাসি মুখে কথা বলে, সাধ্যমত উপহার দেয়। শৈলর দেহে গহনার বাহুল্য নাই। সাধারণ চারগাছা চুড়ির পাশে এঁয়োতির প্রধান নিদর্শন একগাছি লোহা—কপালে সিঁদুরের টিপ, নাকের ডগায় তারই মৃদু আভা, মুখে সদা হাসি। স্বামী প্রেমে গরবিনী শৈল। নিঃশব্দ অনাড়ম্বর জীবন যাত্রা—ভাবিতে ভাল লাগে। একটা ব্যথামিশ্রিত আবেগে সে বিহ্বল হইয়া পড়ে।

ঐশ্বর্য্যের জন্য সে লালায়িত নহে, কিন্তু স্বামীর নিরাসক্তি তাহাকে মর্ম্মান্তিক পীড়া দেয়। আঃ, বিজয়া পাগল হইয়া যাইবে নাকি! সে আপন মনে খানিক হাসিল। কিন্তু শৈলকে কিছুতেই সে মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারিতেছে না। তার চলার পথে শৈলর প্রভাব তাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তোলে, নিজের সম্বন্ধে বিজয়া সজ্ঞান হইয়া ওঠে। সংসারের কাছে তার অনেক পাওনা, একথাটা আরও বিশেষভাবে সে অনুভব করে। আজ বহুদিন পরে বিজয়া পুনরায় আসিয়া আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইল। কিসের জোরে শৈল তার স্বামীকে এমন করিয়া মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে! সেও ত কুৎসিতা নয়!

বাহিরে অকস্মাৎ যেন উন্মত্ত প্রকৃতির তাণ্ডব নর্ত্তন সুরু হইল। বাহিরের সঙ্গে তার অন্তরের বড় নিবিড় সম্বন্ধ, বিজয়া তাহা অনুভব করে; কিন্তু প্রতিকারের উপায় কোথায়। শৈলর কাছে যাহা সহজ স্বাভাবিক, বর্ত্তমানে

বিজয়ার নিকট তাহা অচিন্তনীয়, নিছক একটা স্বপ্ন। কিন্তু তবুও সে আশা রাখে—কল্পনায় স্বর্গ রচনার স্বপ্ন দেখে। কিছু না হউক, এই স্বপ্ন-দেখাটাও তার জীবনে একটা সত্য। বিজয়ার মনের মধ্যে বিশৃঙ্খল চিন্তাধারা, কিন্তু তারই ফাঁকে আগামী কালের দুশ্চিন্তা তাহাকে সচকিত করিয়া তোলে। শৈল অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে—তার প্রয়োজন হয় ত আজিকার মত ফুরাইয়াছে—কিন্তু বিজয়ার প্রয়োজন আজই—এই রাত্রে। শৈলর সাহায্য গ্রহণ রাতের অন্ধকারে সঙ্গোপনে তাহাকে করিতে হইবে—এমন কি বিমানেরও যাহাতে চোখে না পড়ে। হায় রে, মিথ্যাকে ধরিয়া রাখিবার কি নিখুঁত আয়োজন! বিমান কি বোঝে না, সে কি অনুমান করিতেও পারে না যে, এতগুলি বছর তাদের কেমন করিয়া কাটিয়া গেছে?

নীরব চিন্তায় বিজয়ার অনেকক্ষণ কাটিয়াছে। বাহিরের মাতামাতিও অনেকক্ষণ থামিয়া গিয়াছে। বিমান এখনও ফিরে নাই। বিজয়া বাহির হইয়া আসিল, দরজা ভেজাইয়া দিয়া শৈলর উদ্দেশে চলিল। দু-গাছি চুড়ি রাখিয়া আসিবে—ভাণ্ডার তাহার একেবারে শূন্য। বিজয়া বৃক্ষ-শ্রেণীর অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল। এখানকার রাস্তাঘাট তার মুখস্ত—কোথাও গতিরোধ হয় না—তা ছাড়া, এই পথে চলাফেরা তার নিয়মিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শৈলর ঘরের দরজায় আসিয়া বিজয়াকে থামিতে হইল। স্বামী-স্ত্রীর মান-অভিমানের পালা তখন রীতিমত জাগিয়া উঠিয়াছে। বিজয়া আড়ষ্ট হইয়া পড়িলেও এক পা নড়িল না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার এই অতি পুরাতন অথচ লোভনীয় ঘটনাগুলি তার জীবনেও এক সময় আসিয়াছিল—যদিও আজ তাহা একটা মৃত স্মৃতি; কিন্তু তাই বলিয়া জীবনের এই অভিনব মদির মুহূর্ত্তগুলিকে সে উপেক্ষা করিতে পারে না, বরং তার সমস্ত চেতনাকে সজাগ করিয়া সঙ্গোপনে আগ্রহের সহিত উহাদের লক্ষ্য করিতেছিল। শৈলকে সে ডাকিল না। তার অভাবগ্রস্ত সংসারের করুণ তিক্ত আবেদন লইয়া আজ আর বিজয়া তাহাকে বিরক্ত করিবে না। অবাধ্য চোখের জল সুযোগ পাইয়া বিজয়ার দুই গণ্ড প্লাবিত করিয়া দিয়া গেল। বিজয়ার কোন দিকে হুঁস ছিল না।—সহসা শৈলর আহ্বানে চমকাইয়া উঠিয়া সম্মুখের দিকে পা বাড়াইতেই শৈল তাহার একখানি হাত ধরিয়া কহিল, কেন এসেছিলে সে কথা ত বললে না বিজুদি?

বিজয়াকে থামিতে হইল, সে কথা কি রোজই আমায় নতুন ক'রে ব'লতে হবে শৈল? এই দু-গাছা রইল, যা হয় ক'রো।

শৈল কহিল, উনি বলছিলেন, দিনের পর দিন যখন শুধু বন্ধকই পড়ছে—শৈল একটু ইতস্তত করিয়া কহিল—ছাড়িয়ে আনার কোন ব্যবস্থাই যখন হচ্ছে না, তখন মিছে সুদের টাকা না গুণে ওগুলো বিক্রি ক'রে ফেললে হয় না?

বিজয়া একটা উদ্গত দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া গিয়া কহিল, একেবারে বেচে দিতে বলছেন উনি?

খানিক নীরবে কি চিন্তা করিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিয়া মৃদুকণ্ঠে বিজয়া কহিল—জিনিষগুলি একেবারে চ'লে যাবে কথাটা ভাবতেও ভারী দুঃখ হয় শৈল, নইলে আমি কি বুঝিনে, দিন দিন কোথায় এসে আমরা দাঁড়াচ্ছি!

শৈল নিরুত্তর। বিজয়ার কোথায় যে ব্যথা, তাহা সে এক নিমেষেই অনুভব করিল।

বিজয়া বলিয়া চলিল, সেই ভাল, যা দু দিন পরে যাবেই, তা না হয় দু দিন আগেই যাক্। দুলালবাবুকে ব'লো, এবারে শহরে গিয়েই যেন ওগুলোর একটা ব্যবস্থা ক'রে ফেলেন!

শৈল কহিল, করবেন বই কি, কিন্তু···একটু থামিয়া শৈল পুনরায় কহিল, শহর থেকে চমৎকার সুগন্ধি চাল এসেছে বিজুদি, একটু দাঁড়াও, অমন চাল একলা খাব, কিছু নিয়ে যাও—

এই উপায়েই শৈল বিজয়াকে সাহায্য করে, বিজয়া সবই বোঝে, শৈলও সে খবর রাখে, তথাপি এ অভিনয় তাহারা প্রায়ই করিয়া থাকে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই শৈল ফিরিয়া আসিল, কহিল, একটা কফিও নিয়ে এলাম···অসময়ের জিনিষ কি না—

বিজয়াকে নিঃশব্দে গ্রহণ করিতে হয়। শৈলর আন্তরিকতাকে সে অপমান করিতে পারে না। তা ছাড়া, প্রয়োজন আজ সকলের চেয়ে বড় হইয়া দেখা দিয়াছে।

শৈল পুনরায় কহিল, কাল সকালে আমি তোমার কাছে যাব।

পরদিন প্রাতঃকালে যাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়া শৈল একটা পরিচিত ইঙ্গিত করিল। বিজয়া ফিরিয়া চলিল। শৈল নিঃশব্দে তাহার চলার পথে চাহিয়া রহিল। চৌধুরীবাড়ীর গৃহলক্ষ্মী চলিয়াছে, আর অদূরেই তাহাদের অতীত গৌরবের মৃত কাঠামটা শুধু মাটি হইয়া যাইবার অপেক্ষায় দিন গুণিতেছে। জীবনের গতি এমনি আরও রচনা করিয়াই চলে।

বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই বিজয়া চমকাইয়া উঠিল। বিমান ঠিক দোর গোড়ায় দাঁড়াইয়া। দুই চোখ তার লাল। বিজয়া ত্রস্তে তাহার সন্নিকটে সরিয়া আসিল এবং পর মুহূর্ত্তেই মুখে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া হাত কয়েক পিছাইয়া গেল।

বিমানের মুখে বক্র হাসি।

বিজয়া জ্বলিয়া উঠিয়া তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গোক্তি করিল, রক্তের ধারা! এর চেয়ে কত বেশী আর তোমার কাছ থেকে আশা করা যেতে পারে? এক মুহূর্ত্ত থামিয়া অত্যধিক কঠিন কণ্ঠে পুনরায় কহিল—স্ত্রীর গহনা বেচা টাকায় যার দিন কাটাতে হয়, তার লজ্জা করে না ঐ ছাইপাঁশ খেয়ে মাতামাতি করতে? 'বাড়ীর নক্সাখানা যত্ন ক'রে রেখে দেওয়া হয়েছে ত'! নির্লজ্জ—

বিমান একটা কুৎসিত ইঙ্গিত করিয়া অর্দ্ধ-জড়িত কণ্ঠে কহিল, তোমার চেয়ে নয় বিজয়া। কৈফিয়ৎ তলব করা—কিন্তু কোথায় গিয়েছিলে তুমি এত রাত্রে?

বিজয়ারও সহ্য হইতেছিল না, উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, জমিদারবাবুর আগামী কালের রাজভোগের ব্যবস্থা করবার জন্যে।

কথাটা তাহাকে সমাপ্ত করিতে হইল না।

এর পরে ঘটনাটা একটা নাটকীয় পরিণতিতে শেষ হইল। শৈলর দেওয়া সুগন্ধি চাল ইতস্তত ছড়াইয়া পড়িয়া আছে কিন্তু যে লোকটি সযত্নে ঐগুলি বহন করিয়া আনিয়াছে শুধু তাহারই সাক্ষাৎ মিলিল না।

বিজয়া তখন অন্ধকারে নিঃশব্দে পথ চলিতেছে—যথেষ্ট বিড়ম্বনা সে ভোগ করিয়াছে, আর না—

পরদিন প্রাতঃকালে ঘুম ভাঙ্গিতেই গত রাত্রের সমস্ত ঘটনাটা বিমানের চোখের সম্মুখে ছায়াছবির মত মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। গত রাত্রের দুর্ব্যবহারের কথা স্মরণ করিয়া সে ব্যথিত এবং শঙ্কিত হইয়া উঠিল। ইদানিং কয়েক মাস যাবত বিজয়ার সহিত তাহার বাদানুবাদ লাগিয়াই ছিল, কিন্তু গতকল্য তাহার চূড়ান্ত করিয়াছে। বিমানের মধ্যে যে কেমন করিয়া এই পশু-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল এ কথাটা ভাবিতে গিয়াও আজ সে মরমে মরিয়া গেল।

ঝগড়াঝাটি, কথা কাটাকাটি এমন ত কত দিন গিয়াছে, কিন্তু গতকল্য কি জানি কেন তার বিদ্রোহী মন তাহাকে ভিন্ন পথে চালিত করিল। আজ কেমন করিয়া সে বিজয়ার মুখের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিবে! বিমান বাহির হইয়া পড়িল, কিন্তু আজ আর বাহিরেও তাহার মন টিঁকিতেছিল না। অনুশোচনায় তাহার অন্তর ভরিয়া গিয়াছে। বিমান ফিরিয়া আসিল, কিন্তু সারা বাড়ী অনুসন্ধান করিয়াও তাহার দেখা মিলিল না। শৈলর ওখানে গিয়াছে ভাবিয়া আপাতত একটা সঙ্কট হইতে মুক্ত হইয়াছে মনে করিয়া সে কতকটা যেন নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু তাহার এ অনুমান যে ভুল, তাহাও ঘণ্টাখানেকের মধ্যে প্রমাণিত হইয়া গেল। বিমান চিন্তিত হইল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া একটি কথাও কাহাকে বলিতে পারিল না। তার মন নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করিল যে বিজয়া তাহার পিত্রালয়ে গিয়াছে। তথাপি বিমান স্বস্তি পাইতেছিল না।

বিমান তাহার পাঠাগারে প্রবেশ করিল। তাহার অতি প্রিয় বইগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিল কিন্তু সেদিকেও মন দিতে পারিল না।

দিনের পর দিন যায়। বিমানের আশা ছিল যে বিজয়া অভিমানবশে চলিয়া গেলেও দুই-চারি দিনেই পুনরায় ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু বিজয়া আসিল না। বিমান তাহার একাগ্রতা হারাইয়া ফেলিতেছে। শুধু বাজে চিন্তায় তাহার সময় কাটে। তাহার জীবনে বিজয়ার প্রয়োজন যে কত বেশী, তাহা আজ বিমান বড় তীব্রভাবেই অনুভব করিতেছে।

কথাটা কেমন করিয়া গ্রামময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কুয়াশাচ্ছন্ন সন্দেহ উগ্ররূপে প্রকাশ পাইয়াছে। আভিজাত্যের অভিমান এবং মর্য্যাদাবোধের স্বরূপ একেবারে উলঙ্গভাবে তার চোখের সম্মুখে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বিমান শিহরিয়া উঠিল এবং কেমন করিয়া যে বছরের পর বছর এই জীর্ণ ব্যাধিগ্রস্ত সংসারকে বিজয়া

আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল এ কথাটা বড় নির্ম্মমভাবেই সে উপলব্ধি করিতেছে। একটা স্বপ্নের ছায়ারূপকে কেন্দ্র করিয়া এতগুলি দিন যে সে অবহেলায় অপচয় করিয়াছে তাহার ক্ষতিপূরণের পথ কোথায়? চতুর্দ্দিকে অন্ধকার—নিরন্ধ্র অন্ধকারে বিমান শুধু অন্ধের মত হাতড়াইয়া ফিরিতেছে। পথ কোথায়?

শৈলর স্বামী সেদিন উপযাচক হইয়া শ'দুই টাকা দিয়া গেল। বিজয়ার গহনাবিক্রয়লব্ধ অর্থ। বিমানের চোখ সজল হইয়া উঠিল। ব্যাপারটা এমন নগ্নরূপে কোন দিনই তাহার চোখে পড়ে নাই। বিমান একবার তাহার পেশীবহুল বাহু দুখানার পানে চাহিয়া দেখিল। এই বাহুতে তাহার যথেষ্ট শক্তি আছে কিন্তু সে শক্তি সে কোন্ কাজে ব্যয় করিয়াছে?

বিমান অকস্মাৎ সজলকণ্ঠে কহিল, ও টাকা আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান দুলালবাবু, আমার ঋণভার আর বাড়াবেন না—

দুলাল মৃদু হাসিল, কহিল, কিন্তু আপনার স্ত্রী শৈলকে এ টাকা আপনার কাছে পৌঁছে দেবার নির্দ্দেশ দিয়েছেন—

দুলাল প্রস্থান করিল।

বিমানকে টাকা গ্রহণ করিতে হইল—ইহা বিজয়ার নির্দ্দেশ।

* * * *

চৌধুরীবাড়ীর যে অংশটিতে বিমান তার সংসার রচনা করিয়াছিল তাহাও আজ আর অবশিষ্ট নাই, শুধু একটা মৃত কঙ্কাল পড়িয়া আছে। দুলালের দেওয়া দুই শত টাকা মূলধন লইয়া বিমান নূতন করিয়া সংসার রচনার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছে। বিজয়াকে তার চাই। তাহাকে কেন্দ্র করিয়া যে নূতন আলোর সন্ধান সে পাইয়াছে, সেই আলোর পথ ধরিয়াই বিমান অগ্রসর হইবে। এই নূতন আলোর জগতেই হইবে তাহার সংসারের পুনঃ প্রতিষ্ঠা। দূর হউক অতীত স্মৃতি! কিন্তু মন কাঁদিয়া উঠিতে চাহে। মোহের মায়া বড় কম নয়।

বিমান চলিয়া গিয়াছে, এখানে আর ফেরে নাই। চৌধুরীবাড়ীর পূর্ব্ব-ইতিহাস এখনও ধ্বংস-স্তূপের আড়াল হইতে উঁকি মারে। আজিও এই পথে পথিকের আনা-গোনা চলে। চোখে মুখে তাদের সাবেক দিনের মতই বিস্ময় ফুটিয়া ওঠে, কিন্তু তাহাতে ঈর্ষার লেশমাত্র নাই। বরং একটা করুণ সহানুভূতির ভাব দেখা যায়—কি ছিল, কি হইয়াছে। এর বেশী ওরা জানে না, ভাবিতেও পারে না; কিন্তু এখনও ঐ ধ্বংস-স্তূপের দিকে দৃষ্টি পড়িলে শৈল থমকিয়া দাঁড়ায়—একের পর এক বহু সুখদুঃখবিজড়িত ঘটনা তার মনের দ্বারে আঘাত হানে—পুরাতন সঙ্গিনীকে মনে করাইয়া দেয়—একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় চলিতে থাকে।

দিন চলিয়া যায়।

ওতনু-মঞ্জরী

শ্রীঅশ্বিনীকুমার পাল এম-এ

যদিও রয়েছ প্রিয়া আড়ালে গোপন,
তব প্রেম কান্তি ভরে
ঝরে মোর চিত্ত 'পরে;
অপূর্ব্ব লাবণ্য স্রোতে প্লাবিয়া জীবন।

তোমারে স্মরিয়া গাঁথি কত রূপকথা,
রাজার কুমারী তুমি;
ও অঙ্গ-মাধুরী চুমি'
ফুটে ওঠে মধু গন্ধে মোর তনুলতা।

বকুলমঞ্জরী হয়ে হৃদয়কানন
দুলে' ওঠে অবিরল
বিমোহিয়া তনুতল;
কি যেন অমিয় ধারে ভরে প্রাণ মন।

এমনি করিয়া নিত্য সুরভি নির্ঝর,
ঢেলে দাও তুমি প্রিয়া
পূর্ণ করি মোর হিয়া,
ও অঙ্গ-কুসুম গন্ধে নিতি নিরন্তর

বাংলার লোক-সঙ্গীত

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশ বি-এ

বাংলার লোক-সাহিত্যের মূল্য অপরিসীম। বাংলার লোক-সঙ্গীত, লোক-নৃত্য, লোক-ক্রীড়া, লোক-শিল্পকলার ভিতর জাতির অতীত গৌরবকাহিনী, অতীত শিক্ষা ও অতীত সভ্যতার ধারাগুলি বর্ত্তমান রহিয়াছে। জাতীয় গৌরব লোক-সঙ্গীতগুলির রীতিমত সংগ্রহ ও অনুসন্ধান একান্ত আবশ্যক। ইহা দ্বারা বাংলার জাতীয় সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্য সংরক্ষিত হইবে।

আজ পৃথিবীর প্রত্যেক দেশই লোক-সাহিত্যের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা দেখাইতেছে। ইংলণ্ড, আয়ারলণ্ড, জার্মানী, তুরস্ক, রুশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে স্বদেশের লোক-সঙ্গীতগুলির সংগ্রহ উদ্দেশ্যে শত শত সংঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সহস্র সহস্র শিক্ষিত ব্যক্তি গণ-সাহিত্যের সংগ্রহ ও অনুসন্ধানে ব্রতী হইয়াছেন। আমেরিকা ও ইউরোপের সাময়িকপত্রগুলিতে লোক-সাহিত্য সম্বন্ধে নানাবিধ গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে। ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রথম লোক-সঙ্গীত সংগ্রহে ব্রতী হন—খ্যাতনামা সাহিত্যিক পেপিস্। বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক এডিসন "স্পেক্‌টেটার" সাময়িকপত্রে ইংলণ্ডের কতকগুলি লোক-সঙ্গীত সম্বন্ধে গভীর চিন্তাপূর্ণ রচনা প্রকাশ করেন। এই সমস্ত প্রবন্ধে এডিসন গ্রাম্য-গীতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। লোক-সঙ্গীত-গুলির মূল্য সম্বন্ধে ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত লেখক সিসিল শার্প বলিয়াছেন—"সর্ব্বশেষে আছে আমাদের জাতির লোক-সঙ্গীত—যে সহজ, সরল গান ও সুরের উচ্ছ্বাস বনফুলের মতই অতি-স্বাভাবিক ও সহজভাবে আমাদের জাতির মানুষের প্রাণের উৎস থেকে উৎসারিত হয়ে উঠেছে এবং যার ভিতরে আমাদের জাতির ভাষার মতই আমাদের গভীর চরিত্র ও ভাবধারার গভীর সন্নিবেশ রয়েছে। যদি প্রত্যেক ইংরেজ শিশু এই সব জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত হবার সুযোগ পায়, তবে সে এখনকার চেয়ে আরও বেশী করে তার স্বজাতিকে চিনতে ও বুঝতে পারবে; এবং সেই চেনার ও বোঝার ফলে তাদের বেশী করে ভালবাসতে শিখবে এবং তাদের সঙ্গে তার আত্মার ও প্রকৃতির যে গভীর সংযোগ তা উপলব্ধি করে এখনকার চেয়ে আরও বেশী পরিমাণে আদর্শ পৌরজন ও স্বদেশপ্রেমিক হয়ে উঠবে। সুতরাং ইংরেজী লোক-সঙ্গীতের পুনঃ প্রচলনের ফলে যাঁরা স্বদেশপ্রেমিক ও যাঁরা দেশের শিক্ষার নেতা, তাঁদের হাতে একটি মহামূল্যবান্ শক্তি এসে পড়েছে। জাতির বিদ্যালয়গুলির শিক্ষাপ্রণালীর সঙ্গে স্বজাতীয় সঙ্গীতের ঘনিষ্ঠ সংযোগ কেবল যে দেশের সঙ্গীত ভাণ্ডার প্রকর্ষ সাধন করবে তাই নয়, তাতে করে স্ব-ভূমির প্রতি এমন একটা গভীর প্রেমের এবং স্বজাতির প্রতি এমন একটি গৌরববোধের সৃষ্টি হবে যার অভাব আমরা আজকাল বিশেষ করে আক্ষেপ করি।"

বাংলা দেশের পল্লীতে পল্লীতে আধুনিক শিক্ষিত-সমাজের অনাদর ও অবহেলা সহ্য করিয়া আজও বহু লোক-সঙ্গীত বর্ত্তমান। এ যাবৎকাল যে সমস্ত লোক-সঙ্গীত সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে, সেইগুলি বাংলা দেশের লোক-সঙ্গীতসমূহের একটা অংশ মাত্র। শিক্ষিত সম্প্রদায় এখনও যদি এই সব মূল্যবান অতীত সংস্কৃতিধারাকে অবহেলা করেন, তাহা হইলে সত্বরেই এই সব প্রাচীন সম্পদ বিলয়প্রাপ্ত হইবে। সাময়িক পত্রিকাগুলিতে এই লোক-সাহিত্য সম্বন্ধে রীতিমত আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অতি-আধুনিককালে এই সব লোক-সঙ্গীত সংগ্রহের দিকে একটা প্রচেষ্টা দেখা গিয়াছে। এই লোক-সাহিত্যের সংগ্রহকার্য্য অতি দায়িত্বপূর্ণ। এই লোক-সঙ্গীতগুলির ভিতরই প্রাচীন ভাষার ধারা, প্রাচীন ভাব-প্রকাশভঙ্গীর ধারা, প্রাচীন রচনাকৌশলপ্রণালী অন্তর্নিহিত আছে। সুতরাং বাংলা ভাষার ইতিহাস লোক-সাহিত্যের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। লোক-সঙ্গীত-সংগ্রহের ভিতর যদি কোনও ভুল বা গলদ রহিয়া যায়, তাহা হইলে ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসেও ভুল থাকিয়া যাইবে। সুতরাং লোক-সাহিত্যের সংগ্রহ অতি নির্ভুল ও খাঁটি হওয়া দরকার। লোক-সাহিত্য সংগ্রহের দায়িত্বভার প্রাচীন সংস্কৃতিধারার উপর বিশ্বাসী ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের উপর ন্যস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

* লেখক "বাংলা" শব্দ 'বৃহত্তর বঙ্গ" অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন।

বাংলাদেশে যে সব লোক-সঙ্গীত প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে ধামালী, সারি, পটুয়া-সঙ্গীত, বারমাসী, ভাটিয়ালী, কীর্ত্তন, বাউল, জারি, ধুয়া প্রভৃতি গানগুলির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখন এই গানগুলির পরিচয় সংক্ষেপে দিবার চেষ্টা করিব।

ধামালী

বাংলা দেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে ধামালী গানের প্রচলন আছে। দুই হাতে তালি দিয়া গানের সুর বা তালকে লয় করার নাম 'ধামাইল'। ধামালী গানকে শ্রীহট্টে 'ধাম্বালী' ও উত্তরবঙ্গে 'ধামাইল' নামে অভিহিত করা হয়। শ্রীহট্ট অঞ্চলে ষষ্ঠীপূজা, অন্নপ্রাশন বা বিবাহ-উৎসবে স্ত্রীলোকগণ কর্ত্তৃক ধামালী গান অনুষ্ঠিত হয়। উত্তরবঙ্গে কীর্ত্তনীয়ারা দুই হাতে তালি দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া যে সব কীর্ত্তন গান গাহিয়া থাকে, সেগুলিকে সাধারণতঃ 'ধামাইল কীর্ত্তন' বলা হয়। কালক্রমে ধামালী গান বাংলা দেশের মুসলমানদের মধ্যে সংক্রমিত হইয়াছিল, কিন্তু আধুনিক যুগে মুসলমানদের অনেকেই এইগুলি পরিত্যাগ করার আন্দোলন চালাইতেছে। এই ধামালী গানগুলির লালিত্য ও মাধুর্য্য অতি আনন্দদায়ক।

সারি গান

বাংলা দেশের বড় বড় নদী বা বিলগুলির মধ্য দিয়া অতিক্রম করার সময় নৌকার মাঝিরা সমবেতভাবে যে সব গান গাহিয়া থাকে, গ্রাম্য অঞ্চলে সেগুলি 'সারি' গান নামে সুপরিচিত। এখনও রাজসাহী, পাবনা, ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি জেলার পল্লীপ্রদেশে মনসাপূজা বা দুর্গাপূজা উপলক্ষে গ্রামের হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে যুবকগণ কর্ত্তৃক বাইচ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। বাইচ প্রতিযোগিতাকালে যুবকগণ নানাপ্রকার গান পাল্লা দিয়া গাহিতে থাকে। এইসব গানকেও সারিগান নামে অভিহিত করা হয়। এইসব সারিগান বিরহমূলক ও অতি কৌতুকপূর্ণ।

পটুয়া সঙ্গীত

পূর্ব্বে বাংলায় ফরিদপুর, যশোহর, নদীয়া প্রভৃতি জেলার পল্লীতে পল্লীতে পটুয়া সঙ্গীতের প্রচলন ছিল। পটুয়ারা এই সঙ্গীতগুলি পল্লীর প্রতি গৃহে গৃহে আবৃত্তি করিয়া জীবিকার সংস্থান করিত। পটুয়ারা গ্রামের কোনও একটি বিষয়বস্তু নির্দ্দিষ্ট করিয়া ছড়া বাঁধে এবং একটি সুদীর্ঘ পটে ঐ সম্বন্ধে নানা ছবি বিচিত্র বর্ণে অঙ্কন করে। পটুয়ারা জনসাধারণকে ছবি দেখাইবার সময় পটখানা উন্মুক্ত করিতে থাকে এবং ছবির কাহিনীকে নানা প্রকার সুরে আবৃত্তি করে। এই পট-চিত্র জনসাধারণের মধ্যে পর্য্যবেক্ষণ শক্তি বৃদ্ধি করে।

ভাটিয়ালী

বাংলার সঙ্গীত-বিজ্ঞানের কীর্ত্তন, ভাটিয়ালী ও বাউল সুর সমগ্র জগতে বিশিষ্ট পরিচিতি লাভ করিয়াছে। যত প্রকার রাগরাগিণীর প্রচলন আছে, তাহাদের মধ্যে কোনটির সহিতই এই ভাটিয়ালী সুরের সম্বন্ধ নাই। ইহা পল্লী-হৃদয়ের নিছক করুণ রসের পরিচায়ক। বাংলার মাঝিরা পদ্মা, যমুনা, ভৈরব, ধলেশ্বরী, ব্রহ্মপুত্র, ভাগীরথী, ত্রিস্রোতা নদীতে এই সুর গাহিয়া আত্মহারা হইয়া যায়। এই ভাটিয়ালী গান নদীমাতৃক বাংলার নিজস্ব সম্পদ্। এই ভাটিয়ালী সুরের ভিতর এমন মনোমুগ্ধকারী মাধুর্য্য আছে যে, গভীর নিশীথে এই গান শুনিয়া রোগী যন্ত্রণা ভুলিয়া যায় ও শোকার্ত্তের মনোব্যথা দূর হয়, আর্ত্তের নৈরাশ্য দূরীভূত হয়।

বারমাসী

পল্লী-সাহিত্যের বারমাসী গানগুলিকে প্রেমের কবিতা নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। প্রাচীন বাংলার পল্লী-কবিরাই বারমাসী কবিতার রচয়িতা। পল্লীর অধিবাসীরা এই সকল বারমাসী সঙ্গীত গাহিয়া একটা অনাবিল আনন্দ লাভ করে। পল্লীপ্রদেশে বারমাসী সঙ্গীতগুলি খুবই জনপ্রিয়। নায়ক-নায়িকার বিরহ মর্ম্ম-

ব্যথার উপর ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া গ্রাম্য কবি এই সব গান রচনা করিয়াছেন। কবিতাগুলির ভাষা নির্ঝরিণীর মত মুক্তপ্রাণ এবং উপমা ও চিত্রগুলি মনোরম, অতুলনীয়। এই গানগুলির ভিতর দিয়া আমরা প্রাচীন বাংলার পল্লীর নায়ক-নায়িকার সত্যকার সরল প্রেমের পরিচয় লাভ করি। এই কবিতাগুলিতে প্রাচীন সামাজিক রীতি-নীতির বহু উপকরণ পাওয়া যায়। নায়িকার বেদনাবিধুর চিত্তের অস্থিরতা কবি অশেষ রচনানৈপুণ্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

কীর্ত্তন

বাংলার পল্লী-সঙ্গীতগুলির মধ্যে কীর্ত্তন গানই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিশ্ব-সঙ্গীতের কলা ও বিজ্ঞানে এই গানগুলি বাংলার অপূর্ব্ব দান। শ্রীচৈতন্যপ্রভুর জন্মের বহু পূর্ব্ব হইতেই বাংলা দেশে কীর্ত্তন গানের উৎপত্তি হইয়াছিল। তিনি এবং তাঁহার শিষ্যগণ এইগুলিকে নূতন রূপ দিয়া জনসমাজে প্রচার করেন। বাংলার বৈষ্ণব সাধনায় এই গানগুলি একটি বিশিষ্ট গৌরবময় স্থান লাভ করিয়াছে। এই কীর্ত্তন গানের আনুষঙ্গিক ভাব-দ্যোতক নৃত্য সার্ব্বজনীন। কীর্ত্তন গানের নৃত্যগুলির ভিতর ভারতীয় আধ্যাত্ম সাধনা ওতপ্রোত ভাবে রূপায়িত আছে। বাংলার নরনারী এই কীর্ত্তন গানে যে অনাবিল অফুরন্ত আনন্দ লাভ করে তাহা অন্যরূপে বিরল। আজও বাংলার মাঠ, ঘাট, পল্লী ও নদীতে কীর্ত্তন গানের অভাব নাই।

বাউল সঙ্গীত

বাউল গানগুলি দেহতত্ত্ববিষয়ক সঙ্গীত। মানুষের দেহের ভিতরই ভগবানের অবস্থিতি, দেহের ভিতরই পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক বিরাজমান, স্বকর্ম্মানুসারে মানুষ ফল ভোগ করে, মানুষকে চেনাই প্রধান কাজ—এই সব কথাই বাউল সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত বস্তু। 'বাউল' কথার অর্থ হইতেছে 'আত্মহারা'। পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশ্যে আত্মহারাভাবে যে পার্থিব জগতের সব কিছুই অসার মনে করিয়া সংসারের কার্য্যে নির্লিপ্ত হয়, তাহাকেই 'বাউল' বলা হইয়া থাকে। বাউল সঙ্গীতগুলিও ধর্ম্ম বিষয়ে উদারতা ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ভাবের প্রকাশ করে।

জারি গান

মহরম উৎসব উপলক্ষে মুসলমানেরা জারি গান গাহিয়া থাকে। কুরআন শরিফের ভিন্ন ভিন্ন অংশ হইতে আখ্যান লইয়া জারি গান রচিত হয়। অথবা হিন্দু-মুসলমানের মধ্য হইতে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিদ্বেষ দূর হইয়া ঐক্য ও সখ্যভাব স্থাপিত হয়, এইরূপ কথা লইয়াও জারিগান রচিত হয়। জারিগানের সুর অতি সুললিত ও সতেজ। উত্তরবঙ্গে জারিগানগুলিকে সাধারণতঃ 'মরিচিয়া' গান বলিয়া অভিহিত করা হয়।

ধূয়া গান

ধূয়া গান হিন্দু সম্প্রদায়ের নিজস্ব সম্পদ্। তবে অনেক মুসলমান কবিও ধূয়া গান গাহিয়া থাকে। ধূয়া গানগুলি সাধনামূলক, বিষাদ বা প্রেমের গান। এই ধূয়া গান ফরিদপুর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় প্রচলিত আছে। এই ধূয়া গানের ভিতর অনেক রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক বা দেহতত্ত্ব বিষয়ক সঙ্গীতও প্রবিষ্ট হইয়াছে।

গীতা ও বাইবেল

শ্রীবিনোদলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা হিন্দুদিগের একখানি অপূর্ব্ব উপাদেয় ধর্ম্ম গ্রন্থ। কর্ত্তব্যপরাঙ্মুখ অর্জ্জুনকে কর্ত্তব্য কর্ম্মে উপদেশ প্রদান উপলক্ষে শ্রীভগবান ইহাতে জগতের জীবকে কর্ম্মযোগের শিক্ষাপ্রদান করিয়াছেন। শ্রীভগবান কি ভাষায় শ্রীমান অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা জানিবার আমাদের সুযোগ সুবিধা না থাকিলেও ভগবান বেদব্যাস গীতাতে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহাতেই আমরা প্রকৃত বিষয় অবগত হইয়া বিপুল আনন্দ উপভোগ করিতে পারি। ইহা দার্শনিকভাবে ও ভাষায় লিখিত হইলেও কাব্য হিসাবেও অতি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। পৃথিবীর সাহিত্য-ভাণ্ডারে এমন আর একখানি গ্রন্থ আছে কি-না সন্দেহ। সমস্ত উপনিষদ মন্থন করিয়া উহার সার ভাগ ইহাতে গ্রহণ এবং দর্শন চতুষ্টয়ের (সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব্বমীমাংসা ও বেদান্তের) সমন্বয় করা হইয়াছে। অপর দুই দর্শনের উল্লেখ ইহাতে বিশেষ দেখা যায় না। হিন্দুস্থানে গীতার আদর চিরদিনই আছে, অধুনা পাশ্চাত্য দেশেও ইহা তুল্যরূপে সমাদৃত। গীতার অসংখ্য অনুবাদ ও টীকা-টিপ্পনি বাহির হইয়াছে এবং বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজে দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা গীতার আলোচনা করিয়া আসিতেছেন, সুতরাং গীতা সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

হিন্দুদিগের বেদের ন্যায় খ্রীষ্টানদিগের বাইবেল। ইহা দুই অংশে বিভক্ত যথা—প্রাচীন বিধি (Old Testament), নব বিধান (New Testament)। প্রথম ভাগে সৃষ্টিবিবরণ, মুশা-সংহিতা, রাজাদিগের ও ভবিষ্যদ্বাদী সাধুদিগের বিবরণ, অন্যান্য বিবরণ প্রভৃতি সন্নিবেশিত আছে। দ্বিতীয় ভাগে অর্থাৎ নব বিধানে ভক্তাবতার পরমযোগী শ্রীখ্রীষ্টের জীবনী, অলৌকিক কার্য্য, উপদেশ ও তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার লিপিবদ্ধ আছে। উহাতে খ্রীষ্ট শিষ্য ও ভক্তদিগের কার্য্যবিবরণও আছে। উহা পৃথকভাবে চার ব্যক্তি কর্ত্তৃক খ্রীষ্টের তিরোভাবের বহু (ন্যূনাধিক অর্দ্ধ শতাব্দী) পরে সুসমাচার (Gospel) নামে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিরচিত। প্রথম মথি (Mathew), দ্বিতীয় মার্ক (Mark), তৃতীয় লুক (Luke), চতুর্থ জন (John) লিখিত সুসমাচার পর পর প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে প্রথম তিনখানি বিশেষ প্রামাণ্য বলিয়া খ্রীষ্টান সমাজে গৃহীত। জন লিখিত সুসমাচারে খ্রীষ্টের ধর্ম্মমতের আধ্যাত্মিকতার দিক হইতেই বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে, তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে বড় কিছু নাই। ইহার ভাষা ও ভাব পাণ্ডিত্যপূর্ণ, অন্যগুলির ন্যায় সরল নহে এবং ইহা খ্রীষ্টের অশিক্ষিত শিষ্যবৃন্দের উপযোগী ছিল বলিয়াও মনে হয় না।

মথি ও জন খ্রীষ্টের দ্বাদশ জন শিষ্যের অন্তর্গত, মার্ক ও লুক নহে। মথি-লিখিত সুসমাচারই সর্ব্বাগ্রে প্রচারিত হয়। পরে মার্ক ও লুক উহারই অনুসরণে নিজ নিজ সুসমাচার লিপিবদ্ধ করেন। ইঁহাদের সুসমাচার পড়িলে প্রায়শঃ মথির অবিকল প্রতিলিপি বলিয়া মনে হয়, সুতরাং ঐ দুই ব্যক্তির খ্রীষ্টের কার্য্য ও উপদেশ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল বলিয়া মনে হয় না। লুকে অবশ্য মথি অপেক্ষা খ্রীষ্টের দুই-চারিটি অতিরিক্ত অলৌকিক কার্য্য বর্ণিত আছে। দুঃখের বিষয়, ইহাতেও শ্রীখ্রীষ্টের শ্রীমুখের উক্তি জানিবার আমাদের কোনও উপায় নাই। তাঁহার উপদেশ তিনি কিম্বা সেই সময় অন্য কেহ যথাযথভাবে ও তাঁহার ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া যান নাই। বহুদিন (ন্যূনাধিক অর্দ্ধ শতাব্দী) পরে মথি প্রথমে উহা লিপিবদ্ধ করেন। আরও দুঃখের বিষয়, কোন সুসমাচারই খ্রীষ্টের ভাষায় অর্থাৎ হিব্রু ভাষায় লিখিত নহে। চারখানিই গ্রীক ভাষায় লিখিত। সৌভাগ্যক্রমে পরে উহার ইংরেজী অনুবাদ বাহির হওয়ায় আমাদের জানিবার সুযোগ ঘটিয়াছে। তবে 'তিন নকলে আসল ভ্যাস্তা' হইলেও তাঁহার ভাষা না হউক, ভাবটা আমরা ধরিতে পারি।

এই প্রবন্ধে আমরা গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ও নববিধানের

শ্রীখ্রীষ্টের উক্তি তুলনা করিয়া দেখাইব যে, উহাদের মধ্যে বর্ণে বর্ণে না হইলেও ভাব-গত এত সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে যে, দেখিলে হঠাৎ মনে হয় একের দ্বারা অন্যে প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। সত্য বটে মহাকবিদিগের ন্যায় মহাপুরুষদিগের ভাবধারা তুল্যরূপ; কিন্তু যদি দেখা যায়, পূর্ব্ববর্ত্তীর উক্তি সকল জানিবার সুযোগ সুবিধা পরবর্ত্তীর ছিল তবে ঐরূপ ধারণার আর স্থান থাকে না। কিন্তু ঐরূপ তুলনা করিবার সময় একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয়সখা ও অনুগত শিষ্য দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ক্ষত্রিয় রাজপুত্র শ্রীমান অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন, সুতরাং উহার ভাব ও ভাষা দার্শনিক হইবারই কথা। পক্ষান্তরে, ভক্তাবতার ঈশা তাঁহার অশিক্ষিত ধীবর শিষ্যদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন, সুতরাং তাহাদের সহজবোধ্য করিবার জন্য প্রাকৃত কথায় ও দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে হইয়াছিল। এ অবস্থায় উভয়ের ভাষার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া মূল নীতির দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

নিম্নে উভয় গ্রন্থের সুবিদিত স্থল হইতে বঙ্গানুবাদসহ কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল :—

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥
(গীতা, ২।৫৯)

ভোগের অভাবে ভোগ্যের নিবৃত্তি
রসের নিবৃত্তি নয়,
আত্ম দরশন হইলে তখন
রসের (ও) নিবৃত্তি হয়।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥
(গীতা, ৩।৬)

কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযমী যে ভোগ্যবস্তু ভাবে মনে,
মূঢ় সেই, সবে তারে মিথ্যাচারী বলি গণে।

এখানে মূল নীতির কথাই বলা হইয়াছে—

Whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. (Matthew, v, 28)

চাহে নারীপ্রতি যেবা কামাকুল মন
অন্তরেতে ব্যভিচার করেছে সে জন।

এখানে দৃষ্টান্ত দ্বারা মূল নীতি বুঝান হইয়াছে।

ভোগের অভাবে ভোগ্যবস্তুর নিবৃত্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু ভোগবাসনার নিবৃত্তি হয় না; সুতরাং ভোগস্পৃহা রহিয়া যায় এবং উহা দ্বারাই মন কলুষিত হইয়া কায়িক না হউক মানসিক ব্যভিচার ঘটিয়া থাকে। ফল উভয়ের সমান।

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥
(গীতা, ৩।২৬)

কর্ম্মসঙ্গী অজ্ঞানীর বুদ্ধিভেদ না করিবে,
আপনি আচরি কর্ম্ম বিজ্ঞ সবে শিখাইবে।

এখানে ফলের কথা বলা হয় নাই।

Give not that which is holy to the dogs, neither throw ye your pearls before swine, lest they trample them under their feet, and turn again and rend you.
(Matthew, vii, 6)

দিও না পবিত্র যাহা সারমেয়গণে,
ফেলো না মুকুতা তব শূকর সদনে;
পায়ে দলি পাছে, তারা করে উহা নাশ,
ফিরিয়া তোমারে পুন করয়ে বিনাশ।

এখানে ফলের কথাও বলা হইয়াছে।

নিম্নাধিকারীকে উচ্চাধিকারের কথা বলিলে হিতে বিপরীত হইবারই সম্ভাবনা।

প্রঃ—
অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥
(গীতা, ৩।৩৬)

উঃ—
কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥
(গীতা, ৩।৩৭)

আচরে পুরুষ পাপ নিয়োগে কাহার,
নাহি ইচ্ছা তবু যেন বলে দুর্নিবার?
রজোগুণ সমুদ্ভূত কাম ক্রোধ হয়,
অত্যুগ্র দুষ্পূর বৈরী কামনা নিশ্চয়।

The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. (Matthew, xxvi, 41)

জীব চায় উঠিবারে, টেনে রাখে দেহ তারে।

ভাবার্থ—আলোকের জীবদেহী আলোকে থাকিতে সে ত চায়,
আঁধার দেহের ধর্ম্ম আলোক দেখিলে ভয় পায়।

পুণ্য কর্ম্ম করিবার সময় আমাদের দেহ আমাদের আত্মার সহিত সমতা রক্ষা করিতে পারে না পরন্তু অধিকাংশ সময় আত্মার ভার বোঝা হইয়া সৎকার্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকে। অর্থাৎ জীব স্বাধীন থাকিলে সৎকার্য্যই করিতে ইচ্ছা করে কিন্তু দেহ উহাতে অনিচ্ছা ও অপারগতা প্রকাশ করিয়া কার্য্য হানি করিয়া থাকে।

সংক্ষেপে—জীবের প্রবৃত্তি সৎপথে, দেহের প্রবৃত্তি অসৎপথে।

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥
(গীতা, ৬।৩২)

সকলের সুখ দুঃখ নিজ তুলনায়,
যে দেখে পরম যোগী জানিবে তাহায়।

...all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them :
(Matthew, vii, 12)

অন্যের নিকটে চাহ যথা আচরণ
তাহাদের প্রতি তুমি করহ তেমন।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥
(গীতা, ৭।৩)

সহস্রের মধ্যে কেহ সিদ্ধিতরে যত্ন করে,
তার মাঝারে কচিৎ কেহ তত্ত্ব আমার জান্‌তে পারে।

Many are called but few are chosen.
(Matthew, xxii, 14)

আহূত অনেকে হয়, মনোনীত বহু নয়।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥
(গীতা, ৯।১১)

মানুষ বলিয়া মূঢ় ভাবয়ে আমারে,
ভূতেশ্বর ভাব মোর জানিতে না পারে।

And blessed is he, whosoever shall not be offended in me. (Matthew, xi, 6)

ধন্য সেই কভু যার নাহি অবিশ্বাস মোরে।

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥
(গীতা, ৯।২৮)

শুভাশুভ কর্ম্মপাশে পাইয়া নিস্তার,
সন্ন্যাসযোগেতে লাভ হইবে আমার।

So likewise, whosoever he be of you that renounceth not all that he hath, he cannot be my disciple. (Luke, xiv, 33)

তোমাদের মাঝে যেবা পারিবে না
ত্যাজিবারে সর্ব্বস্ব তাহার,
সে কভু নারিবে শিষ্য হইতে আমার।

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥
(গীতা, ৯।২৯)

ভক্তি সহকারে যেবা ভজয়ে আমায়,
আমাতে তাহারা থাকে আমি থাকি তায়।

The father is in me and I in him.
(John, x, 38 ; xiv, 10)

আমাতে থাকেন পিতা আমি থাকি তায়।

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসম্মূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥
(গীতা, ১০।৩)

অজাত অনাদি মোরে লোকমহেশ্বর,
মোহ, পাপে, মুক্ত সেই জানে যেই পর।

But that ye may know that the Son of man hath power on earth to forgive sins.

(Mark, ii-10)

জ্ঞান সবে অধিকারী মানবকুমার,
ক্ষমিতে পাতক যত জগতে সবার।

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন॥

(গীতা, ৭।২৬)

অতীত ভবিষ্য আমি বর্ত্তমান জানি,
আমারে না জানে পার্থ জগতের প্রাণী।

All things are delivered to me of my father: and no man knoweth who the Son, is but the father; and who the father is, but the son, and he to whom the son will reveal him.

(Luke, x, 22)

সকল (ই) আমারে পিতা বুঝায়ে দেছেন আনি,
তনয়ে জানেন পিতা আমিও পিতারে জানি।
(আর) সে জানে জানাই যারে, নাহি জানে অন্য প্রাণী।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥

(গীতা, ৮।১৪)

যে সদা অনন্য চিত্তে স্মরয়ে আমায়,
নিত্যযুক্ত যোগী সেই সুখে মোরে পায়।

My yoke is easy and my burden is light.

(Mat ew, xi, 30)

হালকা অতি আমার বোঝা,
আলগা যোয়াল বইতে সোজা।

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে॥

(গীতা, ৯।১০)

নিয়োগে আমার প্রকৃতি প্রসবে
চরাচর সমুদয়,
এই সে কারণে হয় বারে বারে
জগতের স্থিতি-লয়।

All power is given unto me in heaven and in earth. (Matthew, xxviii, 18)

স্বর্গে, মর্ত্ত্যে যত অধিকার প্রদত্ত আমার।

সমঃ শত্রৌচ মিত্রে চ·········।
············ভক্তিমান যে প্রিয়ো নরঃ॥

(গীতা, ১২, ১৮।১৯)

শত্রু মিত্র সম যার প্রিয়ভক্ত সে আমার।

Love your enemies. (Matthew, v, 41)

ভালবাস বৈরী কুলে।

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥

(গীতা, ১৬।১৮)

অহঙ্কার বল দর্প কাম ক্রোধভরে
দ্বেষী নিজ পরদেহে মোরে হিংসা করে।

If they have called the master of the house Beelzebub, how much more shall they call them of his household. (Matthew, X, 25)

সয়তান বলিয়া যদি হয় অভিহিত,
গৃহস্বামী, লোক তার হইবে কি মত?

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥

(গীতা, ১৮।৫৭)

আমাতে অর্পিয়া চিত্ত বিবেক কৌশলে,
মচ্চিত্ত মৎপর হও বুদ্ধিযোগ বলে।

If any man would come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. (Mark, viil, 34)

কেহ যদি মোর সাথে আসিবারে চায়,
ভুলে যাক আপনারে, ধরিয়া মাথায়
আপদ, বিপদ, যেন মোর পাছে যায়।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥ *

(গীতা, ১৮।৬২)

তাঁহার (ই) শরণ পার্থ লহ তুমি সর্ব্বভাবে
চিরশান্তি নিত্যধাম প্রসাদে তাঁহার পাবে।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ *

(গীতা, ১৮।৬৬)

সর্ব্বধর্ম্মত্যজি একা আমার আশ্রয় ধর,
সর্ব্বপাপে তরাইব শোক তুমি নাহি কর।

Come unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest.

(Matthew, xi, 28)

পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত তোমরা যে জন,
দিব শান্তি সবে লহ আমার শরণ॥
ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং নচ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥

(গীতা, ১৮।৬৭)

তপস্যা শুশ্রূষাহীন অসূয়া আমায়,
অভক্ত যে জন গীতা না শুনাবে তায়।

And whosoever shall not receive you, nor hear your words, when ye depart out of that house or city, shake off the dust of your feet. (Matthew, x, 14)

না হ'লে আদৃত সেথা সবে,
না শুনিলে কথা তোমাদের,
ত্যজিবার কালে সেই স্থান
ঝেড়ে ফেলো ধূলি চরণের।

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতংচরাচরম্॥

(গীতা, ১০।৩৯)

সকল ভূতের পার্থ আমি মূলাধার,
আমি বিনা চরাচরে নাহি কিছু আর।

খ্রীষ্ট সম্বন্ধে প্রিয় শিষ্য জনের উক্তি :—

Allthings were made by him; and without him was not any thing made that was made.

(John, 1, 3)

তাঁহারি রচিত বিশ্বচরাচর সমুদয়,
নাহিক কিছুই আর যাহা তাঁর করা নয়।

ইহা গীতার এই শ্লোকের অনুবাদ বলিয়া ভ্রম হয় না কি?

অতঃপর আর অধিক উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন।

কৈফিয়ৎ

সেকালে অর্থাৎ ইংরেজ রাজত্বের প্রথমাবস্থায় ভদ্রঘরের শিক্ষিত বহু যুবক খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিয়া স্বৈরাচারী হইতেন। সে সময়ে গীতা ও বাইবেলের তুলনামূলক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনার আবশ্যকতা ছিল। কিন্তু একালে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, এখন আর শিক্ষিত ভদ্রলোকের মধ্যে প্রায় কেহ খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে না। এ অবস্থায় বর্ত্তমানকালে ঐরূপ প্রবন্ধ লিখিবার আবশ্যকতা কি, তৎসম্বন্ধে একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন মনে করি।

পূর্ব্বে খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারকদিগের স্কুল কলেজেই কেবল বাইবেল পড়ান হইত; বর্ত্তমানে খ্রীষ্টান ও অখ্রীষ্টান উভয়বিধ ইংরেজী বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তক-তালিকায় বাইবেলও অবশ্যপাঠ্যরূপে স্থান পাইয়াছে। ইহাতে আমাদের বিশেষ আপত্তির কারণ নাই, যেহেতু নীতিশিক্ষার দিক দিয়া দেখিলে বাইবেল একখানি উৎকৃষ্ট নীতি পুস্তক। ইংরেজী ভাষা শিক্ষার্থীর পক্ষেও ইহা বিশেষ উপযোগী; কারণ ইহার ইংরেজী সরল, সুখপাঠ্য ও বিশুদ্ধ। আরও সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্য পাঠ করিতে হইলে যেরূপ রামায়ণ মহাভারত পাঠ করা আবশ্যক, সেইরূপ ইংরেজী সাহিত্য পাঠ করিতে বাইবেল পড়া আবশ্যক। তবে একটা কথা এই যে, বাইবেল শুধু নীতি পুস্তক নয়, উহা খ্রীষ্টানদিগের ধর্ম্মপুস্তকও বটে। যদি বাইবেলের ন্যায় আমাদের ধর্ম্মগ্রন্থ গীতাও পড়ান হইত তাহা হইলে আমাদের কোন কথাই বলিবার থাকিত না, কিন্তু তাহা হয় না এবং হইবারও উপায় নাই। এ অবস্থায় যাহাতে আমাদের তরলমতি বালকবালিকাগণ কেবলমাত্র

* এখানে 'তম্', 'মাম্' ও 'me' ঈশ্বরবাচক।

বাইবেল পাঠ করিয়া ভ্রমবশত স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক পরধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ফেলে, ইহা নিবারণের জন্যই এইরূপ প্রবন্ধ লেখার ও প্রচারের নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছে।

এবারে আমরা গীতার উপদেশের সহিত বাইবেলের উপদেশের তুলনা করিয়া উহাদের মধ্যে সৌসাদৃশ্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। বারান্তরে ঐরূপ সাদৃশ্যের কারণ কি, খ্রীষ্টের প্রচারিত মতবাদ কি, ঐ মতবাদের মূল উৎস কোথায়, উহা ইহুদি ধর্ম্মের (Judaism) আবরণে বৈদিক ধর্ম্ম কি-না, গীতার মতবাদ ও খ্রীষ্টের প্রচারিত মতবাদ একই উৎস হইতে উৎপন্ন হইয়া দেশ, কাল, পাত্রভেদে বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে কি-না ইত্যাদি বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

পূর্ব্বে সময়ে সময়ে গীতা ও বাইবেল সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রচারিত হইয়াছে, উহাতে বাল্যকালে খ্রীষ্টের ভারতে আগমন এবং তথায় মহাত্মাদিগের নিকট বৈদিকধর্ম্মের শিক্ষালাভ মন্তব্য করা হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐ সমস্ত মন্তব্য উপযুক্ত প্রমাণের দ্বারা অসমর্থিত, দুর্ব্বল অনুমানের (presumtion) উপর স্থাপিত। এরূপ আলোচনায় উপকার ত হয়ই না, বরং উহাতে প্রতিপাদ্য বিষয়ের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইয়া অপকার হইবারই সম্ভাবনা।

আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব, খ্রীষ্ট প্যালেষ্টাইনে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার পুনর্জন্ম ভারতেই হইয়াছিল; তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন ভারতেই গঠিত সুতরাং তিনি আমাদিগের মহাত্মাদিগের মধ্যেই অন্যতম এবং ভারতীয় ধর্ম্মমত স্বদেশীয় ধর্ম্মমতের (Judaism) আবরণে কেবল স্বজাতিদিগের মধ্যেই প্রচার করিয়াছিলেন এবং তাহার শিষ্যদিগকেও উহা অন্যত্র প্রচার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন; অতএব তাঁহার পশ্চাতে যাইবার আমাদের কোন কারণ বা প্রয়োজন নাই। আমরা আশা করি, শ্রীভগবানের কৃপায় আমাদের এই মত ধর্ম্মাধিকরণে গ্রহণযোগ্য, প্রমাণ শাস্ত্রানুমোদিত, সন্তোষজনক প্রমাণের দ্বারা সমর্থন করিতে সক্ষম হইব।

বাদল-বাসর

শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী

বনে কে জ্বালিলে খদ্যোত-দীপিকা !
কোন্ পথিক প্রিয়ের লাগি দোলাইলে শাখে শাখে
আলোকের আহ্বান লিপিকা !

যদি আসিতে কানন-পথে বঁধুয়া হারায় দিশা
আঁধারে নয়ন তার না চলে
অভিসার সঙ্কেত ক্ষীণ দীপশিখা তাই
ঢাকিয়া রেখেছ বুঝি আঁচলে !

ওগো, হের গৃহ দীপ মোর তিলেক পা রহে থির
রুদ্ধ দুয়ার মম ভবনে
কাঁপিয়া কাঁপিয়া হায় নিভে যায় বারে বারে
উতল অধীর ঘন পবনে।

বল কে তুমি মায়াবিনি, কোন্ যাদু মন্তরে
কোন্ ইন্ধন হবি ঢালিয়া
ক্ষীণ ওই দীপাবলি বাদল-ব্যাকুল বনে
রেখেছ অনিরবাণ জ্বালিয়া !

হেন ঘন ঘোর বরষায় স্মরণে জেগেছে কিগো,
এমন বাদল দিনে দয়িত
মুগ্ধ কপোত সম কূজনে ও গুঞ্জনে
কানে কানে যত কথা কহিত !

ধীরে তরল সে মুখরতা অনুরাগ ঘন ভরে
আলসে আবেশ ভরে থামিত,
আঁখিতে মিলিত আঁখি, রুধিয়া কথার পথ
অধরে অধর আসি নামিত।

কেন দীর্ঘ নিশ্বাস তব কাননে তুলেছে ঝড়,
অঝোরে নয়নধারা ঝরিছে,
কোন দিন হেন বেলা কোন অনাদর হেলা
ক্ষণে ক্ষণে মনে কিগো পড়িছে ?

ভয় চকিতা মৃগীর সম কভু কি চাহিয়াছিলে—
বিজলী উঠিলে মেঘে চমকি
লুকাতে বঁধুর বুকে, নিরদয় অভিমানে
দূরে সরেছিল প্রিয়তম কি ?

হের, তোমার ব্যথায় ওই আঁধার ঘনায়ে এলো
বিষাদে ভুলিল হাসি দামিনী,
দীপালি মলিন হ'ল, নিঠুর এ অভিমানে
ব্যর্থ ক'র না হেন যামিনী !

ওগো, কি হবে অতীত কথা স্মরিয়া
এ মধু মিলন ক্ষণে কেতকী কদম রেণু
পড়ুক তাহার 'পরে ঝরিয়া।

নাগরিক

শ্রীচরণদাসঘোষ

এক

বৌদ্ধধর্ম্মের আলোক কোথাও পড়িয়াছে, কোথাও বা পড়ি-পড়ি করিতেছে, এমন সময়ে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের এক বৌদ্ধমঠের অধ্যক্ষ ত্রিবর্ণ বসন্তের এক পরিচ্ছন্ন উষায় শয্যাত্যাগ করিতেই ভিক্ষুরা আসিয়া পদধূলি গ্রহণ করিল। তারপর তাহারা সমস্বরে কহিল, "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি !"

ত্রিবর্ণ হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াই বাহিরে পুষ্পোদ্যানে আসিলেন—তাঁহার পরিধানে হরিদ্রা-বস্ত্র, গাত্রে হরিদ্রা-উত্তরীয়। ভিক্ষুরাও তাঁহার অনুসরণ করিল।

উদ্যানের একান্তে এক প্রস্তর-বেদী, তাহার পার্শ্বে স্তূপীকৃত বিল্বপত্র। মঠের নিয়ম—প্রতিদিন এই সময়ে ভিক্ষুরা জড় হইয়া অধ্যক্ষের হাত হইতে অনুমতি স্বরূপ এক-একটি বিল্বপত্র গ্রহণ করিয়া দিবসের প্রচারকার্য্যে চলিয়া যায়। ত্রিবর্ণ বেদীর উপর উপবেশন করিলেন এবং ভিক্ষুরা একে-একে অগ্রসর হইয়া বিল্বপত্র গ্রহণ করিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। একজন মাত্র বাকী আছে, এমন সময়ে একটি ভিক্ষুণী প্রবেশ করিল। মেয়েটির বয়স বাইশ-তেইশ। তাহার আকৃতি সংযম-কঠিন, মুখের গড়ন—নিখুঁত, রূপ—সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া। মস্তক অবনত করিয়া ত্রিবর্ণের পদস্পর্শ করিয়া কহিল, "শঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি—"

ত্রিবর্ণ স্মিতমুখে হাত তুলিয়া যথারীতি আশীর্ব্বাদ করিলেন, তারপর কহিলেন, "আদেশ ফিরিয়ে নিলাম।"

মেয়েটি বিস্ময়ে তাকাইতেই ত্রিবর্ণ কহিলেন, "প্রয়োজন নেই !"

"প্রয়োজন নে-ই ?"

"না, কৌমুদি ! নগরে বসন্ত-উৎসব !"

মেয়েটির নাম বিজ্ঞান-কৌমুদী, মঠে সে 'কৌমুদী' বলিয়াই অভিহিতা। ভিক্ষুণীদের ভিতর সে অগ্রণী।

কৌমুদী জানিতে চাহিল—"বাধা পড়বে ?"

ত্রিবর্ণ সহসা গম্ভীর হইয়া গেলেন। কহিলেন, "তা' নয় ! তুমি নারী !"

কৌমুদী মাথা নীচু করিল। একটু পরেই মাথা তুলিয়া কহিল, "অধিকার আপ্‌নি ত দিয়েছেন !"

মায়ের কোলে উঠিয়া শিশু যেমন করিয়া হাসে, তেম্‌নি করিয়াই হাসিয়া ত্রিবর্ণ জবাব দিলেন, "দিয়েছি সেইখানে, যেখানে তুমি—সকলের মা !"

কৌমুদী বিভ্রান্তনেত্রে ত্রিবর্ণের দিকে তাকাইল, যেন বা কথাটা সে ঠিক বুঝিতে পারে নাই।

ত্রিবর্ণ তৎক্ষণাৎ অর্থ করিয়া দিলেন—"অর্থাৎ যেখানে সকলেই—মানুষ !"

কৌমুদী হাসিয়া কহিল, "মানুষ কি ওরা নয় ?"

"এপনও হয়নি, ওরা—ভাগ্যহীন ! ওদের চোখে তুমি লোভের বস্তু !" বলিয়াই ত্রিবর্ণ একটি বিল্বপত্র তুলিয়া লইয়া ভিক্ষুটিকে কহিলেন, "অঞ্জন, অনুমতি—"

অঞ্জন হাত পাতিল।

ত্রিবর্ণ তাহার চোখে চোখ মিলাইয়া কহিলেন, "নগরে যাবে—" বলিয়া অঞ্জনের হাতে বিল্বপত্রটি ফেলিয়া দিলেন। দিয়াই কহিলেন, "এখন নয়—অপরাহ্ণে ?"

অঞ্জন বিল্বপত্র গ্রহণ করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইতেই ত্রিবর্ণ কহিলেন, "শোনো—" বলিয়াই কি যেন একটা বক্তব্যকে অকথিত রাখিয়া চিন্তিতভাবে উঠিয়া পড়িলেন এবং কুসুমিত লতাপল্লবের ভিতর দিয়া কিয়দ্দূর গিয়াই থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন। অতঃপর স্নিগ্ধনেত্রে অঞ্জনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "প্রচারের কাজে নয়—অপরাহ্ণে তোমাকে নগরে যে'ত হবে একজনকে আমন্ত্রণ করতে !"

"কাকে ?"

অঞ্জন বিস্ময়ে তাকাইতেই ত্রিবর্ণ কহিলেন, "কঙ্কণ, নগরের ভার অর্পণ করবো—তারই ওপর !"

"কে তিনি ?"

"এক তরুণ শ্রেষ্ঠীকুমার—তার মুখে পদ্মের পবিত্র প্রভা প্রতিভাত, চোখে চাঁদের আলো, দেহে রবির রূপ!"

অঞ্জন মূঢ়ের ন্যায় বলিল, "ওরা—"

ত্রিবর্ণ মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "তা' জানি! ওরা ভোগী—গৃহী—কিন্তু, তুমি ত জানো অঞ্জন—তিনিও ছিলেন রাজার দুলাল!"

অঞ্জন আর প্রতিবাদ করিতে পারিল না। শুধু সংশয়ম্লান কণ্ঠে কহিল, "যদি না আসে!"

বুঝিবা তাহাকে নিশ্চিন্ত করিতে গিয়াই ত্রিবর্ণ তৎক্ষণাৎ সহাস্যে জবাব দিলেন, "আস্‌বে! তার অন্তরাত্মা যে আমার কাছে হাত পেতেছে!" কথা শেষ করিয়া তিনি আর দাঁড়াইলেন না।

অঞ্জন কিয়ৎক্ষণ আবিষ্টের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল; তার পর করপল্লবস্থ বিল্বপত্রটির উপর চোখ পড়িতেই ত্রস্ত হইয়া চলিয়া গেল—এ যে অধ্যক্ষের আদেশপত্র—শুধু অনুমতি ত নয়!

দুই

নগরে উৎসব লাগিয়াছে। বসন্ত উৎসব!—ঋতুরাজের নির্লজ্জ আবাহন!

চতুর্দ্দিক ব্যাপিয়া নরনারীর ফাগুন আগুনে মাতামাতি উৎসবের প্রধান অঙ্গ—সুরা আর নারী। পুষ্পবাটিকায়, পথেঘাটে সরোবরবক্ষে বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরের অধিবাসীর বিভিন্ন আয়োজন। বাধা নাই, বাঁধন নাই, নিষেধ নাই—অপ্রতিহত বিচিত্র বিলাসের ঢেউ বহিয়া যাইতেছে অঙ্গনে। কোথাও চলিয়াছে অশ্রান্ত নৃত্য; কোথাও উচ্ছ্বসিত সঙ্গীত, কোথাও বা অফুরন্ত রঙ্গরস ও হাস্যকৌতুক? নগরের প্রতি পথে উভয় পার্শ্বের প্রত্যেক বিপণি বিচিত্র শৃঙ্খলায় সাজানো সারি সারি দোকান—ফলফুল, মিষ্টান্ন, রত্ন, অলঙ্কার, জীবজন্তু—নানাবস্তুর।

যে-রাস্তাটা রাজবাড়ী হইতে বাহির হইয়া নগরের তোরণে আসিয়া ঠেকিয়াছে, সেই রাস্তায় আকস্মিক এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। তখন বেলা পড়িতে সুরু হইয়াছে, রৌদ্রে ততটা ঝাঁঝ নাই। একটি মিষ্টান্নের দোকানের সম্মুখে ব'ছর ছয়েকের একটি ছেলে হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছে—তাহার দেহ শীর্ণ, মাথায় রুক্ষ কেশ, পরিধানে ছিন্ন-মলিন বস্ত্র। কতক্ষণ দাঁড়াইয়া আছে তাহার ঠিক নাই, হঠাৎ চারিদিক ছাপাইয়া বহু কণ্ঠের কলরোল আসিল—'রাজা আস্‌ছেন!' 'রাজা আস্‌ছেন!' সঙ্গে-সঙ্গে পথের সমস্ত পথিক উঠিপড়ি করিয়া ছুটিয়া ছিট্‌কিয়া রাস্তা ছাড়িয়া দিল, কিন্তু ছেলেটির সেদিকে হুঁস্ নাই। দেখিতে-দেখিতে অদূরে অশ্বপদ ধ্বনি শ্রুত হইল এবং চোখের পলক পড়িতে-না-পড়িতেই একজন অশ্বারোহী রাজ-সৈনিক তীরবেগে পথের ধূলা উড়াইয়া আসিয়া ছেলেটির সুমুখে পড়িয়া গেল ও পথে তাহাকে দেখিয়াই ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া উঠিল; পথ ছাড়িয়া সরিয়া যাইবার কঠোর আদেশের সঙ্গে তাহার পিঠে এক কশাঘাত করিয়া আবার ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

মিষ্টান্নের দোকানটির পাশেই একটি প্রমোদশালা ছিল। রাজদর্শনের লোভেই হোক্, অথবা রাস্তার ভিড়-ভাড়ার আতঙ্ক-দৃশ্যটা দেখিবার জন্যই হোক্—তথাকার সমস্ত দর্শকের চক্ষুই তখন পথের দিকে ফিরিয়াছিল, ছেলেটি পড়িয়া গিয়া কাঁদিয়া উঠিতেই তথা হইতে একটি দিব্যদর্শন যুবক ছুটিয়া আসিয়া ছেলেটিকে বুকে তুলিয়া লইল—যেন এক তরুণ কাম দেবদূত! তাহার অঙ্গে রত্নখচিত পরিচ্ছদ, চক্ষে অসাধারণ দীপ্তি, মুখে অভয় সত্যের স্তব-স্তুতি! তাড়াতাড়ি দোকান হইতে মুঠি ভরিয়া মিষ্টান্ন তুলিয়া লইয়া ছেলেটির হাতে গুঁজিয়া দিয়াই মিষ্টান্ন বিক্রেতাকে একটি স্বর্ণমুদ্রা ফেলিয়া দিল।

মুহূর্ত্তেই রাস্তার দুই পার্শ্বে আবার আনন্দ কোলাহল উঠিল—'রাজা', 'রাজা!'

যুবকটি ছেলেটিকে বুকে করিয়াই ফিরিয়া দাঁড়াইল। দেখিল—অদূরেই পাশাপাশি তিনটী অশ্ব, মাঝে একটী পূর্ণ-কল্যাণযুক্ত শ্বেত অশ্বে বসিয়া রাজা—দীর্ঘদেহ এক তরুণ নৃপতি! তাঁহার একপার্শ্বে একজন আরোহী মস্তকে ছত্র ধরিয়া, অপর পার্শ্বের আরোহিটীর হস্তে চামর।

এম্‌নিই সময়ে আর একটী যুবক পার্শ্বের ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া প্রথমোক্ত যুবকটীর হাতে একটান দিয়াই ত্রস্তকণ্ঠে ডাকিল, "কঙ্কণ, কঙ্কণ—"

কিন্তু কঙ্কণের সেদিকে দৃক্‌পাত নাই।

পুনশ্চ আর একবার ব্যাকুল কণ্ঠের ডাক পড়িল—"কঙ্কণ সরে এসো—"

তথাপি কঙ্কণ সেই রাজ-আগমন দৃশ্যের দিকে চোখ পাতিয়া তেমনিই তন্ময়।

দেখিতে-দেখিতে অশ্ব তিনটী কাছে আসিয়া পড়িল। তিনজন অশ্বারোহীর তিনজোড়া রক্ত চক্ষু বিদ্যুৎ চমকের মত কঙ্কণের উপর পড়িয়া যেমন পাশ কাটাইয়া ছুটিয়া যাইবে, অম্‌নি সে লাফ দিয়া সুমুখে পড়িয়া বজ্রমুষ্টিতে রাজ-অশ্বের লাগাম ধরিয়া রাজাকে বলিয়া উঠিল, "প্রশ্ন রয়েছে—"

রাজার চোখ দিয়া যেন অগ্নিশিখা নির্গত হইল—অপমান! পার্শ্বচরেরা চম্‌কিয়া উঠিল! উভয় পার্শ্বের ভিড় হইতে অস্ফুট আতঙ্কধ্বনি বাহির হইল। রাজা বজ্রকণ্ঠে কহিলেন, "কি প্রশ্ন?"

"রাজপথ কার?"

"পথ ছাড়ো—"

"না। জবাব দিন—রাজার, না, রাজার যারা আশ্রিত—তাদের?"

একজন পার্শ্বচর কহিল, "রাজার!"

কঙ্কণ তাহাকে অবজ্ঞাসূচক কণ্ঠে ভৎর্সনা করিল, "তুমি চুপ কর, তুমি রাজার অন্নদাস—প্রশ্ন তোমাকে করিনি!" রাজার দিকে ফিরিয়াই বুকের ছেলেটীকে একহাতে রাজার চোখের উপর তুলিয়া ধরিয়া কশাঙ্কিত পিঠ দেখাইয়া কহিল, "চেয়ে দেখুন—আপনার রাজগর্ব্ব! আপনার অশ্বারোহী পথরক্ষী এম্‌নি কোরেই আপনার পথ মুক্ত করেছে!"

রাজা সদম্ভে জবাব দিলেন "রাজ-আজ্ঞা!"

কঙ্কণও প্রস্তুত হইয়াই ছিল। তৎক্ষণাৎ শ্লেষকণ্ঠে কহিল, "চমৎকার! আপনি রাজা—প্রজাপালক—বিচারক!" বলিয়াই পথ ছাড়িয়া দিল।

রাজাও কঙ্কণের উপর পুনরায় অগ্নি-বৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই ঘোড়া ছুটাইয়া দিলেন।

তিন

কাহার জয় হইল, কাহার পরাজয় হইল—সে আলোচনা এখন থাক্। ছেলেটিকে নামাইয়া দিয়াই কঙ্কণ এদিক ওদিক একবার চাহিয়াই আনমনে খানিকটা গিয়াছে, এমন সময়ে পূর্ব্বোক্ত যুবকটী একটী বৃক্ষ শাখা হইতে লাফ দিয়া সুমুখে পড়িয়াই তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

কঙ্কণ হাসি চাপিতে পারিল না, কহিল "কি দেখছ নন্দন?"

"অপদেবতা কি না?"

"আমিও ভাবছি বুঝি বা বৃন্দাবনেই এলাম নইলে, এখানে 'শাখামৃগ' এল কেমন করে!"

"চিরজীবী হোয়ে থাক্ আমার বৃন্দাবন, ধ্বংস হোক তোমার কুরুক্ষেত্র! চল, এইবার বাড়ী—"

কঙ্কণ হাসিয়া কহিল, "এখ্‌খুনি?"

নন্দন প্রবীণের ন্যায় কহিল, "আজ যাত্রা খারাপ!"

"সেকি! রাজ-দর্শন—"

"হ্যাঁ, এইবার রক্তদর্শন!"

কথাটা কাণে যাইবার পূর্ব্বেই কঙ্কণের দৃষ্টি অদূরে কাহার উপর পড়িয়াছিল স্থির হইয়া। ক্ষণকাল সেইদিকে চাহিয়া থাকিয়া সে নন্দনকে কহিল, "দেখদিকিনি চেয়ে, কে একজন—"

নন্দন ঠাহর করিয়া চাহিয়া দেখিয়া কহিল, "একটা কাছাখোলা সন্ন্যিসী!"

"হুঁ!" বলিয়া কঙ্কণ যেন একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। তারপর নন্দনের পিঠে মৃদু করাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিল, "ঠিক হয়েছে! চলো—"

নন্দন বিস্ময়ের ভাণ করিয়া কহিল, "কোথায়?"

"ওইখানে—"

"হেতু?"

"ওকে ফেরাতে হবে।"

নন্দন মাটীতে বসিয়া পড়িল। দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিল, "পদমেকং ন গচ্ছামি! যা ত হাবাতে কি পড়ে ছাই তোমারই নজরে?"

কঙ্কণ আদর করিয়া নন্দনকে তুলিয়া কহিল, "বল্‌তে নেই! সন্ন্যিসী—মহাপুরুষ!"

নন্দন কৃত্রিম রোষে বলিয়া উঠিল, "তোমার নজরে ওরা এত পড়ে কেন?"

সমস্যা বটে! কিন্তু উপস্থিত যখন পড়েছে—তখন বিহিত একটা করতে হবে ত!

"লাভ?"

"কলহ!"

নন্দন যেন বিশেষ বুঝিয়া জবাব দিল, "মুখরোচক বটে! কিন্তু ওকে ফেরাতে তুমি পারবে না! দেখ, রাজার চেয়েও আমার অধিক ভয়—ওই সব তোমার 'মহাপুরুষকে!'

'বাবাঠাকুর' বলেছ কি, চেয়ে বসেছে—আধখানা রাজত্ব, আর আস্ত এক রাজকন্যে !"

কঙ্কণ সহাস্যে কহিল, "বেশত ! কাছেই ত রাজবাড়ী—দেখিয়ে দেব'খন !" পরক্ষণেই গম্ভীর হইয়া কহিল, "এক ফন্দি বার করেছি—"

"ওদের কাছে -"

"ছাই, শোনোই না—" কঙ্কণ নন্দনের কাণে-কাণে কি বলিতেই নন্দন আসন্ন এক বিজয়ের গর্ব্বে লাফাইয়া বলিয়া উঠিল, "চলো—"

অতঃপর উভয়ে তাহাদের মনোমত অভিযানে যাত্রা করিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে।

* * *

যাহাকে লক্ষ্য করিয়া তাহারা অগ্রসর হইল সে—অঞ্জন। একমনে চলিয়াছে। উৎসবের রাত্রি—রাস্তায় আলোর অনটন নাই। কি ব্রত গ্রহণ করিয়া চলিয়াছে, সে জানে, কিন্তু জানে না—কোথায় গিয়া সে ঠেকিবে ! লক্ষ্যহীন পথ, তত্রাপি সে নির্ভয়। মুখে গান। ইহাই সে গীতবাণী যে, দিবসের আলোক ধরিয়া দেয়—প্রকৃতির অহঙ্কার ; মোক্ষের মুখে যে আলোকবর্ত্ম, তাহা মেলিয়া ধরে রাত্রির কালোরূপ !

এম্‌নি করিয়া কতখানি আসিয়াছে, অঞ্জনের হুঁস নাই, রাস্তার এক বাঁকের মুখে আসিয়া পড়িল। সেখানে কতকগুলি গাছপালা, চারিদিকে আবছাওয়া ! তাহারই ভিতর দিয়া তাহার পথ—যাত্রার নির্দ্দেশ। দুই একটী গাছ পিছন করিয়া যেম্‌নি পা ফেলিবে, চমকিয়া উঠিয়া দেখিল—সুমুখেই একটি গাছে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া একটী তরুণী—নারীমূর্ত্তি ! তাহার মুখে আবরণ—নতমুখী !

পথে অবরোধ !

খানিক পিছাইয়া আসিয়া অঞ্জন প্রশ্ন করিল, "আপ্‌নি কে ?"

'মেয়েটী' কথা কহিল না। শুধুই হাত দুইটী জড় করিয়া তাহার দিকে প্রসারিত করিল. যেন কি-এক মর্ম্মান্তিক নিবেদন !

অঞ্জন পুনশ্চ কহিল, "রাস্তা ছাড়্‌ন !"

মেয়েটী এবারেও তেম্‌নি নীরব।

"শুনছেন ?—"

অঞ্জনের মুখের কথাটা শেষ হইতে না হইতেই, 'মেয়েটী' সহসা অঞ্জনের পদমূলে ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়িল।

পায়ে সরীসৃপ ঠেকিলে মানুষ যেমন চমকিয়া লাফ দিয়া পা ঝাড়িয়া সরিয়া আসে অঞ্জনও তেম্‌নি পিছাইয়া আসিয়াই আপন মনে বলিয়া উঠিল, "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি—"

'মেয়েটী' হাতে ভর দিয়া ঈষৎ একটু নিজেকে উঠাইয়া একান্ত কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "প্রার্থনা—"

"প্রার্থনা ?"—অঞ্জনের বুকের ভিতর আঘাত পড়িল। এক শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের সাধনায় সে নিজেকে উৎসর্গ করিয়াছে—প্রার্থনায় কাতর জীবকে দেখিয়া সে পিছাইয়া আসিবে কি করিয়া ? অগ্রসর হইয়া কহিল, "নিবেদন করুন !"

"সন্তান—"

দ্বিধা হও বসুমতী ! অঞ্জন থর্‌থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল—একি ! পশ্চাৎ ফিরিয়া তাকাইল—কোথায় তার মঠ, কোথায় তার অধ্যক্ষ, কোথায় তার 'মহাপ্রা' ? সে কি পলাইয়া আত্মরক্ষা করিবে ! কিন্তু পা ভাঙিয়া পড়িল—তাহার ধর্ম্মের রীতি ইহা ত নহে ! মৃত্যুর মুখে ভিক্ষু নিজেকে বলি দেয়—পশ্চাৎপদ হয় না ত ! তবে ?

* * * কম্পিতনেত্রে 'মেয়েটীর' দিকে চাহিয়া কহিল, "ক্ষমা করুন !—আমি সন্ন্যাসী—"

মেয়েটীর মাথাটা যেন মাটির উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। লজ্জা-জড়িত কণ্ঠে কহিল, "আর কিছুই না ! শুধু এই একটি রাত্রির জন্য আজ আমি আপনার স্ত্রী—আপনি স্বামী !"

বিষ ! হাতের গোড়ায় যদি বিষ থাকিত, অঞ্জন নিশ্চয়ই তাহা পান করিত ! কিন্তু নাই, সুতরাং সে নিরুপায় ! একদিকে তাহার জীবনে সন্ন্যাস, অপর দিকে ধর্ম্মের নামে এই প্রার্থী ! আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া কণ্ঠে জোর দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি—" তার পর মুহূর্ত্তে নিজেকে সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "এই নাও মা—আজ হ'তে আমিই তোমার সন্তান !"

বলিয়াই যেমন সে মেয়েটীর পদতলে নত হইয়া পড়িতে গেল, একটী গাছের আড়াল হইতে অকস্মাৎ কঙ্কণ বাহির হইয়া অঞ্জনকে ধরিয়া ফেলিল। অতঃপর অঞ্জনের মুখের কাছে মুখ আনিয়া এক মুখ হাস্যোজ্জ্বল আলো ফেলিয়া কহিল, "না নন্ ; উনি শ্রীমৎ পিতাঠাকুর !" বলিয়াই আবার হাসিয়া উঠিয়া "মেয়েটীর" মুখের গুণ্ঠন খুলিয়া দিল—সে নন্দন !

অঞ্জন লজ্জায় পড়িয়াছিল ; কি বলিবে, কি করিবে ঠিক করিতে না পারিয়া কঙ্কণের মুখের দিকে মূঢ়ের ন্যায় তাকাইতে, কঙ্কণ সুস্থির কণ্ঠে কহিল, "আমরাই ঠকিয়াছি !"

এক বিস্ময় ! অঞ্জন চিত্রার্পিতের ন্যায় মিনিট খানেক চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল, "কেন ?"

কঙ্কণ এক অর্থপূর্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া জবাব দিল, "যে বস্তু জন্মের মতই ত্যাগ করেছ, তার প্রয়োজনে অবহেলা তাকে তুমি করলে না ! স্ত্রীলোক জেনেও তবুও ঝাঁপিয়ে পড়লে !"

অঞ্জন নতমুখ হইয়া নির্লিপ্ত কণ্ঠে কহিল, "আমি ভিক্ষু !"

"তুমি নির্ব্বোধ ! এ মাটী তোমার নয় ! এখানে উৎসব—এখানে রাজা !" বলিয়াই কঙ্কণ নন্দনের হাতে এক টান দিয়াই চলিয়া গেল।

চার

সেই রাত্রেই, দ্বিতীয় প্রহরে সুবৃহৎ এক পুষ্পবাটিকায় উৎসবের এক বিরাট অনুষ্ঠান চলিয়াছিল। সম্ভ্রান্ত মহল—ইঁহারাই এখানকার নির্ব্বাচিত অতিথি। দেখিলেই মনে হয়—অজস্র আলেখ্য, সুন্দর নরনারী—তাহাদেরই মেলা। এই উৎসব আনন্দের মধ্যেও যেন নির্জ্জন কারাবাস ভোগ করিতেছিল—মাত্র একজন—সে কঙ্কণ। একান্তে বসিয়া কি ভাবিতেছিল, সেই-ই জানে ! সম্মুখে, পার্শ্বে, চতুর্দ্দিকে—আসর জুড়িয়া মানুষের কলরব, মানুষের প্রীতি-বিনিময়, মানুষের দৌরাত্ম্য ; কিন্তু একমনে বসিয়া কঙ্কণ—কোনোও দিকে তাহার লক্ষ্য নাই ; আসক্তি নাই—যেন তাহার সৌখীন আত্মা কোথায় নিরুদ্দেশে দৌড় দিয়াছে। এম্‌নিই সময়ে একটি তরুণী ভিতর হইতে বাহির হইয়া তাহার কাছে সরিয়া আসিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, "একলাটি এখানে থাকতে নেই !"

কঙ্কণ চম্‌কিয়া চাহিল, দেখিল—মেয়েটির অঙ্গে রূপ আর ধরে না, প্রতিভা মুখ বহিয়া ছাপাইয়া পড়িতেছে। কহিল, "আপ্‌নি কে ?"

মেয়েটি মুখ টিপিয়া হাসিল, কহিল, "নাগরিকা।"

কঙ্কণ মুখ নামাইল।

নাগরিকা পুনশ্চ কহিল, "বাসর সাজিয়েছি—উৎসবের রাত্রি ! আসবে না ?"

"না।"

"না—কেন ?" বলিতে বলিতে উনিশ-কুড়ি বছরের একটি মেয়ে বিদ্যুতের ন্যায় উভয়ের সুমুখে আবির্ভূত হইল। মুখে তাহার হাসি, চোখে তাহার হাসি !

নাগরিকা বিহ্বল হইয়া পড়িল। হঠাৎ তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল—'এত রূপ !' পরমুহূর্ত্তেই আবার নিজেকে সংযত করিয়া লইল। আবার কঙ্কণের দিকে ফিরিয়া আড়চোখে চাহিয়া তারপর ওই মেয়েটির দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া কহিল, "ওঃ ! তাই ব-লুন !" আর দাঁড়াইল না।

হেতু ছিল না, তথাপি কঙ্কণের মুখের উপর যেন এক অপরাধের ছায়া পড়িল। তাড়াতাড়ি নিজেকে সহজ মাত্রায় দাঁড় করাইয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিয়া উঠিল, "পারলে আস্‌তে ?"

মেয়েটি যেন কি খোঁচা মারিয়া কহিল, "ছিল ত একজন !"

"চিত্রা—"

"কঙ্কণ—"

এরপর কি জবাব, কহিবার কি কথা—কঙ্কণের যেন জিহ্বাগ্রে আসিয়াই থামিয়া গেল। একদৃষ্টে চিত্রার দিকে ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকিয়া ইঙ্গিতে নির্দ্দেশ করিল—'বোসো' !

চিত্রা বসিল, পাশাপাশি—কঙ্কণের হাতটি কোলের উপর টানিয়া। কিন্তু, কথা নাই কাহারো মুখে, পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চায়, মুখ টিপিয়া হাসে—আবার মুখ নামায়। এম্‌নি করিয়া কতক্ষণ কাটিয়াছে, তাহা তাহাদের হুঁস্ নাই। যখন হুঁস্ হইল তখন উভয়েই টের পাইল—অবসন্ন কঙ্কণ, আর তাহারই বুকের উপর হেলিয়া পড়িয়া চিত্রার অলস—অবশ দেহ।

এম্‌নি সময়ে তাহাদের চোখে পড়িল, সুমুখের একটি কুঞ্জে কয়েকজন পুরুষের মধ্যে নৃত্যরতা সেই নাগরিকা !

এই দৃশ্যে যেন বা আগুনের ঝাঁঝ ছিল, কঙ্কণের চোখে আসিয়া লাগিল। তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "চলো—এখান থেকে উঠে যাই—"

"কেন ?"

"দেখ্‌ছ না ?"

চিত্রা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "বেশ্ ত !"

কঙ্কণ কোন জবাব না দিয়াই চিত্রাকে টানিয়া তুলিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু, মনোমত স্থান—ইহা আর কঙ্কণের মিলে না। যেখানেই পা বাড়ায়, সেইখানেই সেই একই দৃশ্য—বিভীষিকার সেই একই মৃত্যু মধুর ছবি! কঙ্কণের তাহা চোখে পড়ে, আর অম্নি চিত্রাকে সজোরে বুকের কাছে টান দেয়!

এম্নিভাবে বহুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরিয়া-ফিরিয়া এক পত্রপুষ্পের ছাউনির কাছাকাছি হইতেই, ভিতর হইতে কে একজন ডাকিয়া উঠিল, "কঙ্কণ—"

কঙ্কণ চাহিয়া দেখিল—নন্দন।

ভিতরে এক বিরাট আসর। খণ্ড-খণ্ড মসৃণ প্রস্তর বেদী, প্রত্যেকটির উপর সুচিক্কণ বস্ত্রাবরণ, আর প্রত্যেকটির উপর সাজান নানাবিধ আহার্য্য—এক-একজনের মনোনিবেশ এক-একটি পাত্রের উপর।

নন্দন ছিলাকাটা ধনুকের ন্যায় লাফাইয়া উঠিয়া এর-ওর ঘাড়ে পড়িয়া ভোজনপাত্র ইত্যাদি-প্রভৃতি যথাসম্ভব ফেলিয়া ছড়াইয়া ছিট্কাইয়া বাহির হইয়া পড়িল। তারপর এক ছুটে কঙ্কণের কাছে আসিয়া তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, "এসো—"। চিত্রার দিকে ফিরিয়া হাসিমুখে কহিল, "আপনারও যথারীতি—" বাকী কথাটা আকারে ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়া ভিতরকার পথ দেখাইল।

আপত্তি ছিল না। কঙ্কণ ও চিত্রা নির্দ্দিষ্টপথে অগ্রসর হইল এবং ভিতরে প্রবেশ করিয়াই উভয়ে থম্কিয়া দাঁড়াইল—সেই নাগরিকা, এখানেও!

নাগরিকার লক্ষ্য তাহা এড়াইল না। সে চোখের পলকে সকলকে ফুঁড়িয়া আসিয়া কঙ্কণের হাত্‌টা খপ্ করিয়া ধরিয়া ফেলিল, তারপর চিত্রার দিকে একটিবার আড়চোখে চাহিয়াই মুচকিয়া হাসিয়া কঙ্কণকে কহিল, "স্বাগতং—

কঙ্কণ তাড়াতাড়ি হাত ছাড়াইয়া একটু পিছাইয়া গেল।

মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না। নাগরিকা তেম্নি করিয়াই কহিল, "ভয় নেই! মেয়েমানুষ বটে—আমরা সস্তা নই!" মুখটি চিত্রার দিকে ফিরাইয়া কহিল, "বলুন ত—হ্যাঁ, কি, না?"

চিত্রা মুখ নামাইয়া লইল।

এইবার কঙ্কণ কথা কহিল। বলিল, "এখানেও আপ্‌নি?"

এর সরল জবাব নাগরিকার মুখে যেন প্রস্তুতই ছিল। কহিল, "যেহেতু আপ্‌নিও এখানে।" তারপর চিত্রার দিকে ফিরিয়া কহিল, "এসো ভাই—" বলিয়াই চিত্রাকে টানিয়া লইয়া গিয়া স্বীয় পার্শ্বে বসাইল। কঙ্কণও মন্ত্র-চালিতের ন্যায় চিত্রার অপর পার্শ্বে গিয়া বসিয়া পড়িল। তখন আর-আর সকলেই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

এইবার পালা পড়িল নন্দনের। বক্তৃতা দিবার ভঙ্গি করিয়া কঙ্কণও চিত্রার পরিচয় দিয়া দিল—"ইনি বর, ইনি কনে—"

উচ্চ হাসিয়া সকলে বলিয়া উঠিল, "তাই না কি?"

নন্দন গম্ভীর হইয়া কহিল, "বাকী—মালা-বদল!"

নাগরিকা মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, "তাও কি লোক-দেখিয়ে!"

চিত্রার মুখখানা আরক্ত হইয়া উঠিল। তাহা চোখে পড়িতেই নাগরিকা যেন এক বিজয়-গর্ব্বে বলিয়া উঠিল, "পেয়েছি জবাব?"

পুরুষ-মহল সাগ্রহে জানিতে চাহিল—"প্রশ্নের?"

"হ্যাঁ!"

"কে?"

নাগরিকা নিজের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া গম্ভীর-কণ্ঠে কহিল—"নাগরিকা।"

অপর পক্ষ নাগরিকার দিকে চাহিয়াই ছিল, এইবার যেন তন্ময় হইয়া গেল।

রহস্যটা কঙ্কণকেও আচ্ছন্ন করিল। মূঢ়ের ন্যায় নাগরিকার দিকে তাকাইতেই নাগরিকা একমুখ হাসিয়া কহিল, "শুন্‌বেন?—এঁরা আমাকে জিজ্ঞেস্ করেছেন—'ইহলোকে কাব্যের প্রতিমূর্ত্তি কে?' আমার জবাব—'অহং!'"

"আপ্‌নি?"

"একশো-বার!—বলিয়াই নাগরিকা কঙ্কণের প্রতি এক মধুর কটাক্ষ করিল। তারপর চিত্রাকে দেখাইয়া যেন এক অকাট্য প্রমাণ দিয়া কহিল, "দেখুন চেয়ে—ওঁর ওই মুখ! উনি 'নারী' আর আমি ওঁর 'বাণী' স্ত্রীলোকের বাক্যই পৃথিবীর কাব্য কিনা!" বলিয়াই উঠিয়া পড়িল।

চিত্রা এইবার কথা কহিল। নিছক ভদ্রতার খাতির, তাই—নাগরিকাকে বলিল, "উঠ্‌লেন?"

নাগরিকা কঙ্কণের পানে একটিবার চাহিয়াই চিত্রার দিকে ফিরিয়া জবাব দিল, "আর একদিন—তাদেরও মন যোগাতে হবে!" বলিয়াই হাসি চাপিয়া বাহির হইয়া গেল। চিত্রার মুখখানা ঘৃণায় বিকৃত হইয়া উঠিল।

ঠিক এম্‌নি সময়ে বাহির হইতে এক ক্ষীণ কণ্ঠের আওয়াজ আসিল, "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি"—

কঙ্কণ চম্‌কিয়া উঠিল, যেন এক অদৃশ্য প্রেতমূর্ত্তি অকস্মাৎ তাহার মুখে ছায়া মেলিয়া দিল। কঙ্কণের সেই আকস্মিক ভাবান্তর চিত্রার দৃষ্টি এড়াইল না। সে সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "কি?"

"কিছুই না" বলিয়া কঙ্কণ হাসিবার চেষ্টা করিল।

অতঃপর কঙ্কণ ও চিত্রা উভয়েই চোখ মেলিয়া দেখিল—সুমুখে দাঁড়াইয়া নাগরিকা, তাহার দুই হাতে দুইটি পাত্রে—ফলমূল—মিষ্টান্ন।

নন্দন বলিয়া উঠিল, "আবার চাঁদ উঠেছে!"

কঙ্কণ হাসিয়া নাগরিকাকে কহিল, "তাহলে বলুন—আপ্‌নি মিথ্যুক!"

নাগরিকাও সেই হাসিতে যোগ দিয়া কহিল, "কাব্য কি সত্যি হয়?" বলিয়া উভয়ের সুমুখে পাত্র দুইটি ধরিয়া দিল।

চিত্রা তখনো স্পর্শ করে নাই, কঙ্কণ মাত্র পাত্রে হাত দিয়াছে—ইত্যবসরে বাহিরে এক কলরব উঠিল। কঙ্কণের হাত আর মুখে উঠিল না, আতঙ্কে তার মুখখানা সহসা রক্তহীন হইয়া গেল!

চিত্রারও বুকখানা কাঁপিয়া উঠিল। কহিল, "অমন হয়ে গেলে?"

কঙ্কণ জবাব দিল না, যেন তাহার সমস্ত অনুভূতি বাহিরের জন-কল্লোলে কখন্ কোন্ ফাঁকে গিয়া মিশিয়া নীরব হইয়াছে।

চিত্রা জেদ্ ধরিল—"বল না?"

ঠিক এম্‌নি সময়ে একজন বাহির হইতে আসিয়া খবর দিল—এক উচ্ছৃঙ্খল জনতা এক ভিক্ষুকে ধরিয়া—

স্বামীর পাতে ভাত দিতে আসিয়া স্ত্রীর যদি কাণে যায়—তাহার সন্তান রাস্তায় গাড়ি চাপা পড়িয়াছে, তখন যেমন সে ভাতের থালা আছড়িয়া ফেলিয়া দিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া বাহির হইয়া যায়, ঠিক তেম্‌নি করিয়াই কঙ্কণ উন্মত্তের ন্যায় উঠি-পড়ি করিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, তাহার সমস্ত আকর্ষণ!

পাঁচ

প্রথম প্রতিবাদ প্রতিহত করিয়া অঞ্জন সেই যে সোজা রাস্তায় পড়িল, তারপর সে আর বাধা পায় নাই। শান্ত রাত্রির পথঘাট হইলে কি হইত বলা যায় না, কিন্তু ওই আত্মবিকৃত জনপদের পথে কেহই তাহাকে লক্ষ্য করে নাই, করিলেও ভ্রূক্ষেপ করে নাই। সুতরাং নির্ব্বিবাদেই অঞ্জন এতক্ষণ খুঁজিয়া আসিয়াছে তাহার লক্ষ্যের বস্তু।

ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া রাত্রিতে অঞ্জন ওই পুষ্প বাটিকার প্রবেশ পথে আসিয়া পড়িতেই এক নরবাহিনীর লক্ষ্য তীক্ষ্ণ ও রুক্ষ হইয়া তাহার উপর পড়িল—ভিক্ষু! তারপর তাহাকে ঘিরিয়া যাহা সুরু হইল তাহারই বিবরণ ভিতরের ওই উৎসব-বাসরে এইমাত্র প্রচার হইয়াছে।

কঙ্কণ আসিয়া একবার থমকিয়া দাঁড়াইল, দেখিল একজন অঞ্জনকে ধরিয়া আছে, আর একজন তাহাকে মুহুর্মুহুঃ বেত্রাঘাত করিতেছে! মুহূর্ত্তও অপব্যয় হইল না, কঙ্কণ জনতার ভিতর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং অনুনয়ের মূর্ত্তি ধরিয়া দুই হাতে এক-একটা লোককে টানিয়া, ছুড়িয়া রাস্তা করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল; তারপর আততায়ীদ্বয়কে একটানে ঝট্‌কা মারিয়া নিক্ষেপ করিয়া এক হাতে অঞ্জনকে টানিয়া বুকের ভিতর পুরিয়া গুঁজিয়া রাখিল ও অপর হাতে অপরটার টুঁটি চাপিয়া ধরিয়া বজ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—'শয়তান!'

"ও নয়—" সঙ্গে সঙ্গে আর একটা হাত কঙ্কণের প্রসারিত হাতের উপর পড়িল।

কঙ্কণ চাহিয়া দেখিল—একখানি মুখ, রক্তে মাখামাখি! সে-মুখে অবিশ্রান্ত মিনতি।

পুনশ্চ দাবী আসিল, "ছাড়ো—"

"এরা রাক্ষস!"

অঞ্জন চম্‌কিয়া উঠিল, যেন ওই কলঙ্ক তাহারই মুখে পড়িয়াছে। কহিল, "বলতে নেই! মানুষ হয়ে মানুষের গায়ে হাত দিয়েছে—ওরা ভাগ্যহীন!"

কঙ্কণের হাতের মুঠি খুলিয়া গেল। আস্তে আস্তে বুক হইতে অঞ্জনকে খুলিয়া ঈষৎ দূরে সরাইয়া দাঁড় করাইয়া

তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল। করিয়াই আবার উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "ভিক্ষু—"

অঞ্জনের মুখে হাসির একটু আভা দেখা দিল। কহিল, "ওদের কিছু বলো না যেন!"

নিষেধ! ক্ষোভে ও দুঃখে কঙ্কণের মুখটা ভারি হইয়া ঝুলিয়া পড়িল। ক্ষণকাল মাটির দিকে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ মুখ তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "তোমার সর্ব্বাঙ্গে রক্ত—"

প্রশান্ত কণ্ঠে অঞ্জন জবাব দিল, "ওরা মানুষ, মানুষের এই কলঙ্ক আমি উঠিয়ে নিয়েছি!"

এক পরিচয়হীন বিস্ময়! কঙ্কণ ভাবিতে লাগিল—সেও মানুষ, আর সম্মুখের ওই মূর্তিটা? দেহে এর একদেহ রক্ত, বেত্রাঘাতে সর্ব্বাঙ্গ ফাটিয়া মাংস ঝুলিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু মুখে এক পরিপূর্ণ তৃপ্তি! কেন? মানুষের দেহে যে বিষ, তাহাই ও নিজে চুমুক দিয়া নিঃশেষ করিয়া মানব-সমাজের সকলকেই নির্ব্বিষ করিবে বলিয়া? * * * * নিষ্পলক নেত্রে ওই মূর্তিটার পানে চাহিয়া থাকিয়া ওর এই পরিচয়ই বুঝি বা কঙ্কণ গ্রহণ করিল যে, খাম-খেয়ালি সৃষ্টিকর্তা ঝোঁকে পড়িয়া একদিন কোনো এক অবসন্ন মুহূর্তে পৃথিবীতে খানিক পাপ, খানিক কলঙ্ক, খানিক আত্মহত্যা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, যাহা মানুষ একদিন আচম্কা লুট করিয়া নিয়াছিল—তিনিই আজ তাহা এই অবোধ ধরিত্রীবাসীর হাতে পায়ে ধরিয়া ফিরাইয়া লইতেছেন। অথবা পাপ, কলঙ্ক, আত্মহত্যা—ইহাও প্রয়োজন, মানুষের নয়—সৃষ্টিকর্তার! নতুবা মানুষের রূপ ধরিয়া পৃথিবীতে আসিয়া মানুষের মুখে মুখ রাখিবার তাঁর সুযোগ মিলে না!

এদিকে ওই রুক্ষ জনতা—উহাও যেন কঙ্কণের দিকে নিঃশব্দে তাকাইয়া আবিষ্টের ন্যায়! ভিক্ষুর প্রতি এই নির্য্যাতন—নূতন নয়, ইহা যেন তাহাদের ধর্ম্মের নির্দ্দেশ, রাজার অনুজ্ঞা। কোনও দিন প্রতিবাদ হয় নাই, বিদ্রোহ উঠে নাই। আর, আজ অকস্মাৎ এই বজ্রাঘাত হইল কেন? কঙ্কণকে সবাই জানে, জানে—ঐশ্বর্য্যে সে নৃপতি, সম্ভ্রমে অদ্বিতীয়! নগরের এক অতি বিশ্বাসী অধিবাসী সে! এ হেন লোক আজ এমন বাঁকিয়া দাঁড়াইল কেন, কোন হিসাবে? প্রত্যেকেরই হৃদ্‌পিণ্ডে যেন হাতুড়ির আঘাত পড়িতে লাগিল—কেন? * * *

একটু পরেই একজন লোক কঙ্কণের কাছে আসিয়া কহিল, "ও ভিক্ষু!"

কঙ্কণের চমক ভাঙ্গিল। আস্তে-আস্তে মুখ তুলিয়া লোকটার দিকে তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিল।

লোকটা পুনশ্চ কহিল, "আমাদের ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্য! ও তার শত্রু!"

কঙ্কণের মুখখানা সহসা কঠিন হইয়া উঠিল। কহিল "আর মানুষের ধর্ম্মে তোমরা ঘাতক!"

ঠিক এই সময়ে কোথা হইতে এক খণ্ড পাথর সজোরে আসিয়া অঞ্জনের মাথায় লাগিতেই সে ঘুরিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

কঙ্কণ আর্ত্তনাদ করিয়া তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। দেখিল—তাহার চেতনা নাই!

অতঃপর যেমন করিয়া নিপুণ চিত্রকর তাহার সমস্ত ছবিটার পানে চোখ ফেলিয়া তন্ময় হইয়া থাকে, ঠিক তেম্‌নি করিয়াই কঙ্কণ সেই বান্ধবহীন "রণক্ষেত্রে" এক সার্থক মানব মূর্তির দিকে নির্ণিমেষ নেত্রপাত করিয়া রহিল। কতক্ষণ রহিল তাহা সে জানে না, অকস্মাৎ এক সময় জানিতে পারিল—এক মূর্ত্ত মানবাত্মার প্রয়োজনহীন অচেতন দেহ কাঁধে তুলিয়া নিঃশব্দে পা বাড়াইয়া-বাড়াইয়া সে চলিতে সুরু করিয়াছে। তখন অপর পক্ষের আর কেহই সেখানে নাই।

ছয়

এদিককার উৎসব বন্ধ ছিল মাত্র ততক্ষণ, যতক্ষণ কঙ্কণ উহাদের চোখের আড়াল হয় নাই। তারপর আবার তেমনই কলহাসি, তেমনিই মাতামাতি, তেমনিই সমস্ত শব্দ।

নীরব হইয়াছিল মাত্র একজন—সে চিত্রা। এতক্ষণ সে সকলের সুমুখেই বসিয়াছিল। একটু পরে উঠিয়া গিয়া এককোণে একখানা কাষ্ঠাসনে বসিয়া পড়িল। তাহার মুখ চোখের ভাব দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে, তাহার অন্তস্থলে এক ঝড় বহিয়াছে—যাহার উৎপত্তি বহির্ম্মুখ—নিরুদ্দেশ অনর্থের মূলে। দেখা গেল মুহুর্মুহুঃ তাহার মুখের রং পরিবর্ত্তন হইতেছে। একসঙ্গে অভিমান, রোষ, অনিশ্চিত গুরুতর এক সংকল্প—পরস্পর পরস্পরের প্রতি রেষারেষি করিয়া তাহার মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে।

স্বর্গের দেবতারা অমর হইয়াছেন অমৃত পান করিয়া।

কিন্তু এই বস্তু তাঁহাদের মুখে উঠিত না, যদি না নারী বলিয়া ত্রিলোকে একটি মূর্তি থাকিত! দেব-শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ এক পুরুষকে ঠকাইয়া স্বর্গের মুখ রাখিতে কিছুতেই পারিতেন না, যদি না তিনি ধরিতেন নারীরূপ! অর্থাৎ ইহলোকের মানুষ ত তুচ্ছ, স্বর্গের দেবতারাও ঋণ করিয়াছেন নারীর কাছে—তার মূর্তি, তার রূপ, তার ঠমক! সুতরাং এ হেন নারীজাতির এক চরম প্রতিনিধিকে পিছন করিয়া কঙ্কণ যে নির্ব্বিবাদে বাহির হইয়া গেল, সে ত্রুটী চিত্রা কেমন করিয়াই বা সহিয়া যাইবে? কাজেই স্বর্গের দেবতা, পৃথিবীর মানুষ, পাতালের রাক্ষস—কেহই বুঝি তাহার কাছে আর নিস্তার পাইবে না।

আর নন্দন? কোথা হইতে কি হইয়া গেল, তাহা সে [illegible] ঠিক করিতে পারে নাই। একটু পরেই সুস্পষ্ট [illegible]—ইহা আর এক বিভ্রাট! চিত্রা যখন ও-ধারে [illegible] আসন গ্রহণ করিল, নন্দনেরও চোখের গতি সেই [illegible] চিত্রার উপর ফিরিয়া বিঁধিয়া রহিল। কিন্তু সে [illegible]ক্ষণ! চিত্রার কাছে উঠিয়া গিয়া ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আপনি বসুন, আমি আস্‌ছি—"

চিত্রা মুখ গুঁজিয়া বসিয়াছিল। মুখ তুলিয়া তাকাইতেই, নন্দন আবার বলিয়া উঠিল, "ওঁকে খুঁজিয়া আনি, এই [illegible] বলে—"

প্রস্থানোদ্যত হইতেই চিত্রা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বাধা দিয়া কহিল, "না। কাউকে তিনি নিমন্ত্রণ করে যান নি!"

নন্দন তাহা হাড়ে-হাড়ে জানে। মুখখানা ম্লান করিয়া কহিল, "আমাদের বরাত!"

পুনশ্চ বাহিরের দিকে পা ফেলিতেই চিত্রা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং শাসন কঠিন কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমার নিষেধ!"

এইবার নন্দন একটু থতমত খাইয়া গেল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আপন মনে বলিয়া উঠিল, "যেমন পুতুল, তেমনি নাচ!"

টিপ্পনির জবাব দিল—নাগরিকা। ওদিক হইতে এদিকে যেন উড়িয়া আসিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "নইলে কি মেয়েমানুষের দর বাড়ে?" চিত্রার দিকে ফিরিয়া মুখের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া কহিল, "নিজেকে অত হাতছাড়া কোরো না!"

নাগরিকার বেচাল কিছু না দেখিলেও, চিত্রার মনে এক স্বাভাবিক ধারণা ছিল—নিছক কলঙ্কই এদের পরিচয়! সুতরাং নাগরিকার এই অযাচিত আত্মীয়তা চিত্রার বিসদৃশ ঠেকিল। তাহার দিকে সে দৃষ্টিপাতও করিল না, বসিয়া পড়িল।

কিন্তু নাগরিকা ছাড়িবার পাত্রী নয়। চিত্রার পানে কৌতুক কটাক্ষ করিয়া নন্দনকে হাসিয়া কহিল, "মেয়েমানুষের যা নিষেধ তাই অনুমতি! সুতরাং—"

কথাটা শেষ হইতে-না হইতেই নন্দন গোটা কয়েক লাফ মারিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে চিত্রারও মুখ চোখ আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। যেন খুব রাগিয়া উঠিয়াছে এমনি ভাব দেখাইয়া বলিয়া উঠিল, "কাউকে আমি ডাকিনি—আপনি এলেন কেন?" বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিয়া হাঁটুর ভিতর মুখ গুঁজিল।

নাগরিকা সুমুখে বসিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কহিল, "কেন এলাম?—তোমার আশীর্ব্বাদ কুড়োতে!"

"মিথ্যে কথা!" চিত্রা একবার মুখ তুলিয়াই আবার নামাইয়া লইল।

নাগরিকা সহাস্যে কহিল, "না! ঠকিয়ে জয় করতে আমাকে কেউ পারেনি, তুমিও পার না।"

তীর্থ-প্রত্যাগত যাত্রীর মুখে নানারূপ লৌকিক-অলৌকিক দেবমাহাত্ম্য শুনিয়া অল্পবয়সী বউ-ঝির মনে যেমন শিহরণ জাগে, ঠিক তেমনি ধারা চিত্রা চমকিয়া নাগরিকার মুখের দিকে তাকাইল—কি যেন প্রশ্ন করিবে, কি যেন বুঝিয়া লইবে, কিন্তু বুকে ভাষা নাই, মুখে কথা নাই!

বুঝিতে পারিয়া নাগরিকা স্মিতমুখে কহিল, "ও চোখ আমি চিনি, আসলে তুমি মেয়েমানুষ! তোমার যা গর্ব্ব, তোমার কাছে তা' তুমি রাখনি!"

কথা কহিবার প্রবৃত্তি নাই। যেন আপনিই চিত্রার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল—"কি?"

নাগরিকা আজ বুঝি বা নারীজীবনের অভিধান খুলিয়াই বসিয়াছে। তৎক্ষণাৎ কহিল, "ভালবাসা!" অতঃপর মনোমত এক কটাক্ষ করিয়া আবার সুরু করিল, "বিধাতার দান এ বস্তু—পরকে বিলিয়ে বুক খালি করবার অধিকার তোমার নেই! বলতে পার, কতখানি নিজেকে ভালবেসেছ তুমি?"

চিত্রা মুখ নামাইল।

বলিয়া উঠিল, "একটুও না। কিন্তু ভেবে দেখ, তোমার পরমাত্মীয় কে—তুমি নিজে, না আর কেউ?"

চিত্রা এবার আর নিজেকে সংযমের গণ্ডীর ভিতর রাখিতে পারিল না। প্রতিবাদ করিয়া বলিয়া উঠিল, "মেয়েমানুষ নিজের জন্যে জন্ম নেয় না। তাই বোলেই সে মেয়েমানুষ!"

"আর তাই বোলেই তার চোখে অত জল!" বলিয়াই নাগরিকা থামিল। ক্ষণপরেই কি যেন মনে করিয়া আবার বলিয়া উঠিল, "নিজেকে ঠকিয়ে পরকে বশ করা যায় না! নারী—তার আর একটী নাম 'প্রেম'। প্রেমকে হাতছাড়া করলে নারী হয় অ-নারী।"

চিত্রার বুকে যে সৎ চেতনটির অবশিষ্ট ছিল তাহা আগুনের আঁচ্ লাগার মত বাষ্প হইয়া উঠিয়া গেল। দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া ঘা দিয়া বলিয়া উঠিল "ওকথা তোমারই মুখে মানায়, কেননা তুমি—"

"গণিকা, কুলটা—বলে যাও!"—নাগরিকা একমুখ হাসিয়া উঠিল। তারপর গম্ভীর হইয়া কহিল, "আজ আমি প্রতিমা! জগতের একটি মেয়েও বলেছে—'তুমি আমাদের নও'!"

চিত্রা এইবার অপ্রতিভ হইয়া পড়িল! মেয়েটি তাহার আত্মীয়া নহে—অনর্থক মনান্তর ওর সঙ্গে কেন? অনুতপ্ত কণ্ঠে নাগরিকাকে কহিল, "ক্ষমা করবেন! মেয়েমানুষ আমিও! আপনার ও-অপবাদ অন্ততঃ আমার কাছ থেকে আপনি নেবেন না!"

নাগরিকার মুখে তেমনিই হাসি, তেমনিই নির্ভয়। কহিল, "দিলেও নেব না। নিলে, কি হবে জানো?—তোমার মত, আমাকেও অমনি হয়ত একদিন হাতছাড়া করতে হবে!" একটু থামিয়াই আবার সুরু করিল, "জীবন যাত্রা এই তোমার সুরু হয়েছে, তাই এই কথাটাই তোমাকে বলে রাখছি বোন্—মেয়েমানুষের জন্ম আত্মরক্ষা করতে, আত্মহত্যা করতে নয়!"

চিত্রার ভিতরটা আবার ভেস্তা হইয়া গেল। প্রশ্ন করিল, "তার মানে?"

"মানে? তুমি মেয়েমানুষ—ভালবাসার প্রতীক! যতটা ভালবাসা পরকে বিলিয়ে দেবে, নিক্তির ওজনে ঠিক ততটাই তছরূপ করবে নিজেকে! আর ততটাই হবে—শ্রীহীন!"

"সেই যে—তৃপ্তি!"

"না—চোখের জল।"

বুঝি বা ইহার স্বপক্ষে কথা নাই, বিপক্ষেও প্রতিবাদ নাই। তাই চিত্রা মূঢ়ার ন্যায় তাকাইতেই, নাগরিকা কথাটার অর্থ করিয়া দিল। কহিল, "বুঝলে না? আচ্ছা এসো আমার সঙ্গে—" বলিয়াই উঠিয়া প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে এক প্রস্ফুটিত পুষ্পের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। চিত্রাও মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। পুষ্পটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিল, "এর কাছে আমরাই আসি—এ নিজে যায় না! অর্থাৎ মানুষই ভালবাসে একে—মানুষকে এ ভালবাসে না! মানুষের স্পর্শে—এর হয় মৃত্যু! অস্বীকার কর?"

চিত্রা ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—'না।'

নাগরিকা সগর্ব্বে বলিয়া উঠিল, "মেয়েমানুষ অবি‍ল এদের জাত! যার গরজ পড়বে—ভালবাসা সেই দে‍ !আমরা মেয়েমানুষ, গ্রহণ করবো—আলগোছে!"

চিত্রার মনের ভিতর পুনশ্চ বিদ্রোহ দেখা দিল। কহিল, "অপরাধ হয়!"

নাগরিকাও প্রস্তুত হইয়াছিল। তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "হয় না! দেবার মেয়েমানুষের হাতে কিছুই নেই—অহঙ্কার!"

"অহঙ্কার?"

"হ্যাঁ! দান তুমি আমি করতে পারিনে!"

চিত্রা বুক ভরিয়া ভালবাসা রাখিয়াছে, কাহার জন্য? নিজের জন্য ত নয়! যাহার কাছে বসিয়া তৃপ্তি, কথা কহিয়া তৃপ্তি—দেহ, রূপ—অন্তর-বাহির সমস্তই যাহাকে নিবেদন করিয়া তৃপ্তি, তাহাকে সে কেমন করিয়া বলিবে—'আমি তোমার নই, তুমিই আমার'! তটিনীর যে-নিবেদন আবহমান কাল ধরিয়া স্রোত বহিয়া প্রিয়তমের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে, নারীসমাজের এই অনিশ্চিত, অস্থায়ী অমাময়ী মেয়েটার হাতছানি মানিয়া কেমন করিয়া সে আবার মুখ ফিরাইয়া উজান বহিয়া চলিয়া আসিবে? তাহা সে কি পারে? না ত!

চিত্রার বুকের ভিতরটা মুচ্ড়িয়া উঠিল। আশে পাশে চারিদিকে ছিন্ন চাহনি ফেলিয়া নাগরিকার দিকে ফিরিয়া হঠাৎ কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিয়া উঠিল, "না, না! ...ান' নয়—'নিবেদন'!"

ইত্যবসরে পশ্চাতে কাহার পদশব্দ হইতেই উভয়ে ...মকিয়া উঠিল। ফিরিয়া দেখিল—নন্দন!

নন্দন যেন ঝড় মাথায় করিয়া আসিয়াছে। আসিয়াই ...হা বিবৃত করিল, তাহার মর্ম্মার্থ ইহাই যে—সহস্রাধিক ...র-ঘাতকের হাত ছাড়াইয়া এক ভিক্ষুকে বাঁচাইতে গিয়া ...ক্ষণের মাথার খুলিটা উড়িয়া গিয়াছে। তারপর কাহিনীটা ...মাপ্ত না করিয়াই যেমন প্রস্থান করিবে, নাগরিকা বাধা দিয়া কহিল—"দাঁড়ান—"

নন্দন বিপদে পড়িল। বলিয়া উঠিল, "ওই যে ছাই ...লাম—'ইতি গজ'টা বাদ দিয়ে!"

"কোথায় তিনি?"

"বাড়ীতে। এতক্ষণ আছে, কি নেই—" নন্দন আর ...পেক্ষা করিল না।

তখন চিত্রার দিকে আর চাওয়া যায় না। একটি ...ায়, একটি যমুনায় এত বড় ভারতবর্ষের অভাব বুঝিবা ...টে না, তাই তাহার চক্ষু দুইটি দিয়া আর একটি করিয়া ...িত্র তটিনী এখনি যেন প্রবাহিত হইবে! ক্ষণকাল ...টির দিকে স্থির-নেত্র হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া নাগরিকার ...নে একটিবার তাকাইল; তারপর আস্তে আস্তে গাত্র হইতে অলঙ্কারগুলি এক এক করিয়া খুলিয়া কহিল, "আমার একটি অনুরোধ রাখবেন?"

নাগরিকার মুখ দেখিয়া মনে হইল যেন তার বিস্ময়ের অবধি নাই। কহিল, "কি?"

"এইগুলো যদি রেখে দেন!"—চিত্রা দুই হাত ভরিয়া অলঙ্কারগুলি নাগরিকার সম্মুখে ধরিল!

নাগরিকা কহিল, "আমি?"

"হ্যাঁ!"

"কিন্তু, আমি যে প্রতিমা!"

চিত্রার মুখে যেন কে কালি ঢালিয়া দিল। অপ্রতিভ হইয়া কহিল, "আজ উৎসবের দিন—দীন-দরিদ্রকে দেবেন!"

"ভালো কাজ! কিন্তু, হঠাৎ এমন গা খালি করলে?"

ম্লান হাসিয়া চিত্রা জবাব দিল, "সেজেগুজে আর তাঁর সুমুখে দাঁড়াতে পারিনে!"

"তোমার অপরাধ?"

"পাপ—ভেতরের!"

বলিয়াই চিত্রা অলঙ্কারের গোছাটা নামাইয়া রাখিয়া অবসন্নার ন্যায় বাহির হইয়া চলিতে সুরু করিল, যেন তাহার সম্মুখে পড়িয়া এক পৃথিবী পথ, সে-পথ, আর ফুরাইবে না।

(ক্রমশঃ)

প্রলয় বরাভয়

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

...শ্বজুড়ে' পাপের আগুন উঠলো জ্বলে হিংসা এবং রক্তে
মানবনারী উঠছে কেঁদে নিত্য—হা—হা—ছন্দে,
...াপন পাপে দগ্ধ সবে ছুটছে মাগি' দেহের লাগি' শান্তি
কাঁপছে মহাশূন্য—নিখিল ভরলো নিরানন্দে।

...ক্ষ হাজার বৎসরেরি লক্ষ কোটি পাপের কালো ধূম্রে
এই জীবনের পাতাল থেকে উঠলো জ্বলে অগ্নি,
...ষ্টিতে আজ ঊর্দ্ধশিখায় লক্লকিয়ে উঠ্ছে তারি জিহ্বা
রক্ষা নাই আজ বিশ্বে কোথাও—কাঁদছে ভ্রাতা ভগ্নী।

ছুট্ছে সবাই লক্ষ্যহারা জান্ছে না কো মিলবে কোথা আশ্রয়
চৌদিকেতে অট্টহাসি প্রলয় দেছে লম্ফ,
ঝড়ের দাপে গর্জ্জে মড়ক মত্ত রোষে গর্জ্জে' আসে বন্যা
পায়ের তলায় অট্টহাসি তুলছে ভূমিকম্প।

কোথায় যাবে ঠাঁই যে নাহি, মাথার 'পরে আকাশ ছেড়ে ঊর্দ্ধে
রক্ত আঁখি চাইছে গ্রহ চাইছে রোষে সূর্য্য,
নরের পাপের অগ্নিদাহে পাহাড় সম উঠ্ছে ফুলে সিন্ধু
মৃত্যুদানব চৌদিকেতে বাজায় ঘনতূর্য্য।

সঞ্চিত এই যুগের যুগের আপন পাপের উত্তাপেরি ধূম্রে
উঠ্‌লো জ্বলে অগ্নিতে এই প্রলয় রোষের মন্ত্র,
লক্ষ দিনের অবজ্ঞাতে ক্রুদ্ধ হোল দেবদেবী আজ স্বর্গে
রক্ষিতে আজ বিরূপ তারে আশীর্ব্বাদ আর মন্ত্র।

রক্ষা নাই আজ রক্ষা নাহি মানবনারী কাঁদছে হতভাগ্য
বিশ্বগ্রাসী অগ্নিতে এই সব্বাই তারা জ্বল্‌বে,
মিথ্যা কথা অত্যাচার আর হিংসাঘাতের রক্তঝরা বক্ষে
ধর্ম্মদেবের রুদ্র অভিসম্পাত আজি ফল্‌বে।

দুঃখহরা বারির পাথার শুষ্ক হোল কোন্ পাপে এই বিশ্বে
খুঁজ্‌লো না কেউ কোথায় সে পাপ রইল হয়ে গুপ্ত,
দেহের দেশের যাত্রী ওরা জান্‌লো না কোন্ ঊর্দ্ধটানের সূত্রে
বুভুক্ষার ওই সুধার ধারা আকাশে হোল লুপ্ত।

হাজার কোটি লক্ষপাপে অন্ধ তারা বক্ষে ক্ষত দগ্‌দগ্
তাই যে তাদের কর্ম্মজুড়ে রচল তারা অগ্নি,
তীর্থ নদীর পুণ্যসলিল বহ্নিদাহে করছে আজি টগ্‌বগ্
ভাইরের পাপে মরবে আজি বিশ্বে যত ভগ্নী।

আজ এই প্রলয়-পর্ব্ব-তলে বিশ্বে নিয়ে আশীর্ব্বাদের সরবৎ
জাগ্‌বে শুধু ভক্ত কবি এবং যোগীভক্ত,
জ্বলছে সারা সৃষ্টিখানা মর্ত্ত হবে রক্তে প্রলয়ক্ষেত্র
বিশ্বে যারা ভাগবত ওরে তারাই রবে শক্ত।

আগুন জ্বলে—আগুন জ্বলে—শুকিয়ে গেল মন্দাকিনী গঙ্গা
তপ্ত নিখিল ক্ষুধার দাহে মরণপথে গর্জ্জে,
দেখনু গো সেই অগ্নিমাঝে গুপ্ত হ'ে ভগবানের মূর্ত্তি
নরের লাগি নারীর লাগি' ঢালছে অভয় বর যে।

সর্ব্বনাশী পাপের তলে এই জীবনের গুপ্ত পূতিগন্ধে
মিথ্যা এবং অধর্ম্মেতে হয় নি যারা বিদ্ধ,
বিশ্বগ্রাসী এই প্রলয়ের সৃষ্টিনাশা অগ্নিলীলার বক্ষে
সেই নারী নর অজর অমর তারাই হবে সিদ্ধ।

দেখ্‌নু গো এই পাপ আগুনের প্রলয় দাহের শিখার রাঙা বক্ষে
রুদ্র ভগবানের কৃপা গোপনে রহি ছদ্ম,
মৃণাল হয়ে উঠ্‌ছে বেড়ে বিশ্বে নবীন আবির্ভাবের গন্ধে
নতুন মহা-সৃষ্টিলীলার ফুট্‌ল যে তায় পদ্ম।

সেই অতলের পদ্মহিয়ায় গুপ্ত রহি বাজাও তুমি বংশী
প্রকট হয়ে ঊর্দ্ধে তুমি শূল ধর আজ হস্তে,
গর্জ্জে উঠুক অগ্নিপ্রলয় নিয়ে তোমার ফুটুক রাঙা সৃষ্টি
অগ্নিতে আজ সাঁতার কেটে সূর্য্য যাউক অস্তে!

হিংসাঘাতে রক্তমাখা অধর্ম্মেতে দীর্ণ জরাজীর্ণ
কাজ নাহি আর বিশ্বে বেঁচে মনুর পচাবংশ,
জ্বলছে আগুন—জ্বলুক আজি—পূর্ণ আজি পাপের মহাযজ্ঞ
কান্না বৃথা—ধ্বংস আজি—ধ্বংস ওরে ধ্বংস!

প্রলয়-ভীত আর্ত্ত ওরে ধ্বংসমুখে বাঁচার বৃথা চেষ্টা
তার চেয়ে আয় প্রলয় শিবে চিত্ত সঁপে ডাক্‌বি,
ভাগ্‌বতেরি সঙ্গে এসে কান্না ভুলে' তাল বাজা আজ রঙ্গে
ধ্বংসমুখে বাঁচতে গেলে তারির সাথে বাঁচবি।

প্রহ্লাদ এবং পার্থসম বিশ্বে যারা সর্ব্বজয়ী বীরদল
আয় রে তারা তাল বাজা আজ জ্বলুক প্রলয় অগ্নি,
ঝড়ের নাচে বাজছে মাদল্—নাচছে ঈশান—
কাঁপছে মহী থর থর
বীরের মতন আয় রে দাঁড়া—আয় রে ভ্রাতা-ভগ্নী।

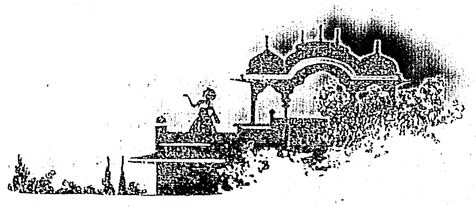

ডাক-ঘর

শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়

৩

পার্লামেণ্ট বারলামচীর হস্তে ডাকের কার্য্য ছাড়িয়া দিলে পর উইদারিঙ্গেস্ ইহাতে মহা আপত্তি তুলেন। কিন্তু ইহাতে যখন কোনই ফল হইল না তখন তিনি ওয়ারউইক্ পরিবারভুক্ত রবার্ট রীচীকে, আইন অনুসারে তাঁহার কার্য্যভার অর্পণ করিয়া নিজের ক্ষমতা বলবৎ রাখিতে চেষ্টা করেন। লর্ডস এবং কমন্স সভার উপর রবার্ট রীচীর কিছু প্রভাব ছিল। এই কারণে পার্লামেণ্ট ১৬ ২ খৃষ্টাব্দে ইহাকেই মনোনীত করেন এবং ডাকের সমস্ত হিসাব ইঁহাকে বুঝাইয়া দিবার জন্য বারলামচীর প্রতি আদেশ প্রেরণ করেন: বারলামচী ইহার উত্তরে পার্লামেণ্টকে জানাইয়া দেন যে ডাকের কার্য্য এক্ষণে যদিও আমার অফিস হইতে চলিতেছে, তাহা হইলেও ইহার সম্পূর্ণ অধিকার প্রীডোর। তিনি আমার অফিস লোকজন সমস্তই ভাড়া লইয়া এই কার্য্য পরিচালন করিতেছেন। এই উত্তর লাভে কিন্তু লর্ডস সভা বারলামচীর উপর খুব চটিয়া ওঠেন এবং বল-প্রকাশের দ্বারা উহার অফিস কাড়িয়া লইবার জন্য রবার্ট রীচীকে এক আদেশ প্রদান করেন। ইহার ফলে ইংলণ্ডে পাশাপাশি দুইটা ডাক সমিতির প্রতিষ্ঠা হয় এবং পরস্পর আক্রোশ থাকায় ডাক লুট প্রভৃতি চলিতে থাকে। শেষে এই দোষে অভিযুক্ত বলিয়া বারলামচী, তাঁহার ভৃত্যবর্গ এবং রবার্ট রীচীর দুই-একজন ভৃত্য কমন্স সভা কর্ত্তৃক হাজতে প্রেরিত হন। ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে বারলামচী দেহত্যাগ করিলে পর পার্লামেণ্ট রবার্ট রীচীকে সরাইয়া দিয়া মিঃ এডমণ্ড প্রীডোকে ডাক অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন। ইহাতে রবার্ট রীচী বিচারকদিগের নিকট গিয়া আইনের সাহায্য প্রার্থনা করেন। বিচারে ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে বিচারকগণ এই মর্ম্মে এক রায় প্রকাশ করেন যে, পার্লামেণ্ট উপযুক্ত বোধে যাঁহাকে এই কার্য্যভার অর্পণ করিবেন তিনিই ইহার প্রকৃত উত্তরাধিকারী হইবেন। ডাক-ঘরের কার্য্যভার অন্য হস্তে ন্যস্ত করিবার অধিকার পার্লামেণ্ট ভিন্ন অপর কাহারও নাই। ডাক অধ্যক্ষগণ কার্য্যের সুবিধার জন্য যে যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়াছেন বা করিতেছেন পার্লামেণ্ট ইচ্ছা করিলে যে-কোন মুহূর্ত্তে তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া নূতন করিয়া এই অফিস গড়িয়া লইতে পারেন। ইহার পর রবার্ট রীচীর আর কোন দাবীদাওয়া থাকিল না।

প্রীডো ডাক-অধ্যক্ষপদ লাভ করিয়াই উইদারিঙ্গস প্রবর্ত্তিত ডাকের নিয়মগুলি আরও কার্য্যকরী করিয়াতুলিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন। উইদারিঙ্গস ডাক চলা-ফিরার সময় ঠিক নিয়মিত করেন, কিন্তু ডাক প্রেরণ জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট দিন এ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হয় নাই; প্রীডোই প্রথম প্রতি বৃহস্পতিবার লণ্ডন হইতে সর্ব্বত্র ডাক প্রেরণ ব্যবস্থা করেন। নরউইচ, ইয়ার মাউথ প্রভৃতি যে সকল শহর এই সময় বেশ সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠিতেছিল সেই সকল স্থানে ডাক প্রেরণ জন্য শাখা পথগুলিরও যথেষ্ট উন্নতিসাধন করেন। তাহা হইলেও প্রীডো প্রথমে সাধারণের মন জয় করিতে পারেন নাই। ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লোকে ইহার আরও সুবিধা খুঁজিয়া ছিলেন। এই কারণে কমন্স সভা জন হীলের সাহায্যে ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে এডিনবরা পর্য্যন্ত ঘোড়ার ডাক প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। প্রীডো ইহাতে প্রথমে খুব আপত্তি জানাইয়াছিলেন এবং নিজের কার্য্যদক্ষতা দেখাইয়া কাউন্সিল অফ ষ্টেট-এর বৈঠকে এক আবেদন পেশ করেন। ইহার উত্তরে কাউন্সিল তাঁহাকে জানাইয়া দেন যে, তাঁহার ডাকের উন্নতি কল্পে যে ৫।৬টী প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে তাঁহারা সেই সকল প্রস্তাব অনুযায়ী দিনকতক ডাক-ঘরের কার্য্য চালাইয়া দেখিবেন—ইহার পর আর কোনও উন্নতি এ অবস্থায় সম্ভবে কি-না। ইহাতে আপত্তি তুলিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। প্রীডো তখন ইহাতে তাহার যে লোকসান হইবে তাহার ক্ষতিপূরণ জন্য কর্ম্মচারীদিগের মাহিনার ব্যবস্থা করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। কমন্স সভা এই সুযোগই খুঁজিতে ছিলেন। ইহাতে

তাঁহারা প্রীডোকে তাঁহার আয়-ব্যয়ের হিসাব কাউন্সিলের সম্মুখে উপস্থিত করিতে বলেন। প্রীডো কাউন্সিলের আদেশ মত সমস্ত হিসাব কাউন্সিলে উপস্থিত করিলে পর, কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ ইহা দেখিয়া অতঃপর ডাক-ঘরের কার্য্যভার অন্যূন্য বাৎসরিক পাঁচ হাজার পাউণ্ড রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থায় ইজারা দেওয়া যাইতে পারে বলিয়া সাব্যস্ত করেন এবং প্রীডোকে তাহা জানাইয়া দেন। তখন তাহার হস্ত হইতে এই লাভবান কার্য্যটি হস্তান্তর হইবার ভয়ে প্রীডো নিজেই ঐ রাজস্ব দিয়া কার্য্যটি রক্ষা করেন। ইতিমধ্যে প্রীডো এটর্ণি জেনার্ল পদ লাভ করিয়াছিলেন, ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে কাউন্সল অফ ষ্টেটের একজন সভ্য বলিয়া মনোনীত হন। তিনি এই সুবিধা লাভ করিয়াই ক্লিমেণ্ট অক্সনব্রীজ, রীচার্ড ব্ল্যাকওয়েল, ফ্রান্সিস টমসন, উইলিয়ম ম্যালন প্রভৃতি যে পাঁচ ছয়জন ব্যক্তি ডাকের উন্নতির চেষ্টায় এক একটি উপায় উদ্ভাবন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন তাঁহাদিগকে নিজ দলভুক্ত করিয়া লইয়া যাহাতে ডাক খরচ কমাইতে এবং আরও শীঘ্র শীঘ্র ডাক প্রেরণ করা যাইতে পারে তাহারই চেষ্টায় যত্নবান হন।

১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে অলিভার ক্রমওয়েল প্রীডোকে সরাইয়া জন ম্যানলের উপর ইহার কার্য্যভার অর্পণ করেন। এই সময় দশ হাজার পাউণ্ড বাৎসরিক রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা হয়। ম্যানলে এই ইজারা পাইয়াই অলিভারের একদল সৈন্য লইয়া প্রীডোর ডাক-ঘরে উপস্থিত হইয়া সকলকে শাসন ও মারধর করিয়া ডাক-ঘর অধিকার করেন। কিন্তু তাঁহাকেও দুই বৎসরের বেশী স্থায়ী হইতে হয় নাই। ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার ইজারার সময় কাটিয়া গেলে পর ক্রমওয়েল-এর সভাসদগণ মিঃ সেক্রেটারী থার্লোকে ডাক-ঘরের কার্য্য-ভার অর্পণ করেন।

থার্লো ডাক-ঘরের কার্য্যভার লাভ করিলে পর তিনি ক্লক্ লেন হইতে ডাক-ঘর উঠাইয়া আনিয়া বিসপ্ স্ ষ্ট্রীটে ইহা স্থাপন করেন এবং ইহার পরিচালনভার অক্সনব্রীজের উপর ইজারা দিয়া দেন। অক্সনব্রীজ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া ডাক-খরচ কমাইয়া ইংলণ্ডের মধ্যে তিন পেনি; স্কটল্যাণ্ড চারি পেনি; আয়রল্যাণ্ড ছয় পেনি; বোর্দ্দো—(ফ্রান্স), নানটিস্—(ফ্রান্স), কেডিজ—(স্পেন), মেড্রিড—(স্পেন), লেগহর্ণ—(ইটালী), জেনোয়া—(ইটালী), ফ্লোরেন্স—(ইটালী), লিঁয়—(ফ্রান্স), মার্শেলী—(ফ্রান্স), স্মার্ণা—(তুরস্ক), আলিপ্পো—(তুরস্ক), কন্সটানটিনোপল—(তুরস্ক), ডানজীগ—(পোল্যাণ্ড), লুবেক—(বেলজিয়ম) ষ্টক্হলম—(সুইডেন), কোপেনহেগেন—(ডেনমার্ক), বোর্দ্দো, নানটিস, কেডিজ, মাদ্রিদ নয় পেনি; লেগহর্ণ, জেনোয়া, ফ্লোরেন্স, লিয়ঁ, মার্শেল, স্মার্ণা, আলিপ্পো, কন্সটান্‌টিনোপল, ডানজীগ, লুবেক, ষ্টক্হলম্ এবং কোপেন-হেগেন এক শিলিং ইত্যাদি ক্রমে ধার্য্য করেন এবং সপ্তাহে তিন দিন করিয়া সর্ব্বত্র ডাক প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। শেষে কিন্তু ইনিও ক্রমওয়েল কর্তৃক বিতাড়িত হন। তখন থার্লো নিজেই ডাক-ঘরের কার্য্য পরিচালন করিতে থাকেন। ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দ হইতে থার্লোর নিকট বাৎসরিক চৌদ্দ হাজার পাউণ্ড রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা হয়।

জন হীল ইংলণ্ডে "পেনি পোষ্ট" প্রবর্ত্তনের সুবিধা দেখাইয়া এই সময় একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ইহাতে তিনি বলেন, "Though a man will willingly pay three-pence to have an account of his family or business rather than want such an account; yet certainly no man will, or ever did willing pay three pence, for which he need pay but a peny. And if for reasons of State Posts must be erected, certainly he is not the fittest man that will give the most money for it, but rather he that will undertake the service at the cheapest rate, which must be the best advantage to the commonwealth ইত্যাদি। ইহার ফলে ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় চার্লস ডাক-খরচ কমাইয়া লণ্ডন হইতে বারউইক্ আশী মাইলের মধ্যে দুই পেনি, তদুর্দ্ধে তিন পেনি: বারউইক্ হইতে স্কট্‌ল্যাণ্ডের চল্লিশ মাইলের মধ্যে দুই পেনি, তদুর্দ্ধে চারি পেনি; লণ্ডন হইতে ডাবলিন ছয় পেনি; ডাবলিন হইতে আয়রল্যাণ্ডের চল্লিশ মাইলের মধ্যে দুই পেনি, তদুর্দ্ধে চারি পেনি ধার্য্য করিয়া দেন। কিন্তু তাহা হইলেও প্রধান ডাকপথ হইতে দূরে অবস্থিত শহরগুলির মধ্যে পরস্পর পত্র আদানপ্রদান করিতে হইলে তাহার জন্য অতি উচ্চহারে মাশুল আদায় হইত। কারণ সে সময় ইংলণ্ডে "ক্রশ পোষ্টের" ব্যবস্থা না থাকায় সকল দেশের সকল পত্রই প্রথমে লণ্ডন শহরে আসিয়া জমা হইত, পরে তথায় ছয় জন সর্টার কর্তৃক ছয়টী পথের পত্র বাছাই

শিল্পী—শ্রীযুক্ত [illegible] মজুমদার

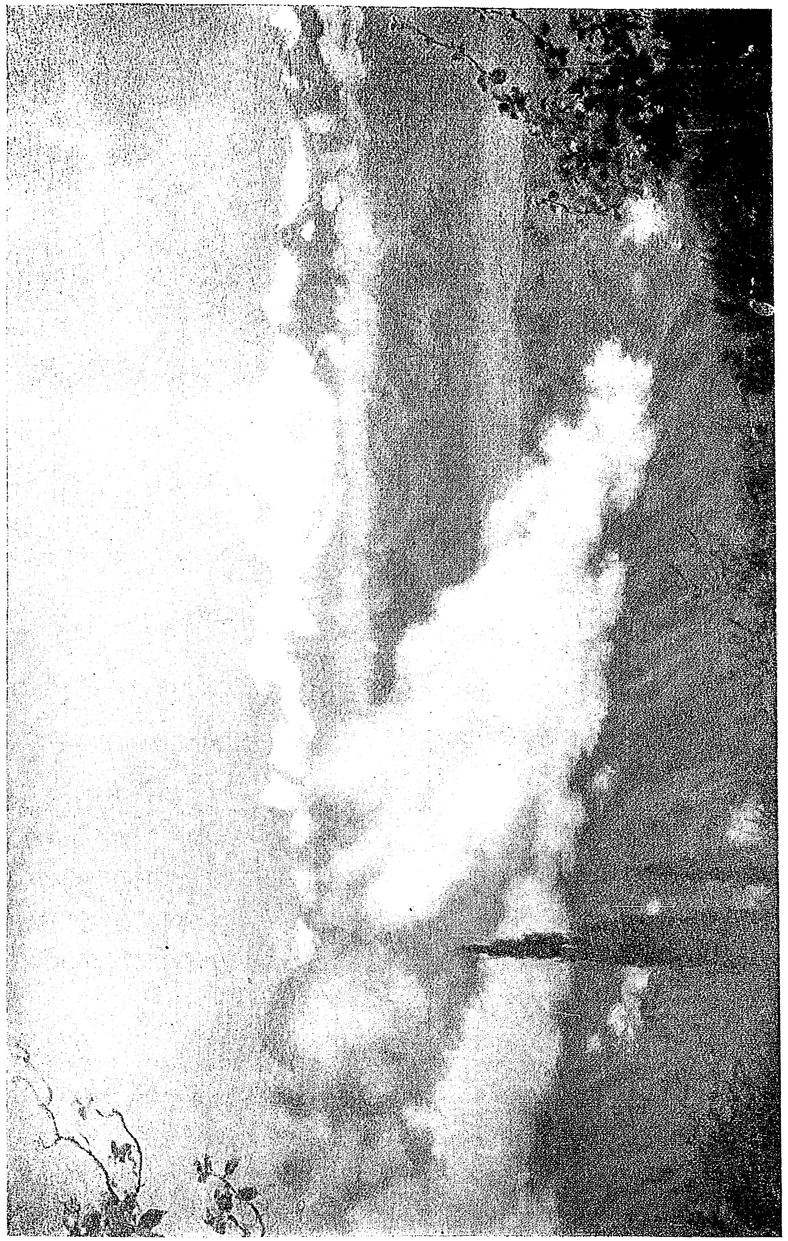

তুষারগিরি

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

হইয়া তাহা পূর্ব্ববর্ণিত উপায়ে ভাগ করিয়া, ছোট ছোট থলীর মধ্যে ভরিয়া প্রেরণ করা হইত: এই কারণে ঐ দেশটি অতি সন্নিকট হইলেও পত্র প্রেরণ করিলে ঐ পত্র পৌছানর জন্য একবার ঐ দেশ হইতে লণ্ডন, পরে লণ্ডন হইতে যে স্থানে পত্র যাইবে সেই স্থানের খরচ দিতে হইত। যেমন ব্রিষ্টল হইতে এক্সটার যদিও পঞ্চাশ মাইল, তথাপি এই উভয় দেশের মধ্যে পত্র আদানপ্রদান খরচ দুই পেনি না হইয়া ব্রিষ্টল হইতে লণ্ডন আশী মাইলে তিন পেনি, পরে লণ্ডন এক্সটার পুনরায় আশী মাইলে আর তিন পেনি উভয়ে মিলিয়া ছয় পেনি আদায় হইত।

যাহা হউক, অতঃপর থার্লোর ইজারার সময় কাটিয়া গেলে সম্রাট দ্বিতীয় চার্লস্ হেনরী বিশপ্‌স্‌কে বাৎসরিক একুশ হাজার পাঁচশত পাউণ্ড রাজস্ব আদায় দিবার ব্যবস্থায় ইহার ভার অর্পণ করেন। এই সময় ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে স্থির হইয়াছিল যে, ভবিষ্যতে রাজা, মন্ত্রী প্রভৃতি উৰ্দ্ধতন রাজ-কর্ম্মচারী এবং পার্লামেণ্টের সময় এই সভার সভ্যবৃন্দের পত্রের জন্য আর ডাকমাশুল আদায় হইতে পারিবে না এবং সেক্রেটারী অফ্ ষ্টেট্ যখন ইচ্ছা নিজে গিয়া অথবা কোন কর্ম্মচারীর দ্বারা হিসাব পরীক্ষা করিতে পারিবেন। বিশপ ডাক-ঘরের কার্য্যভার প্রাপ্ত হইয়া মাত্র দুই বৎসর স্বহস্তে ইহা পরিচালনা করেন। অতঃপর ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে তিনি ডানিয়াল-ওনাইলকে ইহার স্বত্ব ছাড়িয়া দেন। ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মে তারিখের একখানি সরকারী বিজ্ঞাপন হইতে জানা যায়, থার্লোর সময় পুলিশের সাহায্যের জন্য ডাক-ঘরে পত্র খুলিয়া পড়ার যে রীতি ছিল তাহা এই সময় আইন দ্বারা রহিত করিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর নিজের

মোহরাঙ্কিত করিবার যন্ত্র

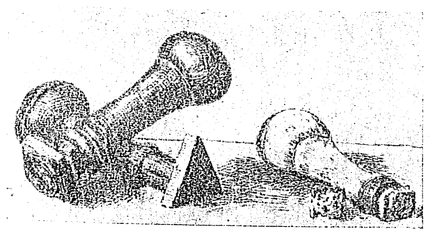

পত্র ভিন্ন অপর কাহারও পত্র খুলিয়া দেখিবার কাহারও অধিকার রহিল না। এই বৎসর আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছিল। সম্রাট দ্বিতীয় চার্লস ডিউক অফ ইয়র্কের খোরপোষ জন্য ডাকের সমস্ত আয় তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

১৬৬৬ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর শনিবার মধ্যরাত্রে লণ্ডন

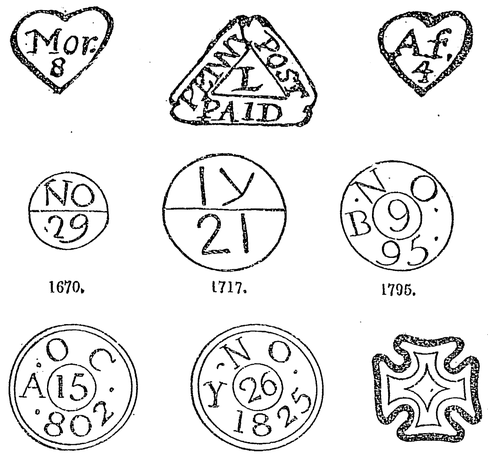

উইলিয়ম ডাকওয়ারার সময় হইতে পর পর
উপরোক্ত ছাপগুলি চলিয়া আসিতেছে

শহরে যে অগ্নিকাণ্ড হইয়াছিল, তাহার ফলে বিশপ ষ্ট্রীটের ডাক-ঘরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়। তখন কন্‌ভেণ্ট গার্ডেনের নিকট সাময়িক কার্য্য চালাইয়া লইবার জন্য একটি ডাক-ঘর খোলা হয়।

১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে ওনাইলের ইজারার সময় কাটিয়া গেলে পর আর্লিংটন পরিবারভুক্ত হেনরী বেনেট্‌র্লে ইহার পরিচালন ভার ইজারা প্রাপ্ত হন। ইঁহার ভ্রাতা সার জন বেনেট প্রথমে ইঁহার সহকারী থাকিয়া মিঃ ফক্সলের প্রস্তাবিত উপায়ে পেনি পোষ্ট প্রবর্ত্তনের ইচ্ছা করেন, কিন্তু বিফল মনোরথ হন। ইঁহাদিগের সময় কেণ্টে নিত্য একবার, স্কটল্যাণ্ডে সপ্তাহে তিন বার এবং আয়রল্যাণ্ডে সপ্তাহে দুই বার ডাকপ্রেরণের ব্যবস্থা হয় হয়। তবে কোন্ স্থানটি কোথায় অবস্থিত এবং তাহা কোন্ ডাক-ঘরের এলাকাভুক্ত ইহা জানিবার কোন উপায় না থাকায় এবং বাড়ীঘরের নম্বর—অথবা রাস্তা ঘাটের কোন নির্দ্দিষ্ট নাম না থাকায় পত্রপ্রেরণ এবং বিলির যথেষ্ট অসুবিধা ছিল। মিঃ ব্লোম্ সর্ব্বসাধারণের এই অসুবিধা দূর করিবার মানসে

তাঁহার ব্রিটেনিয়া নামক সংবাদপত্রে কয়েকখানি মানচিত্র প্রকাশ করিয়া তাহাতে ডাক-পথ এবং ডাক-ঘরগুলির

হরকরারা ডাক লইয়া রওনা হইতেছে

অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন। ইহার পর ডাক-ঘরের কর্ত্তৃকপক্ষগণও ইহার সুবিধা দেখিয়া একখানি মানচিত্র প্রকাশ করেন। ইহার ফলে ডাকে পত্র প্রেরণ সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় এবং বিলি ব্যবস্থারও অনেক সুবিধা হয়। ইহার পর কয়েক বৎসরের মধ্যেই লণ্ডন শহর পুনর্গঠিত হইয়া ওঠে। তখন ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে কনভেণ্ট গার্ডেন হইতে লম্বার্ড ষ্ট্রীটে একটি বড় বাড়ীতে ডাক-ঘরটিকে স্থানান্তরিত করিয়া আনা হয় এবং "জেনার্ল পোষ্ট অফিস অফ্ লণ্ডন" নামে ইহাকে অভিহিত করা হয়। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত আমারা যাঁহাদিগকে ডাক অধ্যক্ষ অর্থাৎ—"মাষ্টার অফ্ দি পোষ্ট" নামে অভিহিত করিয়া আসিয়াছি এই সময় হইতে তাঁহারা "পোষ্ট মাষ্টার জেনার্ল" এবং প্রত্যেক ডাক-ঘরের অধ্যক্ষগণ পোষ্ট মাষ্টার নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। লম্বার্ডির ডাক-ঘরের প্রথম পোষ্ট মাষ্টার ছিলেন কর্ণল রজার হোয়াইট হল, ইঁহার অধীনে সেই সময় এই ডাক-ঘরে প্রায় ৭৭ জন কর্ম্মচারী কার্য্য করিতেন। অন্যান্য সকল স্থানের ডাক-ঘরে ডাক অধ্যক্ষগণই সকল কার্য্য চালাইয়া লইতেন। ১৬৭৭ খৃষ্টাব্দে লম্বার্ডির জেনার্ল পোষ্ট অফিস ছাড়া লণ্ডনের মধ্যে আরও ৮টী রিসিভিং হাউস প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইহার বাহিরে ইংলণ্ড এবং স্কট্‌ল্যাণ্ডের মধ্যে ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বসমেত প্রায় ১৮২টী, আয়রল্যাণ্ডে ৪৫টী এবং ডাবলিনে ১২টী সর্ব্বসমেত ২৩৯ ডাক-ঘর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইত্যবসরে আর্লিংটনের ইজারার সময় শেষ হইয়া যাওয়ায় তিনি পুনরায় নূতন করিয়া ইহার ইজারা গ্রহণ করেন, এই সময় বাৎসরিক ৪৩,০০০ পাউণ্ড রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা হয়।

এই ভাবে লণ্ডনের ডাক-ঘরের ক্রমান্বয় উন্নতি হইতে থাকিলেও শহরের মধ্যে এক অঞ্চল হইতে আর এক অঞ্চলে পত্রপ্রেরণের ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত লণ্ডনের ডাক অধ্যক্ষগণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। রবার্ট মুর নামক একজন আবগারী কর্ম্মচারী লণ্ডন শহরের মধ্যে ১ পেনি খরচে আদালত এবং ব্যবসার স্থানগুলিতে দিন ৬।৮ বার এবং দূরে ৪ বার পত্র বিলি ব্যবস্থার জন্য বেসরকারীভাবে এক ডাক-সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর উইলিয়ম ডাকওয়ালা নামক কাষ্টম হাউসের জনৈক কর্ম্মচারীও ইহার সহিত আসিয়া মিলিত হন। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দের ২২শে মার্চ্চ সোমবার Mercurious Cinicus No. 1 লিখিতেছেন—

We are informed some ingenious persons and good citizens, for the benefit of the City and Suburbs in point of charge and quick conveyance of Notes and Letters, have projected a method for doing the same through-out for 1d. a Letter one with another, further or nearer, which may be termed a Foot post, whereof our next may give your more particular account.

টমাস-ডিলনে তাঁহার "Present State of London, 1681"-রে বলিয়াছেন—মিঃ ডাক্‌ওয়ারা লাইম ষ্ট্রীটে তাঁহার

একজন প্রাচীন পিওন

বাসভবনে প্রধান ডাক-ঘর স্থাপিত করিয়া শহরের অন্যান্য পল্লীতে গিয়া সাতটি সর্টিং হাউস এবং প্রায় চারি পাঁচশত রিসিভিং হাউস স্থাপন করিয়া আসেন। এই সকল রিসিভিং হাউস হইতে প্রতি ঘণ্টায় ধাবকেরা পত্র সংগ্রহ করিয়া সর্টিং হাউসে পৌছাইয়া দেয়। ইহার মধ্যে যেগুলি রাজকীয় ডাক-ঘরের মারফৎ বিদেশে প্রেরণের জন্য থাকে, সেইগুলিকে প্রথমেই লম্বার্ডির জেনার্ল পোষ্ট অফিসে পাঠাইয়া দিয়া পরে বাকীপত্রগুলির বিলি বন্দোবস্ত করা হয়। এক পাউণ্ডের অতিরিক্ত ওজনের অথবা দশ পাউণ্ডের অতিরিক্ত মূল্যের কোন মোড়ক অর্থাৎ পার্শেল এই ডাকে লওয়া হয় না। লণ্ডন, ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার, সাউথওয়ার্ক, রেডরিফ, ওয়েপিং, র‍্যাট-ক্লিফ, লাইমহাউস, ষ্টিপ্‌নে, পপলার, ব্ল্যাক্‌ওয়েল প্রভৃতি স্থানে এক পেনি খরচে পত্রাদি বাড়ী বাড়ী পৌছাইয়া দেওয়া হয়। ইহার বাহিরে হেক্‌লে, ইসলিংটন, সাউথ-নিউ-ইসলিংটন, ... প্রভৃতি স্থানের পত্র এক পেনি খরচে ঐ সকল স্থানের রিসিভিং হাউসে পৌছায়। ঐ স্থান হইতে তাহা বাড়ী বাড়ী পৌছাইতে হইলে পুনরায় তাহার জন্য এক পেনি খরচ ধার্য্য হয়—অর্থাৎ তুই পেনি খরচ পড়ে। পত্রাদির উপর মোহর অঙ্কিত করার যে রীতি ডাকওয়ারাই তাহা প্রবর্ত্তন করিয়া-ছেন। এই সময় ক্রিষ্টমাসের ৩ দিন, ঈষ্টার ও হুট্‌সানটাইডের

একজন প্রাচীনা স্ত্রী-পিওন.

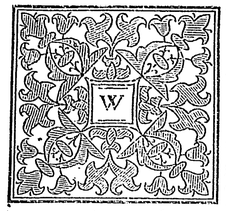

তুই দিন, সম্রাটের জন্মদিন (৩০শে জানুয়ারী) এবং রবিবারে কেবল ডাক-ঘর বন্ধ থাকে। অন্যান্য সকল দিনই রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত দিনে প্রায় ছয়-আট বার আদালত এবং ব্যবসাস্থান-গুলিতে এবং চারি-পাঁচ বার অন্যান্য স্থানগুলিতে পত্র বিলি

Whereas upon the one and twentieth of March, One thousand six hundred forty and nine, It was resolved by the then Parlament, That the Office of Post Master, Inland and Foreign, were and ought to be in the sole power of the Parlament; and several Orders were made by the said Parlament, whereby the management thereof was referred to the Council of State. And whereas on the thirtieth day of June, One thousand six hundred fifty and three, the then Council of

১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে জোন ম্যানলেকে সরকার ডাকঘরের কাজ ইজারা দেওয়ায় তাঁহাদের মধ্যে যে লেখাপড়া হইয়াছিল, তাহারই কিয়দংশের নকল

ব্যবস্থা করা হয়। পার্লামেণ্টের অধিবেসনের সময় তথায়ও দিন ৮।১০ বার পত্র প্রেরণ করা হয়।

এই সকল বিষয় প্রকাশ করিয়া ডাকওয়ারা নিজেও একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার প্রতি-ষ্ঠিত এই ডাক ব্যবস্থার প্রতিরোধ করিবার জন্য প্রথমে অনে-কেই চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার কোন ফল হয় নাই। ২ বৎসর ক্রমান্বয় বেশ সুশৃঙ্খলার সহিত ইহার কার্য্য পরি-চালিত হইলে পর ১৬৮২ খৃষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর ডিউক্ অফ্ ইয়র্ক এই ডাক-সমিতির বিরুদ্ধে এক মামলা আনয়ন করিয়া ১১ই ডিসেম্বর উহা আইনের সাহায্যে বাজেয়াপ্ত করেন। অতঃপর এই ডাক সমিতি জেনার্ল পোষ্ট অফিসের অধীনে চলিয়া যায়।

১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে আর্লিংটন ডাক-ঘরের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে পর লরেন্স হাইড অফ রচেষ্টার ইহার পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন। ইনি ফিলোফ্রড্‌কে সহায়করূপে গ্রহণ করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন। ইঁহার সময়ের একখানি সরকারী বিজ্ঞাপন হইতে জানিতে পারি যে, এই সময়ে মুটে, মাঝি, ফেরিওয়ালা, ঘোড়ার গাড়ীর চালক প্রভৃতি সকলেই বেসরকারীভাবে পত্রাদি বহন করিতে আরম্ভ করে। এই

কারণে সম্রাট্ দ্বিতীয় জেম্‌স্, ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম জেন্‌স্ কর্ত্তৃক যে আইন প্রবর্ত্তিত হইয়া পরে ১৬৪২ খৃষ্টাব্দে বন্ধ হইয়া

ডাক বহনে প্রথম রেলগাড়ী

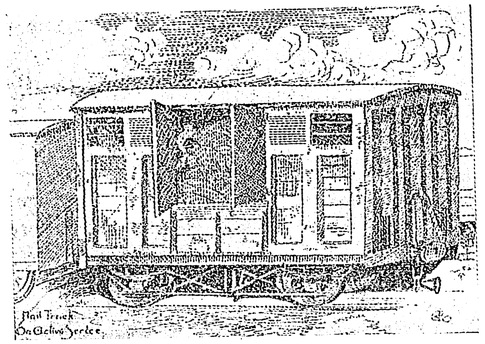

যায়, তাহা পুনস্থাপিত করেন এবং এই সকল ডাক বহন-কারীর গতিরোধ করিবার জন্য কয়েকজন "সারচার" নিযুক্ত করেন। কোন পথিকের নিকট পত্র আছে এমন সন্দেহ হইলেই তাহার সহিত পেটরা-পুঁটলী যাহা কিছু থাকিত সকলই ইহারা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেন। ইহাতে যদি কাহারও নিকট কোন পত্র পাওয়া যাইত তাহা হইলে সেই পত্র-বাহককে, এমন কি, সেই পত্র-লেখককে পর্য্যন্ত গ্রেপ্তার করিয়া আইন অমান্য করার দরুণ ভীষণ শাস্তি দেওয়া হইত।

১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে ইহার কার্য্যকাল শেষ হয়। তখন জন উইডম্যান ডাক-ঘরের কার্য্য পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। ইঁহার সময়ের বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। ইনি মাত্র ৮ মাসকাল ডাক-ঘরের কার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন। অতঃপর পার্লামেণ্ট ইঁহার হস্ত হইতে ঐ কার্য্য উঠাইয়া লইয়া স্যর রবার্ট কটন ও মিঃ ফ্রাঙ্ক ল্যাণ্ড-এর উপর এই কার্য্যভার ন্যস্ত করেন।

১৬৯০ খৃষ্টাব্দে কটন ও ফ্রাঙ্ক ল্যাণ্ড ডাক-ঘরের কার্য্য বাৎসরিক ৫৫০০০ পাউণ্ড রাজস্ব আদায় দিবার ব্যবস্থায় গ্রহণ করেন। ইঁহাদিগের সময় ইংলণ্ডের ডাক-ঘরের যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। কারণ ইঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, বে-সরকারী ডাক শুধু বন্ধ করিলেই চলিবে না, তাহার স্থানে যাহাতে সরকারী ডাক প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। ইঁহারা ডাক-অধ্যক্ষ পদ লাভ করিয়াই সমগ্র ইংলণ্ডটি ৯ ভাগে ভাগ করিয়া তাহার এক এক ভাগের মধ্যস্থ ডাক-ঘরগুলির পরিচালন-ভার এক একজন ব্যক্তির উপর ইজারা দিয়া দেন। ইহাতে এই সুবিধা হইয়াছিল যে, প্রত্যেক ইজারাদার তাঁহার আয় বৃদ্ধির জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন দ্বারা যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিতে থাকেন। ফলে বে-সরকারী ডাক-প্রথা চিরতরে বিলুপ্ত হয় এবং রাজকীয় ডাক-বিভাগের সাহায্যে রাজ্যের সকল পত্র ও পার্শ্বেলাদি আদানপ্রদান চলিতে থাকে। এইভাবে পত্রাদির সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকায় সপ্তাহ মধ্যে সোম, বুধ ও শুক্র এই তিনদিন লণ্ডন হইতে প্রধান ৬টী রাজ-পথে এক্সটার বারমিংহাম, ইয়র্ক প্রভৃতি শহর পর্য্যন্ত ঘোড়ায় টানা মাল-গাড়ীতে ডাক প্রেরণের চেষ্টা চলে; পরে তথা হইতে ঐ সকল দেশের আরও উত্তরের পত্রাদি ঘোড়ার পিঠে পাঠাইয়া দেওয়া হইত। এই সকল গাড়ীতে যে যাত্রী যাইবার সুবিধা ছিল তাহা আমরা জনৈক ফরাসী ভদ্রলোকের নিকট জানিতে পারি; তিনি ঐ গাড়ী ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—That I might not take post, or be obliged to use the stage-coach, I went from Dover to London in a waggon. It was drawn by six horses, one before another and driven by a waggener, who walked by the side of it. He was clothed in black, and appointed in all things like another George. He had a brave Montero on his

লণ্ডন বারমিংহাম রেলপথে ব্যবহারের জন্য প্রথম নির্ম্মিত ডাক গাড়ী

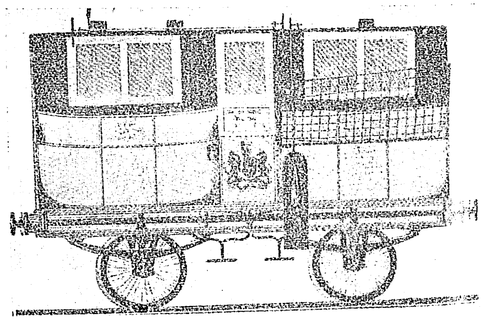

head, and was a merry fellow, fancied he made a figure and seemed mightily

pleased with himself. তবে ইহাতে কিন্তু পত্রোত্তর আসিতে ৭।৮ দিনের স্থানে ১১।১২ দিন বিলম্ব হইতে থাকিল। কারণ এই সকল গাড়ী আধুনিক কালের ন্যায় হালকি এবং স্প্রিংযুক্ত না হওয়ায় ইহা ঘণ্টায় ৩ মাইলের অধিক পথ অতিক্রম করিতে পারিত না। এইভাবে ঘোড়ার গাড়ীতে এবং ঘোড়ার পালের সাহায্যে ডাক গড়ে গ্রীষ্মকালে দিন ৫০ মাইল এবং শীতে ও বর্ষায় ৩০ মাইল করিয়া যাইত। ইহার অধিক শীঘ্র গতিতে কাহারও কোন সংবাদ পৌঁছাইবার থাকিলে ডাক-অধ্যক্ষগণকে তাহা জানাইলে তাঁহারা তাহার ব্যবস্থাও এই সময় করিয়া দিতেন। তবে ইহার জন্য অতিরিক্ত কিছু খরচ করিতে হইত। এই সকল পত্র ঘোড়ার ডাকের সাহায্যে পাঠাইবার ব্যবস্থা ছিল;

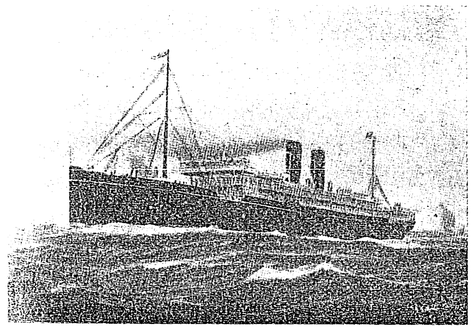

পি এণ্ড ও কোম্পানীর প্রথম জাহাজ

এই ব্যবস্থায় সাধারণত ৮২ ঘণ্টায় লণ্ডন হইতে এডিনবরায় ডাক পৌঁছাইত।

এইভাবে ইংলণ্ডের ডাক-ঘরের কার্য্য ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইতে থাকায় ডাক-ঘরের কর্ম্মচারীর সংখ্যাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পূর্ব্বে লম্বার্ড ডাক-ঘরে যে স্থানে ৭৭ জন মাত্র কার্য্য করিতেন, এই সময় সেই স্থানে ১৮৫ জন নিযুক্ত ছিলেন। এতৎব্যতীত বিদেশের ডাক-ঘরগুলিতে ২৬৯ জন, জাহাজে ডাক প্রেরণ ব্যবস্থায় ফ্রান্সের জন্য ২ জন, ফ্লেণ্ডার্সদের জন্য ২ জন, হলাণ্ডের জন্য ২ জন, স্পেন ইটালী প্রভৃতি দেশের জন্য ২জন, আয়রল্যাণ্ডের জন্য ৩ জন এবং ডক্‌ওয়ারা প্রতিষ্ঠিত পেনি পোষ্ট-ডাকঘরের কার্য্য পরিচালন জন্য শহরে নানান অঞ্চলে "ইন হাউস" ও বড় বড় দোকানগুলিতে প্রায় ৭৪ জন রিসিভার, ৭টী ডাক-ঘরে ১৪ জন সর্টার, ৫৭ জন পত্রবাহক, ১ জন কণ্ট্রলার, ১জন একাউণ্টেণ্ট এবং ১জন কালেক্টর নিযুক্ত ছিলেন।

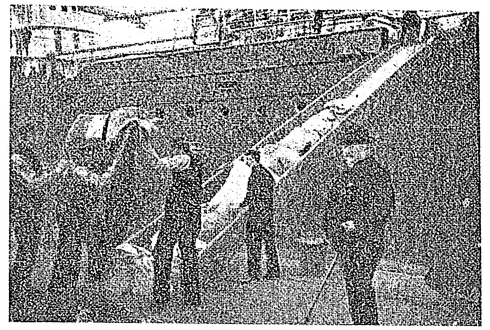

জাহাজ হইতে ডাক নামান

১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে কটন এবং ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড তাঁহাদিগের ইজারার সময় শেষ হইয়া যাওয়ায় তাঁহারা তৃতীয় উইলিয়মের নিকট হইতে পুনরায় নূতন করিয়া ইজারা গ্রহণ করেন। এই সময় রাজস্বের হার আরও বৃদ্ধি পাইয়া বাৎসরিক ৫৯, ৯৭২ পাউণ্ড ধার্য্য হয়।

এই সময় স্কটল্যাণ্ডের ডাক-ঘর ইংলণ্ডের ডাক-ঘরের অধীনে থাকিলেও ইহার পরিচালনভার অপর হস্তে ন্যস্ত ছিল। সম্রাট দ্বিতীয় চার্লসের সময় ১৬৬২ খৃষ্টাব্দের

জাহাজের ডাক মিলানো

সেপ্টেম্বর মাসে বাৎসরিক ৫০০ পাউণ্ড মাহিনা দিবার ব্যবস্থায় পেট্রিক্ গ্রাহাম্ নামক জনৈক ব্যক্তিকে সর্ব্বপ্রথম

ইহার পরিচালনভার দেওয়া হয়। কিন্তু গ্রাহাম ঠিক-ভাবে ইহা পরিচালন করিতে না পারায় স্কটিস প্রিভি-

রেলে ডাক বোঝাই দেওয়া

কাউন্সেল রবার্ট ম্যানকে স্কটল্যাণ্ড হইতে লিনলিথগো, কিলসিথ, গ্লাসগো, কিল্‌মারনক্, ডামবার্গ্, বলেন্টি, পোর্ট পেট্রিক্ হইয়া আয়রল্যাণ্ডের ডাক প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে বলেন। ইহাতে ঐ সকল দেশের মধ্য দিয়া ঘোড়ার ডাক সাহায্যে পোর্ট পেট্রিক্ পর্য্যন্ত—পরে তথা হইতে খোলা নৌকায় ডোনাগাদিতে ডাক প্রেরণের ব্যবস্থা হয়। পরে এই ব্যবস্থার আরও উন্নতি হইয়া ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে গ্লাসগো পর্য্যন্ত ঘোড়ার গাড়ীতে ডাক প্রেরণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইতিমধ্যে ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে এডিনবরা হইতে এবারডেন এবং পরে ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে বারউইক ও পোর্ট পেট্রিক পর্য্যন্ত ঘোড়ার গাড়িতে ডাক যাতায়াতের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু সে সময় ইংলণ্ড বা স্কটল্যাণ্ড কোথায় বেশ প্রশস্ত পথ না থাকায় এবং যাহা ছিল তাহাও উভয় পার্শ্বের বড় বড় গাছগুলিতে আলোক-রৌদ্রশূন্য, অন্ধকার এবং জলকাদায় পরিপূর্ণ করিয়া রাখায় সর্ব্বদাই গাড়ীর চাকা উহাতে বসিয়া যাইত, বন্ধুরা তার জন্য অনেকক্ষেত্রে গাড়ী উল্টাইয়াও পড়িত, এই সকল কারণে এই ব্যবস্থা কি ইংল্যাণ্ড, কি স্কটল্যাণ্ড কোথাও বেশীকাল স্থায়ী হইতে পারে নাই; শেষে ঘোড়ার ডাকে ডাক যাওয়ার ব্যবস্থাই বলবৎ থাকে।

আয়রল্যাণ্ডের ডাক-ঘরগুলির পরিচালনভার ডেপুটী পোষ্ট মাষ্টার জেনার্লের হস্তে থাকিত। প্রথম চার্লসের সময় ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে এই দেশে সর্ব্বপ্রথম ডাক প্রবর্ত্তিত হয়। অতঃপর ক্রমওয়েল ইহার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে ডাবলিন হইতে চেষ্টার এবং মিল্‌ফোর্ড হইতে ওয়াটারফোর্ড ডাক-পারাপারের জন্য জাহাজ নিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা কিছুকাল চলিয়াই বন্ধ হইয়া যায় এবং পরে ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে তাহা পুনঃ স্থাপিত হয়। ইহার মধ্যবর্ত্তী সময়ে খোলানৌকায় ডাক-পারাপার করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। লণ্ডনের জেনার্ল পোষ্ট অফিসের ন্যায় এই দেশেও ডাবলিন শহরে একটি প্রধান ডাক-ঘর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এই ডাক-ঘর হইতেই লণ্ডনের নর্থরোড, হলিহেড রোড, ওয়েষ্টার্ণ রোড, কেণ্ট রোড, ব্রিষ্টল রোড, ইয়ারমাউথ রোড প্রভৃতির ন্যায় মল্‌ষ্টার রোড, আল্‌ষ্টার রোড, কলিউড রোড ধরিয়া ডাক যাত্রা করিয়া পুনরায় ঐ পথেই ঘুরিয়া আসিত। হল্যাণ্ড, স্পেন প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশগুলির সহিত ইংলণ্ডের ডাক আদান-প্রদানব্যবস্থা যে ইংলণ্ড সরকার থার্ণ এণ্ড টেক্সিস এবং ফ্রান্সের ডাক-অধ্যক্ষর হস্তে কয়েক বৎসরে জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে ঐ ব্যবস্থা ইংলণ্ড সরকারের হস্তে পুনরায় ফিরিয়া আসিলে

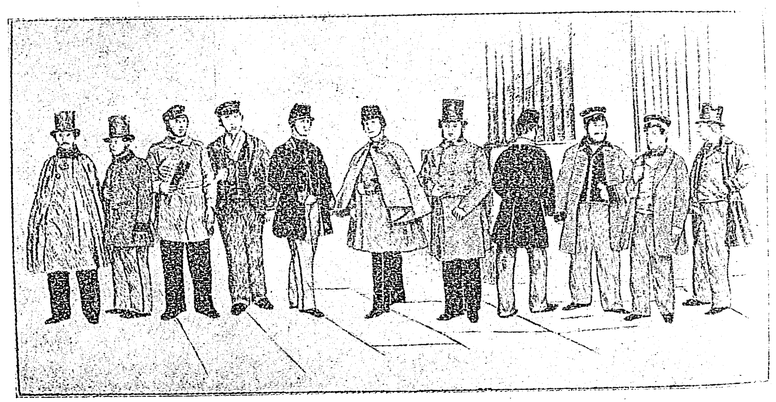

ডাক কর্ম্মচারীদের পদানুসারে পোষাকের পার্থক্য

পর তাঁহারা ডোভার হইতে ক্যালে ও অষ্ট্রেণ্ড বা নিউপোর্ট এবং হারউইচ হইতে ব্রীল এই তিনটি ডাক-পথ প্রবর্ত্তিত করেন। কিন্তু ফ্রান্সে যুদ্ধ বিদ্রোহাদির জন্য এই ব্যবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারেন নাই। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে ডোভারের ডাক বন্ধ হইয়া ফালমাউথ হইতে প্রায়নি ডাক প্রেরণের ব্যবস্থা হয় এবংছোট ছোট খোলা নৌকার স্থানে বড় বড় নৌকা এই কার্য্যে নিযুক্ত করা হয় যাহাতে ৫০ হইতে ৬০ জন যাত্রীরও ঐ সকল নৌকায় পারাপার করা চলিতে পারে। অতঃপর ফ্রান্সের যুদ্ধ অবসান হইলে ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ডোভার হইতে ক্যালে এবং অষ্ট্রেণ্ডের পথ পুন স্থাপিত হয়। এই সময় ইংলণ্ডের বিদেশ হইতে যে সকল জাহাজে পত্র আসিত, সেই সকল জাহাজের মালিকেরা প্রতি ১ পেনি করিয়া খরচ পাইতেন। এই হিসাবে দেখা যায় যে, ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড সরকার কাটক ডাক-পথ প্রবর্ত্তিত হইলে পর তাঁহারা বৎসর শেষ সর্ব্বসমেত মোট ২৫১ পাউণ্ড ১৭ শিলিং ৬ পেনি পাইয়া ছিলেন অর্থাৎ ৬০, ৪৪৭ খানি পত্র আদান-প্রদান হইয়াছিল।

ইউরোপের বাহিরে ডাক প্রেরণ ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত ইংলণ্ড বা অন্য কোনও দেশের ডাক-অধ্যক্ষগণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। মধ্যে মধ্যে বাণিজ্যাদি-ব্যাপারে যে সকল জাহাজ সেই সময় ঘুরিয়া ফিরিত সেই সকল জাহাজের মালিকদের মারফৎ বহির্দেশ গুলির সহিত আবশ্যক মত পত্রাদি আদান-প্রদান চলিত। ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে মাসাচুসেট্ সরকারের একখানি বিজ্ঞাপন হইতে জানা যায়, সেই সময় বোষ্টন শহরের (আমেরিকা) রিচার্ড ফেয়ার ব্যাঙ্কের নিকট সমুদ্রপারের পত্রাদি জমা করিয়া দিতে পারিলে তিনি তাহা যথাস্থানে পৌছাইবার ব্যবস্থা

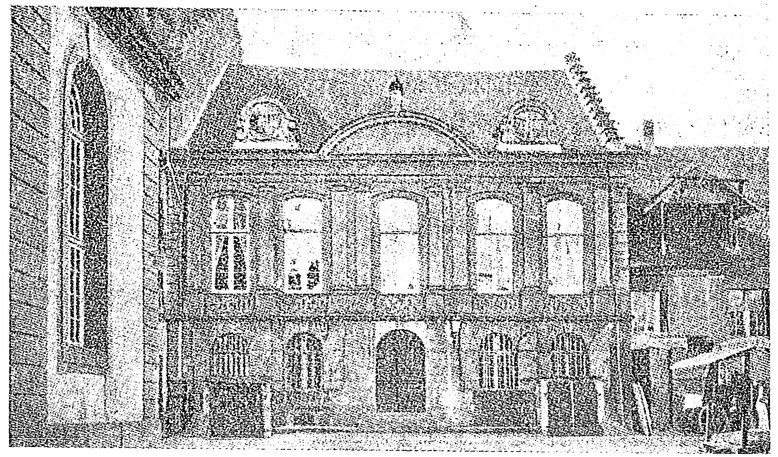

প্রথম পোষ্টাল ইউনিয়নের গৃহ

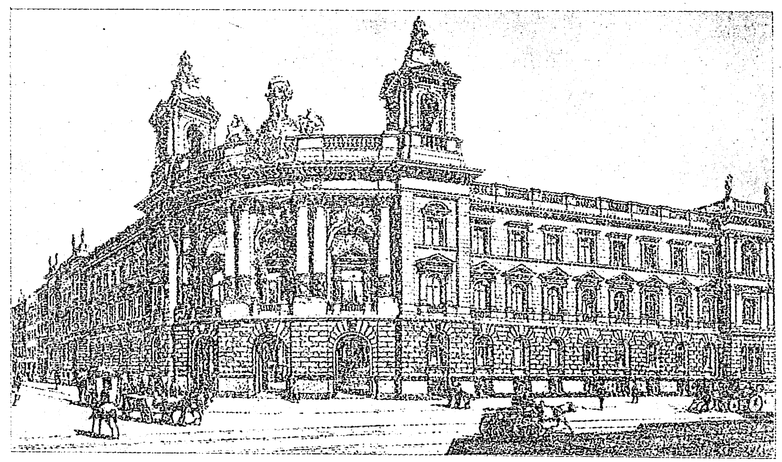

বার্লিন পোষ্টাল মিউজিয়াম

করিয়া দিতেন। ইংলণ্ডের কফি হাউসেও এই রকম এক ব্যবস্থা ছিল। তথায় একটি থলী ঝুলান থাকিত, এক পেনি খরচ সমেত ঐ থলীর মধ্যে কোন পত্র জমা করিয়া দিলে তাহাও যথাসময়ে নির্দ্দিষ্ট ঠিকানায় পৌছিত।

ইংলণ্ড করকার কিন্তু এই ব্যবসার জন্য সে সময় কোন আপত্তি অথবা ইহার লাভের উপর কোন দাবীদাওয়া করিতে পারিতেন না। অতঃপর ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। তাঁহারা ইতিমধ্যে জামাইকা দেশ জয় করিয়াছিলেন, এই কারণে এই সময় হইতে দেশ মধ্যে পত্র আদান-প্রদানের উপর ৬পেনি করিয়া কর ধার্য্য করেন। যে কোন জাহাজেই পত্র আসুক না কেন, পত্র প্রতি ঐ খরচ তাহাকে ইংলণ্ডের ডাক-ঘরে জমা করিয়া দিতে হইত। পরে ১৭০২ খৃষ্টাব্দের হিসাব হইতে জানিতে পারি, ইতিমধ্যে ইংলণ্ড সরকার সাধারণের হস্ত হইতে ডাকবহন কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া নিজেই উভয় দেশ মধ্যে জাহাজ স্থাপন করিয়া পত্র প্রতি ১ শিলিং ৩ পেনি করিয়া মাশুল নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। তাহা হইলেও অন্যান্য দেশের সহিত পত্রাদি আদান-প্রদানের উপর ইংলণ্ড সরকারের কোনরূপ লাভালাভ ছিল না। তবে যদি ঐ সকল পত্র ইংলণ্ডে পৌঁছিলে পর, সরকারী ডাক-মারফৎ তাহা বিলি ব্যবস্থায় মাশুলের যে হার নির্দ্দিষ্ট ছিল তদনুযায়ী ন্যায্য খরচ আদায় করিয়া লইতেন। এই জন্য ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে সরকার লানসিলট পামার ও উইলিয়ম ব্যারেট নামক দুইজন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন। ইহারা নৌকা লইয়া লণ্ডন বন্দরে থাকিয়া বিদেশীয় বাণিজ্য পোতগুলি হইতে পত্রাদি সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেন।

সরকারী জাহাজে এই সময় যে সকল পত্র এবং যাত্রী বাহিত হইত তাহারও হিসাব রাখিবার নিয়ম এই সময় প্রবর্ত্তিত হয়। কি ভাবে ঐ হিসাব রাখা হইত, নিম্নের হিসাবটি দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন—

28 April, 1705

Recieved on board the Prince Packet Boat the following Packets and letters.

Zech: Rogers···Commander.

From my Lord Ambassador···a Bag of Letter directed to Mr. Jones.

Sixteen packets and letters for her majestis service.

From the King of Spain···a very large packet.

From London and Holland···Double and Single letters···Two hundred and ninetysix.

Thirteen Packets do.

Devonshire letters···Double and single···Twenty-nine and three packetts.

For Falmouth···Double and single letters ···six.

Two mail for London.

Outward bound.
No Passenger.
Homeward bound.
One English marchent.
Three Dutch Gentleman.

Four poor sailors discharged from His Majesties Ship Antilope being encapable for the service.

এইভাবে ১৭০৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কটন এবং ফ্রাঙ্ক ল্যাণ্ড উভয়ে ডাক-ঘরের কার্য্য পরিচালন করেন। অতঃপর কটন্ বাতগ্রস্ত হইয়া পড়ায় এবং তাঁহার ইজারার সময় অতিবাহিত হওয়ায় তিনি এই কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তখন জন এভিলিন বাৎসরিক ৬৬,৮২২ পাউণ্ড রাজস্ব আদায় দিবার অঙ্গীকারে ঐ কার্য্যভার ইজারা লইয়া কটনের পরিত্যক্ত শূন্য স্থান পূর্ণ করিয়া তোলেন।

চেতন ও অচেতন

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

আমি সিনেমা আর্টিষ্ট। অভিনয় শিখেছিলাম পটে ছবি দেখে, সিনেমার প্রেক্ষা-গৃহে। কারণ অভিনয় শিক্ষার কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থা এ দেশে নাই।

পরের কথা জানিনা। আমার ক্ষুদ্র সাফল্যের মূলে ছিল—প্রসিদ্ধ চিত্র-শিল্পীদের ভাব-ভঙ্গীর নীরব অনুকরণ—ইতিহাস-প্রসিদ্ধ আদর্শ শিষ্য একলব্যের মত।

বহু-বর্ষ চিত্র-পটে দেখেছি প্রসিদ্ধ রূপ-স্রষ্টাদের অসাধারণ সৃষ্টি—লোমহর্ষক বিভীষিকা, মনোরম প্রণয়-চিত্র। কিন্তু বাস্তব-জীবনে যে এক অপূর্ব্ব কাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছি, তদনুরূপ ঘটনার কোনো অভিনয় কুত্রাপি দেখিনি। সে ঘটনা আজ সংক্ষেপে বলব। কিন্তু নাম-ধাম কাল্পনিক—অনিবার্য্য কারণে।

দিল্লীর চাঁদনী চকে বিলাসবাবুর সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়—পাশ্চাত্য প্রথায় উভয়ের পরিচিত ব্যক্তির সাহচর্য্যে নয়—দেশী প্রথায়। আমি একটা দোকানে ফটকিরি কিনছিলাম—ক্ষৌরকার্য্যকে অবিযাক্ত কর্ব্বার মানসে। তিনি কিন্‌ছিলেন জবা-কুসুম তৈল—মস্তিষ্ক শীতল ও কেশের শ্রী-সম্পাদন প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদনের উচ্চাশায়।

ক্ষণকাল আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক বল্লেন—মশায়কে যেন কোথায় দেখেছি।

—সে আর আশ্চর্য্য কি? বিশেষ যখন আমি পরদার অন্তরালে নিজেকে আবদ্ধ রাখিনা। মহাশয়ের নাম?

—শ্রীবিলাসমোহন পাল। মশায়ের নাম?

—শ্রীনটবর বিশ্বাস।

—ওঃ!—ব'লে ভদ্রলোক আমার মুখের দিকে দৃঢ়ভাবে তাকালে।—বটে!

—মশায় কি আমাকে চেনেন?

—খুব চিনি। যে কেহ—হট্টগোল—দেখেছে সে আপনাকে চেনে। আপনার দামামা ঘোষের ভূমিকা, যদি চার্লি চ্যাপলিন অভিনয় কর্ত্ত, ঠিক্ ঐ রকমই করত। একেবারে—হুবহু।

বুঝতে পারলাম না ভদ্রলোক পরিহাস করলেন কিনা। কারণ সত্যের অনুরোধে অবশ্য স্বীকার্য্য যে আমি হট্টগোলের মহল্লা দেবার সময় প্রত্যেক চাল-চলন হাব-ভাবে বিশ্ববিশ্রুত চার্লি চ্যাপলিনকে অনুকরণ করতাম। আমাকে একটু গৌন দেখে শ্রীযুক্ত বিলাসমোহন পাল আর এক দফা ব্যাজস্তুতির উপক্রমণিকা আরম্ভ করলে, কিন্তু দোকানদারের ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম হ'ল। সে বল্লে—বাবুজী বাধ দুঁ।

কেনা-বেচার অন্তে কিন্তু বিলাসবাবু আমাকে ছাড়লেন না। একখানা তাঙ্গায় বসিয়ে বাড়ি নিয়ে গেলেন নব-দিল্লী!

মন্দ কি? এসেছিলাম একজন নাচ-শিল্পী শ্রীমতী উত্তাল মণ্ডলের সঙ্গে স্থানীয় এক রঙ্গালয়ে পাঁচ-মিশালী রঙ্গরস দেখাতে। আমাদের যিনি কলিকাতা হতে আমদানী করেছিলেন তিনি শ্রীমতীকে একটা বড় হোটেলে রেখে-ছিলেন। আমি ছিলাম ভিন্ন হোটেলে। কারণ বিদেশে উভয় শিল্পীর একত্র বাস কুলোকে কু-কথা রটনার অনিবার্য্য কারণ হবে।

পরে বুঝে ফেল্লাম—শ্রীবিলাসমোহন পাল—এদেশে মিঃ বি-এম্-পল, এম-এস্ সি, ফলিত বিজ্ঞানের প্রফেসার। ইনি ঢাকা হ'তে মাত্র এক বৎসর ভারতের রাজধানীতে শুভাগমন করেছেন।

মানুষটি ফলিত বিজ্ঞানের অধ্যাপক হ'লেও চারু-শিল্পের অনুভূতিতে তার প্রাণ মন সরস। কলিকাতায় যারা সঙ্গীত-কলায় প্রসিদ্ধ, হলিউড্ থেকে টলিউড্ অবধি যারা নির্ব্বাক্ ও সবাক চিত্রে প্রখ্যাত, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নৃত্যে যারা কুশল—তাদের নামের তালিকা তার জিহ্বাগ্রে। তার গৃহে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আমার গা ছম্ ছম্-ভাব তিরোহিত হ'ল। শিশুর মত সরল, কুসুমের মত কোমল, অথচ ভদ্রলোক বৃহস্পতির মত বিজ্ঞ।

আসল কথা ঐ শ্রেণীর লোক আমাকে একটু সন্ত্রাসিত করে। যে সব শিক্ষিত লোক মাসিক পত্রিকা হাতে

পেলেই দেখেন তাতে বিলাস-বিলোল-কটাক্ষ, আঁকা ভুরু, যথাসম্ভব স্বল্প-বসনা অভিনেত্রীর চিত্র আছে কি না—প্রকাশ্য ভাবে তারা অভিনেতাদের সঙ্গে মেশবার সময়, নিজেদের চতুর্দ্দিকে একটা তুলসী-বীথির গণ্ডী দেবার ভঙ্গী করে। বিশেষ শিক্ষা-বিভাগের শিক্ষাভিমানীরা। প্রফেসার পাল এ সব ভণ্ডামীর বাহিরে। তাই বিদেশে নিজের ভাষায় প্রবাসী বাঙ্গালীর সঙ্গে শিল্প-কলা-কুশলদের প্রসঙ্গে অভিভূত হ'লাম; আর মনে মনে বল্লাম—ভগবান ভাল কর পালের।

কিন্তু পথের যত্ন তার গৃহের যত্নের মাত্র অগ্রদূত। আর গৃহসজ্জা! এমন না হ'লে মানুষের মনে এত সুষ্ঠু কোমল ভাব বিরাজ করতে পারে?

ছোট বাড়ি। সামান্য একটু বাগান। কিন্তু ডেলিয়া, জিনিয়া, চন্দ্র-মল্লিকা নানা রঙ্গে পরস্পরের সঙ্গে মিশে এমন একটা মনোরম ব্যাপারের সৃষ্টি করেছে—যার কমনীয়তায় আমার প্রবাসী মন মুগ্ধ হ'ল।

তার ঘরের সরঞ্জাম—সম্পদের বিজ্ঞাপন নয় মোটে। প্রত্যেকে গৃহ-স্বামীর স্বচ্ছন্দের সহায়ক। খোলা র‍্যাকে সাজানো তকতকে ঝকঝকে পুস্তকের সারি। ঘরে চিত্র ছিল মাত্র দু'খানি—একখানি রবীন্দ্রনাথের, অপরখানি দেশবন্ধুর।

আমাকে বসিয়ে ফয়জাবাদী পরদা সরিয়ে সে ভিতরে গেল। যার সঙ্গে কথা কহিল তিনি মধুর-ভাষিণী।

মধুর-ভাষিণী কে—এ সম্বন্ধে হাটে-বাজারে সিনেমার প্রেক্ষা-গৃহে এবং হেদোর চাতালে—নানা রকম মতামত শুন্‌তে পাওয়া যায়। আমার মনে হয়, কণ্ঠস্বর প্রতিযোগিতায় মানুষকে লুকিয়ে রাখা উচিত। কারণ কণ্ঠস্বর বিচারে আমাদের অজ্ঞাতে বিচারশক্তিকে ম্লান করে পরীক্ষার্থীর রূপ, গুণ, বংশ-মর্য্যাদা—আর অধিক মাত্রায়, হাসি ও চোখের চাহনী।

যখন মিসেস পালকে দেখিনি তখনই সিদ্ধান্ত করলাম যে তার কণ্ঠস্বর সু-মধুর। তাতে দুটা সুর—একটা খাদ আর একটা উঁচু, মোলায়েম ওতঃপ্রোত ভাবে পাক খেয়ে গেছে, দুই তারের পাকানো সুতার মত। সে সম্মিলিত সুরটি চিত্তাকর্ষক। এই রকম কণ্ঠ আমাকে আকৃষ্ট করে। আবার গম্ভীর খাদের সঙ্গে উপরকার মিহি সুর একাঙ্গ হ'লে আমাকে মত্ত করে।

যখন শ্রীমতী রেবা পাল আমাকে অভ্যর্থনা করলেন বুঝলাম আমার মন দুষ্ট। তাঁর চোখের চাহনী লজ্জা ও আক্রমণের বিচিত্র সংমিশ্রণ। তাঁর চলনও প্রতিপদে হেঁকে বলছিল—আমার নারীত্ব চাহে না চল্‌তে—কিন্তু আমার মানবতা ভয় করে না সাধু বা দুষ্ট, ধনী বা শ্রমিক কারও সম্মুখীন হ'তে।

বলছিলাম—আমি দুষ্ট। কারণ এ মূর্ত্তি আমার নয়ন-পথে পড়বামাত্র মনে হল—পটে এ চিত্র প্রতিফলিত হ'লে এবং লাউড্ স্পীকারে এ কণ্ঠস্বর প্রচার হ'লে—রাণী রাণী অনেক শিল্পীকে পাত্তাড়ি গুটিয়ে গজে মেপে কাপড় ও লজঞ্জেস বেচতে হবে।

ভদ্রমহিলা সম্বন্ধে এরকম একটা ভাব যে মনকে কলুষিত করলে—সে মনের মনে মনে কান মলে দিলাম। আরে ছ্যা! সত্যই এই জন্য আমাদের মত দুষ্ট সুষ্ঠু সমাজে মেশবার অযোগ্য।

(২)

দ্বিতীয় দিন যখন অভিনয় শেষ হ'ল—থিয়েটারের বাহিরে পাল-দম্পতির সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ল্লাম প্রতিশ্রুতি মত। তার পর তাঁদের মোটরে চড়ে গেলাম—নব-দিল্লী।

পথে শ্রীমতী আমার অভিনয়ের সুখ্যাতি করলে। প্রাণ-খোলা প্রশংসা—খাতিরের সুখ্যাতি নয়।

—ধন্যবাদ। উত্তাল মণ্ডলের নাচ কেমন লাগ্‌লো? ভারি দক্ষ শিল্পী উত্তাল—সুরে তালে বেশ পাকা।

সে আমার দিকে তাকালে। পথের আলোকে তার চোখের চাহনী দেখলাম। তার ভাব—আমি ঘরের বউ পুরুষের সঙ্গে কথা কহিতে লজ্জা পাই। কিন্তু আমি—আমি কি ডরাই সখি ইত্যাদি সমরে আহ্বান ক'র না।

হাতের ঢিল ছুঁড়েছি—তাকে উত্তেজিত করেছি। সে তখনই আমার কথার প্রত্যুত্তর দিলে—প্রতি-প্রশ্নে।

—আপনার সঙ্গে ওঁর কি কোনো সম্পর্ক আছে না কি?

গোলা গড়িয়ে দিয়েছি ময়দানে—এখন তাকে প্রহার ক'রে গোলের মধ্যে পাঠাতেই হ'বে। লজ্জা ক'রে আমিই বা কি করব।

আমি বল্লাম—আজ্ঞে দু'জনে একসঙ্গে নাচি—সহকর্ম্মী। সম্পর্ক আর কি থাকবে ওর সঙ্গে? ও মণ্ডল, আমি বিশ্বাস।

—ওঃ—বল্লে শ্রীমতী রেবা পাল। বাকীটুকু তার চক্ষু বল্‌লে—আমি খুকী নই, এমন কি বিদ্যালয়ের ছাত্রীও নই।

কাজেই আমি প্রত্যুত্তর দিলাম শব্দ ও দৃষ্টির।

—আজ্ঞে মানে হচ্চে, ওর সঙ্গে শিল্পীরা কেহ ভাব করতে সুবিধা পায় না। ওর পিতা—যে ওর মা-র—ওর অর্থাৎ-পিতা—মহল্লা এবং অভিনয়ের পরেই উত্তালকে নজর-বন্দী ক'রে রাখে।

এবার সে প্রাণ খুলে হাসলে। মোটর-চালক অর্থাৎ তার স্বামী হেসে বল্লে—আ—হা!

শ্রীমতী বল্লে—সত্য কথা নটবরবাবু। উত্তাল আর একটু গভীর হলে লাজকী নাচটা জম্‌তো ভাল। আপনি যখন বাঁশী বাজিয়ে নেচে তাকে তুষ্ট কর্ব্বার সময় পাহাড়ের মাথায় মারখর ভেড়া দেখে লাফিয়ে উঠ্‌লেন—বেচারা উত্তাল—অর্থাৎ-বাপের ভয়েই হ'ক, কি নির্ব্বুদ্ধিতার ফলেই হ'ক, আপনার দিকে বা মারখরের দিকে না তাকিয়ে ওড়না টেনে নিজের দেহ ঢাক্‌তে ব্যস্ত হল।

স্বামী সামনে থেকে বল্লে—কি করা উচিত ছিল?

—উচিত ছিল? যে প্রেমিক রামছাগল দেখে উপেক্ষা করে সেই প্রণয়িণীকে যার মনস্তুষ্টির জন্য সে বাঁশী বাজাচ্ছিল—যার অনুভূতি গভীর—পাহাড়ী লাজকী রমণী, যার জেলাসী নিজেকে ব্যক্ত করে ছুরি মেরে—সে ঐ উপেক্ষার সময় বাঁশরী-বাদককে বা ভেড়াকে ভস্ম কর্ব্বার একটা চাহনী ও ভঙ্গী না দেখায় যদি—দর্শক টিকিটের মূল্য ফেরত পাবার অধিকারী।

সে লুলু! আমাদের গর্ব্বিত অধিকারী মশায় একথা শুনলে কি রকম বোকার মত তর্ক করত—তা ভেবে নিলাম।

সারথি বল্লে—ব্র্যাভো! রেবা তোমার অনুভূতি ভারি সূক্ষ্ম।

শ্রীমতী বল্লেন—পথের দিকে মন দাও। না হ'লে লোক চাপা দেবে।

আমাকে বসিয়ে রেখে তারা যখন বাড়ির ভিতর গেল—কানে কথা পৌঁছিল—আড়ি পাতার ফলে নয়।

—তোমার কথাবার্ত্তা শুনে ভারি গর্ব্ব হয় রেবা।

—তোমার কাছেই তো শেখা কথা। তুমিই তো আমার মনকে জাগিয়েছ—গুরুমশায়।

তারপর শব্দ শুনলাম—গভীর চুম্বনের—প্রাণে প্রাণে মেশামিশির—অমল সহজ সঙ্কেত। সিনেমার ভাড়া-করা ঘটা-করা প্রাণ-হীন আবেগের ইঙ্গিত নয়।

(৩)

ভোজনের পর অধ্যাপক বল্লে—চলুন কুতবের নির্জ্জন পথে খুব খানিক দূর বেড়িয়ে আসি। আপনি এবং মিসেস পাল যে সব গুরুতর বিষয় আলোচনা করেছেন—আমার চিত্তের পক্ষে সে-টা হ'য়েছে গুরু-পাক।

আমি বল্লাম—মিসেস পাল পথের ভবঘুরে ধ'রে এনে মনের ভুরি-ভোজনের ব্যবস্থা করেছেন তা' নয়। তিনি দেহের পুষ্টির যে ব্যবস্থা করেছেন হফ্‌তা খানেক অনাহারে দেহ প্রকৃতিস্থ হবে।

রেবা পাল হেসে বল্লে—মানুষের পেশা তার চিন্তা এবং বাক্যকে নিয়ন্ত্রণ করে। রাজা উজীর সেজে আপনাদের ভাষাও হ'য়েছে লম্বা চওড়া।

তর্ক নিষ্প্রয়োজন। বল্লাম—সার, কিন্তু আমাকে গাড়ি চালাতে দিতে হবে।

মিসেস রেবা বল্লে—যদি প্রতিশ্রুতি দেন যে অক্ষত দেহে পথে জীবহত্যা না ক'রে ঘরে ফিরিয়ে আন্‌বেন, আমার আপত্তি নাই।

—দেখুন সকল কর্ম্মফলের মালিক বিধাতা—আমার পক্ষে সে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হবে দারুণ ধৃষ্টতা।

একথা যখন বল্লাম—চমকে উঠ্‌লো প্রাণটা।

যে কারণে গাড়ি চালাতে চাহিলাম—সে ইষ্ট সিদ্ধ হ'ল। বহুকাল-মৃত প্রাচীন সহরের ধ্বংশ স্তূপের ভিতর দিয়ে যাবার সময় বুঝলাম—অমৃতের সন্ধান কেবল একনিষ্ঠ সর্ব্বগ্রাসী প্রেমই দিতে পারে। জ্যোৎস্নার আলোক এবং পথিক বাতাস তাদের আত্ম-বিস্মৃত করে দিলে। তারা অধিক পথ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে চল্‌লো—মুখে তৃপ্তির অব্যক্ত মৃদু হাসি—দেহে মোক্ষের আত্ম-বিস্মৃতি।

সফদর জঙ্গ পার হয়ে দেখলাম একটা বটগাছের তলায় ধুনি জ্বলছে। ধ্যান-স্তিমিতনেত্র এক সাধু। তার সম্মুখে সিঁদুর মাখানো নর-মুণ্ডের কঙ্কাল আর একটা ত্রিশূল।

প্রেমিকদের ধ্যান ভেঙ্গে বল্লাম—একবার ভাগ্য পরীক্ষা করলে হয়—চার্লি চ্যাপলিন হোতে পার্ব্ব কিনা।

তারা চেতনা পেয়ে হাসলে। অধ্যাপক বল্লে—ক্ষতি কি? পুরুষস্য ভাগ্যম্।

গাড়ি রাখলাম গাছতলায়।

সাধুর মাথায় প্রকাণ্ড গৈরিক পাগড়ি—মুখে অসভ্য দাড়ি—তৈল-হীন, অপরিষ্কার।

গাড়ি যেমনি থামলো সাধু আমাদের তিনজনকে দেখ্‌লে। রেবা একটা ক্ষীণ আর্ত্তনাদ করলে। সাধুর চক্ষু জ্বলে উঠ্‌লো।

এসব হলো নিমেষে। সন্ন্যাসী বিদ্যুৎ-ক্ষিপ্র পদে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লো। মরার খুলিটা ধ'রে এত জোরে রেবার মাথায় মারলে যে দুটা কাঠে-কাঠে ঠুকলে যেমন ভীষণ শব্দ হয় তেমনি ভীষণ একটা শব্দ হল।

সে মূর্চ্ছিতা হ'ল। আমি লাফিয়ে পড়ে বজ্র মুষ্টিতে পাপিষ্ঠর হাত ধরলাম।

—পাপিষ্ঠ—ভণ্ড—খুনী!

তার অঙ্গের ক্ষিপ্রতা অসাধারণ। চকিতে কঙ্কালটা বাম হস্তে ধ'রে সে টিপ করে আবার মারলে রেবাকে।

মাথার খুলির দাঁতগুলা লাগলো রেবার গালে। সে ভীম আর্ত্তনাদ করলে। পাগলটা বিকট অট্টহাস্য করলে।

চমকে উঠ্‌লো প্রফেসার।

আমি মাথা ঠাণ্ডা ক'রে তার থুব্‌নী লক্ষ্য ক'রে একটা ঘুষা চালালাম প্রাণপণ শক্তিতে।

পালোয়ান যেমন শিশুর হাত ধরে তেমনি স্বচ্ছন্দ অনায়াসে সে আমার হাত ধরলে। আবার অট্টহাস্য করলে। তারপর বল্লে—ভারি সুখ হচ্চে নয় বেলা দেবী? তোমার গালে চুমু খেলে কে জান? অনিল রায়। শয়তানের দিব্যি এ মাথার খুপড়ি তার—নিজের হাতে কেটেছিলাম—যখন আমার বিছানায় দুজনে মুখোমুখি করে শুয়েছিলে।

বুঝলাম কি একটা গভীর রহস্যর মধ্যে পড়েছি। বল্লাম—প্রফেসার গাড়ি এগিয়ে নিয়ে যাও। পালাও।

সে মন্ত্র-মুগ্ধের মত গাড়ি চালিয়ে দিলে।

সাধু বল্লে—তুমি কে বাবা? চার নম্বর?

আমি বল্লাম—তুমি কে? যদি প্রাণও যায় ছাড়ব না। এ নারী-হত্যা হ'ল আমার কুবুদ্ধিতে। আমিই গাড়ি দাঁড় করালাম। কে জান্‌তো তোমাকে স্ত্রীহত্যা করতে দেবার অবসর দেবার জন্য এ দুর্ব্বুদ্ধি জাগ্‌লো মাথায়! পাষণ্ড!

সে বল্লে—হত্যা হবার নারী নয়। সেবার বে-মালুম পালিয়েছিল। আমি তার পতি। তার উপ-পতির গলা কেটে মুণ্ড নিয়ে ভেগেছিলাম—তারই মত বে-মালুম।

—বল্লাম—তোমার কথা সত্য হ'লেও এ-মহিলা অন্য। এর নাম বেলা দেবী নয়।

সে বিকট হাস্য করলে। খুব বড় সিনেমা আর্টিষ্টের মত মুখ-ভঙ্গী ক'রে, পুরাতন বন্ধুর মত বল্লে—সে পতি বদলায় যে নাম বদলে উপ-নাম নিতে পারে না।

—তুমি পাগল। ওঃ! অনায়াসে স্ত্রী-হত্যা—

সে বল্লে—দেখ বাবা চার নম্বর। দু নম্বরের মুণ্ড সামনে রেখে তিন বৎসর ধ্যান করেছি—শ্মশান-কালির, বেলা-দেবীর আর দু'নম্বর অনিল রায়ের।

—পিশাচ—শয়তান।

তাকে ধরে চীৎকার করলাম—ডাকু—খুন। কোই হায়। ডাকু। খুন।

সে বল্লে—দেখ বাবা এখন সু-সময় চেঁচিয়ো না। আজ সাধুর মোক্ষ হ'ল। সন্ন্যাস শেষ হ'ল। চড়ক সংক্রান্তি। হাসি মুখে চড়ক গাছে ঝুলবো। চেঁচিও না। পালাব না।

কি বল্‌ব? মহাবলী লোকটা। ইচ্ছা করলে হাত ছাড়িয়ে নিশ্চয় পালাতে পারে। তবু ধরে রইলাম।

সে বল্লে—জজ কোর্টের নাজিরের মুহুরি ছিলাম—বেলা বড় বড় বই পড়েছিল—উঁচু উঁচু কথা বলত।

তারপর চুপি চুপি বল্লে—আমাকে কেন পছন্দ হয়ে বল। জমিদারদের মেজোবাবু অনিল রায়ের সঙ্গে ফেঁসে গেল। একদিন ধরলাম—এক বিছানায়—আমার দীন শয্যায়। অনিলের বুকে ছুরি মারলাম। তার মুণ্ডটা কেটে নিলাম। বুঝ্‌লে?

আমার মাথা ঘুরছিল। শিল্প সমালোচনা কানে বাজছিল। রেবার উন্মাদক কণ্ঠস্বর! এই উন্মত্তের রুদ্ধ ধ্বনি দামামার রোলের মত প্রবিষ্ট হ'ল কর্ণে।

সে বল্লে—বেলা পালিয়েছিল। আমিও মুণ্ড নিয়ে দে ছুট্। যেমন দুধ মরে ক্ষীর হয়, মুণ্ড শুকিয়ে কঙ্কাল হয়। কিন্তু ছাড়িনি। এই দিনের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। সাধনা কর্ত্তাম—অনিলের মুণ্ড দিয়ে রেবার মুণ্ড ভাঙ্গব। তান্ত্রিক সাধনা।

—চোপ্।

—ধম্‌কেও না বাবা। আচ্ছা তিন নম্বরটা নীলু পালের বেটা বিলাস পাল না? ওটা বেলাকে পেলে কোথায়? ও যখন কলেজে পড়ত—ঘুরতো আমার বাড়ির চারিদিকে, আনাচে কানাচে।

আমি বল্লাম—চল। তোমার হাতে মরবার সময় অবধি আঁকড়ে থাক্‌ব।

—আচ্ছা চল—ছুঁড়ির মাথাটা ভেঙ্গেছে ঠিক। কি বল? ফটাস্!

তার পর আনন্দে হাস্‌লে—বিকট পিশাচের হাসি।

এবার লক্ষ্য সার্থক হল। আমার ঘুসি খেয়ে সে ঘুরে পড়লো।

অচৈতন্য!

গাড়ি ঘুরে এলো। বিলাস বল্লে—চলে এস। ও থাক্।

গাড়িতে উঠ্‌লাম—তখন লোকটা উঠে বসে আর একবার বিকট হাসলে।

তার চৈতন্য হ'ল। রেবার কিন্তু চৈতন্য হ'ল না। সাত দিন সাত রাত—বহু চেষ্টা করলে দিল্লীর সকল ডাক্তার মিলে।

লোল-জিহ্বা লক্‌-লকে বহ্নি পারলে না—আমার চোখের জল শুকাতে। ভাবলাম এ অভিনয়ে আমি না নাম্‌লে কে জানে জীবন-মরণের হিসাব-খাতার খরচের দিকে এ-রত্ন উল্লিখিত হত কিনা।

চৈতন্যের গৃহত্যাগ

শ্রীঅমল সেন

ঘুমাও ঘুমাও প্রিয়া!—শুকতারা নিভে নিভে আসে,
শারদ-পূর্ণিমা চাঁদ ম্লান হেসে মিলালো আকাশে।
বসুন্ধরা শ্যামলিমা প্লাবিয়া নেমেছে জ্যোৎস্নালোক,
স্তম্ভিত নিখিল-বিশ্ব, ঘুমাইছে দ্যুলোক ভূলোক।
দেবতা-মন্দির তলে সন্ধ্যারতি সমাপ্ত এখন,
নিভে গেছে দীপালোক—সুপ্তি মৌন ধরার অঙ্গন;
রাজপথে লোক নাহি, রাজদ্বারে প্রহরীরা যত
সতর্ক সন্দিগ্ধ দৃষ্টি জেগে আছে স্তব্ধ তন্দ্রাহত।
রজনীগন্ধার বুকে শিশিরের অশ্রু-মাল্যখানি
শুভ্র এই জ্যোৎস্নালোকে চুপে চুপে কে দিয়েছে আনি'?
সহকার শাখে শুধু জাগে মৃদু মলয়-স্পন্দন,
মর্ম্মরে পল্লব-দল, কাঁপে দূরে দেবদারু বন।
উচ্ছ্বসিতা ভাগীরথী প্রবাহিয়া চলিয়াছে ধীরে—
কুলু কুলু কলগান ভেসে আসে উদার সমীরে।
যাবার এসেছে লগ্ন—আমারে মাগিছে বিশ্ব-লোক,
ডাকে স্তব্ধ নীলাকাশ, ডাকে দূর নীহারিকা-লোক।
মহাসাগরের বুকে শুনিতেছি আকুল আহ্বান,
ডাকে মোরে কোটি কণ্ঠে লক্ষ শত ব্যথাতুর প্রাণ।
অন্ধকারাগৃহ মাঝে বন্দী যারা—অশ্রুসিক্ত আঁখি
মুক্তি মাগে প্রতিক্ষণ মোর কাছে, নির্ব্বাসনে থাকি
লক্ষ নরনারী ওই রুদ্ধ ঘরে যাপিতেছে দিন,
রুগ্ন-দেহ ভগ্ন-স্বাস্থ্য কাঁদে বন্ধু ব্যথায় মলিন,
দারিদ্র্যের অত্যাচারে মৃত্যু মুখে চলেছে অবাধে
আমার আপন যারা—তার লাগি প্রাণ মোর কাঁদে।
বঞ্চিত যাহারা বিশ্বে, সর্ব্বহারা, রিক্ত, অসহায়;
পঙ্কিল আবর্ত্তে যারা, নেমে গেছে ধ্বংসের সীমায়,
তাদের মুক্তির বাণী মোর মাঝে উঠিবে উদ্ভাসি—
বিদায়, বিদায় প্রিয়া! তুমি হাসো সকরুণ হাসি
তন্দ্রায় সুখের স্বপ্নে; বাহু ডোরে কণ্ঠ আলিঙ্গিয়া।
যখন জাগিবে তুমি, আমি রব বহুদূরে প্রিয়া!
পুরীর সমুদ্র মাঝে দেখিয়াছি আলোক-শিশিরে
তরুণ অরুণ-দীপ্তি—ধরিত্রীর নীলাম্বর ঘিরে
উদ্বেল তরঙ্গরাজি শূন্যপানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি
মানবের ব্যথাবিষে নীলসিন্ধু, ক্ষুব্ধ জল রাশি।
সীমার মোহানা হ'তে চলিয়াছে অকূল সীমায়।
তরঙ্গিত মহাসিন্ধু দিশেহারা দূর নীলিমায়।
সেই মত চলি মোরা পথের পাথেয় করি ক্ষয়—
চলি মোরা রাত্রিদিন—বিলাইয়া, করি না সঞ্চয়।
স্নেহের বন্ধন হ'তে আপনারে লই অপসারি,
কাঁদে কত শচীমাতা—অশ্রু আঁখি বিষ্ণুপ্রিয়া নারী
প্রেয়সী সে প্রিয়তমা বাহুপাশে বাঁধিবারে চায়—
সকল বন্ধন টুটি' মৃত্যুহীন দূর লোকে ধায়।
বিহঙ্গ-কুজিত কণ্ঠে নিশীথের ভাঙিবে স্বপন,
যাই প্রিয়া, প্রিয়তমা! ছিন্নকর ব্যগ্র আলিঙ্গন।

রাত্রি হ'লো অবসান—ম্লান শশী মিলালো আকাশে,
ঘুমাও ঘুমাও প্রিয়া! শুকতারা নিভে নিভে আসে।

হরিহর ছত্রে

শ্রীপ্রতুলচন্দ্র ঘোষ

হাক্স্‌লী সাহেবের 'Along the Road'-এ লিখিত "Why not Stay at Home" প্রবন্ধটি বহুলাংশে মূল্যবান বলিয়া প্রতীত হইল। নিজের উপর ইহার সত্যতা আর একবার সপ্রমাণিত করিয়া লইলাম। আমরা যে দেশভ্রমণে বাহির হই, দল বাঁধিয়া হল্লা করিয়া টুরিষ্ট হইয়া বহু-খ্যাত, বহু-আকাঙ্খিত দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়া বেড়াই, তাহার পশ্চাতে সত্যিকার কতখানি ভ্রমণের নেশা থাকে, কতটুকু তত্ত্ব এবং তথ্য শিখিবার ও জানিবার আগ্রহ থাকে? 'ইন্‌টেলেক্‌চুয়্যাল্ ইন্‌টেন্‌সিটি' শব্দ দুইটির প্রচলন ইদানীং আশ্চর্য্যরকম বৃদ্ধি পাইয়া গিয়াছে—দেশভ্রমণের পশ্চাতে ইহার কোন গোপন দুরভিসন্ধি লুক্কায়িত নাই ত? অনেক প্রবীণ, অভিজ্ঞ পরিব্রাজকের মুখে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি, —'দেখুন, সত্যিই নতুন দেশ দেখার কোন আনন্দ নেই, কোন প্রেরণাও পাই নে; যা-কিছু আছে তাহা দেশ দেখে এসে গল্প বলবার এবং গল্প শুনিয়ে মুগ্ধ ও বিস্মিত করবার!'

'অমুক্ ভদ্রলোক অনেক দেশ ঘুরে এসেছেন'—এই শ্রদ্ধা-সম্বলিত বিস্মিত দৃষ্টি ও জিজ্ঞাসা যেমন শ্রুতিমধুর, তেমনি যশবর্দ্ধক। আমরা সবাই কম-বেশী অনুরূপ খ্যাতি লাভের জন্য উন্মুখ হইয়া থাকি। না হইলে, বহুবিধ শারীরিক ও আর্থিক ক্লেশ-যাতনা সহ্য করিয়া কোন-একটি বিশেষ স্থানে কয়েকঘণ্টা বা কয়েকটা দিন অতিবাহিত করিয়া আসিতেই যে সেই স্থানটির যাবতীয় রস ও মাধুর্য্য সংগৃহীত হইয়া রহিল, ইহা কল্পনা করাও যেমন হাস্যকর, এই উৎকট অভিজ্ঞতার বাহাদুরী লওয়াও তেমনি অননুশীলিত মনের পরিচায়ক। অথচ মজা এই যে, উক্ত মর্য়াল্-টি আমরা সবাই জানি এবং জানিয়া শুনিয়াই পুনরায় দেশভ্রমণে বহির্গত হই।

"পান্থের অন্তরে জ্বলে দীপ্ত আলো জাগ্রত নিশীথে" —ইহা শুধু কাব্যেই সম্ভব। শূন্য গগনে কাহারও বারতা কোন পান্থ কোন দিন পাইয়াছেন বলিয়া আজ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই; তবুও সমস্ত পান্থেরই সেই চঞ্চলতা···বহির্গমনে একই প্রকারের উৎফুল্লতা ও ব্যস্ততা। পুস্তকের শ্রীকান্তে ও বাস্তবের শ্রী পরিব্রাজকে এখনও অনেকখানি তফাৎ রহিয়া গিয়াছে।

এবম্বিধ চিন্তাধারার মধ্যেও হেমন্তের এক অনতিপ্রখর মধ্যাহ্নে কম্বলখানা দেহের একধারে ফেলিয়া গৃহপ্রাঙ্গণ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলাম; গৃহস্বামী আসিয়া যাত্রারম্ভেই বাধা প্রদান করিয়া বলিলেন—'কোথায় চললেন?'

—এই, একটু ঘুরে আসব ভাবছি।

—সে কি? আবার কোথায় ঘুরতে যাবেন? এই তো সেদিন চিত্রকূট-মন্দার থেকে ফিরলেন?

হাসিয়া বলিলাম—'অনেকদিন তো নিরুপদ্রবে আপনার অন্নধ্বংস করা গেল; এবার অপর এক স্থানে 'লাক ট্রাই' ক'রে দেখা যাক।'

—রাখুন মশাই, আপনার চালাকি! এখন দাবার থলেটা বে'র করুন দেখি।

দাবার পুটলিটা বাহির করিয়া গৃহস্বামীর হস্তে দিতে দিতে বলিলাম—'এই কাশীর সেট্‌টা আমার স্মারক স্বরূপ আপনার নিকট গচ্ছিত রহিল। যদি কোন দিন আবার এ পথ দিয়ে ফিরি, তখন নূতন কিস্‌মতে কিস্তীমাত্ করা যাবে, কিন্তু আমাকে এবার সত্যিই যেতে হ'বে। নমস্কার!'

পিছনে ফিরিয়া তাকাইবার সাহস নাই। বাঙালী বিরল পশ্চিমের শহরটিতে এই ভদ্র সজ্জন বৃদ্ধটির আতিথেয়তা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে রুচিতে বাধিল। দ্রুতপদে স্টেশনের দিকে অগ্রসর হইলাম। দীর্ঘপথ একটানা ট্রেনে অতিবাহিত করিতে হইবে। আবার বদ্‌লী, আবার ছোট গাড়ী। তারপর, পাটনা। পাটনার অন্তঃস্থলে মহেন্দ্রঘাট। মহেন্দ্রঘাট হইতে গঙ্গা পার হইয়া পালেজাঘাট স্টেশন। সেখান হইতে বি-এন্-ডব্‌লিউতে সোনপুর। ক্লান্তিকর বঙ্কিম পরিভ্রমণ। হরিহরনাথের মন্দির সোনপুর স্টেশন হইতে কয়েকমাইল দূরে দণ্ডায়মান; এইবারকার লক্ষ্যস্থল সেই দিকেই। মহেন্দ্রঘাট হইতে

গঙ্গা পার হইতে গিয়া কিন্তু আচম্‌কা শিহরিয়া উঠিলাম। বেশ ত, নির্ঝঞ্ঝাটে ছিলাম। কেন আবার এই নিরর্থক ভ্রমভোগ? কোথাও যে তিল ধারণের স্থান নাই! দেহাতীক (গ্রাম) ও শাহরিক সভ্যতা সমস্ত আসিয়া এই ক্ষুদ্র ষ্টীমারখানার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় এই বৎসর নাকি বিশেষ শুভযোগ আছে। গণ্ডক নদীতে স্নান, হরিহরনাথের পূজা প্রদান এবং সোনপুরের বিখ্যাত মেলার বাণিজ্য সম্পাদন একই সময়ে উদ্‌যাপিত হইবে। মানুষের জন্য মানুষের স্নেহ-মমতা করুণা-সহানুভূতি নাই, একের জন্য অন্যের বসিয়া থাকিলে চলিবে কেন? ঠেলাঠেলি, ভীড়, গাঁট্‌কাটা, বোঁচ্‌কা, ঘটি প্রভৃতির সংমিশ্রণে একটা অদ্ভুত আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। দেহাতী তীর্থযাত্রীর দল ভারতের বিভিন্ন জাতি-বর্ণ-আচার-নির্বিশেষে পুণ্যসঞ্চয়ে চলিয়াছে। ষ্টীমারে কোনপ্রকারে পদার্পণ করিতে পারিয়াছি, কিন্তু ট্রেনের সঙ্কীর্ণ প্রবেশদ্বার দিয়া গন্তব্যস্থলে অবতরিত হইতে পারিব ত? না পারিলে আর কি করা যাইবে? হরিহরনাথ দর্শন করিয়াই বা এমন কোন্ লোকলাভ হইবে!

নাঃ, ফিরিয়াই যাইতে হইল দেখিতেছি। পাথরের দেবতার নিকট পুণ্যকামীরা সিদ্ধিলাভ করিতে যাইতেছেন—মানুষের প্রতি আকর্ষণ থাকিলে বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে! কোথাও যে ব্যূহ-ভীড় ভেদ করিয়া প্রবেশলাভ করিতে পারিব এমন মনে হইল না। এ-ই বা মন্দ কী? গঙ্গার তীর দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে অনেক দূর অগ্রসর হইয়া যাইতে পারিব। অব্যবহার্য্য দুস্তর পথ, উচ্ছিষ্ট ময়লার প্রতি পদক্ষেপে সমস্ত শরীর ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইয়া ওঠে। পয়দালের যাত্রীও ন্যূন নহে, সকলেরই অবিচলিত নিষ্ঠা, অদম্য উৎসাহ। তাহাদের সঙ্গী হইতে পারিলে রাস্তাটুকু বেশ উত্তেজনায়ই কাটাইতে পারিব।

—"এই যে নমস্কার! আপনিও মেলার যাত্রী নাকি?"

পিছনে ফিরিয়া তাকাইলাম। পাটনার ধনী ব্যবসায়ী মিঃ চ্যাটার্জ্জী গাড়ীর মধ্য হইতে নমস্কার জানাইতেছেন। হাত তুলিয়া প্রত্যভিবাদন করিলাম।

—"অভিপ্রায় তো সেই রকমই ছিল, তবে—"

—"আবার তবে কি? ভেতরে চলে আসুন, এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে।"

যাওয়া ত যাবে, কিন্তু যাই কেমন করিয়া? দরজার সুদৃঢ় অর্গল মুক্ত করিবার শক্তি আমার মতন ক্ষীণকায়দের নাই। একমাত্র ভরসা স্বল্প-পরিসর জানালা কয়টি। অগত্যা তাহার উপর দিয়াই acrobatic feats প্রদর্শন করিতে হইল।

সোনপুর স্টেশনে আসিয়া যখন গাড়ী থামিল, তখন বেলা প্রায় শেষ হইতে চলিয়াছে। সেই স্বল্পালোকে ভারতের দীর্ঘতম প্লাট্‌ফর্মটির একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত তাকাইতে গিয়া আর একবার শিহরিয়া উঠিলাম—এক মাইল-ব্যাপী প্লাট্‌ফর্মটির দুই দিকই যে অগুন্তি মাথা ও মালের ঠাস্‌বুনানি। ইহার পরেও ত মাইল দুই আন্দাজ রাস্তা আছে, রাস্তার পার্শ্বেও নিশ্চয়ই বিশাল শাল্মলী তরুর অভাব নাই। তাহা ছাড়া, একপক্ষ কাল ধরিয়া যে-মেলার পূর্ণাধিষ্ঠান হইবে তাহার নিমিত্ত অস্থায়ী পর্ণকুটির এবং পাকা ধর্ম্মশালাগুলির অবস্থা ভাবিতেও যে ভয় হইতেছে!

—'আসুন না, দাড়িয়ে রইলেন কেন?' মিঃ চ্যাটার্জ্জী দুই হাতে ভীড় ঠেলিতে ঠেলিতে অগ্রসর হইলেন।

সস্ত্রীক ধর্ম্মসংস্থানে চলিয়াছেন—আপনার পথ আপনি নিজে দেখুন মশাই। পশু-পক্ষীর হাট দেখিয়া কোন্ স্বর্গ লাভ হইবে? বরঞ্চ, আলো থাকিতে থাকিতে সোনপুরের বিখ্যাত প্লাট্‌ফর্মটিতে বারকয়েক পায়চারি করিয়া লই, রাত্রি বাড়িলে মেলার আসল রূপটা না হয় একবার দেখিয়া আসা যাইবে!

—'দেখেছেন কি রকম ভীড়! চট্ ক'রে এদিকে চলে আসুন্, লাইট্ যা পাওয়া গেছে তাতেই গোটা কয়েক স্ন্যাপ্ নেওয়া যাবে।'—মিঃ চ্যাটার্জ্জী ক্যামেরার তোড়জোড় ঠিক করিতে লাগিলেন।

পা-মাপিয়া দূরত্ব ঠিক করা হইল, হাত আড়াল করিয়া দেখা হইল 'ইমেজ্'। কিন্তু, খট্ করিবার পূর্ব্বেই চট্‌পট্ বহু লোক আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। সবাই-ই তস্‌বীর উঠাইতে চায়; ফলে সমস্ত ব্লার্ড্। পরে শোনা গিয়াছে, উহারই মধ্যে একখানা নাকি বহুমূর্ত্তির রূপ পরিত্যাগ করিয়া নির্দ্দিষ্ট 'অব্‌জেক্টের' সম্মান রক্ষা করিয়াছে।

ক্যামেরার মোহ ছাড়াইয়া মেয়েরা ইতিমধ্যে জনারণ্যে মিশিয়া গিয়াছিল। মিঃ চ্যাটার্জ্জী সচকিত হইয়া বলিলেন, —'তাই ত, ওঁরা গেলেন কোথা?'

ওঁরা মানে স্ত্রী ও শ্যালিকা। কোথায় গেলেন তাহা আমি কেমন করিয়া বলিব, নিজে খুঁজিয়া দেখুন কোথায় তাঁহারা পথ হারাইয়া ফেলিয়াছেন। মেলার ভীড়ে ও পুণ্যস্নানের উদ্দেশ্যে মেয়েদের লইয়া বাহির হইলে চল্‌তি—পথের সঙ্গীদের উপর নির্ভর করিলে চলিবে কেন? আমি ত মশাই সরিয়া পড়িলাম।

'—আপনি তা হ'লে ও দিকটা খুঁজুন, আমি বাইরে যাবার সুড়ঙ্গটা দেখি।' মিঃ চ্যাটার্জ্জী অত্যন্ত অস্থির হইয়া ছুটিয়া চলিলেন।

এই জনসমুদ্রে কে কাহাকে অন্বেষণ করিবে? এইমাত্র আমরা যে-গাড়ীখানা হইতে অবতরণ করিলাম, তাহারই কয়েক সহস্র যাত্রী এখনও প্লাট্‌ফর্ম্ পার হইতে পারে নাই। ইহা ছাড়া প্রতিমুখ যাত্রীরা আছেন। সাবধানে পা ফেলিতে ফেলিতে ওয়েটিংরুমের দিকে অগ্রসর হইলাম। যদি সেখানে পাওয়া যায়, ভালই। নচেৎ, রিফ্রেস্‌মেণ্ট রুমে রিফ্রেশ্‌ড্ হইতে ঢুকিয়া পড়িব। ঐকান্তিক নিষ্ঠায় সোনপুরের ওয়েটিং রুমে তীর্থকামীরা অপেক্ষা করিতেছেন। যাহারা ফিরিয়া আসিয়াছেন তাহারা ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্ত। পুণ্য ও পণ্যের ভারে অবনমিত। কতক্ষণে ট্রেন্ আসিবে, কখন গঙ্গার ওপার গিয়া পাটনার ট্রেন্ ধরা যাইবে ইত্যাদি নানা উদ্বিগ্নতায় তাহারা উদ্ব্যস্ত। বহু বিনিদ্র রজনীর ক্লিষ্ট ছাপ সকলের চোখেই পরিস্ফুট; দেহের বসন মলিন, পর্য্যাপ্ত আহারের অভাবে শরীর শ্রীহীন। বৃদ্ধারা ক্লেশ-সহিষ্ণু, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্কাদের পানে তাকাইতে সাহস হয় না। বহু বাঙালী রমণীর এবম্বিধ দুর্ভোগের মধ্যে বসিয়া থাকিতে দেখিলাম। যাঁহারা দর্শনেচ্ছু তাঁহারাও পশ্চাদপদ নহেন। তাঁহারাও অনুরূপ অবস্থায় বিপদগ্রস্ত হইতে প্রস্তুত। বহুদূর দেশ হইতে তাঁহারা বাবা হরিহর-নাথকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন। গণ্ডক নদীতে স্নান করিয়া অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করিতে হইবে। গাড়ীর ভীড়ে, রাস্তার অসুবিধায় ফিরিয়া আসিতে হইলে তীর্থযাত্রার আকর্ষণ রহিল কোথায়? বস্তুত ইদানীং রেল কোম্পানীর দ্রুত প্রসারলাভহেতু যাত্রীদের তীর্থের মোহ দিনে দিনে হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে। আজ আর রামেশ্বর সেতুবন্ধ যাইতে হইলে পরিজনদের নিকট হইতে চিরবিদায় লইয়া যাত্রা করিতে হয় না। শ্রীক্ষেত্রের পথের প্রান্তে রোগযন্ত্রণায় প্রাণ হারাইতে হয় না, গামছা বাঁধিয়া চিড়া-মুড়ি-কলা (স্থানবিশেষ ও আচারবিশেষ বাদ দিয়া) বাঁধিয়া লইবার প্রশ্নই ওঠে না। মানুষ কি ক্রমেই শ্রমবিমুখ হইয়া পড়িতেছে, না সভ্যতার সংস্কৃতিতে তীর্থের দুর্ব্বার মোহ হইতে ভারতীয় মন ধীরে ধীরে নিষ্কৃতি পাইতেছে?

বিহার প্রদেশের রমণীরা ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে অতিশয় নিপুণা। কায়িক পরিশ্রমে তাহারা আজিও ভারতের অন্য প্রদেশস্থিত স্ত্রীজাতি (পার্ব্বত্যশ্রেণী বাদ দিয়া) হইতে দৃঢ়মনা ও উন্নত রহিয়া গিয়াছে, শারীরিক সৌন্দর্য্যে এবং পরিচ্ছন্নতায় তাহারা হয় ত প্রিয়দর্শিনী নহে (এমন কি সময়-বিশেষে তাহাদের পানে দৃষ্টিপাত করিলে সমস্ত নারীজাতির উপর বিতৃষ্ণা জন্মে), তবুও তাহাদের বলিষ্ঠ দীপ্তি, সতেজ দেহভঙ্গিমা পুরুষমাত্রকেই সশ্রদ্ধ করিয়া তোলে, সর্ব্বত্র তাহাদের উন্মুক্ত গতিবিধি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। কিন্তু সব চাইতে নয়নবিদারক দৃশ্য উলঙ্গ এবং অর্দ্ধোলঙ্গ শিশুদের ব্যাকুল চীৎকার ও অব্যবহার্য্য আহার্য্য গ্রহণ। বিহার প্রদেশের পিতামাতারা বোধ হয় এই বিষয়ে নিষ্করুণ কর্ত্তব্যপরায়ণ। বহু সম্ভ্রান্ত বিহারী-পরিবারে ছেলেমেয়ের যত্নের অভাব অত্যন্ত মলিনভাবে প্রকটিত হইতে দেখিয়াছি। অর্থের অভাব নাই, অথচ আদরের অভাব প্রতিমুহূর্ত্তে স্মরণ করাইয়া দেয়।

—'এই, এক-কাপ্ চা লে আও ত', রিফ্রেশমেণ্ট রুমে ঢুকিয়া একমাত্র ভারতীয় পানীয়ের অর্ডার দিলাম।

—'শুধু চা, আর কিছু খাবেন না?' ফিরিয়া দেখি মিঃ চ্যাটার্জ্জী ইতিমধ্যে সকলকে খুঁজিয়া লইয়া আসরে বসিয়াছেন—'ফিরবার গাড়ী কিন্তু অনেক রাতে, এই বেলা যা হয় কিছু খেয়ে নিন্।'

জিজ্ঞাসা করিলাম—'এদের কোথায় পেলেন? হারিয়ে যায় নি তা হ'লে!'

—'নাঃ, এদিকেই পাওয়া গেছে! চলুন, তাড়াতাড়ি প্রথমে মন্দিরটা দেখে আসি, তারপর ঘুরে-ঘুরে মেলা দেখা যাবে।'

—'আপনারা অগ্রসর হোন্, আমি আস্তে আস্তে পদব্রজেই এই পথটুকু পার হব।'

—'বলেন কি? রাত হয়ে যাবে যে! অন্ধকারে পথ চলবেন কেমন ক'রে—পাক্কা দুই মাইল, সে খেয়াল আছে?'

তাহা হউক, শ্লথগতিতে উন্মত্ত জনারণ্যে মিশিয়া গেলাম। সোনপুর স্টেশন হইতে মেলার প্যাণ্ডেলে পৌঁছিতে প্রায় এক ক্রোশ পথ হাঁটিতে হয়। রাস্তা ধূলি-ধূসরিত, কিন্তু দুর্গম নয়। পদব্রজে প্রায় আধঘণ্টা লাগে। পথপ্রান্তে চুল্লী জ্বলিতেছে দেখিলাম। ভস্মমাখা কৌপীনবন্ত সন্ন্যাসীরা এখানে-ওখানে আস্তানা পাতিয়াছেন, যাত্রীরাও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। মাটির হাঁড়িতে নৈশভোজ প্রস্তুত হইতেছে; প্রব্রজ্যাদের চেলাগণ উত্তেজক ধূম্রে প্রবৃত্ত। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া মিউনিসিপ্যালিটি কর্ত্তৃপক্ষের সুদৃশ্য তাঁবু দেখিতে পাওয়া গেল। আইন ও শৃঙ্খলার কর্ত্তারাও আসিতে বাধ্য হইয়াছেন। ডাকবিভাগের অস্থায়ী অফিস খোলা হইয়াছে। সবাই ব্যস্ত, মেলার সুসামঞ্জস্য রক্ষায় সকলেরই আগ্রহপরায়ণ, অপেক্ষাকৃত এই কোয়ার্টারটাই

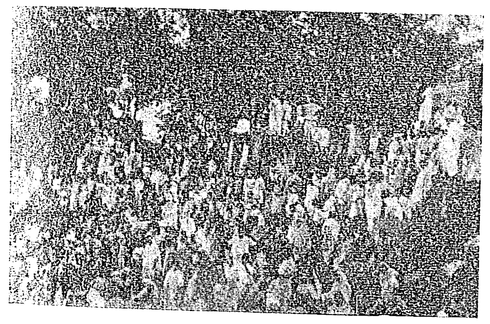

জনতার রূপ—সোনপুর মেলা

সোনপুর মেলার সুপরিচ্ছন্নতা প্রস্ফুট করিয়া রাখিয়াছে; উপরন্তু পার্শ্বে রাজা-মহারাজাদের তাঁবু; সশস্ত্র সান্ত্রীদ্বারা সুরক্ষিত। সোনপুর মেলার বিশেষত্ব, ভারতের বিভিন্ন রাজন্যবর্গের শুভ পদার্পণ, কেহ-কেহ শুধু অমাত্য-আকালী পাঠাইয়াই সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখেন। উদ্দেশ্য, মেলার কয়েকটি উৎকৃষ্ট হাতি ও ঘোড়া সওদা করা। পশু-পক্ষীর ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সোনপুরের মেলা ভারতের বৈশিষ্ট্য অম্লান রাখিয়াছে। কত রকম-বেরকম পাখীই যে আমদানি করা হয়, কোন চিড়িয়াখানায় তাহার একত্র সংরক্ষণও একান্ত দুঃসাধ্য বলিয়া মনে হয়। জঙ্গলা পাখী, দেশী ও বিলাতী টিয়া-কাকাতুয়া—একই পাখীর অদ্ভুত বর্ণবৈচিত্র্য প্রতি দর্শককে মুগ্ধ করিয়া দিয়াছিল।

—'হাতির বাজার দেখ্‌বেন না, বাবু?'

দেখব বইকি! হাতিবাগানে প্রবেশ করিলাম। বিশালকায় হস্তীবৃন্দ অত্যন্ত নির্লিপ্তমনে বিশাল বিশাল কদলীবৃক্ষ ভোজন করিতেছে। তাকাইতে ভয় হয়, গজদন্ত দুইটি শ্বেত, সুমার্জ্জিত হইয়া চক্‌চক্ করিতেছে। রক্ষকেরা স্নেহাধিক্যে শুণ্ড লইয়া আদরে ব্যাপৃত। মোটা মোটা লৌহ শৃঙ্খল দ্বারা প্রত্যেক হস্তীর প্রতিটিপদ দৃঢ়বদ্ধ। শোনা গিয়াছে, কোন-কোন হাতি নাকি হঠাৎ ক্ষেপিয়া যায়, মাহুতেরা নিজ নিজ পণ্যের গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিল। 'খুব শান্ত, আহার অত্যন্ত পরিমিত এবং মূল্য আশ্চর্য্য রকম সস্তা।' আমাদের মধ্যে হাতি-ক্রয়ের মতন আগ্রহ কাহারও পরিলক্ষিত হইল না। এক ফাঁকে

মহেন্দ্র ঘাট—পাটনা

একজন বিক্রেতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—'কেমন হে, এবার কিছু সওদা করতে পারলে?"

—'না বাবু, বাজার একেবারেই মন্দা।'

সব চাইতে ভাল হাতিটা এবার নাকি মাত্র হাজার টাকায় বিক্রী হইয়াছে। লক্ষ টাকার কথা শুধু শিশুকালে উপকথায়ই শুনিয়াছি। নিতান্ত দুরবস্থার কাহিনী বিক্রেতা ইতিবৃত্ত করিল। একমাস—দেড়মাসেরও উপর পথে তাহারা বহু ক্লেশ সহ্য করিয়া এখানে আসিয়াছে; পুনরায় ঐভাবেই তাহাদের ফিরিতে হইবে। হাওদার উপর ঘর, তাহার উপরই রাত্রি যাপন। এমন কি, পথের নদ-নদী-নালা হাতির পিঠেই ইহারা পার হইয়া আসে। একটা হাতীর বাচ্চা হইয়াছে শুনিয়া সবাই সেখানে ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে। নবজাত শিশুটির জন্য পৃথক একটি তাঁবু

করা হইয়াছে ; ভেটেনারী সার্জ্জেনের ঊর্দ্দিপরা আর্দ্দালীকে আশেপাশে ঘুরিতে দেখিলাম।

অতঃপর ঘোটক বিক্রয় দেখিতে অগ্রসর হইলাম। নানা জাতীয় ঘোড়া আসিয়া জুটিয়াছে। চঞ্চল হইয়া প্রতিমুহূর্ত্তে সব কয়টি লেজ-পা নাড়িতেছে! সুন্দর, বলিষ্ঠ, ওয়েব্‌লার, আরবী ঘোড়াও নাকি আছে! সেখানকার অবস্থাও বিশেষ আশাপ্রদ বলিয়া মনে হইল না! বাণিজ্য-সম্পাদনে গরুর বাজারই নাকি সর্ব্বপ্রথম হইয়াছে। আশ্চর্য্য নয়! মুলতানী গাইগুলির দিকে তাকাইলে আর চোখ ফিরানো যায় না।

অন্ধকার ক্রম ঘনায়মান। রাত্রি বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে

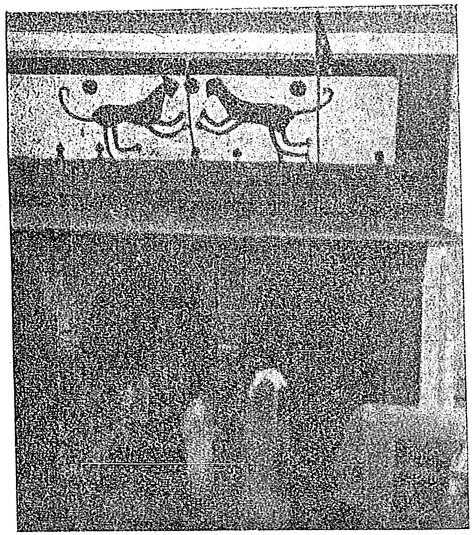

হরিহরনাথের মন্দির

সঙ্গে জনতার কোলাহলও যেন উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছে। দ্রুতপদে হরিহরনাথের মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলাম। মেলায় অপরাংশে মন্দিরটি অবস্থিত। পার্শ্বেই ক্ষীণস্রোতা, বিশীর্ণা গণ্ডক নদ। ঐখানেই স্নান ও তর্পণাদি সমাপনান্তে হরি ও হরনাথের যুগ্ম মূর্ত্তি দর্শন এবং মন্দিরপ্রাঙ্গণ প্রদক্ষিণ করিতে হইবে। ভীড় ঠেলিতে ঠেলিতে চলিয়াছি। দুই দিকে পণ্যের যথাসম্ভব সজ্জিত বিপণি—মাঝখানে সঙ্কীর্ণ রাস্তা। উহারই মধ্য দিয়া টম্‌টম্, ঘোড়ার গাড়ী, মোটর যাতায়াত করিবে। কখন কোন্‌টা ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়ে, ইহা ভাবিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে সবাই সন্ত্রস্ত হইয়া আছে। কলিকাতার বহু বাঙালী ব্যবসায়ী স্টল্ ভাড়া লইয়াছে দেখিলাম। রাত্রি বেলাই নাকি বাজার জমিয়া ওঠে। ক্রেতা-বিক্রেতাদের বচসা এবং টানাটানিও তাই উত্তরোত্তর তীব্র হইয়া উঠিতেছে। কোনপ্রকারে শেষপ্রান্তে গিয়া উপস্থিত হইলাম। হরিহরনাথের মন্দিরটি বহু পুরাতন; কালীঘাট মন্দিরের মতন দুই ধারে ভিখারী, সাধু ও পূজারীদের অত্যাচারে চক্ষু মেলিয়া অগ্রসর হইতে সঙ্কোচ বোধ। সাধুবাবাদের কিছু দক্ষিণা না দিলে নয়, নির্লিপ্ত যোগাসনে বসিয়া তাহারা ত্যাগেরও প্রত্যক্ষ মোক্ষলাভের উপদেশ বিনামূল্যে বিতরণ করিতেছেন; ভিখারীরা নাছোড়বান্দা, পূজারী ঠাকুরেরা ত এক-একজন গাণ্ডু; মন্দিরের অপূর্ব্ব মহিমা ও পুরাতন ইতিবৃত্ত তাহারা না থাকিলে কাহাদের নিকট শোনা যাইবে ; সুতরাং কাহাকেও পরিত্যাগ করা গেল না। মন্দিরের ভিতরেও ভোগের সুব্যবস্থা আছে; বাবার চরণামৃত, নির্ম্মাল্য-প্রসাদীর আয়োজনে এতটুকু কৃপণতা লক্ষ্য করিলাম না! যুগ্ম-মূর্ত্তি করজোড়ে প্রণাম করিলাম। একই মূর্ত্তির একদিকে বিষ্ণু, অপরদিকে শিব। নিকষ কালো পাথরের নিখুঁত ভাস্কর্য্য। তেলে ফুলে জলে হরি ও হরের অঙ্গ দুইটি ঐজ্জ্বল্য দীপ্তিমান। আরও কয়েকটি ছোট ছোট মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। পূজারী ঠাকুর আগ্রহের সহিত একগাছা গাঁদা ফুলের মালা গলায় পরাইয়া দিলেন, চরণামৃতটুকু ঠোঁটে স্পর্শ করাইয়া মস্তকে সিঞ্চন করিলাম। প্রসাদীটুকু আপাতত পকেটে রহিল। মন্দিরের চত্বরটুকু প্রদক্ষিণ করিয়া আসা গেল। মাঝখানে মন্দির, তাহারই চতুঃপার্শ্বে পূজারী ঠাকুর ও সন্ন্যাসীদের থাকিবার স্থান। সংশ্লিষ্ট ধর্ম্মশালাও একটি আছে। মন্দিরের উপরে ছাদ আছে, ইচ্ছা করিলে সেখানেও উঠিতে পারা যায়। দেবমন্দিরের মিনারটি বাস্তবিকই সুদৃশ্য কারুকার্য্যে খোদিত। প্রাচ্যকর আজও ভারতের প্রাচীন মন্দিরগুলিতে অন্বেষণ করিলে আশ্চর্য্যভাবে প্রকটিত হইয়া পড়ে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্ত দেখিলাম। মন্দিরের সংলগ্ন খাবারের দোকানগুলিতে অসম্ভবরকম ভীড় জমিয়া গিয়াছে। পুণ্যার্থীরা এই স্থানে পূজা-পার্ব্বণ সমাপনান্তে জলযোগ করেন। অন্তরে বিশ্বা

থাকিলে, কিছুতেই রুচির ব্যতিক্রম হয় না। না হইলে, ঐ খাবারগুলিতে যে-সমস্ত বীজাণু মিশিয়া থাকে (বা থাকা সম্ভব)—তাহা কল্পনা করিতেও শিহরিয়া উঠিতে হয়।

ফিরিয়া চলিলাম। মেলার রূপ এতক্ষণে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। আলোতে, কোলাহলে সমস্তই উজ্জ্বল ও উন্মত্ত। কাহাকেও মেলার উপহার যখন দিতে হইবে না, তখন আর বৃথা দোকানের দরজায় শারীরিক শক্তির অপব্যবহার করিয়া ফল কি? অন্যমনস্কভাবে জনতার সঙ্গে মিশিয়া গেলাম। একস্থানে কয়েকটা সুবিন্যস্ত হোটেল-রেস্তরাঁ দেখা গেল। অপেক্ষাকৃত অভিজাত সম্প্রদায়ও এইখানেই পানাহার সমাধা করেন। দিশী সরাব এবং তাড়ির দোকানগুলিও যথোপযুক্ত স্থানে নির্দ্দিষ্ট আছে। খাবারের দোকানগুলি ইহাদের মধ্যে সব চাইতে উদ্দীপ্ত ও বিনম্র। ডানদিকের রাস্তাটির দুই দিকে ভীড় তখন কেন্দ্রীভূত। আকর্ষণের কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল, সেই ধারের তাঁবুগুলিতে বিভিন্ন শহর হইতে বাঈজী এবং তাহাদের ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইয়াছে। মুরজা ও মাইফেলে সমস্ত রাস্তাটা তখন সরগরম। গানের মজলিস্, তবলচীদের বিকৃত হাসি ও হল্লা, ফিস্‌ফিস্ করিয়া আলাপ, সন্তর্পণগতিতে চলাফেরা—সমস্তই ইহাদের উপস্থিতি বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। বারনারী ও ভিখারী ভারতের বৈশিষ্ট্য ; দুইটিই অঙ্গাঙ্গীভাবে প্রতি শহরে, মেলায়, প্রধান প্রধান তীর্থক্ষেত্রগুলিতে জড়াইয়া রহিয়াছে। যে-দেশ যত বেশী দরিদ্র, সেই স্থানেই ইহাদের প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয়। কেবলমাত্র কুষ্টি এবং সুরুচিপরায়ণতার প্রভাবে ভিখারী ও বারনারী বিতাড়ন আজ পর্য্যন্ত কোথাও সম্ভব হয় নাই।

গাড়ী ছাড়িবার সময় প্রায় সন্নিকট! আস্তে আস্তে স্টেশনের দিকে পা চালাইলাম। রাত্রির অন্ধকারে একা একা হাঁটিতে বেশ লাগে! 'সোনপুর মেলা দেখিয়া কি এমন আনন্দলাভ হইল'—নিজের মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম···হরিনাথের মন্দির সত্যই কি ভক্তির মাত্রা বৃদ্ধি করাইতে সমর্থ হইয়াছে? পকেট্ হইতে প্রসাদীটুকু বাহির করিয়া মুখে পূরিলাম। দিনের পর দিন খুশীর খেয়ালে ঘুরিয়া বেড়াইতে এখন আর মোটেই ত উত্তেজনা বোধ করি না। তবুও কেন গৃহবিমুখ মন অকারণ বাহির হইতে চায়! যাযাবরপ্রবৃত্তি দেহের রক্তবিন্দুর মধ্যে বাসা বাঁধিল কি? কিন্তু কোথাও ত অন্তরের মধ্যে ইহার আলোড়ন অনুভব করি না—কোথাও বিন্দুমাত্র সামঞ্জস্য আছে বলিয়া স্বীকার করিতেও দ্বিধাবোধ হইতেছে!

সোনপুর স্টেশনের আলোকমালা ক্রমেই নিকটতর হইয়া আসিতেছে। পাটনার বন্ধুদের কথা বারংবার মনে হইতে লাগিল! পুনরায় গঙ্গা পার হইয়া বিশ্রাম করিয়া যাইব নাকি? স্টেশন-প্লাটফর্ম-এর বিস্তীর্ণ রাস্তায় পায়চারি করিতে করিতে পিছনের দিকে ফিরিয়া তাকাইলাম; মেলার কোলাহল দুই মাইল দূরেও ভাসিয়া আসিতেছে। আগামী কল্য নাকি প্লাটনার গভর্ণর বাহাদুর মেলা পরিদর্শনে আসিবেন; স্টেশন-স্ট্যাফ্ তাই রাত্রি জাগিয়া রঙিন কাগজের চেন্ ঝুলাইতেছে। মিঃ চ্যাটার্জ্জী ইতিমধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

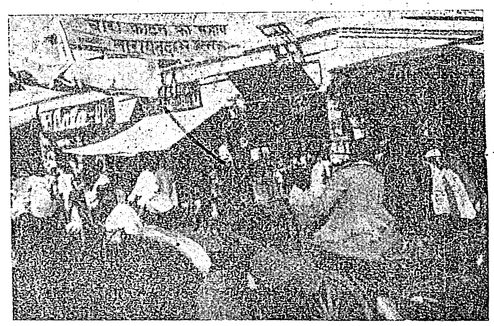

সোনপুর মেলা

—'আপনিও আমাদের সঙ্গে ফির্‌ছেন ত?' উত্তর দিতে পারিলাম না। গাড়ী আসিবার এখনও বিলম্ব আছে—দেখি, পাটনা না পশুপতিনাথ? এ-পার, কি ও-পার?

রাত্রির মধ্যপ্রহরে মিঃ চ্যাটার্জ্জীকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া বলিলাম—'ফিরিবার পথে নিশ্চয়ই পাটনাতে বিশ্রাম করে যাব, ছেলেদের বল্‌বেন আমার কথা।'

গাড়ীখানা ধীরে ধীরে স্টেশন্ ছাড়িয়া চলিয়া গেল। নেপালের গাড়ীর জন্য আমাকে আরও দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইবে। ইত্যবসরে আর এক পেয়ালা ভারতীয় পানীয় সেবন করিতে রিফ্রেস্‌মেণ্ট রুমের দিকে অগ্রসর হইলাম।

একটি ময়ূর

শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

আমার বাড়ীর ছাদে কোথা থেকে একটা ময়ূর এসেছে।

উলঙ্গ ছাদ। না আছে টবে-বসানো ফুলগাছ, না তরুলতার বাহার। এই সময় সেখানে প্রচুর ঘুড়ি উড়ে এসে পড়ে। আমার মেজ ছেলে পল্টু একটা লাঠির আগায় ঝাঁটা বেঁধে সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই, সমস্তক্ষণ ঘুড়ি ধরছে। নিজেকে সে ঘুড়ি ওড়ায় না, কাকেও দেয় না, তবু অকারণে ঘুড়ি ধরাটা তার একটা নেশা—শিকারের নেশার মতো। গৃহিণী দিনরাত্রি ভয়ে ভয়ে থাকেন, তাঁর সুবোধ পুত্র কখন উৎসাহের আধিক্যে ছাদ থেকে প'ড়ে যায়।

এমনি ছাদ। তার একমাত্র সার্থকতা—কাপড় মেলে দেওয়ায়, আর বড়ি শুকোতে দেওয়ায়। এ সংসারে যা আমার দ্বিতীয় পুত্রের শিকারসঙ্কুল বৃক্ষলতাহীন অরণ্য রূপে ব্যবহৃত হয়, সেই ছাদে—কাক নয়, চিল নয়—আস্ত ময়ূর সাহারা মরুভূমিতে একতাল মেঘের মতোই অপ্রত্যাশিত এবং বিস্ময়কর।

ক'লকাতা শহরে বন্য ময়ূরের আবির্ভাবের কোনোই সম্ভাবনা নেই। নিশ্চয়ই কারো পোষা ময়ূর, কোনো গতিকে ছাড়া পেয়ে নগর-পরিভ্রমণে বেরিয়েছিল। কিন্তু তার আর আবশ্যক হোল না। গোটা নগর তাকে দেখবার জন্যে আমার এই ছোট বাড়ীতে ভেঙে পড়েছে। সে ভিড় ছাদের দরজা থেকে নীচে এবং সেখান থেকে বহুদূর রাস্তা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। আর ক্রমেই আশঙ্কাও উদ্বেগজনকভাবে বেড়ে চলেছে।

সে ভিড়ও দেখবার মতো। হিন্দুস্থানী ঝাঁকা-মুটে, মেসের উড়িয়া চাকর, আলখাল্লা পরিহিত কাবুলীওয়ালা, পাড়ার ছেলে, এমন কি কর্ম্মক্লান্ত আফিসের বাবুও একবার ঊর্দ্ধমুখে চেয়েই ক্ষুৎপিপাসা ভুলে সেইখানেই দাঁড়িয়ে পড়ছে। পথে গাড়ী-ঘোড়া চলাচল বন্ধ হবার উপক্রম।

দাঁড়িয়ে দেখবার মতোই দৃশ্য! ছাদের আলসেতে ব'সে ময়ূরটা নীচের দিকে যেন আলগোছে ঝুলিয়ে দিয়েছে তার বিচিত্র বর্ণের পুচ্ছ। মাঝে মাঝে নীচের ঊর্দ্ধমুখ ভক্ত জনতার দিকে যখন গ্রীবা বেঁকিয়ে কৃপাকটাক্ষে চাইছে, তার অপরূপ গ্রীবা ঝিকমিকিয়ে উঠছে অপরাহ্ণের রঙিন আলোয়। আমার নিরাভরণ ছাদ যেন একটা সম্রাটের আবির্ভাবে আলোকিত হয়ে উঠেছে।

বৈশাখের খররৌদ্রের পর এমনি একটি জীবের আবির্ভাব সকলের চোখ যেন জুড়িয়ে দিয়েছে। নইলে মোটভারাবনত ঝাঁকা-মুটে কিম্বা মেসের চাকরের কথা ছেড়েই দিলাম, কাবুলীওয়ালা কখনও খাতকের সন্ধানে নিযুক্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টি অন্যমনস্কভাবে ময়ূরের দিকে নিবদ্ধ করত না। কাবুলীওয়ালার আত্ম-বিস্মৃতি সহজে ঘটে না।

সকলেই খুশী হয়ে উঠেছে। বিব্রত হয়েছি কেবল আমি। এই অত্যন্ত স্নিগ্ধদর্শন জীব আমার বাড়ীর দরজা দিয়েছে খুলে। ভক্তবৃন্দের অনুদ্ধত নিঃসঙ্কোচ অভ্যাগমে আমার অন্দরের মর্য্যাদা ধূল্যবলুণ্ঠিত। অথচ বহু চেষ্টাতেও এদের বিদায় করার কোনো প্রক্রিয়া আবিষ্কার করতে না পেরে আমি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠছিলাম। ভগবান আমার কণ্ঠে যথেষ্ট শক্তি দেন নি। ভিড় হঠাবার জন্যে যে রূঢ়তা প্রয়োজন, তা বহু চেষ্টাতেও আমি সংগ্রহ করতে পারি না। সুতরাং এমন একটা অপদার্থ লোকের মনে মনে উত্তপ্ত হওয়া ছাড়া সান্ত্বনা লাভের আর কি উপায় থাকতে পারে!

এমন সময় এ বাড়ীর মালিক ব্রজরাজবাবুকে হন্তদন্তভাবে এই দিকেই ছুটে আসতে দেখে আমি যেন অকূলে কূল পেলাম।

ব্রজরাজবাবুকে এ পাড়ার বাঘ বললেও অত্যুক্তি হয় না। এ রাস্তার অধিকাংশ বাড়ীই তাঁর। লক্ষ্মীর করুণা যে তাঁর উপর কতখানি বর্ষিত হয়েছে, তা তাঁর চেহারা দেখে বোঝবার উপায় নেই। স্থূলতনু, খর্ব্বাকৃতি মানুষ—পরিধানে একখানি মলিন বোম্বাই চাদরের অর্দ্ধাংশ। কখনও কখনও পায়ে জুতাও থাকে। মাথার চুল ছোট ছোট

করিয়া ছাঁটা। কিন্তু এদিকের ত্রুটি সংশোধিত হয়েছে পরিপুষ্ট গুম্ফে এবং উদাত্ত কম্বুকণ্ঠে।

আমি সাগ্রহে ডাকলাম, এই যে এদিকে, এদিকে।

ডাকবার আবশ্যক ছিল না। উনি এই দিকেই আসছিলেন এবং লক্ষ্য ওই ময়ূর।

বললেন, কি ব্যাপার?

করুণ কণ্ঠে বললাম, দেখুন তো কাণ্ড। কাজ-কর্ম্ম, এমন কি রান্না-বাড়া পর্য্যন্ত বন্ধ।

আর বলতে হ'ল না। পাশেই একটি বাঙালী পানওয়ালা ছোকরা দাঁড়িয়ে ছিল। ব্রজরাজবাবু প্রচণ্ড হিন্দিতে তাকেই ধমক দিলেন:

—এই উল্লু, কেয়া দেখতা হ্যায়?

—আজ্ঞে ময়ূর।

—আঁঃ! ময়ূর! ভাগো।

ব্রজরাজবাবু আর তার দিকে চাইলেনও না। জনতা উভয় পাশে যথাসম্ভব নিজেকে সঙ্কুচিত ক'রে তাঁর জন্যে সঙ্কীর্ণ এক ফালি রাস্তা ক'রে দিলে, আর ব্রজরাজবাবু চক্ষের পলকে তেতলায় উঠে এলেন। হতাশভাবে আমি আবার আমার নিজের নিভৃত জায়গাটিতে এসে বসলাম। শুনতে লাগলাম:

—ও-রকম ক'রে নয়, ও-রকম নয়। আগে দুটিখানি ছোলা ছিটিয়ে দাও। সন্ধ্যে পর্য্যন্ত খাক ব'সে ব'সে।

—বেশ বললেন! খেয়ে-দেয়ে যদি পালায়?

—অন্ধকার হয়ে গেলে আর পালাতে পারবে না।

—কেন?

—ওরা অন্ধকারে চোখে দেখতে পায় না।

—তাই নাকি? ওরে ছোলা নিয়ে আয় না কেউ। এ বাড়ীতে ছোলা নেই?

—না থাকে নেই নেই। আমার নাম ক'রে সামনের দোকান থেকে আধ পোয়া ছোলা নিয়ে আয় তো!

(অনেকগুলি পায়ের দুমদাম শব্দ হ'ল। বোধ হয় একাধিক লোক ছোলা আনতে ছুটল।)

আমার বড় ছেলে প্রসাদ এবার ম্যাট্রিকুলেশন দেবে। সে কোথায় গিয়েছিল। বাড়ীতে ভিড় দেখে সে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

—কি ব্যাপার?

—ময়ূর।

—কোথায়?

—তোমাদের ছাদে।

—কাদের ময়ূর?

—কে জানে।

প্রসাদ উল্লসিত হয়ে উঠল:

—ময়ূর? ময়ূর ব্যংসকাদি কর্ম্মধারয়? আমাদেরই ছাদে? হুররে! (প্রসাদের কাছে ময়ূর কি ময়ূর-ব্যংসকাদি কর্ম্মধারয়ে পরিণত হ'ল অবশেষে?)

কয়েকটি বাঙালী ছোকরা কাবুলীওয়ালাকে নিয়ে আমোদ করছে:

—ক্যায়সা চিড়িয়া?

—আচ্ছা চিড়িয়া। ভালা, ভালা।

—ক্যায়সা রং?

—রংগ্? বহুত খুবসুরৎ?

—তুমারা মুল্লুকমে হ্যায়?

—হ্যায়।

—ময়ূর, ময়ূর হ্যায়?

—হাঁ, হ্যায়। বউর হ্যায়।

—হাঁ হ্যায়, না আরো কিছু!

—জরুর হ্যায়। ইস্‌সে বড়া। এৎনা বড়।

(ব'লে লাঠিটা মাথার উপর উঁচু ক'রে দেখিয়ে দিলে কত বড়।)

—ওৎনা বড়!

(লোকগুলো হো হো ক'রে হেসে উঠল।)

চোখে চশমা-পরা কয়েকটি ছেলে বলছিল:

—এই সময় যদি মেঘ উঠতো ভাই?

—আঃ!

কেতকী কেশরে কেশ পাশ করো সুরভি
ক্ষীণ কটি তটে গাঁথি লয়ে পরো করবী,
কদম্ব রেণু বিছাইয়া দাও শয়নে
অঞ্জন আঁকো নয়নে।

তালে তালে দুটি কঙ্কণ কনকনিয়া
ভবন শিখীরে নাচাও গণিয়া গণিয়া
স্মিত বিকশিত বয়নে,
কদম্ব রেণু বিছাইয়া ফুল শয়নে।

কি আনন্দই হোত তাহ'লে! ওরা মেঘ দেখলেই নাচে, না?

—কাদের ময়ূর কে জানে? ছাদ যেন আলো ক'রে দাঁড়িয়েছে! এই সময় একবার পেখম মেলত!

—যদি বা মেলত, এত লোক দেখে ভয় পেয়ে গেছে। কেন যে এরা দাঁড়িয়ে আছে! আশ্চর্য্য!

—হুজুক আর কি!

—"ভবন-শিখীরে নাচাত গণিয়া গণিয়া।"

—পুরুষ-ময়ূর, না?

—হুঁ। ময়ূরী এত সুন্দর না।

(ঠিক ওদেরই উপরে সামনের বাড়ীর দোতালার বারান্দায় ক'টি তরুণী দাঁড়িয়ে ছিল। তারা কখনও দেখছিল ময়ূর, কখনও দেখছিল রাস্তার জনতা। ছেলেগুলির কথা বোধ হয় তারা শুনতে পেলে। চুপি-চুরি একজন আরেকজনকে বললে:)

—শুনছিস? পুরুষ-ময়ূর। ময়ূরী এত সুন্দর হয় না।

—হবার দরকার কি? ওদের তো আর আমাদের মতো এত বয়স পর্য্যন্ত আইবুড়ী থাকতে হয় না। যৌবন জাগতে জাগতেই দুয়ারে ময়ূর এসে পেখম তুলে দাঁড়ায়।

—আর আমাদের?

—আমরা কখন ময়ূর এসে ফিরে যায় ব'লে দিনরাত্রি পেখম তুলে দাঁড়িয়ে আছি। সাজ-সজ্জার আর বিরাম নেই।

(দু'জনে হাসল।)

(ব্রজরাজবাবুর চোখ শিকারীর মতো একাগ্রতায় জ্বলছিল। ময়ূরের নড়াচড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখ কখনো ডাইনে, কখনো বাঁয়ে, কখনো উপরে, কখনো নীচে ঘুরছিল।)

—আর ঘণ্টাখানেক বাবা, তারপরে একবার অন্ধকার হয়ে এলেই···

—আপনি ময়ূর বুঝি খুব ভালোবাসেন?

—ওঃ!

—বড় বাড়ী নইলে ময়ূর মানায় না। তা আপনার বাড়ীতে মানাবে। বেশ বড় বাড়ী।

—অনেক দিন থেকেই আমার ময়ূর পোষবার সখ আছে। কিন্তু সুবিধামত···

(এতদিন সুবিধামত দরে পাচ্ছিলেন না ব'লেই মনের সখ মনেই চাপা ছিল। এতদিনে সুবিধা যদি হ'ল, কিন্তু যে ভিড়! ময়ূরটা খুঁটে খুঁটে ছোলা খাচ্ছিল, আর মাঝে মাঝে উচ্চকিত হয়ে চারিদিকে ভয়ে ভয়ে চাইছিল।)

—ভয় পেয়ে গেছে বোধ হয়। এত লোক, ভয় পাবে না?

—বাস্তবিক।

—বাবাসকল, একটু আড়ালে যাও দিকি। ময়ূর ধরি, তারপরে আমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে দিনরাত্রি দেখো। ওই সামনেই আমার বাড়ী, ১৪ নম্বর।

(কিন্তু বাবাসকলের সরবার লক্ষণ দেখা গেল না। তারা শুধু, যাকে বলে, গা মারলে।)

—যা হোক বাবা!

চশমা-পরা ছেলেটি বলছিল:

—আমার মামার বাড়ীতে একটা ময়ূর ছিল। তার জন্যে গোছা গোছা সাপ নিয়ে আসতে হ'ত।

—কেন?

—খেত।

—সাপ খায়! কি সর্ব্বনাশ! ওকে দেখে দেখে যতগুলি কবিতা আবৃত্তি করছিলাম, সব সুর কেটে গেল!

—কেন?

—যাবে না? তুই যদি দেখিস, একটি পরমা সুন্দরী মেয়ে ডাষ্টবিন থেকে খুঁটে খুঁটে···

—কি ভয়ানক! সেই উপকথার রাক্ষসী সুয়োরাণীর মতো। দিনে পরমাসুন্দরী রাণী, রাত্রে হাতীশালা থেকে হাতী, ঘোড়াশালা থেকে ঘোড়া টপাটপ গিলছে! ভয়ঙ্কর কল্পনা!

—না, তুই ময়ূরের সম্বন্ধে ঘেন্না ধরিয়ে দিলি ভাই। অমন সুন্দর জন্তু সাপ খায়!

—আরও শোন্। অমন বিষধর সাপ পরমানন্দে ভোজন করছে, কিন্তু কুকুরে ছুঁলেই বাস্!

—ম'রে যাবে?

—হ্যাঁ। আর দেখতে হবে না।

দোতালার বারান্দায় তরুণীটি বলছিল:

—আমাদের বারে ময়ূরের সম্বন্ধে রচনা লিখতে দিয়েছিল। আমি লিখিনি। এখন একটা কবিতা লিখতে ইচ্ছা করছে।

—কি কবিতা?

—'ময়ূরের অপমৃত্যু'। মানুষের প্রেমে ময়ূর ম'রে গেল—যেমন ক'রে মরল পদ্মিনী, মরল কৃষ্ণকুমারী। চেয়ে দেখ, লোকগুলো কি হিংস্র ভালোবাসায় থাবা গেড়ে বসেছে।

—লেখ তুমি। চমৎকার হবে।

সন্ধ্যা আর কিছুতে যেন হ'তে চায় না। ভয়ে অথবা কি জানি কি ভেবে ময়ূরটা ডেকে উঠল। ক'টি ছোট ছেলে, যারা এতক্ষণ মুগ্ধ বিস্ময়ে এই অপূর্ব্ব জীবটিকে দেখছিল, এই অশ্রুতপূর্ব্ব কর্কশ শব্দে চমকে দু পা পিছু হ'টে এল।

প্রসাদ আপন মনেই আর একবার বললে, হুঁ। ময়ূর বংসকাদি কর্ম্মধারয়।

ময়ূর নামের সঙ্গে ব্যাকরণের এই ভীতিকর সমাস যে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল, কেকাধ্বনিতে বুঝি তারই সাড়া মিলল।

—কি খোকাবাবু, নেবে? (কথাটা বোধ হয় মুদি বললে।)

—না।

—না, কেন? অমন সুন্দর দেখতে।

—আমার এগজামিন।

পাশের বাড়ীর বৌটি অনেকক্ষণ থে'কে জানালার আড়াল থেকে দেখছিল। কাজকর্ম্ম সেরে তার শাশুড়ী এসে পাশে দাঁড়ালেন।

—ওমা, একটা ময়ূর যে!

—হ্যাঁ। অনেকক্ষণ থেকেই ওইখানে রয়েছে। ধরবার জন্যে কত লোক ছুটেছে দেখুন। কি সুন্দর ময়ূর!

—ভারী সুন্দর! আহা! বলে, 'যশোদা নাচাত তোরে ব'লে নীলমণি'।

—সে ময়ূরকে নয় মা, নাচাত গোপালকে। (বৌটি হাসল।)

—সে একটি কথা বৌমা। যে গোপাল সে-ই ময়ূর। নইলে কি আর ভগবান শিখীপুচ্ছ মাথায় নেন? বৃন্দাবন যেতে কত ময়ূরই দেখলাম মা, বন যেন আলো ক'রে রয়েছে।

—অনেক ময়ূর?

—ঝাঁকে ঝাঁকে। যমুনার ধারে···

—কদম গাছ আছে?

—আছে বই কি।

—সবই আছে, কেবল বৃন্দাবনচন্দ্রই নেই।

—তিনিও আছেন মা। সবই যখন আছে তখন তিনিও আছেন বই কি! এসব ছেড়ে কি কোথাও যেতে পারেন!

—ছবিতে যখন দেখি, যমুনার নীল জল, ফুলে ভরা কদম গাছ, শ্রীকৃষ্ণ বাজাচ্ছেন বাঁশী আর-ময়ূর ময়ূরী নাচছে, —এমন অদ্ভুত লাগে আমার!

(বৌটি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে বোধ হয়।)

মুদি জিজ্ঞাসা করলে ব্রজরাজবাবুকে:

—ময়ূরের মাংস খেয়েছেন কখনও?

(ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে আসছে দেখে ব্রজরাজবাবু এবার প্রস্তুত হচ্ছিলেন। চমকে বললেন:)

—ময়ূরের মাংস?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

—খায় নাকি?

—ওঃ! খুব পেয়ার ক'রে খায়। এমন চমৎকার মাংস!

—তাই নাকি?

(ব্রজরাজবাবু ময়ূরটার দিকে চেয়ে ওর কথার সত্যতা পরীক্ষা করলেন।)

—তুমি খেয়েছ ?

—অনেক। আমাদের মুল্লুকে···

—কার ময়ূর কে জানে !

—কত সখের জিনিস ! সেও ব্যস্ত হয়ে বেড়াচ্ছে নিশ্চয়ই।

—তার আর কথা ! কালই খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেবে দেখবেন।

—নিশ্চয়।

—তখন তো যার ময়ূর তাকে ফেরত দিতে হবে ?

—তা ছাড়া আর উপায় কি ?

—চাই কি, এখনও এসে পড়তে পারে।

—তা তো পারেই।

—এলে ভালো হয়। বুড়োটা যে রকম তাক্ ক'রে ব'সে আছে, ভারি জব্দ হয়ে যায়।

(সেই সম্ভাবনায় দু'জনে খুশীর সঙ্গে হেসে উঠল।)

—এই, ও রকম ক'রে হাসবেন না, হাসবেন না।

(অন্ধকার হয়ে এসেছে। ব্রজরাজবাবু বুড়োকেই ওস্তাদ স্থির ক'রে তার উপরই ময়ূর ধরার ভার দিয়েছেন। মুদি ওস্তাদ শিকারীর মতো গুটি গুটি চলেছে।)

—এই ওরকম ক'রে হাসবেন না। ময়ূরটা উড়ে পালাতে পারে।

—পালাবে কি ক'রে ? অন্ধকারে দেখতে পায় না যে !

—না, পায় না আবার !

—সত্যি পায় না। শ্রীরাধার অভিশাপ আছে।

—আছে !

—নেই তো দেখতে পায় না কেন ? তার উত্তর দাও।

(লোকটা তার উত্তর দিতে না পেরে চুপ ক'রে রইল।)

রাস্তার ভিড় এখন অনেকটা হালকা হয়েছে। সেখান থেকে এখন আর অন্ধকারে ময়ূরটাকে দেখা যায় না। নিতান্ত যারা উৎসাহী তারা ছাড়া আর সকলেই চ'লে গেছে।

ব্রজরাজবাবু আছেন। আর আছে সেই মুদি। কখনও উত্তর দিক থেকে, কখনও দক্ষিণ দিক থেকে, কখনও সে গুটি গুটি এগুচ্ছে, কখনও পিচুচ্ছে। অন্ধকারে তার কালো দেহের একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে, কৃষ্ণকায় শিকারী কুকুরের মতো।

ব্রজরাজবাবু ক্রমেই অধৈর্য্য হয়ে উঠছেন।

হঠাৎ একটা ঝটপট শব্দের সঙ্গে মুদি চীৎকার ক'রে উঠল : এইবার !

ময়ূরটা ধরা পড়েছে !

কালিদাসের যুগে ভারতবর্ষ

অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন এম-এ

প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস ঠিক কোন্ সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তা এখনও সম্পূর্ণ নিঃসংশয়ে বলা যায় না। তবে আজকাল ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে, কালিদাস খুব সম্ভব খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথম ভাগে তাঁর অমর কাব্যগুলি রচনা করেছিলেন। সে সময়ে উত্তর-ভারতে গুপ্তবংশীয় সম্রাটগণের অখণ্ড প্রতাপ। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতকে সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত পরাক্রমাংক আর্যাবর্তের রাজাদের পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত ক'রে উত্তর-ভারতের অধিকাংশ স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। তারপর তিনি দক্ষিণাপথ জয় করার উদ্দেশ্যে বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম তীরপথে অগ্রসর হ'য়ে দক্ষিণ-কোশল প্রভৃতি বহু জনপদের অধিপতিদের পরাভূত ক'রে আধুনিক মাদ্রাজ নগরের নিকটবর্তী কাঞ্চী রাজ্যে উপনীত হলেন। কিন্তু তিনি দক্ষিণাপথের বিজিত জনপদগুলি স্বীয় অধিকারভুক্ত করলেন

না ; আনুগত্য স্বীকারের পর পরাজিত রাজাদের রাজ্য ফিরিয়ে দিলেন। এই অস্ত্র-বিজিত ভূখণ্ডের বাইরেও সমুদ্রগুপ্তের রাজশক্তি বহু বিভিন্ন জনপদে স্বীকৃত হয়েছিল। পূর্বে সমতট অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ এবং কামরূপ বা আসাম, উত্তরে নেপাল, পশ্চিমে পঞ্জাব ও রাজপুতানার অন্তর্গত মালব, যৌধেয় প্রভৃতি জাতিদের রাজ্যেও সমুদ্রগুপ্তের রাজপ্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তা-ছাড়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কুষাণ রাজা এবং মালবের শক রাজারাও মগধের গুপ্ত রাজশক্তির প্রাধান্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। আর সুদূর সিংহল-দ্বীপেও সমুদ্রগুপ্তের প্রভাব প্রসার লাভ করেছিল। সুতরাং দেখ্‌তে পাচ্ছি, কামরূপ থেকে গন্ধার (অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত) এবং নেপাল থেকে সিংহল পর্যন্ত ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রান্তেই সমুদ্রগুপ্তের শক্তি ও খ্যাতি পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। একমাত্র অশোক ছাড়া সমুদ্রগুপ্তের পূর্ববর্তী আর কোনো রাজার আমলেই এমন বিরাট ভারতব্যাপী শক্তি ও খ্যাতির পরিচয় পাওয়া যায় না। মৌর্য যুগের পর ভারতীয় রাজশক্তি বহুধা খণ্ডিত হ'য়ে পড়ে এবং অখণ্ড ভারতের ধারণাও সম্ভবত কিছুকালের জন্য তিরোহিত হয়। কয়েক শতাব্দী পরে আবার অখণ্ড-ভারত-বোধের পরিচয় পাই গুপ্তযুগের সাহিত্যে। আর ওই সাহিত্যের মধ্যে এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখ্যযোগ্য হচ্ছে সমুদ্রগুপ্তের মহা সেনাপতি কবি হরিষেণের একখানি প্রশস্তিকাব্য এবং মহাকবি কালিদাসের মেঘদূত ও রঘুবংশ নামক দুখানি কাব্য। হরিষেণের প্রশস্তিখানি প্রয়াগে মৌর্যরাজ অশোকের একটি স্তম্ভের গায়ে উৎকীর্ণ আছে ; ওই উৎকীর্ণ লিপি থেকেই আমরা সমুদ্রগুপ্তের দিগ্‌বিজয় কাহিনী ও তৎকালীন ভারতের রাষ্ট্রবিভাগের কতকটা পরিচয় পাই। সমুদ্রগুপ্তের পর তৎপুত্র চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের (৩৮০-৪১৩) সময়ে গুপ্ত সাম্রাজ্যের আয়তন ও খ্যাতি-প্রতিপত্তি আরও বেড়ে যায়। রাজ্যগ্রহণের অল্পকাল পরেই চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য সুরাষ্ট্র (কাঠিয়াবার) ও মালবের শক রাজাকে পরাজিত ক'রে ওই দুই জনপদ স্বীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। গুপ্তসম্রাট্‌গণের আদি রাজধানী ছিল মগধের (দক্ষিণ বিহারের) পাটলিপুত্র নগরে। মালব রাজ্যাধিকারের পর শকারি বিক্রমাদিত্য অর্থাৎ সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত উক্ত রাজ্যের প্রধান নগরী উজ্জয়িনীকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানীরূপে গ্রহণ করেছিলেন ব'লে মনে করার হেতু আছে। মহাকবি কালিদাস এই চন্দ্রগুপ্তের আমলে উজ্জয়িনী নগরীতে অন্তত কিছুকাল বাস করেছিলেন ব'লে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। মেঘদূত কাব্যে কালিদাস উজ্জয়িনীকে স্বর্গগামীদের পুণ্যবলে ধরাতলে আনীত একখানি অতি সুন্দর স্বর্গ-খণ্ড ব'লে বর্ণনা করেছেন। ভারতবর্ষের আর কোনো স্থানকে কালিদাস এত খানি মর্যাদা দেন নি। এর থেকেই মনে হয়, কালিদাস খুব সম্ভব বিক্রমাদিত্যের রাজধানী বিশাল উজ্জয়িনী নগরীর অধিবাসী ছিলেন। পূর্বেই বলেছি, মৌর্যযুগের পরে এই সময়ে আবার সমগ্র ভারতবর্ষের চেতনা ভারতবাসীর মনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কালিদাসের কাব্যেই তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। শুধু অখণ্ড ভারতবর্ষের চেতনা নয়, কালিদাসের কাব্যে যে গভীর ও নিবিড় ভারত-প্রীতির পরিচয় পাই সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যে তার তুলনা বিরল। ভারতবর্ষের প্রতি প্রান্তের নদী পর্বত জনপদ প্রভৃতির সঙ্গে ভারতের এই শ্রেষ্ঠ কবির যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় তাঁর কাব্যগুলিতে পাওয়া যায় তা সত্যই বিস্ময়কর। সুদূর বংক্ষুনদী বা আমুদরিয়া থেকে তাম্রপর্ণী নদী এবং আসামের অন্তর্গত প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর থেকে কুমারিকা অন্তরীপের নিকটবর্তী মলয় পর্বত পর্যন্ত ভারতবর্ষের প্রত্যেক অংশই কবিচিত্তের প্রীতিরসে অভিষিক্ত হ'য়ে যে মহিমা অর্জন করেছে আজও তা আমাদের হৃদয়কে অভিভূত করে। বস্তুত রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা, কালিদাসের কাব্য, রাজশেখরের কাব্যমীমাংসা প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ভারতবর্ষকে সমগ্রভাবে আয়ত্ত ও উপলব্ধি করার যে ঐকান্তিক প্রয়াস দেখ্‌তে পাই, আধুনিক ভারতের প্রাদেশিক সাহিত্যে তার চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট নেই। এটা সত্যই বড় আক্ষেপের বিষয়। প্রাচীন কালে তীর্থ পর্যটন প্রভৃতি নানা উপলক্ষে সমগ্র দেশের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়-স্থাপনের যে ব্যবস্থা ছিল, আধুনিক বিজ্ঞানের যুগেও তার পরিবর্তে কোনো সন্তোষজনক ব্যবস্থার উদ্ভব হয় নি। তার ফল এই হয়েছে যে, আজকাল আমরা স্কুলপাঠ্য ভূগোল-পুস্তকের সাহায্যে ভারতবর্ষকে চিন্‌তে পারলেও তাকে অন্তরের মধ্যে কিছুতেই উপলব্ধি করতে পারিনে।

কালিদাস তাঁর কাব্যগুলিতে নানা উপলক্ষে তৎকালীন

ভারতবর্ষকে সমগ্রভাবে বা আংশিকভাবে বর্ণনা করেছেন। এই সবগুলি বর্ণনা একত্র মিলনে গুপ্তযুগের ভারতবর্ষের যে চমৎকার চিত্রটি ফুটে ওঠে তা সত্যই অপূর্ব। রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে রঘুর দিগ্‌বিজয় বর্ণনা উপলক্ষে কবি ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রান্তেরই একটি অতি মনোরম বিবরণ দিয়েছেন। আবার ঐ কাব্যের ষষ্ঠ সর্গে ইন্দুমতীর স্বয়ংবর-সভায় আগত রাজকন্যার পাণিপ্রার্থী নরপতিদের বর্ণনা-প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের বহু জনপদের উল্লেখ করেছেন। তারপর ঐ কাব্যেরই ত্রয়োদশ সর্গে রাক্ষসপুরী থেকে সীতাকে উদ্ধার ক'রে রামচন্দ্র যখন পুষ্পক-রথে আরোহণ ক'রে আকাশমার্গে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন, তার বর্ণনা উপলক্ষে কবি সিংহল থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত রামচন্দ্রের পথরেখার একটি অপূর্ব চিত্র অংকন করেছেন। আর তাঁর মেঘদূত-কাব্যে বিরহী যক্ষের বার্তাবাহী দূতরূপী মেঘের পথ নির্দেশ উপলক্ষে বিন্ধ্যপর্বত ও নর্মদা-নদীর দক্ষিণস্থিত রামগিরি থেকে হিমালয়ের পরপারস্থিত কৈলাসপর্বত ও মানস সরোবর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগের যে ছবিটি এঁকেছেন, তা যুগে যুগে ভারতবর্ষের চিত্তকে মুগ্ধ করেছে। ভারতবর্ষের সমগ্র উত্তরসীমাব্যাপী বিশাল হিমালয় পর্বতের একটি বর্ণনা পাই কুমারসম্ভব কাব্যের প্রথম সর্গে; আর ভারতবর্ষের দক্ষিণদিক্‌বর্তী মহাসমুদ্রের একটি বর্ণনা পাই রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গে। এই সবগুলি বর্ণনা একত্র মিলিয়ে পাঠ করলে তদনীন্তন ভারতবর্ষের একটি অখণ্ড ছবি যেন চোখের সাম্‌নে প্রত্যক্ষবৎ ভেসে ওঠে। রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে দেখি রাজা রঘু দিগ্‌বিজয়-বাসনায় ষড়্‌বিধ সেনাদল নিয়ে প্রথমেই পূর্বদিকে অগ্রসর হ'লেন। সুহ্ম অর্থাৎ দক্ষিণ রাঢ়ের অধিবাসীরা বেতস লতার ন্যায় নত হ'য়ে আত্মরক্ষা করল। তৎপরে রঘু গঙ্গাস্রোতোন্তরবর্তী বঙ্গদেশে (আধুনিক প্রেসিডেন্সী বিভাগ) উপনীত হ'য়ে নৌযুদ্ধ-নিপুণ বাঙালীদের পরাজিত ক'রে ঐ দেশে জয়স্তম্ভ স্থাপন করলেন এবং বাংলা দেশের কলম ধান্য অর্থাৎ রোয়া ধান যেমন প্রথমে উৎখাত ও পরে প্রতিরোপিত হ'য়ে প্রচুর শস্য দান করে বঙ্গদেশের রাজাও তেমনি প্রথমে রাজ্যচ্যুত ও পরে রাজপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে রাজা রঘুকে প্রচুর উপহার দিয়ে সংবর্ধনা করেছিলেন। তৎপরে তিনি কপিশা অর্থাৎ মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাসাই নদী উত্তীর্ণ হ'য়ে উৎকল (উত্তর উড়িষ্যা) দেশের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'য়ে কলিঙ্গ অর্থাৎ বৈতরণী ও গোদাবরী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী দেশে উপস্থিত হ'লেন। তাম্বুল, নারিকেল ও মহেন্দ্রপর্বতের জন্য কলিঙ্গ বিখ্যাত। এই দেশের অধিপতিকে পরাভূত ও স্বপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ক'রে ধর্মবিজয়ী রঘু আরও দক্ষিণে কাবেরী নদী অতিক্রম ক'রে মরীচ, এলা ও চন্দন-সুরভিত মলয়-পর্বতের উপত্যকাস্থিত পাণ্ড্য (দক্ষিণ তামিল) দেশে গিয়ে তাম্রপর্ণী-সাগর সংগমে জাত প্রচুর মুক্তা উপহার গ্রহণ করলেন। তৎপরে তিনি ক্রমে দর্দুর (সম্ভবত নীলগিরি) ও সহ্য (পশ্চিম ঘাট) পর্বত অতিক্রম ক'রে কেরল (ত্রিবাংকুর ও মালাবার) দেশে প্রবেশ করলেন। তৎপরে অপরান্ত (কোংকন) দেশের চিত্রকূট পর্বতের পার্শ্ব দিয়ে এগিয়ে পারসীকদের দেশে গিয়ে যবনদের অর্থাৎ পারসীকদের অসংখ্য শ্মশ্রুমণ্ডিত শির ভূলুণ্ঠিত করেন। পরে তিনি উদীচ্য দেশ জয়ে অগ্রসর হ'য়ে বংক্ষু অর্থাৎ আমুদরিয়ার তীরবর্তী কুংকুম-রঞ্জিত বাহ্লীক দেশে উপনীত হলেন। সেখানে হূণদের যুদ্ধে পরাজিত ক'রে রাজা রঘু আধুনিক কাশ্মীরের অন্তর্গত কাম্বোজ দেশের মধ্য দিয়ে হিমালয়ের উপত্যকায় প্রবেশ করেন। ক্রমে পূর্বদিকে অগ্রসর হ'য়ে গঙ্গা নদী অতিক্রম ক'রে ও কিরাত প্রভৃতি পার্বত্য জাতিদের বিধ্বস্ত ক'রে তিনি লৌহিত্য অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে কালাগুরুদ্রুম শোভিত প্রাগ্‌জ্যোতিষ-রাজ্যে প্রবেশ করেন। তৎপর ভয়ত্রস্ত কামরূপাধিপতি অসংখ্য রত্ন পুষ্পোহার দ্বারা দিগ্‌বিজয়ী রঘুর চরণ বন্দনা করেন। এভাবে সুহ্ম বা রাঢ় দেশ থেকে আরম্ভ ক'রে সমস্ত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ ক'রে কামরূপ বা আসামে এসে রঘুর দিগ্‌বিজয় সমাপ্ত হয়। এই বর্ণনাটিতে শুধু ভারতবর্ষের সীমান্তস্থিত নদী-পর্বত জনপদগুলিরই উল্লেখ আছে, ভারতবর্ষের মধ্যবর্তী জনপদসমূহের কোনো উল্লেখ নেই—এটা লক্ষ্য করার বিষয়।

রঘুবংশের ষষ্ঠ সর্গে বিদর্ভ (অর্থাৎ আধুনিক বেরার) দেশের রাজার ভগিনী ইন্দুমতীর স্বয়ংবর-সভার বর্ণনা উপলক্ষে ভারতবর্ষের আর একটি চিত্র আমাদের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। স্বয়ংবর-সভায় বহু জনপদের রাজন্যবৃন্দ উপস্থিত হয়েছেন, তার মধ্যে রঘু-পুত্র কুমার অজও উপবিষ্ট আছেন। এমন সময় বিবাহবেশে সজ্জিতা পতিম্বরা রাজকন্যা ইন্দুমতী পরিচারিকা-সহ স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত হলেন। নৃপতিগণের চরিত্র ও বংশ বিষয়ে অভিজ্ঞা এবং পুরুষের মত প্রগল্‌ভা সহচরী সুনন্দা ইন্দুমতীকে একে একে রাজাদের কাছে নিয়ে গিয়ে প্রত্যেকের পরিচয় দিতে লাগল এবং ইন্দুমতী যখন রাজাদের অতিক্রম ক'রে যেতে লাগলেন তখন তাঁদের আশা-সমুজ্জ্বল মুখগুলি একে একে নৈরাশ্যের অন্ধকারে কালো হ'য়ে গেল। যাহোক্, সুনন্দা প্রথমেই ইন্দুমতীকে মগধের (দক্ষিণ বিহারের) রাজার কাছে নিয়ে মগধরাজের পরিচয় দিলে; সব শুনে ইন্দুমতী তাঁকে একটি শুষ্ক প্রণাম ক'রে অন্য রাজার দিকে অগ্রসর হলেন। তারপর অঙ্গ (মুঙ্গের ও ভাগলপুর জেলা) দেশের অধিপতিকেও প্রত্যাখ্যান ক'রে সিপ্রানদীতীরস্থিত অবন্তী (অর্থাৎ মালব)-রাজের নিকট গেলেন। তারপর অনূপ বা দক্ষিণ মালবের অধিপতির পালা, ঐ জনপদের রাজধানী রেবা অর্থাৎ নর্মদা নদীর তীরস্থিত মাহিষ্মতী (আধুনিক মান্ধাতা) নগরীর খ্যাতিও ইন্দুমতীর চিত্তকে আকৃষ্ট করতে পারল না। তারপর ক্রমে ক্রমে কালিন্দী অর্থাৎ যমুনার তীরবর্তী শূরসেন বা মথুরা রাজ্য, পূর্ব সমুদ্রের তীরস্থিত মহেন্দ্র পর্বত শোভিত কলিঙ্গ দেশ, মলয় পর্বতের উপত্যকাস্থিত তাম্বুল লতা ও গুবাক বৃক্ষ এবং এলা লতা ও চন্দন বৃক্ষ শোভিত পাণ্ড্য (রাজধানী উরগপুর) প্রভৃতি জনপদের অধিপতিদের উপেক্ষা ক'রে অবশেষে ইন্দুমতী উত্তর কোশলের অধিপতি রঘুর পুত্র অজের কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণ করেন। এই বর্ণনাটিতে ভারতবর্ষের মধ্যবর্তী কতকগুলি নূতন জনপদের নাম পাওয়া গেল।

ভারতবর্ষের তৃতীয় ভৌগোলিক বিবরণ পাই রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গে। রামচন্দ্র রাবণ বিনাশের পর সীতাসহ পুষ্পকরথে আরোহণ ক'রে আকাশ-পথে লংকা থেকে অযোধ্যায় ফিরে চলেছেন। পুষ্পক রথ দ্রুতবেগে উড়ে চলেছে এবং দক্ষিণ ভারতের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক দৃশ্য ঘন ঘন পটপরিবর্তনের মত একে একে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে, আর রামচন্দ্র সীতার নিকট ঐ সব দৃশ্যের বর্ণনা করছেন। লংকা ছেড়ে প্রথমেই চোখে পড়ল রামেশ্বর সেতুবন্ধ। শরৎকালে ছায়াপথ যেমন তারকাখচিত সুনীল আকাশকে দ্বিধা বিভক্ত করে, মলয় পর্বত থেকে লংকা পর্যন্ত বিস্তৃত ঐ সেতুটিও তেমনি ফেনখচিত নীল সমুদ্রকে দ্বিধা বিভক্ত করেছে। তারপর নক্র-শংখসংকুল সমুদ্রের শোভা দেখতে দেখতে দূর থেকে তমাল ও তালবন-শোভিত বেলাভূমি একটি বৃহৎ লৌহচক্রের প্রান্তস্থিত কলংক রেখার ন্যায় দৃষ্টিগোচর হ'ল। অতঃপর পম্পা অর্থাৎ তুঙ্গভদ্রা এবং গোদাবরী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী জনস্থান, পঞ্চবটী প্রভৃতি জনপদ ও মাল্যবান্ পর্বত আবির্ভূত হ'য়ে রাম ও সীতার মনে বনবাসকালের কত আনন্দ-বেদনার স্মৃতি জাগিয়ে ছিল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রয়াগের নিকটবর্তী চিত্রকূট পর্বত এসে উপস্থিত হ'ল; অদূরে স্বচ্ছসলিলা মন্দাকিনী নদী প্রবাহিত হচ্ছে—মনে হচ্ছে যেন চিত্রকূটের পার্শ্ববর্তী ভূমি কণ্ঠদেশে একছড়া মুক্তার মালা পরেছে। তারপরেই এল শুভ্রসলিলা গংগা ও নীল-সলিলা যমুনার অপূর্ব সংগমস্থল। সর্বশেষে উত্তর কোশলের সুবিখ্যাত সরযূ নদী দৃষ্টিগোচর হ'ল—দেখা মাত্রই রামচন্দ্রের মনে হ'ল যেন জননী কৌশল্যার মতই ঐ নদীটি তাঁকে তরঙ্গহস্ত প্রসারিত ক'রে বুকে টেনে নিতে ব্যাকুল হয়েছে। অতঃপর রাম ও সীতা পুষ্পক রথ থেকে অবতরণ ক'রে প্রতীক্ষমান বশিষ্ঠ, ভরত ও প্রজাবৃন্দ কর্তৃক অভ্যর্থিত হ'য়ে অযোধ্যার সংলগ্ন সাকেত নগরের একটি সুরম্য উপবনে গিয়ে কিছুকাল অবস্থান করলেন। এই বর্ণনাটিতে সুস্পষ্ট কারণবশত কালিদাসের যুগের চেয়ে রামায়ণের যুগের ভৌগোলিক চিত্রটিই অধিকতর পরিস্ফুট হয়েছে।

কালিদাসের যুগের ভারতবর্ষের আর একটি ভৌগোলিক বিবরণ পাই মেঘদূত কাব্যের পূর্ব খণ্ডে। এটি স্পষ্টতই কালিদাসের নিজের যুগের বর্ণনা এবং এ বর্ণনার অনেকটাই কবির নিজের ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাজাত ব'লে মনে হয়। ব্যক্তিগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ছাপ রয়েছে ব'লেই মেঘদূতের দেশ বর্ণনা রঘুবংশের দেশ বর্ণনার চেয়ে আমাদের চিত্তকে অধিকতর আকর্ষণ করে। কোনো সময়ে এক যক্ষ কর্তব্যে অবহেলা করার দরুণ প্রভু কর্তৃক এক বৎসরের জন্য নির্বাসন-দণ্ডে দণ্ডিত হ'য়ে রামগিরি (আধুনিক নাগপুরের নিকটবর্তী রামটেক্) পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করে। কয়েক মাস পরে নব বর্ষার আবির্ভাবকালে পত্নী-বিরহ-কাতর যক্ষ একটি মেঘকে দৌত্যে বরণ ক'রে হিমাদ্রির পরপারস্থিত অলকা পুরীতে পতি-বিরহবিধুরা পত্নীর নিকট প্রেরণ ক'রে এবং মেঘ কোন্ পথ ধ'রে অলকায় যাবে তার

নির্দেশ দান করে। এই নির্দেশদান উপলক্ষেই কবি তৎকালীন ভারতবর্ষের একাংশের একটি অতি অপূর্ব বর্ণনা করেছেন। রামগিরির নিকট বিদায় নিয়ে উত্তরদিকে মালভূমির উপর দিয়ে একটু এগিয়েই পক্ক আম্র শোভিত আম্রকূট পর্বত। আর একটু অগ্রসর হ'লেই হস্তী দেহে অংকিত শ্বেত রেখার ন্যায় বিন্ধ্য পর্বতের পাদদেশে শীর্ণকায় রেবা অর্থাৎ নর্মদা নদী দেখা যাবে। তারপরেই সুবিখ্যাত দশার্ন (পূর্ব মালব) দেশ, সেখানে বাগানে বাগানে কেয়া ফুটেছে, গাছে গাছে কালো জাম পেকেছে, গ্রামের বড় বড় গাছে গৃহবলিভুক্ পাখীরা বাসা বেঁধেছে ; এই দশার্ন দেশেই বেত্রবতী (অর্থাৎ বেতোয়া) নদীতীরে সুবিখ্যাত রাজধানী বিদিসা নগরী (আধুনিক বেস্ নগর) অবস্থিত। তারপর নেব নীচৈঃ নামে একটি পাহাড় ও একটি ধননদী অতিক্রম করে একটু বাঁকা পথে উজ্জয়িনীর দিকে অগ্রসর হবে ; পথে পড়বে নির্বিন্ধ্যা অর্থাৎ আধুনিক নিবাঝ্ ও কালীসিন্ধ্ নদী। তারপর অবন্তি (পশ্চিম মালব) দেশে পৌঁছে ধরাতলে স্বর্গতুল্য শিপ্রা নদীতীরে অবস্থিত বিশাল উজ্জয়িনী পুরীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। উজ্জয়িনীর অনতিদূরে শিপ্রার শাখা গন্ধবতীর তীরে সুবিখ্যাত মহাকালের মন্দির অবস্থিত। এই বিশাল নগরীর অতুল ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্য দর্শন ক'রে একটু এগিয়েই মেঘ ক্ষীণকায় গম্ভীরা নদী ও তৎপরে দেবগিরি (আধুনিক দেবগড়)-স্থিত কার্তিকেয়ের মন্দির দেখতে পাবে। আরও অগ্রসর হ'য়ে চর্মন্বতী অর্থাৎ আধুনিক চম্বলা নদী অতিক্রম ক'রে মেঘ দশপুর (সিন্ধিয়ার রাজ্যের মন্দশোর) নগরে উপনীত হবে। অতঃপর মেঘ দ্রুতগতিতে ব্রহ্মাবর্ত অর্থাৎ আধুনিক থানেশ্বর অঞ্চল ও সরস্বতী নদী পার হ'য়ে কনখলের নিকটে যেখানে জাহ্নবী হিমালয় থেকে অবতীর্ণ হচ্ছেন সেখানে যাবে। তারপরে হিমালয়ের সানুদেশের সমস্ত সৌন্দর্য দর্শন ক'রে যক্ষের দূতরূপী মেঘ অবশেষে ক্রৌঞ্চ রন্ধ্র নামক গিরিসংকটের মধ্য দিয়ে তিব্বতের অন্তর্গত সুবিখ্যাত মানস সরোবর ও তার নিকটবর্তী কৈলাস পর্বতের উপরে অবস্থিত কবি কল্পিত অলকাপুরীতে পৌঁছোবে। মেঘদূতের পাঠককেও এখানে বাস্তব জগৎ থেকে কল্পনা জগতে প্রবেশ করতে হয়। এই বর্ণনাটিতে দশার্ন ও অবন্তির ছোট খাটো পরিচয়গুলিও কবি অতি সযত্নে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেছেন, অন্যান্য জনপদের বর্ণনায় কবির এমন পুংখানুপুংখ প্রয়াসের পরিচয় পাওয়া যায় না। তার থেকেই মনে হয় দশার্ন ও অবন্তি জনপদের সঙ্গে কবির ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। এই পরিচয়ের জন্যেই পূর্ব মেঘের জনপদ-বর্ণনার রস এমন নিবিড় হ'য়ে উঠেছে।

যাহোক্, বংক্ষু নদী থেকে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর এবং সিংহল দ্বীপ থেকে মানস সরোবর পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষের সম্বন্ধে কালিদাসের যে গভীর জ্ঞান ও প্রীতির আকর্ষণ ছিল, আশা করি এই আলোচনা থেকে তার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাবে। বস্তুত প্রাচীন বা আধুনিক আর কোনো কবির কাব্যেই ভারতবর্ষের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের নিদর্শন পাওয়া যায় না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে অখণ্ড ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এমন গভীর উপলব্ধির পরিচয় থাকা সত্ত্বেও কালিদাসের কাব্যে 'ভারতবর্ষ' এই নামটি কিংবা তার কোনো প্রতিশব্দও পাওয়া যায় না। কিন্তু নাম না থাক্‌লেও ভারতবর্ষের যে রূপটি তাঁর কাব্যে ফুটে উঠেছে তা চিরকাল অক্ষয় হ'য়ে বিরাজ করবে।

পৃথিবী ছাড়িয়ে

প্রবোধকুমার সান্যাল

রাত নয়টার সময় দিল্লী স্টেশনে আমাদের এক্‌স্‌প্রেস ট্রেন পৌঁছিল। বোম্বাই-বরোদা লাইন দিয়া আসিয়া সন্ধ্যার সময় টুণ্ডুলা হইতে এই গাড়ী ধরিয়াছি, সুতরাং মনে করিয়াছিলাম দিল্লী স্টেশনেই রাত্রির আহার সাঙ্গ করিব। গাড়ী পনেরো মিনিটকাল দাঁড়াইবে, অতএব স্টেশনের রেস্টোরেণ্টে কিছু খাইয়া কিছু-বা সঙ্গে লইয়া এক রকম করিয়া ব্যবস্থা করিব।

মে মাসের মাঝামাঝি। গতকাল সন্ধ্যা হইতে ট্রেনে ভ্রমণ করিতেছি—বালুর ঝড়ে, ধূলিরাশির ঝাপটে, জলের অভাবে আজ সারাদিন ধরিয়া রাজপুতনার সমস্ত পথটা প্রচণ্ড অগ্নিদাহে সিদ্ধ হইয়াছিলাম, রাত নয়টায় এখনও ঠাণ্ডা বাতাস কোথাও নাই, বরং চারিদিক-অবরুদ্ধ দিল্লী স্টেশনের ভিতরটায় যেন একটা গুমটের সৃষ্টি হইয়াছিল। আগুনের খাপরার ন্যায় তৃতীয় শ্রেণীর কামরা হইতে তাড়াতাড়ি নামিয়া আমি প্রথমে একটু শীতল পানীয়ের অন্বেষণে এদিক ওদিক ছুটিলাম।

ঠাণ্ডা জল হয়ত পাইতাম কিন্তু ক্লান্ত দেহে খুঁজিয়া বাহির করিবার আর উৎসাহ নাই ; সুতরাং স্টেশনের এক রেষ্টুরেণ্টে ঢুকিয়া বরফ জল হুকুম করিলাম। জল আসিল। জল খাইয়া কিছু মালাই রুটি মিঠাই ও ফল অর্ডার করিয়া খাইতে বসিয়া গেলাম।

মনে করিয়াছিলাম আহারাদি শেষ করিয়া যদি মিনিট পাঁচেক সময় পাই তবে প্লাটফরমের পাইপে স্নান করিয়া লইব, কিন্তু তাহা আর হইয়া উঠিল না। আলীগড় স্টেশনের বাথ্‌রুমটা অবহেলা করিয়া খুবই ভুল করিয়াছি, তখন সময়ও হাতে ছিল। আগামী কাল প্রভাত ছাড়া স্নান করিবার আর কোনো উপায় নাই।

আহার শেষ করিয়া পয়সা চুকাইয়া এক লোটা জল হাতে লইয়া যখন বাহির হইয়া আসিলাম তখন আর সময় নাই, গাড়ীর তৃতীয় বেল্ পড়িয়া গিয়াছে। দূরে সবুজ সিগ্‌নাল্ দিল, গার্ড বাঁশী বাজাইল—আমি তাড়াতাড়ি আমার কামরায় আসিয়া উঠিলাম।

চালাক-চতুর যুবক হইয়া এমন একটা দ্রুত মুহূর্তে যে এমন ভুল করিব তাহা জানিতাম না। নিজের কামরায় না উঠিয়া অন্য কামরায় তাড়াতাড়িতে উঠিয়া পড়িয়াছি প্রথমেই তাহা উপলব্ধি করিলাম। সকল তৃতীয় শ্রেণীর চেহারা একই, কেবল চাক্ষুষ পরিচয়ের যে-সকল আরোহী তাহাদেরই চেনামুখের সঙ্কেত পাইয়া কামরা চিনিয়া লই, কিন্তু এক্ষেত্রে নূতন মানুষ ও স্ত্রীলোক দেখিয়া ভুল বুঝিলাম। গাড়ী নড়িতে ও দুলিতে আরম্ভ করিয়াছে, আমি দ্রুত নামিয়া নিজের কামরার দিকে ছুটিব—এমন সময় দরজায় বাধা পাইলাম। একব্যক্তি আমার পথ অবরোধ করিল।

মুখ তুলিয়া চাহিলাম। লোকটি আমাকে বাধা দিয়া জানাইল—ইহাই আমার কামরা, ঠাহর করিতে না পারিয়া নামিয়া যাইতেছিলাম। গরমের চোটে মাথার ঠিক ছিলনা, এইবার ভালো করিয়া চাহিলাম। দুই তিন ঘণ্টা ধরিয়া যাহাদের দেখিয়াছিলাম তাহারা অনেকেই আছে, নূতন যাত্রীও দুই চারিজন উঠিয়াছে। নিজের জায়গায় আসিয়া নিজের পাতা বিছানাটা চিনিলাম বটে, কিন্তু তাহা একটি স্ত্রীলোককে দখল করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম।

স্ত্রীলোকটির অভিভাবক কে তাহা বুঝিতে না পারিয়া কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। বলিলাম, ই হমারি সীট্ হ্যায়, ছোড় দিজিয়ে।

মেয়েটি মুখ তুলিল। বয়স তাহার অল্প, চেহারাটা সুন্দর, সর্ব্বাঙ্গে রেশমের পরিচ্ছদ ; মনে হইল গলায় এক ছড়া শাদা মুক্তার মালা ঝিকমিক করিয়া উঠিল। বিপরীত বেঞ্চের উপর একখানা পা সে তুলিয়া দিয়াছিল—সেই পায়ে তাহার অলক্তক এবং মখমলের ফিতা-বাঁধা জুতা। তাহার মুখে এক মুখ পান, দুই কানে দুইটা দুল। মুখ তুলিয়া সে হাসিমুখে প্রশ্ন করিল, আপকো বিছওয়ানে ?

জী।

বুঝিলাম এই গরমে জানালার ধারের বাতাস ছাড়িয়া তাহার উঠিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তাহার হাসিমুখের উত্তরে আমার গম্ভীর ও সংযত মুখের চেহারা দেখিয়া সে বসিতে সাহস করিল না।

মাঠের ভিতর দিয়া ট্রেন তখন দ্রুতগতিতে চলিয়াছে। জায়গাটা ছাড়িয়া দিয়া সে বিপরীত বেঞ্চে আমার আসনের সম্মুখেই নিজের জায়গা করিয়া লইল। আমি তখনও বুঝিলাম না—কে মেয়েটির অভিভাবক। এক সময় তাহার দুইখানা হাত নড়িতেই লক্ষ্য করিলাম, দুই হাতে প্রচুর সোনা ও জড়োয়ার অলঙ্কার। গাড়ীতে আর দ্বিতীয় স্ত্রীলোক নাই, কিন্তু সেজন্য তাহাকে আড়ষ্ট হইতে দেখিলাম না, বরং মাথার ঘোমটা একটু কমাইয়াই সে সপ্রতিভভাবে বসিয়া রহিল।

আমার আচরণে সে খুশি হয় নাই শীঘ্রই তাহার প্রমাণ পাইলাম। কণ্ঠস্বরে ঈষৎ উষ্মা মিলাইয়া এক সময়ে সে প্রশ্ন করিল, শামান্ হটায় লেঁই ?

বুঝিলাম তাহারই মালপত্রে দুইটা বেঞ্চের মধ্যস্থল প্রায় ঠাসাঠাসি, হাত পা ছড়াইতে আমার খুবই অসুবিধা হইবে, কিন্তু তাহাকে আর ব্যস্ত না করিবার জন্য সংক্ষেপে জবাব দিলাম, রহেন দিজিয়ে।

মেয়েটি সহসা পুনরায় প্রশ্ন করিল, আপ কিৎনা দূর যায়েঙ্গে ?

বলিলাম, শিম্‌লা। কাল্‌কেমে উতর্‌না।

ফজিরমে ?

জী।—এই বলিয়া সৌজন্যের খাতিরে আমিও জিজ্ঞাসা করিলাম, আপ্ কিধর্ চল্ রহা হেঁ ?

লুধিয়ানে।—সে জবাব দিল। বলিল, বদ্‌লি হ্যায় বীচ্‌মে। ম্যা আতা হুঁ বোম্বাইসে।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তাহার বলিবার আগেই বুঝিয়াছিলাম সে বোম্বাই হইতে আসিতেছে। আমেদাবাদ, ওয়াধওয়ান ও আজমীঢ় হইয়া সে দিল্লীতে আসিয়া এই গাড়ী ধরিয়াছে। ভাবিলাম, বোম্বাই না হইলে আর এমন স্বাধীন তরুণী কোথা হইতে আসিবে ?

আবার একসময়ে সে কথা কহিল। বয়সের দোষে এবার আমি একটু পুলকিত হইলাম। সে জিজ্ঞাসা করিল, কসুর ন লিজিয়ে, আপকো নাম ?

জবাব দিলাম, বিরিজলাল শেঠী। আপ্‌কো ?

সে হাসিয়া কহিল, জেনানেকো নাম বোল্‌না কুছ সরম লাগ্‌তা হুঁ।

মনটা সরস হইয়া উঠিল। বলিলাম, কুছ নেহি।

সলজ্জকণ্ঠে সে কহিল, রামকুমারী।

নিজের কাছেই আমি চরিত্রবান বলিয়া পরিচিত ছিলাম, কিন্তু নিজের নাম বলিতে গিয়া রামকুমারীর মুখের উপরে যে রক্তাভাস ফুটিল তাহারই চিত্র নিজের মনে মুদ্রিত করিয়া একটুখানি চিত্তবিলাস করিতে ইচ্ছা জাগিল। মুখে যথাসম্ভব গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া একবার মনে করিলাম, আমার জায়গাটা পুনরায় তাহাকে ছাড়িয়া দিই, কিন্তু আশপাশে দুই চারিজন কৌতূহলী যাত্রীর অস্তিত্ব অনুভব করিয়া নিজেকে সংযত করিলাম। একবার যাহাকে তাড়াইয়াছি পুনরায় তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া হাস্যাস্পদ হইতে মন উঠিল না। হৃদয়বৃত্তির দুর্ব্বলতা বরং চাপিতে পারিব ; কিন্তু আমার কোনো গভীর বাসনা ইহাদের চক্ষে প্রকাশিত হইয়া পড়িলে একেবারে মাথা হেঁট হইয়া যাইবে। তাহা পারিব না।

আলাপের যবনিকা ওইখানেই পড়িল না। আমার চোখে ও মুখে যদি সুদূর অনুরাগের কোনো চিহ্ন ফুটিয়া উঠিত তাহা হইলে কি ঘটিত বলিতে পারিনা, কিন্তু সন্তর্পণে আমার মুখে আত্মসম্ভ্রমবোধ ও সংযমশ্রী লক্ষ্য করিয়া রামকুমারী সহজকণ্ঠে পুনরায় আলাপ সুরু করিল। আলাপের মধ্যে অন্তরঙ্গতার রং বুলাইবার চেষ্টা পরস্পরের দিক হইতেই ছিলনা, কেবলমাত্র এই ক্ষণস্থায়ী পথযাত্রায় উভয়কে মোটামুটিভাবে জানিবার একটি আগ্রহ জন্মিল। আমি চরিত্রবান হইলেও এমন একটি সুন্দরী তরুণীর সহিত আলাপ দীর্ঘতর করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না এবং নিজের একাকীত্বকে এড়াইয়া সময়টা যে ভালোই কাটাইতে পারিব এই মনে করিয়া বেশ ভব্য হইয়া তাহার সহিত প্রশ্ন ও উত্তরের খেলা খেলিতে লাগিলাম।

তাহাকে জানাইলাম, আমার বাড়ী কাথিয়াবাড়ে, রাজকোট হইতে ষাট মাইল পশ্চিমে নন্দগাঁও নামক স্থানে। আমরা বিখ্যাত শেঠী পরিবার। আমাদের ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র আমেদাবাদ এবং পুরুষানুক্রমে

আমরা রেশম ব্যবসায়ী। জয়পুর, আজমীঢ়, আগ্রা ও দিল্লীতে আমাদের শাখাপ্রতিষ্ঠান আছে। সম্প্রতি শিমলায় যাইতেছি একটি শাখাকেন্দ্র খুলিবার জন্য। আমার পিতামাতা জীবিত। আমরা পাঁচ ভাই ও এক ভগ্নী। বীজনৌরের রাজপরিবারে আমার ভগ্নীর বিবাহ হইয়াছে। আমার উপরে তিন ভ্রাতাও বিবাহ করিয়াছেন।

নিজের পরিচয় দিয়া তাহার পরিচয় লইব ভাবিতেছি—এমন সময় ও-পাশের একটি লোক রামকুমারীর সহিত আলাপ আরম্ভ করিল। লোকটি দীর্ঘাকার এবং আমার অপেক্ষা বলিষ্ঠ। এতক্ষণ কোনো রকমেই বুঝিতে পারি নাই যে, লোকটি রামকুমারীর অভিভাবক, এইবার জানিতে পারিয়া আমি যেন সহসা অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম। ঈশ্বর সাক্ষী করিয়াছেন, আমি তাহার সহিত কোনোরূপ অভব্য আচরণ করিয়া ফেলি নাই। এত ঘটা করিয়া নিজের পরিচয় দিবার আমি যেন কোনো সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না এবং রামকুমারীরও অধিকতর পরিচয় পাইবার আগ্রহ আমার কমিয়া গেল। নিজের দুর্ব্বলতা গোপন করিব না। যতই চরিত্রবান বলিয়া বড়াই করি না কেন, রামকুমারীর সঙ্গী কেহ নাই এই মনে করিয়া আমার যুবক-পুরুষের মন একটু অহেতুক উল্লাসে মাতিয়াছিল, কিছু পুলক-শিহরণেরও সাড়া পাইয়াছিলাম, কিন্তু এতক্ষণে সহসা ভুল ভাঙিয়া গেল। বলা বাহুল্য ইহার পরে আমি ভোঁতা মুখ করিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া অন্ধকারের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে লাগিলাম। বোকা বনিয়া গিয়াছি সন্দেহ নাই, কিন্তু কৃত্রিম মহানুভবতা প্রকাশ করিয়া মেয়েটাকে যে নিজের জায়গাটা ছাড়িয়া দিই নাই এইকথা মনে করিয়া কতকটা সান্ত্বনা পাইলাম। স্বার্থপরতার জন্যই এ যাত্রায় আত্মসম্মানটা বাঁচিয়া গেল।

মুখ ফিরাইয়া তাহাদের আলাপটা দেখিবার সাহস ছিল না, তবু নড়িয়া চড়িয়া বসিবার ভান করিয়া এক সময় দেখিলাম, লোকটি পানের কৌটা বাহির করিল এবং পান ও কিমাম বাহির করিয়া সে সাদরে রামকুমারীকে খাইতে দিল। যে-বিবেচনাটা আমি এতক্ষণ রামকুমারীর প্রতি প্রকাশ করিতে পারি নাই, দেখিলাম লোকটি তাহাকে সেই স্বাচ্ছন্দ্য দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। নিজে সঙ্কীর্ণভাবে থাকিয়া রামকুমারীকে আরাম করিয়া বসিবার জন্য অনেকখানি জায়গা করিয়া দিল, বিছানাটা এলাইয়া পাতিয়া দিল এবং বাতাস খাইবার জন্য একটি ঝালর-বাঁধা পাখা বাহির করিল। যত্ন, আরাম ও তোষামোদ পাইলে স্ত্রীলোকরা যে কেমন করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে পারে তাহারই একটা জাজ্বল্যমান উদাহরণ দেখিয়া আমার মনে মনে যেন একটু ঈর্ষার উদ্রেক হইল। এখন হইতে এই কথাটা মনে রাখিব, সম্মান দেখাইয়া নারীর হৃদয় জয় করা কঠিন, বরং তাহার রূপশ্রীর যোগ্য মূল্য দিলে স্ত্রীলোক সহজে বশ্যতা স্বীকার করে। বুঝিলাম আমি উহার মনে কোনো দাগ কাটিতে পারি নাই। একবার যেন আমার সন্দেহ হইল, অভিভাবক বলিয়া যাহাকে মনে করিয়াছি তাহার সহিত অভিভাবকত্বের সম্পর্ক অপেক্ষা বন্ধুত্বের অনুরাগের সম্পর্কটাই যেন অধিকতর প্রকট হইয়া উঠিতেছে।

অন্ধকার রাত্রি বিদীর্ণ করিয়া আমাদের এক্‌স্‌প্রেস ট্রেণ পাঞ্জাবের ভিতর দিয়া ছুটিতেছিল। বাতাসে গরমের ভাব অনেকটা কাটিয়াছে। হাতঘড়িতে দেখিলাম রাত্রি এগারোটা বাজে। একাকী থাকিলে সময় কাটিত না, কিন্তু নারীর ছোঁয়াচ থাকার জন্য দুইটা ঘণ্টা যেন পলকের মধ্যেই পার হইয়া গেল। বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলাম বটে, কিন্তু বালকের ন্যায় আমার যেন মনে হইতে লাগিল আমি মস্ত বড় একটা সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইয়াছি, অনেকদিন অবধি আমার ভিতরটা হায় হায় করিতে থাকিবে। আমি যেন মানসচক্ষে দেখিতে লাগিলাম, আমার পিছন দিকে বসিয়া ওই কদাকার ষণ্ডামার্ক লোকটা পান চিবাইতে চিবাইতে আমাকে লইয়াই রামকুমারীর সহিত হাসাহাসি করিয়া আসর জমাইতেছে।

নব্য যুবকের এই অবস্থায় যাহা মনে হয় আমারও তাহাই মনে হইল। খামোকা এই তুচ্ছ ঘটনার সূত্র ধরিয়া সুদূর ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া ভাবিলাম, এই সুন্দরীর সহিত যখন আমার অন্তরঙ্গতা হইল না তখন অবশ্যই আমার জীবন ব্যর্থ। দ্রুতগতিশীল ট্রেণের ভিতরে বসিয়া রাত্রির এই দোলায়মান ক্ষণস্থায়ী মোহ-মুহূর্ত্তগুলির উপরে নিজের ব্যর্থতাটা ঘসিয়া যখন পরীক্ষা করিতেছিলাম এমন সময়

সহসা রামকুমারীর মধুর কণ্ঠস্বর কানে বাজিল—বিরিজলালজী ?

মুখ ফিরাইয়া তাহার দিকে চাহিলাম এবং তৎক্ষণাৎ হাসিমুখে কহিলাম, ফরমাইয়ে ?

সে কহিল, ঘুম পাচ্ছে না আপনার ?

বলিলাম, এখনও পায়নি।

উত্তরটা শুনিয়া দুইজনে যেন কৌতুকবোধ করিল। আমার নিদ্রার সংবাদ লইতে তাহাদের এই আগ্রহ ও কৌতুক কেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমি পুনরায় মুখ ফিরাইয়া লইলাম। তাহাদের হাসির আওয়াজ আমার কানে আসিল, আমি যেন তাহাতে চাবুকের আওয়াজ অনুভব করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

এইবার যে-দৃশ্যের বর্ণনা করিব তাহাতে নীতি ও রুচির প্রশ্ন উঠিবে জানি ; কিন্তু ভয় নাই, যেখানে বিপদের সম্ভাবনা ঘটিবে সেখানে ইঙ্গিতেই কাজ সারিয়া আমি নীতিবিদের সম্ভ্রম বাঁচাইয়া যাইব। আমি নিজে রুচি ও চরিত্রবত্তা প্রকাশ করিয়া এখনই এই কাহিনীর সমাপ্তি-রেখা টানিয়া দিতে পারি—কিন্তু যাহারা শ্লীলতা ও সম্ভ্রম-বোধকে গ্রাহ্যই করে না, যাহারা ভদ্রসমাজের গায়ের উপর পড়িয়া দুরন্তপনা করিয়া যায়, তাহারাও জনসমাজের অন্তর্ভুক্ত এবং তাহাদের বাদ দিয়া চলিতে হইলে পৃথিবীর মোটা অংশটার সহিত কাজ-কারবার চলে না—ইহা অস্বীকার করিবে কে ?

বোধ করি সমস্ত কামরার যাত্রীগুলি ঘুমাইয়া পড়িবে এমনি একটা অবস্থা দুইজনে কল্পনা করিতেছিল। শীতকাল হইলে তাহাদের সে-কল্পনা সত্য হইত, কিন্তু গ্রীষ্মের গুমটে তাহা আর হইয়া উঠিল না, দুই চারিজন জাগিয়া রহিল। আমিও ঘুমাইয়া পড়িতাম, কিন্তু কানের কাছে মৃদু চুড়ির আওয়াজ, টুক্‌রা হাসি, গদগদ কণ্ঠ, শাড়ির মরমরানি, পরিহাস-সরস আলাপ—এইগুলি শুনিতে পাইলে নব্য যুবকের চোখে ঘুম আসিবে এতবড় অপৌরুষ আমার নাই। আমি ঘুমাইবার ভান করিয়া পড়িয়া রহিলাম। আমি যেমন ভদ্রতা করিয়া মুখ ফিরাইয়া রহিলাম, আমাদের কামরার জাগ্রত যাত্রীরা তাহা করিলনা, তাহারা সকৌতুক পরিহাসের সহিত রামকুমারী ও তাহার সঙ্গীর প্রণয়কাণ্ডের দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহাদের লোলুপ দৃষ্টি ও নির্লজ্জ ভঙ্গী অনুভব করিয়া আমি পাথরের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিয়াছি, পাকা-ফলের মাধুর্য্য আস্বাদ করিতে হইলে ফল পাকিবার সময় দেওয়া দরকার ; কিন্তু প্রণয়কাহিনীতে বোধ হয় ইহার বিপরীত, একসঙ্গে অনেকগুলি ধাপ ডিঙাইয়া দ্রুত অগ্রসর না হইলে সুফল পাওয়া যায় না। ইহাদের কোনো কোনো কথার ছিটা আমার কানে আসিতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহা মাদকতারসে এতই জড়িত ও অপরিস্ফুট যে তাহার অর্থসঙ্গতি খুঁজিয়া পাইলাম না। এক সময়ে তাহারা সহসা চুপ করিলে আমি ভয় পাইয়া অলক্ষ্যে চোখ খুলিলাম। দেখিলাম, স্বামী স্ত্রী যেমন অন্তরঙ্গ হইয়া বসে উহারা তেমনিভাবে বসিয়া অতিশয় চাপা কণ্ঠে আলাপ করিতেছে এবং রামকুমারী মাথার ঘোমটা খুলিয়া ফেলিয়াছে। অনেকেই তাহাদের পিছন দিক হইতে লক্ষ্য করিতেছে, কিন্তু আমিই একমাত্র যাত্রী তাহাদের সম্মুখস্থ বেঞ্চে আড় হইয়া বসিয়া আছি, সুতরাং আমি যতটা তাহাদের কীর্ত্তিকলাপ দেখিতে পাইব এমন আর কেহ পাইবে না। আমি ঘুমাইয়া পড়িলেই তাহারা খুশি হইত।

এক সময়ে পুনরায় চোখ বুজিলাম। সত্য বলিব, বাতাস লাগিলে যেমন নদীতে তরঙ্গদল জাগিয়া উঠে আমার মনের অবস্থা সেইরূপ হইল। প্রাণপণে ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু ঘুম আসিল না। উহারা কথাবার্ত্তা হাসি-তামাসা করিলে বরং ঘুম আসিত, কিন্তু নীরব হইয়া গেলেই ছাঁৎ করিয়া আমার তন্দ্রা ভাঙিয়া যায়। ইহা অনুভব করিলাম আমি না ঘুমাইলেও উহাদের কিছু আটকাইবে না এবং যেহেতু উহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, লজ্জা-সরম, নীতি রুচি, সভ্যতা ও ভদ্রতা কিছুই মানিবেনা—সেই হেতু আমাকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করিয়া উহারা সকলের চোখের উপর নিজেদের জন্য একটা পৃথক জগতের সৃষ্টি করিয়া লইল। সকলে উহাদের দেখিলেও উহারা কাহাকেও লক্ষ্য করিবে না। এমনি করিয়া দৃশ্যটা যখন ইতর হইতে ইতরতর হইয়া উঠিল, আমি তখন সমগ্র পৃথিবীর উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া পাশ ফিরিয়া ঘুমাইতে চেষ্টা করিলাম এবং গাড়ীখানা সকলকে কোলে লইয়া প্রচণ্ড দোলায় দোলাইয়া গমগম করিয়া ছুটিতে লাগিল।

শিল্পী—শ্রীযুক্ত পূর্ণ চক্রবর্তী

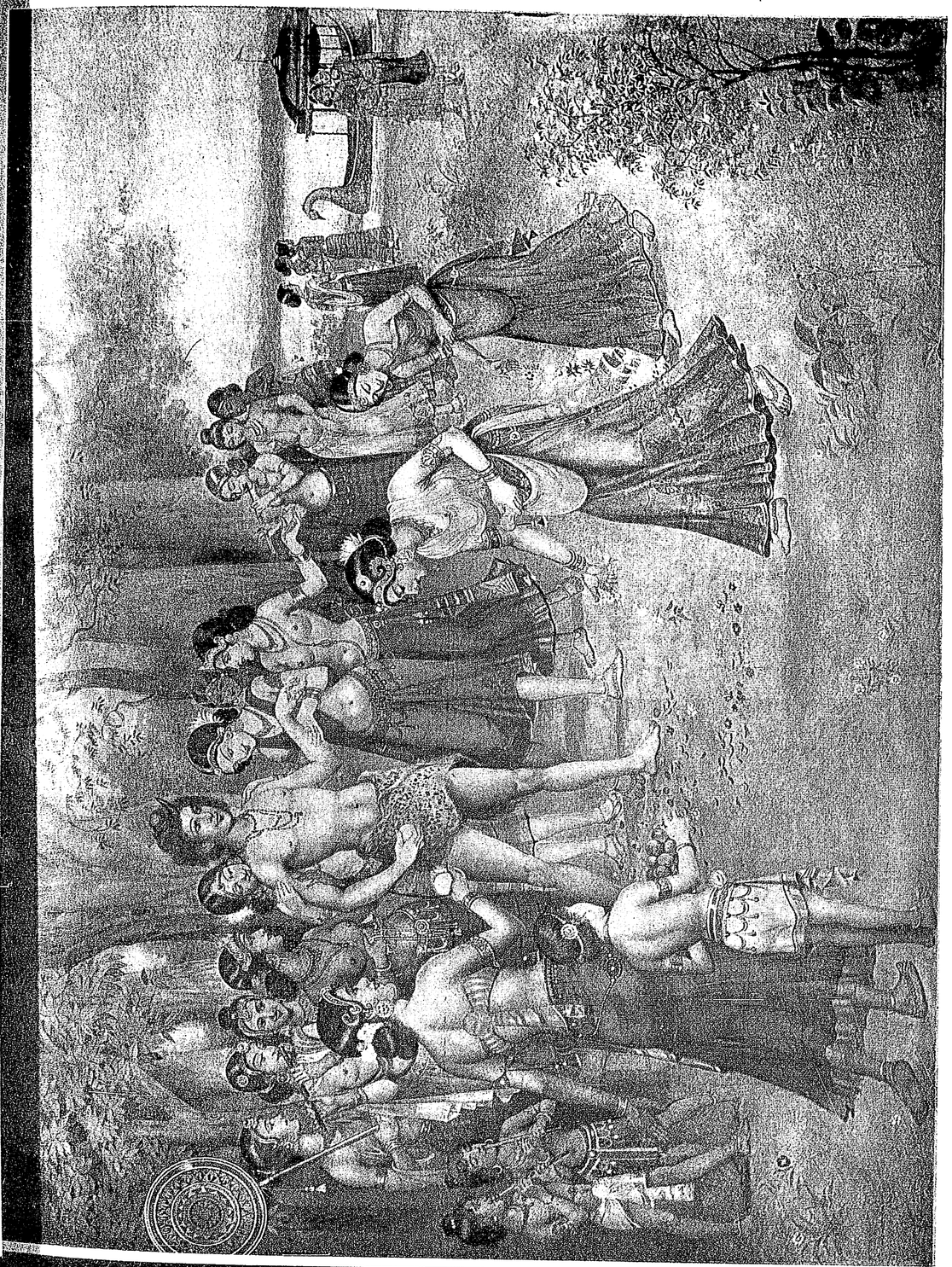

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

কতক্ষণ পরে জানিনা, এক সময় রেল-লাইন পরিবর্ত্তনের ধাক্কায় আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল। জাগিয়া উঠিয়া যাহা সহসা আমার চোখে পড়িল তাহাতে সত্য সত্যই বিস্মিত হইলাম। দেখিলাম সমস্ত জায়গাটা জুড়িয়া রামকুমারী তাহার সুন্দর দেহখানি ছড়াইয়া শুইয়া আছে এবং তাহার সঙ্গীটি তাহার নিকট নাই। এদিক ওদিক চাহিলাম কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। ট্রেন থামিয়া গিয়াছে কিন্তু বিদ্যুৎলতাটি নিশীথিনীর কোলে বেশ স্থির হইয়া আছে। রাত দুইটা বাজিয়া গিয়াছে। আমাদের ট্রেন আম্‌বালা স্টেশনে পৌছিল। আমি স্তব্ধ হইয়া বসিয়া একরূপ অদ্ভুত বৈরাগ্য ও বিতৃষ্ণায় ডুবিয়া ছিলাম—এমন সময় রামকুমারী উঠিয়া আমাকে ডাকিল, বিরিজলালজী ?

হয়ত আমার মনেরই ভুল হইবে, আমি তাহার কোমল ও শান্ত কণ্ঠস্বরে একপ্রকার অসহায় ও করুণ আবেদন শুনিলাম। উত্তর দিলাম, কেন ?

লুধিয়ানার গাড়ী কখন জানো ?

আমি তাহার সহিত পুনরায় আলাপ করিব কিনা বিচার করিতে লাগিলাম।

সে পুনরায় কহিল, এদিকের রাস্তাঘাট আমি ভালো জানিনে, একবার মাত্র এসেছিলাম।

বলিলাম, তোমার সঙ্গী কোথায় গেল ?

সঙ্গী ?—রামকুমারী কহিল, সঙ্গী আমার কেউ নেই, বিরিজলালজী।

আমার বিস্ফারিত চক্ষু দেখিয়া মায়াবিনী হাসিল, বলিল, তার সঙ্গে পথেই আলাপ, সে নেমে গেছে। বিরিজলালজী, এই আমার পেশা।

যে-আন্তরিকতা ও সত্যের প্রেরণায় সে লোক-লজ্জাকে অস্বীকার করিয়া দীর্ঘ রাত্রি ধরিয়া এক বর্ব্বরের সহিত বিলাস করিয়াছে, সেই আন্তরিকতা ও অকপটতা তাহার কোমল কণ্ঠস্বরে আমি শুনিতে পাইলাম। এমন করিয়া সে আমার দিকে চাহিল যে, সেই দৃষ্টির ভিতর আমি আবহমানকালীন নারীপ্রকৃতির পরাশ্রিতপরতার চেহারা দেখিতে পাইলাম। সমস্ত অন্তর ভরিয়া একটু আগে পর্য্যন্ত যাহাকে ঘৃণা করিয়াছি, সমস্ত হৃদয় তাহার প্রতি করুণায় ভরিয়া উঠিল। বলিলাম, এই রাত্রে একা কোথা যাবে তুমি, রামকুমারী ? গায়ে এত অলঙ্কার, এত জিনিসপত্র—

গাড়ী তখন স্টেশনে থামিয়াছে। সে ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, তারপর কহিল, যদি ভরসা দেন্ তবে একটি কথা বলি।

নতমস্তকে সে কহিল, আপনার চোখের সামনে আমি নোংরামি করেছি, বড় অধম আমি, তবু আপনার সাহায্য প্রার্থনা করি।

বলিলাম, আমিও ত' মন্দ লোক হ'তে পারি। জানো, তোমার প্রতি আমারো লোভ রয়েছে ?

সে কহিল, শেঠজী, লোভীর হাতেই হয়ত একদিন আমাকে মরতে হবে। লোভী ছাড়া 'মরদের' অন্য চেহারা আমি দেখিনি। আপনার লোভের বস্তুই আমি হ'তে চাই।

আমাকে কি করতে বলো ?

রাত 'আঁধিয়ারা'—একলা যাওয়া বড়ই শক্ত। আপনি আমাকে নিয়ে চলুন লুধিয়ানায়।

সময় তখন অল্প। হিসাব করিয়া কিছু বলিবার অবকাশ ছিল না। সম্মুখে একাকিনী রমণী, চক্ষু দুইটি নিদ্রারসে ভরা, রেশমী পরিচ্ছদের উপর স্টেশনের আলো পড়িয়া তাহাকে রূপলোকবাসিনীর ন্যায় মনে হইতেছিল। আমার বুকের ভিতরটা এই দৃশ্য দেখিয়া সমস্ত জগতের সকল নব্য যুবকের মতোই তোলপাড় করিয়া উঠিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, চলো।

কি কাণ্ড করিয়া বসিলাম জানিনা, কেহ আমাকে দেখিয়া কি মনে করিতেছে তাহাও বুঝিলাম না, আমার এই কার্য্যের পুরস্কার অথবা গৌরব কি, তাহাও বিচার করিয়া দেখিলাম না—ঘুম চোখে নিশি পাওয়ার মতো প্রেতিনীর সঙ্কেতে পথ হাতড়াইয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ চলিতে লাগিলাম। দিবালোক হইলে হয়ত একবার থমকিয়া দাঁড়াইয়া আমি আমার এই নির্ব্বোধ হঠকারিতাকে সংযত করিতে পারিতাম, যুক্তিশাস্ত্র হইতে নজীর তুলিয়া নিজেকে ধিক্কার দিতাম, নীতি ও চরিত্রবত্তার প্রশ্ন আনিয়া আমার এই নিঃসঙ্কোচ লজ্জাহীনতাকে চাবুক মারিতাম, কিন্তু সেই নিবিড় রাত্রে স্টেশনের সেই রহস্যময় প্রদীপালোকে অজানা দেশের স্বপ্নময় পথে পরমাসুন্দরী এক রমণীর

ইসারায় আমি আমার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিস্মৃত হইলাম। সে আমাকে কোন্ কল্পলোকে লইয়া চলিল কিছুই ঠাহর করিতে পারিলাম না।

মালপত্র সমেত কোন্ গাড়ীতে কখন উঠিয়াছি, কখন গাড়ী ছুটিতে সুরু করিয়াছে, কোন্ পথ কোথা দিয়া পার হইয়া গেল, কিছুই বুঝিতে পারি নাই। যখন চৈতন্য ফিরিল, দেখিলাম, লুধিয়ানা স্টেশনে নামিয়াছি। পূর্ব্বাকাশে ঈষৎ শাদা রঙ ধরিতেছে।

বলিলাম, কোথায় যাবে এবার ?

রামকুমারী বলিল, অনেক 'তখলিপ্' তোমাকে দিলাম, বিরিজলালজী। আমার কাজ এখানে সামান্য, এখুনি কাজ সেরে আবার ফিরে যাবো।

সামান্য কাজের জন্য সে বোম্বাই হইতে এই প্রায় একহাজার মাইল ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছে ইহা বিশ্বাস করিতে আমার মন উঠিল না। বলিলাম, সেটা কি ভালো হবে ? বরং দুদিন বিশ্রাম ক'রে যেয়ো।

বিশ্রাম ?—রামকুমারী হাসিয়া কহিল, বেশ, তুমি যা বলবে তাই হবে। ম্যানে আপ্‌কো বাঁন্দী বন্‌গৈ !

রাত্রে যাহা লক্ষ্য করি নাই, এখন তাহা চোখে পড়িল। দেখিলাম, তাহার অনেকগুলা লগেজের সহিত একটুক্‌রি পরিপূর্ণ ফুল ! সেই রাশীকৃত নানাবিধ ফুলগুলি তাজা রাখিবার জন্য জলের ঝারির বন্দোবস্ত হইয়াছে। ইহা দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিলাম, হাজার মাইল দূর থেকে এত ফুল এনেছ কেন ?

সে কহিল, ঠাকুরের পায়ে এই ফুল দেবো, শেঠজী।

কথাটা আমার ভালো লাগিল না, ইহা যেন অত্যন্ত বাড়াবাড়ি মনে হইল। জীবনে যাহার শুচিতার অভাব আছে এবং যাহার দৈনন্দিন আচরণে কপটতা ও লোভ ছাড়া দ্বিতীয় আর কোনো উদ্দেশ্য নাই—সে যত বড় সুন্দরীই হউক, তাহার এই আত্ম-প্রতারণাশীল ঈশ্বরানুরাগ দেখিয়া আমার গা জ্বালা করিয়া উঠিল। কিন্তু আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

প্রভাতের রাঙা রৌদ্রে স্টেশনের বাহিরে আসিয়া রামকুমারী আমার ও তাহার লগেজগুলি স্টেশন-মাষ্টারের জিম্মায় রাখিল এবং একখানা টাঙাগাড়ী ডাকিয়া আমাকে উঠিতে বলিল ও নিজে ফুলের সেই বড় টুক্‌রিটা লইয়া আমার পাশে উঠিয়া বসিল। বলিল, এবার আমিই বোধ হয় তোমাকে চিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবো।

প্রশ্ন করিলাম, কোথায় যাবে ?

সে কহিল, পৃথিবী ছাড়িয়ে।

বলিলাম, বাৎলাইয়ে ক্যা মত্‌লব ?

রামকুমারী হাসিয়া কহিল: যাবো মৃত্যুর মন্দিরে।

বলিলাম, মেরি পিয়ারী, দিনের আলোয় তোমার কথায় আর নেশা লাগবে না। কোথায় যাবে বলো শুনি ?

সে কহিল, বেহেস্ত্।

গাড়ী দ্রুতগতিতে শহরের প্রান্ত দিয়া চলিয়াছে। সেই নিরুদ্দেশ পথের দিকে চাহিয়া হাসিমুখে বলিলাম, যেতে রাজি আছি, তবে ঘোড়ার গাড়ী ততদূর যেতে পারবে না।

উত্তরে সে কেবল আমার কাঁধের পাশে মাথা রাখিয়া বলিল, কী সুন্দর তোমার ব্যবহার, বিরিজলালজী ?

বলিলাম, এই কথা তুমি শত শত লোককে বলেছ, রামকুমারী !

রামকুমারীর মুখের হাসি মরিয়া গেল, সে সোজা হইয়া বসিল। মনে হইল সে একটু আঘাত পাইয়াছে। ধীরে ধীরে এক সময় বলিল, সাচ্চি বাত্ শেঠজী।

অনেকদূর পথ অতিক্রম করিয়া একসময়ে রামকুমারীর ইঙ্গিতে টাঙাগাড়ী একটা জনবিরল প্রকাণ্ড বাগানের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। নিকটে একজন অন্ধ ভিক্ষুক বসিয়াছিল। আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া রামকুমারী গাড়ী হইতে নামিল এবং সেই ফুলের টুক্‌রিটা লইয়া বাগানে প্রবেশ করিবার পথে বৃদ্ধ ভিক্ষুককে কিছু ভিক্ষা দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। আমার মনে কেমন একটা সন্দেহ হইল, কিন্তু এই যাত্রার শেষ পরিণতি দেখিয়া যাইবার জন্য আমি নীরবে বসিয়া রহিলাম।

কতক্ষণ বসিয়া রহিলাম, সূর্য্যের আলো দেখিতে দেখিতে উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, পাশ দিয়া দুই একজন সব্জীওয়ালাকে মোট মাথায় লইয়া শহরের দিকে যাইতে দেখিলাম, বার বার হাতঘড়ি তুলিয়া সময় গণিতেছি, কিন্তু রামকুমারী সেই যে গিয়াছে আর দেখা নাই। সমস্তটাই যেন রহস্যময় মনে হইল। আমি ইহার ফাঁদে পড়িয়াছি কিনা তাহাও সভয়ে ভাবিতে লাগিলাম।

একটা হেস্তনেস্ত করিব এই মনে করিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া আমিও বাগানে প্রবেশ করিলাম। পাঞ্জাবের এই রুক্ষ ও ধূসর ভূভাগে এমন একটি বৃক্ষলতাপরিপূর্ণ মধুর বায়ুহিল্লোলিত সুন্দর উদ্যান দেখিব আশা করি নাই। গাছে গাছে প্রভাতী পাখীর কলকাকলী তখনও চলিতেছিল, তখনও দূরে কোথায় শিখগণ গ্রন্থসাহেবের ওঙ্কারধ্বনি তুলিয়া উদাত্তকণ্ঠে প্রভাতী গাজন গাহিতেছিল। আমি যেই পুষ্পলতাচ্ছাদিত বনময় উদ্যানের একটি জলধারা-যন্ত্রের পাশ দিয়া আসিয়া এক সময় স্থির হইয়া দাঁড়াইলাম। যে দৃশ্য দেখিলাম তাহার সহিত চারিদিকের লতাবৃক্ষের শোভা, পাখীগণের প্রভাত-বন্দনা, তরুণ সূর্য্যের রক্তরশ্মি, জলধারাযন্ত্রের অবিশ্রান্ত মর্ম্মরধ্বনি, বায়ুর মধুর স্পর্শ, বনপুষ্পদলের সুগন্ধ-সমারোহ—এই সমস্ত না মিলাইয়া দেখিলে তাহার মূল্য বুঝা যাইবে না। দেখিলাম, একটি শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত পুষ্পাচ্ছাদিত সমাধির উপরে স্বর্ণলতার ন্যায় রামকুমারী পড়িয়া আছে। তাহার সেই নিশ্চল প্রণতি-মূর্ত্তি দেখিয়া আমি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলাম।

অনেকক্ষণ পরে ডাকিলাম, রামকুমারী ?

সে সাড়া দিলনা। কাছে গিয়া সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া তুলিলাম। দেখিলাম অশ্রুপ্লাবিত দুই চক্ষু ; ফুলিয়া ফুলিয়া সে কাঁদিতেছে।

বলিলাম, তুমি ত' হিন্দুর মেয়ে, রামকুমারী ?

সে আর্দ্রকণ্ঠে কহিল, দেবতার পায়ের কাছে কোনো জাত নেই, শেঠজী।

কে আছে এই সমাধিতে ?

আমার প্রিয়। মেরে দেওতা'।

ইহার পরে আর কিছু জানিবার ও বলিবার প্রয়োজন ছিল না। তাহাকে লইয়া বাগানের বাহিরে আসিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। শুনিলাম আজ তাহার প্রিয়ের মৃত্যু তিথি, দুই বৎসর পূর্ব্বে রামকুমারীর সেই প্রণয়ীর মৃত্যু হইয়াছে। এই উদ্যান তাহার সম্পত্তি এবং প্রতি বৎসর তাহার মৃত্যুতিথিতে রামকুমারী বোম্বাই হইতে এখানে আসিয়া ফুল দিয়া যায়। প্রেমিকের মৃত্যুর পর রামকুমারী বোম্বাইতে গিয়া অভিনেত্রীর জীবন যাপন করিতেছে। যে কাহিনীটুকু আহরণ করিলাম তাহা সংক্ষিপ্ত। ধনীর পুত্র তাহার প্রণয়ী পাঞ্জাব হইতে গোয়ালীয়র অরণ্যে ব্যাঘ্রশিকার করিতে গিয়াছিল—রামকুমারী গোয়ালীয়রের কোন্ এক সম্ভ্রান্তবংশের কন্যা—দুর্গপ্রাকারের বাহিরে নৌকাবিহার করিতে গিয়া দুইজনে সাক্ষাৎ হয়—তারপর সে এক মধ্যযুগীয় অত্যাশ্চর্য্য প্রণয়-কাহিনী। কালক্রমে মহাকাল তাহাদের দুইটি জীবনের পটভূমি ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়।

স্টেশনের নিকট আসিয়া আঁচলে চক্ষু মুছিয়া ভারাক্রান্ত-কণ্ঠে রামকুমারী কহিল, কোন্ হোটেলে উঠতে চাও, শেঠজী ?

বলিলাম, না, কোনো হোটেলেই নয়, এবার আমি বিদায় নেবো, রামকুমারী।

লোভের বস্তু আমি যে ছাড়িয়া দিব তাহা সে ভাবে নাই ; মাংসখণ্ডের প্রতি ব্যাঘ্রের আসক্তি নাই ইহাও অপ্রত্যাশিত। বিস্মিত হইয়া সে কহিল, থাকতে চাওনা দুদিন আমার সঙ্গে ?

বলিলাম, না, অশেষ ধন্যবাদ তোমাকে।

পুরুষ হইয়া এমন অবহেলায় তাহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলাম, তাহাতে হয়ত তাহার অহমিকায় কিছু আঘাত লাগিয়া থাকিবে। কিন্তু সে আর মুখ তুলিল না, নতমুখেই কহিল, তোমার উপকার আমি চিরদিন মনে রাখবো, বিরিজলালজী।

বলিলাম, লালসার প্রেরণায় তোমার সঙ্গে আমি এসেছিলাম, উপকার করতে আসিনি। আমাকে মনে রাখবার প্রয়োজন নেই, বরং আমাকেই তুমি ক্ষমা ক'রো, রামকুমারী।

তাহার চোখে পুনরায় উদ্গত অশ্রুর চিহ্ন দেখিলাম। কিন্তু সে আর জবাব দিলনা।

আমি লাহোর হইয়া কাল্‌কায় যাইব, সে দিল্লী হইয়া বোম্বাই যাইবে। তাহার গাড়ী আগে আসিল। আমি তাহার মালপত্র তুলিয়া তাহাকে ভালো জায়গা দেখাইয়া দিলাম।

কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য স্ত্রীলোকের কোমল হৃদয় সহজেই উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠে, রামকুমারী আর কিছু না পারিয়া আমার দুইখানা হাত লইয়া সাষ্টাঙ্গে নত হইয়া নিজের কপালে ঠেকাইল এবং তাহার পর আমি সেখানে আর দাঁড়াইতে পারিলাম না—দ্রুতপদে লাহোরের ট্রেন অনুসন্ধান করিবার জন্য অন্যত্র চলিয়া গেলাম।

শটী

শ্রীপ্রমথনাথ ঘোষ

দেশের বর্ত্তমান আর্থিক দুরবস্থা ও বেকার-সমস্যার কথায় মনে হয়, আমাদের ভাবিয়া দেখা দরকার আমাদের-ই সম্মুখে অজ্ঞাত বা অবজ্ঞাত এমন কিছু আছে কি-না যাহাকে আশ্রয় করিলে হয়ত অন্ন-সমস্যার আংশিক সাহায্যও হইতে পারে। এই কথা ভাবিতে গিয়া মনে পড়ে উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-বঙ্গের পথে-ঘাটে, কাননে-কান্তারে পাহাড়ে-পর্ব্বতে দিগন্ত-বিস্তৃত শটীর বনের কথা। এই অযত্ন-সম্ভূত অজ্ঞাত-প্রায় শটী যুগ-যুগান্ত ধরিয়া জন্ম-মৃত্যুর খেলার সামগ্রী হইয়া লীলা সাঙ্গ করিতেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া লোক-চক্ষুর অন্তরালে প্রকৃতির এই অযাচিত লক্ষ লক্ষ টাকার বনজ বিত্ত ভূগর্ভে হতাদরে বিলীন হইয়া যাইতেছে। অথচ ইহার প্রয়োজনীয়তা যে আমরা মোটেই জানি না এমনও নয়। বহু প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের দেশে শটীর ব্যবহার জানা আছে। শটীর জন্ম-ভূমিতে মেয়েরা অবসর সময়ে তাহাদের স্বকপোলোদ্ভাবিত প্রাচীন পদ্ধতিতে একটু আধটু শটীর পালো প্রস্তুত করিয়া শিশু ও রোগীর পথ্যরূপে অথবা পিষ্টকাদিতে ময়দার পরিবর্ত্তে ব্যবহার করিয়া থাকেন। অবশ্য কোনও কোনও জায়গায় শটী ক্রয়-বিক্রয়ও হয়। ইহার মধ্যে বরিশালই উল্লেখযোগ্য। ব্যবসা-ক্ষেত্রে আমরা যে শটী দেখিয়া থাকি উহার প্রায় সমস্তই বরিশাল হইতে আমদানি করা হয়। পথ্যরূপে ইহার একটু বৈশিষ্ট্য আছে। ইহা একাধারে পথ্য ও ভেষজ। পেটের অসুখে জ্বাল দিয়া ঘন করিয়া খাওয়াইলে অথবা কোষ্ঠকাঠিন্যে পাতলা করিয়া খাওয়াইলে সঙ্গে সঙ্গে উপকার দর্শে, বসন্তের প্রতিশেধক বলিয়া আবিরের মধ্যেও ইহা প্রাচীনকাল হইতেই দোলোৎসবের অপরিহার্য্য অঙ্গরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। গৃহস্থরা তাহাদের গরুর পেটের অসুখে এই শটীর পালোই আবির রূপে ভাতের মাড়ের সহিত খাওয়াইয়া উপকার পায়। হিন্দুস্থানীরা ইহাকে 'কচুর' বলে। তাহারাও বসন্তের মর্ম্মন্তুদ গাত্রদাহে ইহা গায়ে মাখিলে যে গাত্রদাহের উপশম হয় তাহা বিশেষ রূপেই জানে।

অন্যত্র, এমন কি, কোন কোনও স্থানে শটীর জন্ম-ভূমিতেই, কলিকাতা হইতে আনীত কাগজের বাক্সে ভরা শটীর পালো প্রতি সের আট আনা, দশ আনা দরে বিক্রীত হইলেও অজ্ঞতা প্রযুক্ত সেই স্থানেই শটীর বন ব্যাঘ্রের আবাসভূমি রূপে অথবা অপরাজেয় বলিয়া ভীতির কারণ হইয়া রহিয়াছে। উত্তর ও পূর্ব্ব-বঙ্গের বহুস্থানে আবাদের উপযুক্ত ভূমিতেও উহার দৌরাত্ম্য এমনই উৎকট যে শস্য উৎপাদন অসম্ভব হইয়া জমি পতিত থাকিতে বাধ্য হয়। অনেক স্থানে ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে বাঁধের সাহায্যে বৃষ্টির জল আটকাইবার পরে ক্ষেত চাষ করিয়া আবদ্ধ জলের সাহায্যে শটী পচাইয়া ধ্বংস করার পর জমি আবাদ করা সম্ভব হয়। স্থানবিশেষে শটী নির্ম্মূল করিবার অভিপ্রায়ে এই অঙ্গীকারে জমি বর্গা দেওয়া হয় যে, বর্গাদার এক বৎসরে জমির শটী ধ্বংস করিয়া পরবর্ত্তী দুই বৎসর উহার সম্পূর্ণ শস্য ভোগ করিবার অধিকারী হইবে। অজ্ঞতা হেতু ও উপযুক্ত উপায় অভাবে এমন মূল্যবান জিনিষের এমন দুর্গতি।

বর্ত্তমানে মেয়েরা এক খণ্ড টিন তার-কাটা লোহার সাহায্যে চালুনীর ন্যায় ছিদ্র করিয়া উহার ধারাল পৃষ্ঠে শটী ঘসিয়া ঘসিয়া কাটিয়া থাকে। পরে কর্ত্তিত অংশ জলে বার বার ধুইয়া উহার শ্বেত-সার বাহির করে। এই উপায়ে প্রস্তুত করিতে টিনের ধারাল পৃষ্ঠে লাগিয়া অঙ্গুলি ক্ষত-বিক্ষত হইবার ভয়ে শটী অর্দ্ধেক কর্ত্তিত হইবার পরেই অবশিষ্টাংশ পরিত্যক্ত হয়। যে পরিমাণ আয়াস স্বীকার করিয়া শটী মাটির নীচ হইতে সংগ্রহ করা হয় ও পরিষ্কার করা হয়, তাহাতে অকর্ত্তিত অর্দ্ধাংশ ফেলিয়া দেওয়া যে কতটা ক্ষতিজনক তাহা সহজেই অনুমেয়। কেহ কেহ শটী ঢেঁকিতে কুটিয়া পালো বাহির করিয়া থাকেন। এই উপায়ে পালো যেমন অপরিষ্কৃত হয় পরিমাণেও তেমনই অনেক কম বাহির হয়। কাহারও কাহারও মতে টিনে ঘসিয়া যে পরিমাণে পালো পাওয়া যায় ঢেঁকিতে কুটিলে তাহার দুই-তৃতীয়াংশেরও কম বাহির হয়। এই সব কারণে শটীর পালো অতি অল্প মাত্রায়

উৎপাদিত হয় বলিয়া বাণিজ্যক্ষেত্রে ইহার প্রয়োজনীয়তার তুলনায় উপযুক্ত স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইতেছে না। ইহার আরও একটি লক্ষ্য করিবার বিশেষ দিক আছে। এই পালো কার্ত্তিক মাস হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিবার সময়। ইহার আগে বা পরে শটীর কন্দে এই শ্বেত-সারের অস্তিত্ব দেখা যায় না। অথচ এই সময় বিশেষ করিয়া শেষের তিন মাস, সাধারণ গৃহস্থের হাতে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনও কাজ থাকে না এবং অর্থাভাবও এই সময়ই বিকটাকার দেখা দেয়। বর্ত্তমান পদ্ধতিতে শটীর পালো উৎপাদন করা গুরুতর আয়াসসাধ্য ও লতাহীন বলিয়া পুরুষেরা এদিকে প্রায় লক্ষ্যশূন্য। এই জন্যই অবসর সময়ে মেয়েরা যেটুকু পালো তৈয়ার করেন সেই পালোর জন্য শটী সংগ্রহ করিতে তাঁহাদিগকে পুরুষের করুণার উপরে নির্ভর করিতে হয়।

যদি কোনও সহজ-লভ্য ও সহজে মেরামত করার উপযুক্ত জটিলতাহীন যন্ত্র-সাহায্যে অনায়াসে অধিক পরিমাণে শটীর পালো উৎপাদন করা সম্ভব হয় তবে বিদেশাগত এরারুট, ফেরিনা (Farina), ডেক্‌স্‌ট্রিন (Dextrin), সাগুর ময়দা (Sago flour), আলুর ময়দা (Potato flour) প্রভৃতির সহিত মূল্যে ও কার্য্যকারিতায় এই শটী অনায়াসে প্রতিযোগিতা করিয়া বহু বেকারের অন্ন-সংস্থানে সমর্থ হইবে। কেবল শিশু ও রোগীর পথ্য রূপে নয়, এরারুটের পরিবর্ত্তে উচ্চাঙ্গের বিস্কুটে অধিকতর কার্য্যকরী রূপে এই শটীর পালো ব্যবহৃত হইবে এবং নিত্য ব্যবহার্য্য ময়দার স্থান বহুল পরিমাণে অধিকার করিতে পারিবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, একমাত্র শটীর পালোই আবিরের মূল উপাদান। কিন্তু দুর্ম্মূল্যতা হেতু ব্যবসায়ীরা শটীর পালোর পরিবর্ত্তে অপেক্ষাকৃত অল্প দামের এরারুট ময়দা ও আলুর ময়দার সহিত রং মিশাইয়া বর্ত্তমানে আবির প্রস্তুত করিয়া থাকে। শটীর পালো সহজ-লভ্য হইলে ইহা দ্বারা যেরূপ খাঁটি আবির প্রস্তুত হইতে পারিবে, তেমনই মূল্যের স্বল্পতা হেতু আবিরও অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া বসন্তের প্রতিষেধক রূপে সকলেরই কল্যাণসাধন করিতে সমর্থ হইবে।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের বাৎসরিক বৈদেশিক বাণিজ্য-বিবরণী হইতে জানা যায়—পোল্যাণ্ড, জার্মানী, বেলজিয়াম, ফ্রান্স এবং অন্য আরও দেশ হইতে শ্বেত-সার (starch), ফেরিনা, আলুর ময়দা, সাগুর ময়দা ও ডেক্‌স্‌ট্রিন প্রভৃতি মুখ্যত কাপড়ের কলে ও কাগজের কলে ব্যবহারের জন্য নিম্নলিখিত হারে বৃটিশ ভারতবর্ষে আমদানি করা হইয়াছিল :

সন	পরিমাণ	মূল্য
১৯৩৪—৩৫	৩, ৬৩, ৬৮০ হন্দর	২৬, ০৮, ০২৬ টাকা
১৯৩৫—৩৬	৩, ৩৭, ০৬২ „	২৫, ৮৩, ০২৭ „
১৯৩৬—৩৭	৩, ৬৫, ৫৩৫ „	২৭, ৮৪, ০৩৪ „

ইহার মধ্যে একমাত্র বাংলার ভাগে পড়িয়াছে নিম্নলিখিত হারে :

সন	পরিমাণ	মূল্য
১৯৩৪—৩৫	১, ৪৪, ৩২৪ হন্দর	৯, ৩২, ৬০১ টাকা
১৯৩৫—৩৬	১, ৮৬, ০৪০, „	১১, ৮২, ৫২১ „
১৯৩৬—৩৭	১, ৯৪, ৪০৫, „	১২, ৯১, ৯২৬ „

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের বৃটিশ ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য-বিবরণী হইতে জানা যায়, ১৯৩৮এর ১লা এপ্রিল হইতে ৩০এ নভেম্বর পর্য্যন্ত ৮ মাসে ৪,২১,৮২০ টাকা মূল্যের ৬৪,৯৪১ হন্দর ঐ সমস্ত দ্রব্য আমদানি করা হইয়াছে। পূর্ব্বে এ দেশে মাড় প্রস্তুত করার সমস্ত দ্রব্যই বিদেশ হইতে আমদানি করা হইত। কিন্তু ইদানিং মাড় প্রস্তুতের ২।-টী ছোট-খাট কারখানা গড়িয়া উঠিলেও এখনও উপরোক্ত হারে আমদানি করা হইতেছে। সুতায় মাড় রূপে যে সমস্ত দ্রব্য ব্যবহৃত হয় উহাদের মধ্যে যাহারা বায়ু হইতে জলীয় অংশ শোষণ করিতে পারে তাহারাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। শটীর পালোর এই বিশেষ গুণ থাকায় উহা অধিকতর দামী ফেরিনা প্রভৃতির পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ফেরিনাও শটীর ন্যায় কন্দ-প্রসূত শ্বেত-সার। শটী কাপড়ের কলে ফেরিনার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইলে উহা বর্ত্তমানের ন্যায় বিশেষ সাবধানতার সহিত পরিষ্কৃত করিতে হইবে না। কাজেই উৎপাদনের পরিমাণ বহুগুণে বাড়িয়া যাইবে। গতানুগতিক শিশু ও রোগীর পথ্যের দিক ছাড়িয়া বিস্কুটের কারখানা কাপড় ও কাগজের কল প্রভৃতি সুবিস্তৃত ক্ষেত্রের কথা ভাবিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। যে দিক দিয়াই বিবেচনা করা যাউক না কেন, শটীর ভবিষ্যৎ যে সমূহ উজ্জ্বল, তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। এখন এদিকে কাহারও

তেমন লক্ষ্য না থাকায় নামান্য যে কয়জন ব্যবসায়ী ইহার ব্যবসায়ে রত আছেন তাঁহারা মফঃস্বলে অতি নামমাত্র মূল্যে কিনিয়া একমাত্র পথ্যরূপে বিক্রয় করিয়াই প্রভূত লাভবান হইতেছেন।

এই সব বিষয় বিস্তারিত অবগত হইয়া যাহাতে সহজে বেশী উৎপাদন করা যায় তাহার উপযুক্ত কল-কারখানার অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাই, বাজারে কেবল শটী তৈয়ার করার জন্যই কোনও কল নাই। তবে ঐ কাজ করা যাইতে পারে এমন কল যাহা দেখিয়াছি তাহা মূল্যাধিক্য হেতু শটীপ্রস্তুতকারী সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে একান্ত অলভ্য। উপরন্তু উহার কোনও একটি অংশ হারাইলে বা নষ্ট হইলে বিদেশ হইতে অর্ডার দিয়া না আনাইলে আর পাওয়ার উপায় নাই। তাহাতেও যে সময় লাগিবে তাহা প্রাগুক্ত পালো উৎপাদনের নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরমায়ুতে কুলাইবে না। যে দেশে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড, লোকাল বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটীর ন্যায় মহামহিম প্রতিষ্ঠানেরও টিউব-ওয়েলের ন্যায় অতি সাধারণ জিনিষের একটা বল্টু বা মহুরি স্থানচ্যুত হইলেও অনেক স্থলেই বহু মূল্যের ও বহু পরিশ্রমের টিউব-ওয়েলটি অকেজো অবস্থায় চিরতরে ভূগর্ভে লয় পায় সে দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কুটিরশিল্পে দামী ও জটিলতাপূর্ণ মেসিনের স্থান কোথায়? শটী প্রস্তুতকারীদিগের আর্থিক ও কারিগরী বুদ্ধির যেরূপ অভাব তাহাতে এমন কিছু হওয়া দরকার যাহা তাহারা স্থানীয় সহজ-প্রাপ্য জিনিষে গ্রাম্য সূত্রধর দ্বারা অনায়াসে মেরামত করাইতে পারে। এই সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া আমি সাধারণ কাঠ, টিন, তার-কাটা প্রভৃতি দিয়া স্থানীয় সূতার মিস্ত্রী দ্বারা দুইটি মেসিন প্রস্তুত করাইয়াছি। উহার একটি শটীর কন্দগুলি প্রাথমিক পরিষ্কার করিবার জন্য এবং অপরটি কাটিবার জন্য। হাতে ঘসিয়া সমস্ত দিনের গুরুতর পরিশ্রমেও একজনের পক্ষে যে স্থলে এক পোয়া বা দেড় পোয়ার বেশী উৎপাদন করা সম্ভব নয়, এই মেসিনে সে স্থলে ঘণ্টায় দুই সের অনায়াসে তৈয়ার করা যাইবে। ইহা ঘরে ঘরে কুটির শিল্পরূপে অবসর সময়ে হাতে চালাইবার উদ্দেশ্যেই প্রস্তুত করা হইয়াছে। কেহ ইচ্ছা করিলে আখের কলের ন্যায় কতকগুলি কল ভাড়া দিয়া ভাড়া স্বরূপ শটী অথবা নগদ টাকা লইয়া লাভজনক ব্যবসা করিতে পারেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শটীর ব্যবসাও চালাইতে পারেন। ইহাতে দরিদ্র উৎপাদনকারীদের আর মেসিন কিনিবার মূলধনের ভাবনা ভাবিতে হইবে না।

অনায়াস-লভ্য উপাদানে গঠিত বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, মেসিনটি খেলনা জাতীয়। শটীর মধ্যে পার্ব্বত্য শটীই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ও বৃহৎ। উহার শিকড়-গুলিও স্থূল ও শক্ত। আমি এই পার্ব্বত্য শটীই এই কলে অনায়াসে কাটিয়াছি। উহাদের অধিকাংশই ওজনে পাকার তিন ছটাক ছিল। এখানে শটী সম্বন্ধে একটু না বলিলে ত্রুটি থাকিয়া যাইবে মনে করি। শটী হরিদ্রা জাতীয় গাছ। দেখিতে হরিদ্রা গাছের সহিত কোনই প্রভেদ নাই। উহার কন্দও দেখিতে অবিকল হরিদ্রার ন্যায়। ইহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—এক জাতীয়ের কন্দের ভিতরের রং সম্পূর্ণ সাদা; ইহাতেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী শ্বেত-সার দেখা যায়। আর এক জাতীয় কন্দ হরিদ্রাভ সাদা; ইহাতে পালোর ভাগ পূর্ব্বোক্ত জাতীয় হইতে অপেক্ষাকৃত কম। অবশিষ্ট জাতীয় শটী দেখিতে অবিকল হরিদ্রার ন্যায় রং বিশিষ্ট; ইহাতে পালোর ভাগ উপরোক্ত দুই জাতি অনেক কম। শটী এবং হরিদ্রা, উহাদের বিশিষ্ট গন্ধ দ্বারাই নিরূপিত হয়।

উপসংহারে আমি বাংলা গবর্ণমেণ্টের ডিরেক্টর অব ইণ্ডাষ্ট্রিজ্ মহোদয়ের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিতে চাই। ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর মাননীয় এ, টি, ওয়েস্টন্ সাহেব এখান হইতে চলিয়া যাওয়ার কিছুদিন পূর্ব্বে আমি তাঁহার নিকট এ বিষয়ে এক বিস্তারিত পত্র লিখিয়া আশাতীত অল্প সময়ের মধ্যেই খুবই আন্তরিকতাপূর্ণ উত্তর পাই। তাহাতে তিনি তাঁহার সহিত দেখা করিতে লিখিয়াছিলেন ও মেসিন স্থায়িত্বে এবং কার্য্যকারিতায় উপযুক্ত হইলে সাহায্য দেওয়ার ইঙ্গিত ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অপরিহার্য্য কারণে তাঁহার সহিত আর দেখা করা সম্ভব হয় নাই। সেই লক্ষ্য করিয়াই কিছুদিন আগে বর্ত্তমান ডিরেক্টর বাহাদুরের নিকট প্রাগুক্ত দুই পত্রের নকলসহ এক পত্র দেই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এমন কি প্রাপ্তি স্বীকারটা পর্য্যন্ত, স্মারকলিপি দেওয়ার পরেও এ পর্য্যন্ত ভাগ্যে জুটিয়া উঠিল না। ইণ্ডাষ্ট্রিজ্ ডিপার্টমেণ্ট যেরূপ উৎকট উৎসাহে পুতুল তৈয়ারি, ছাতা তৈয়ারি, বাঁশের কাজ প্রভৃতি নানা জাতীয় কাজে মহড়া দিতেছেন তাহাতে শটী সম্বন্ধে একটু অবহিত হইলে যে সময়ের ও স্বার্থের অপব্যবহার হইবে এমন মনে করিবার কারণ দেখি না। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় ও ইণ্ডাষ্ট্রিজ্ ডিপার্টমেণ্টের হাতে এই সব বিষয়ে যে পরিমাণ ব্যাপক ক্ষমতা, তাহাতে তাঁহারা এ বিষয়ে অগ্রণী হইলে দেশের একটি বড় সমস্যার সমাধান হইবে বলিয়া আশা করি।

প্রতিবাদ

স. চ.

"ভারতবর্ষের" বৈশাখ, (১৩৪৬) সংখ্যায় শ্রীযুত ক্ষেত্রনাথ রায় "সর্প" নামক প্রবন্ধের একস্থানে (৭৫৬ পৃঃ) লিখিয়াছেন—"শ্রবণের নিমিত্ত সর্পের কর্ণ নাই, শ্রবণেন্দ্রিয়ের কার্য্য ইহারা জিহ্বা দ্বারা সম্পন্ন করে।"

সর্পের কর্ণ নাই ইহা সত্য, কিন্তু কর্ণের অভাবে ইহারা জিহ্বা দ্বারা শ্রবণ কার্য সম্পন্ন করে, লেখকের এই উক্তির আমরা প্রতিবাদ করিতেছি। সর্প শুনিতে পায়, কোনো প্রাণীতত্ত্ববিদ্ একথা স্বীকার করিবেন না; সর্বপ্রকার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদ্বারা তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, শ্রবণযন্ত্র না থাকায় সর্প চির-বধির। সুতরাং সর্প গান শুনিতে ভালোবাসে, বাঁশীর মধুর সুরে মুগ্ধ অথবা সম্মোহিত হইয়া যায়, প্রচলিত এই বিশ্বাসকে বৈজ্ঞানিক যুক্তি অথবা প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করা যায় না। সুমধুর সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া সর্প উপস্থিত হইয়াছে এই প্রকারের জনশ্রুতি ভৌতিক গল্পের ন্যায় প্রায়ই আমাদের গোচরে আসে, কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন, ইহা অসম্ভব; যে বদ্ধকালা সে আবার গান শুনিবে কি করিয়া?

যে কোনো প্রামাণিক গ্রন্থে ক্ষেত্রনাথবাবু নাগজাতির বধিরতার উল্লেখ দেখিতে পাইবেন। সর্প আমাদের ভয়ংকর শত্রু। সুতরাং সাধারণের মন হইতে ইহার সম্বন্ধে এই ভ্রান্ত ধারণাটি দূর করিবার চেষ্টাও বিজ্ঞানীরা করিয়াছেন। পাঠ্যপুস্তকেও ইহাদের এই বধিরতার উল্লেখ দেখা যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীতত্ত্ববিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ হিমাদ্রিকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিতেছেন—"সাধারণ লোকের ধারণা জিহ্বা দিয়া ইহারা (সর্প) শুনিতে পায়, কিন্তু তাহা ঠিক নয়। জিহ্বা দিয়া শুনিবার কাজ মোটেই চলিতে পারে না" (প্রকৃতি পরিচয়, ২য় ভাগ, ১১৬ পৃঃ)। সর্প বিষয়ে বিশেষজ্ঞ খ্যাতনামা পণ্ডিত Dr. Boulenger বলিয়াছেন—সর্পের কোনো শ্রবণ যন্ত্রই নাই। সাপুড়ের বাঁশী তাহার ব্যবহার একটা ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। সাপের এই তথা-কথিত মুগ্ধতা আপনাআপনিই সাধিত হয়, ইহার সহিত বাদ্যসঙ্গীতের কোনও সম্পর্ক নাই। বিষয়টি তাঁহার নিজের কথায় শুনিলে আরও পরিষ্কার হইবে—

Since the snake is virtually without a hearing apparatus, the gourd flute which usu lly accompanies a charmer's display is regarded as a piece of professional bluff, the so-called dancing being usually performed independent of the Orchestral accompaniment. (Natural History, by Tate Regan, Director, British Museum. P 384-385.)

প্রতিবাদের উত্তর

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

প্রত্যক্ষ পরীক্ষা-নিরীক্ষার অসৌকর্য্যতা বশতই হয়ত এ সমস্যা আজও অমীমাংসিত, আর তাহারই ফলে আমাদের মত জিজ্ঞাসুদের এ হেন বাদ প্রতিবাদ।

প্রথমেই বলিয়া রাখি কি সাহিত্য, কি রাজনীতি, কি বিজ্ঞান কোথাও সকলের মত সকল বিষয়ে এক হইতে পারে নাই। সাহিত্য ও রাজ-নীতির মতভেদ দৈনন্দিন ব্যাপার। বিজ্ঞানেও এ জিনিষের অভাব নেই। গুরুতর ব্যাপারে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদেরও মতভেদ শোনা যায়।

সর্পের কোন কোন বিষয় লইয়াও প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে।

প্রতিবাদী প্রসঙ্গক্রমে হিমাদ্রিবাবু ও Dr. Boulengerএর মত উল্লেখ করিয়াছেন। হিমাদ্রিবাবুর মত প্রতিবাদী যেভাবে উল্লেখ করিয়া-ছেন তাহা অস্পষ্ট অর্থাৎ তাহা পড়িয়া এই সত্যে উপনীত হওয়া যায় না যে, সর্প চিরবধির (প্রতিবাদীর যাহা বলিবার উদ্দেশ্য)। সাধারণ লোকের যে একটা ধারণা আজ বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে যে, সর্প জিহ্বা দ্বারা শুনিতে পায়—এই ধারণার বিরুদ্ধেই প্রতিবাদস্বরূপ হিমাদ্রিবাবু বলিয়াছেন "জিহ্বা দিয়া শুনিবার কাজ মোটে চলিতে পারে না।" এখানে চিরবধিরতার উল্লেখ কোথায়? জীবজগতে কোন কোন জীব অবশ্য প্রয়োজনীয় ইন্দ্রিয় হইতে বঞ্চিত হয়, সেই জন্য তাহারা অন্য উপায়ে সেই ইন্দ্রিয়ের কার্য্য করিয়া লয়। সর্পের কর্ণ নাই সুতরাং ইহারা যে একেবারে শুনিতে পায় না ইহা হিমাদ্রিবাবুর উল্লিখিত মতের মধ্যে পাওয়া যায় না। জানি না ইহার পর তিনি আরও কিছু লিখিয়াছেন কি না, যাহার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার বক্তব্যের উল্লেখ করিয়াছেন। সর্পের জিহ্বা দ্বারা শ্রবণ কার্য্য সম্পন্ন—সাধারণের এই ধারণার উপর হিমাদ্রি-বাবুর আস্থা নাই; কিন্তু সর্প যে জিহ্বা দ্বারা শ্রবণ করে তাহা প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক অনুমোদিত প্রাথমিক বিজ্ঞান পুস্তকের লেখক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় উল্লেখ করিয়াছেন—"...জিভ দিয়াই সাপ কানের কাজ করে। সাপের ঠোঁটের মধ্যে একটি ফুটা আছে। সেই ফুটা দিয়া সাপ জিভটি সর্বদা বাহির করিয়া, কোথায় কোন শব্দ হইতেছে তাহা শুনিয়া লয় এবং এই জিভ বাহির করিয়াই তাহার সম্মুখে কোন জিনিষ আছে কি না জানিয়া লয়।" (—"প্রকৃতিপাঠ" পৃষ্ঠা ৮৮)

অবশ্য যাঁহারা সর্পের শ্রবণ শক্তি আছে বলিয়া বিশ্বাস করেন তাঁহাদের মধ্যেও দুই মত পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর লোক বলেন, সর্প শ্রবণ করে জিহ্বার সাহায্যে—আর একশ্রেণী বলেন চক্ষু সাহায্যে। আর সেই জন্যই সর্পের অপর নাম "চক্ষুঃশ্রবা"। অভিধানে এই শব্দ ও তাহার অর্থ পাওয়া যায়।

খ্যাতনামা ডাঃ রায় বাহাদুর শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এসসি, এম-বি, বি-এস লিখিয়াছেন—

"সাপের কাণ নাই। ঐ যে তাহাদের জিহ্বাখানি অনবরত লক্ লক্ করিতেছে দেখিতে পাও, ঐ জিভ দিয়াই তাহারা শব্দ বুঝিতে পারে।"

"শিশুভারতী" পৃষ্ঠা ১৮৩৩।

"তাহা ছাড়া আমাদের আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে এইরূপ উপদেশ আছে যে রাত্রিকালে ও দিনের বেলা ছাতা এবং ঝন্ ঝন্ ও ঝুন ঝুন শব্দ করে এমন লাঠি হাতে করিয়া পথে চলিবে। তাহা হইলে ছায়া ও শব্দে ভয় পাইয়া সাপেরা পলাইয়া যাইবে। "শিশুভারতী" পৃষ্ঠা ১৮৩৮।

Clude E. Benson তাঁহার সর্পবিষয়ক প্রবন্ধে সর্পের কর্ণ নাই উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু লেখার মধ্যে চিরবধিরতার কথা না পাইয়া হতাশ হইয়াছি। সর্পবিষয়ক প্রবন্ধে বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিদ Dr. Burgess Barnettও সর্পের চিরবধিরতার কথা উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার লেখায় পাই—"The belief, however, that snakes respond to musical sounds is ancient and widespread. "The deaf adder (বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের একজাতীয় সর্প) that stoppeth her ear, which will not hearken to the voice of the charmer's was considered an exception by the psalmist." এ ছাড়া "Pliny and seneca believed that snakes could be drawn away from their lairs by the seductive power of music." আমাদের দেশেও অনুরূপ ঘটনার উল্লেখ আছে। সর্প যে চিরবধির নহে তাহা আরও বহু লেখকের লেখায় উল্লেখ পাই।

প্রতিবাদী একস্থানে বলিয়াছেন "সুমধুর সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া সর্প উপস্থিত হইয়াছে···কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন, ইহা অসম্ভব।" ইহা ছাড়া তিনি পণ্ডিত Dr. Boulenger-এর মত উল্লেখ করিয়াছেন "—সর্পের কোনো শ্রবণ যন্ত্রই নাই। সাপুড়ের বাঁশী তাহার ব্যবসার একটা ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়"—অনেকের সহিত এই উক্তিরও যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে। আমাদের দেশে সুমধুর সঙ্গীতে সর্প যে আকৃষ্ট হয়—ইহা বহু দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। এইরূপ একটি বহু দিনের প্রচলিত মতবাদকে একেবারে উড়াইয়া দিতে পারা যায় না। কিন্তু এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। কেননা সর্প যে বাঁশীর সুরে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে—এইরূপ কোন কথা আমি আমার প্রবন্ধে লিখি নাই।

এইরূপ একটি জটিল ব্যাপারের সঠিক মত প্রতিবাদকারীর জানিবার ইচ্ছা সত্যসত্যই প্রশংসনীয়।

তোমারে বাসিব ভাল

শ্রীদুর্গাদাস ঘোষাল

তোমারে বাসিব ভাল
দুনিয়ার সব কিছু চেয়ে ;
স্মরিতে তোমার কথা,
দু নয়নে অশ্রু যাবে বেয়ে।

তোমারে ডাকিতে প্রভু
কণ্ঠরোধ হ'য়ে যাবে মোর,
স্তব্ধ হবে ভাষা যত
তব প্রেমে হইয়া বিভোর।

চেতনা হারাবে হৃদি
থর থর দেহের কম্পন,
পুলকে ভরিবে প্রাণ,
ধ্যানে আঁখি মুদিব যখন।

সকল করম মাঝে
সারা প্রাণ তোমাতে সঁপিয়া,
তোমারি আদেশে জানি
বিশ্বপথে চলিব ছুটিয়া।

কান্না হাসি জীবনের—
প্রতি স্তরে প্রতিটি স্পন্দনে,
প্রেমের ফুল্‌গুটি তব
ব'য়ে যাবে নীরব গোপনে।

সুখ দুঃখ নাহি কিছু
সারা বিশ্ব মূরতি তোমার
তোমারে বাসিব ভাল
তোমা সনে হব একাকার।

বিবিধ-প্রসঙ্গ

ছত্রাক ও তাহার স্বজাতি

শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়

প্রকৃতির রাজ্যে কত যে বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ রহিয়াছে তাহা গণনায় শেষ করা যায় না। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, আদিম যুগে উদ্ভিদ ও প্রাণী একত্রে জলাশয়ে বাস করিত। সেই সময় তাহাদের বিচ্ছিন্নভাবে গণ্য করা হইত না। তাহার পর কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের জীবনযাত্রা-প্রণালী পৃথকরূপ ধারণ করায় একদল উদ্ভিদ নামে এবং অপরদল প্রাণী নামে অভিহিত হইল। উভয়ের জীবনযাত্রা প্রণালী পৃথক হইলেও উভয়েই উভয়ের প্রতিবেশী। প্রাণীজগতকে জীবন ধারণের জন্য পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়। প্রাণীজগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানবজাতি আজ যে সভ্যতার সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছে তাহার চতুর্দ্দিকে উদ্ভিদ জগতের প্রভাব রহিয়াছে। যাহার অভাবে মানবের জীবনযাত্রা অচল হইয়া পড়ে সেই একান্ত পরোপকারী প্রতিবেশী উদ্ভিদ-জাতির জীবনযাত্রা ও গুণাগুণের বিষয় আমাদের জানিয়া রাখা বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু পৃথকভাবে বিভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ সম্বন্ধে গবেষণা বা আলোচনা সম্ভবপর নয়। সেই জন্য উদ্ভিদবিদগণ সপুষ্পক ও অপুষ্পক এই দুই শ্রেণীতে সমস্ত উদ্ভিদ জগতকে ভাগ করিয়াছেন। এই দুই শ্রেণী আবার কয়েকটী উপ-শ্রেণীতে বিভক্ত। সপুষ্পক শ্রেণীর উদ্ভিদের ফুল ফল হয়। ইহারা উচ্চশ্রেণীর। অপুষ্পক নিম্নশ্রেণীর উদ্ভিদ। ফুল ফল ইহাদের হয় না; একপ্রকার বীজরেণু (Spore) দ্বারা বংশ বৃদ্ধি হয়। আবার এই শ্রেণীর উদ্ভিদের অনেকের কাণ্ড মূল প্রভৃতি থাকে না। অপুষ্পক শ্রেণীর উদ্ভিদ আবার ছত্রাক (Fungi) শৈবাল, মস ও ফার্ণ এই কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত। আমাদের আলোচ্য ছত্রাক বা ছাতা ও তাহার স্বজাতি অপুষ্পক শ্রেণীর উদ্ভিদ। বর্ষাকালে গাছ, গাছের পাতা, ভিজা জুতা, পচা ফল, পুরাতন আচার, দোয়াতের কালি, পুরানো ভিজা খড় ও গোবর প্রভৃতির উপর নানা আকারের ছাতা পড়িতে সকলেই দেখিয়াছেন। এই সকল ছত্রাক বিভিন্ন আকৃতিতে জন্মলাভ করিয়া নিজ নিজ জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে। পৃথিবীতে বহু প্রকারের ছত্রাক দেখা যায়। এই সকল ছত্রাক গোত্রের মধ্যে ক্লোরোফিল (সবুজ পত্র) ও শ্বেতসার পদার্থের সম্পূর্ণ অভাব লক্ষিত হয়। সেইজন্য ইহারা পরজীবী (Parasites) অথবা মৃতজীবী (Saprophytes) হয়। কয়েক শ্রেণীর ছত্রাক এত ক্ষুদ্র যে তাহাদের চোখে দেখিতে পাওয়া যায় না। দেহের আকারের পার্থক্য হেতু ছত্রাক উদ্ভিদকে

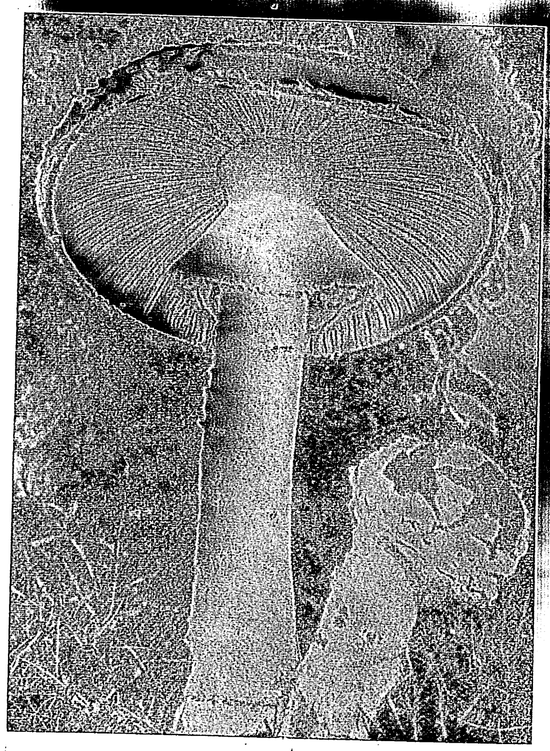

বিবাক্ত ব্যাঙের ছাতা। টুপির নিম্নদেশে গিল (gill) ও দণ্ডে অঙ্গুরীয়ক দেখা যাইতেছে। টুপির উপরিভাগ রঞ্জিত এবং আঁইসযুক্ত।

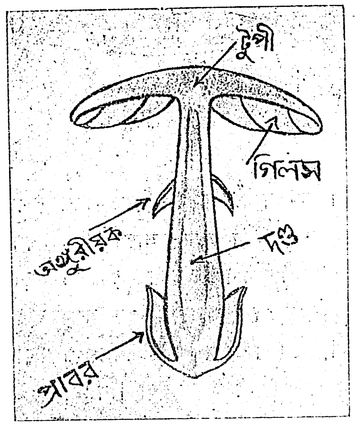

ছত্রাকের দেহ।

উদ্ভিদবিদ্‌গণ প্রধান চারভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(১) আরচিমাইসিটিস (Archimycetes) (২) ফাইকোমাইসিটিস (Phycomycetes)—আলু ও রুটীর উপর এই শ্রেণীর ছাতা পড়ে। (৩) এসকোমাইসিটিস (Ascomycetes) ও (৪) ব্যাসিডিওমাইসিটিস (Basidiomycetes)-ব্যাঙের ছাতা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ব্যাসিডিওমাইসিটিসকেও উদ্ভিদবিদগণ এগার ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—(১) এগারিকস (২) পলিপোরস (৩) ট্রেমেল্লা (৪) লাইকোর্পাডন (৫) হিডনম (৬) থিলিফোরা (৭) ক্লাভেরিয়া (৮) ফ্যালাস (৯) সক্লেরোডার্মা (১০) হাইমেনোগেসটার (১১) নিডিউলেরিয়া। ইহাদের মধ্যে এগারিকস বংশ অর্থাৎ ব্যাঙের ছাতাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ষাকালে গোচারণভূমি, পুরাতন খড়ের উপর ছাতা (Umbrella) আকারে যে ছত্রাক দেখা যায় তাহা ব্যাঙের ছাতা নামে পরিচিত। ইহারা উদ্ভিদবিদগণের নিকট ও সহর অঞ্চলে ব্যাঙের ছাতা নামে পরিচিত হইলেও বাংলার পল্লীগ্রাম অঞ্চলে ইহাদের ছাতু বলে। কোন কোন জেলায় আবার কোঁড়ক নামেও অভিহিত হয়। লম্বায় (ডাঁটা সমেত) ছয় সাত ইঞ্চির উপরও হইতে দেখা যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ছত্রাক বীজরেণু দ্বারা বংশ বিস্তার করে। ছত্রাকের বিভিন্ন শ্রেণী অনুসারে বীজরেণুর আকারও বিভিন্ন

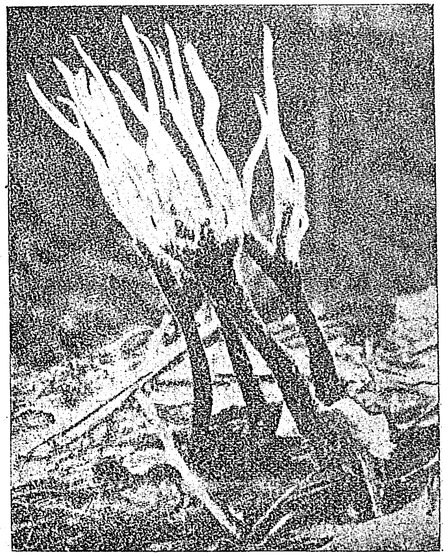

মৃগ-শৃঙ্গ (Stag's horn) ছত্রাকের জন্ম বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে। পুরাতন কাঠের উপর ইহাদের পাওয়া যায়। দণ্ডের রং কাল ও অগ্রভাগ শ্বেতবর্ণ।

বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের এক জাতীয় আহার্য্য-ছত্রাক আহার্য্য ছত্রাক হইলেও ইহাদের গিল শ্বেত বর্ণের।

মাটির তারা (Earth Star). বাঙ্গলা দেশের কুড়কুড়ি ছাতু। জঙ্গলে এই শ্রেণীর আহার্য্য-ছত্রাক পাওয়া যায়।

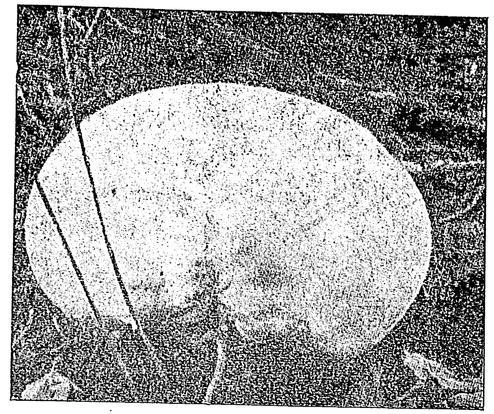

লাইকোর্পাডন বংশের বৃহৎ ছত্রাক (লাইকোর্পাডন জাইগানটিয়াম)। বাঙ্গলা দেশে এই জাতীয় আহার্য্য ছত্রাক কদাচিৎ গৃহস্থ বাড়ীতে জন্মাইতে দেখা যায়।

হয়। উপযুক্ত স্থানে ও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার মধ্যে বীজরেণুর উপরিভাগের আবরণ (Volva) হইতে ছত্রাক মুক্ত হইয়া দণ্ডাকারে ঊর্দ্ধে বর্দ্ধিত হয়। দণ্ডের উপরিভাগের অপরিণত অংশ যথাসময়ে ছাতার ন্যায় বিস্তৃত হয়। ছত্রাকের মূল শিকড় (Real roots) থাকে না। বীজরেণু হইতে অতি সূক্ষ্ম আকারের অনুসূত্র বাহির হইয়া মৃত্তিকার চতুর্দ্দিকে দেহ বিস্তার করে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে ছত্রাকের আশ্চর্য্যরূপ বংশ বিস্তার হয়। কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে যে স্থানে কোন ছত্রাকের চিহ্ন ছিল না, সেই স্থানে কিছু সময়ের মধ্যে অসংখ্য ছত্রাকের আবির্ভাব সম্ভব হয়। দণ্ডের (ডাঁটার) উপরিভাগের টুপি (ছাতার উপরিভাগের আকারের ন্যায় আচ্ছাদন) দণ্ডের গাত্রে অঙ্গুরীয়ক (Ring) বা বলয়াকারে কিয়দংশ রাখিয়া নিজের দেহ বিস্তার করে। এই টুপিকে আমাদের দেশে সময়ে সময়ে তিনচার ইঞ্চি

এই জাতীয় ছত্রাকের দণ্ডে অঙ্গুরীয়ক ও প্রাবর (Valva) না থাকা সত্ত্বেও ইহারা আহার্য্য-ছত্রাক বলিয়া প্রমাণিত।

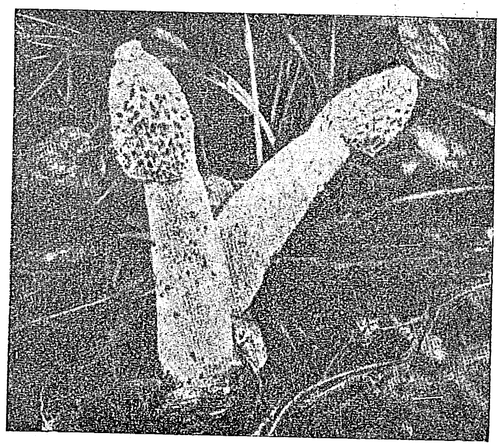

শৃঙ্গ ছত্রাকের গিল নাই। ইহাদের টুপির উপরিভাগ কুঞ্চিত আঠাযুক্ত। একপ্রকার দুর্গন্ধ ইহাদেয় গাত্র হইতে বাহির হয়।

ব্যাস বিশিষ্ট গোলাকার হইতে দেখা যায়। গোলাকার টুপির নিম্নভাগের চতুর্দ্দিক পাতলা গিল (gill) দ্বারা সজ্জিত হইয়া বহু ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের সৃষ্টি করে। ইহাদের মধ্যেই ছত্রাকের বীজরেণু (spore) উৎপন্ন হয়। ছত্রাকের বিভিন্ন শ্রেণী অনুসারে বীজরেণুর আকার যেমন ভিন্ন হয়, আবার বীজরেণু প্রকোষ্ঠ বা স্থলীও সেইরূপ নানা প্রকার হয়। সাধারণতঃ বিষাক্ত ছত্রাকের দণ্ডে অঙ্গুরীয়ক থাকে। আহার্য্য-ছত্রাকে অঙ্গুরীয়ক থাকিলেও আবরণ (volva) থাকে না। বিষাক্ত-ছত্রাকের টুপির উপরি-ভাগে একপ্রকার আঁইস থাকে এবং নিম্নদেশের গিল (gill) শ্বেতবর্ণ। এগারিকস বংশের কয়েক শ্রেণীর ছত্রাককে পরিপাটীরূপে রন্ধন করিয়া আহার করা হয়। ফ্রান্স, ইউরোপ, চীন, জাপান ও আমেরিকা অঞ্চলে ছত্রাকের কৃষিকার্য্য প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। ইহা একটি লাভবান ব্যবসা। আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে ইহার চাষ হয় না। জঙ্গল হইতে ছত্রাক সংগ্রহ করিয়া কৃষকেরা বিক্রয় করে। বাঙ্গলা দেশে এগারিকস বংশের কয়েক শ্রেণীর আহার্য্য-ছত্রাক পাওয়া যায়। আহার্য্য-ছত্রাকের মধ্যে এ দেশে পোয়াল, কাড়ান, উই, মৌচাল ও দুর্গাছাতুর নামই উল্লেখযোগ্য।

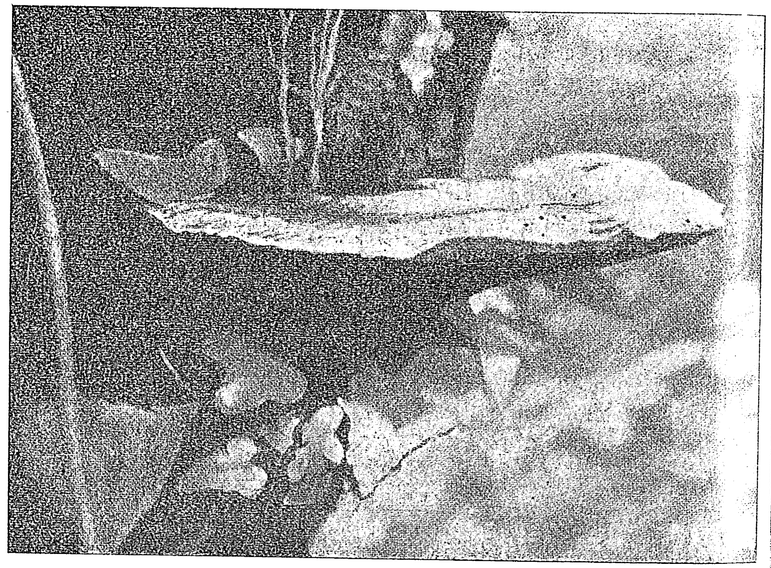

ব্রাকেট ছত্রাকের জন্ম বৃক্ষে। কোন কোন দেশে এই শ্রেণীর কয়েক জাতীয় ছত্রাক খাদ্যরূপে গ্রহণ করা হয়।

বর্ষার সময় পুরাতন খড়-স্তূপের উপর যে সকল ছাতুর জন্ম হয় তাহারা পোয়াল ছাতু নামে পরিচিত। পোয়াল ছাতুর টুপির নিম্নদেশ ঈষৎ রঞ্জিত। আউস ধান্যের খড়েই পোয়াল ছাতু প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। বর্ষাকালে ঐ পুরাতন খড়েই নাকি দ্রুত পচন কার্য্য আরম্ভ হয়। কাড়ান ছাতু বর্ষার সময়ে জঙ্গল অঞ্চলে খুব বেশী পরিমাণে জন্মাইতে দেখা যায়। উইঢিপির উপরিভাগে একত্রে বহু ছত্রাক ফুটিতে দেখা যায়। ইহারা এক ইঞ্চির বেশী বড় হয় না। এগারিকস্ বংশের ছত্রাকের মধ্যে বোধহয় আকারে ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা ছোট। গুচ্ছাকারে উইঢিপির উপর একসঙ্গে হাজার হাজার উই ছাতুর দৃশ্য দূর হইতে সুন্দর দেখায়। মৌচাল ছাতু মোল গাছের (মহুয়া বৃক্ষ) পাদ দেশে জন্মিয়া থাকে। সেইজন্য ইহার মৌচাল নামকরণ হইয়াছে। মৌচাল ছাতু মহুয়া (মোল) গন্ধযুক্ত। পল্লীগ্রাম অঞ্চলে জ্বালানি কাঠের জন্য মোল গাছ কাটিয়া বাড়ীর আশ পাশে ফেলিয়া রাখা হয়। বর্ষার সময়ে তাহার চারি পাশে মৌচাল ছাতু জন্মায়। দুর্গা ছাতু বা অষ্টমী ছাতুর আবির্ভাব শরৎকালে। দুর্গা ছাতুর ডাঁটা লম্বায় অনেক বড়।

লাইকোপার্ডন বংশের দুই শ্রেণীর ছত্রাক বাংলা দেশেও পাওয়া যায়। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের লাইকোপার্ডন জাইগানটিয়াম (Lycoperdon giganteum) পল্লীগ্রামে গৃহস্থ বাড়ীতে সময়ে সময়ে জন্মাইয়া থাকে। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে ইহাদের দুই ফিট ব্যাস পরিমাণে দেখা গিয়াছে। বৃটেনে লাইকোপার্ডন বংশের এক শ্রেণীর ছত্রাক মাটির তারা (Earth star) নামে পরিচিত। আমাদের দেশে ইহাদের কুড়কুড়ি ছাতু

এগারিকস বংশের এই জাতীয় ছত্রাক আহার্য্য হইলেও খাদ্য-রূপে গ্রহণ করা উচিত নহে। কারণ আর এক জাতীয় ছাতা (mould) ইহাদের সময়ে সময়ে আক্রমণ করে ও বিষাক্ত করিয়া দেয়।

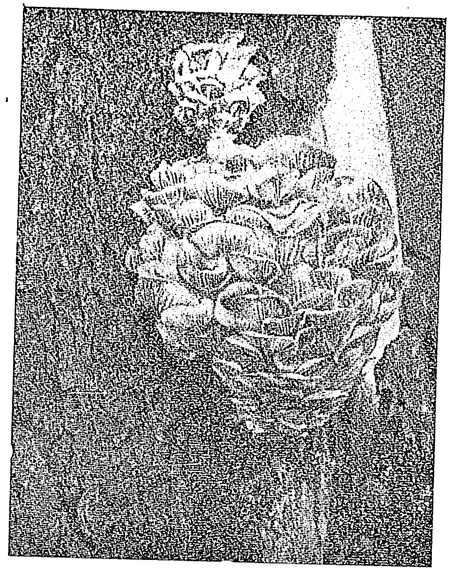

বৃক্ষবাসী ওসটার ছত্রাক আহার্য্য-ছত্রাক শ্রেণীভুক্ত।

বলে। আকারে ইহারা গোল আলুর ন্যায়। মৃত্তিকার তলদেশ হইতে মৃত্তিকা ফাটাইয়া আত্মপ্রকাশ করে। ইহার উপরিভাগে শ্বেতবর্ণের একটি মসৃণ, চামড়ার ন্যায় আবরণ থাকে। আবরণ মুক্ত করিলে শ্বেতবর্ণের গোলাকার শাঁস বাহির হয়। এই জাতীয় ছত্রাকের আবরণ যথাসময়ে আপনা হইতেই ফাটিয়া যায় এবং মাটির বুকে ইহাদিগকে তখন সত্য সত্যই তারার ন্যায় দেখায়। আমাদের দেশে ছত্রাক একই স্থানে দুই তিন দিনের বেশী জন্মাইতে দেখা যায় না। একদিনের হইলেই ছত্রাকে কীটের আবির্ভাব ও তাহাতে দুর্গন্ধ বাহির হয়। ইহা আহারের পক্ষে অনিষ্টকর। সেইজন্য টাটকা ছাতুই আহারের উপযোগী। ছত্রাক গোত্রের মধ্যে আবার বহু বিষাক্ত ছত্রাকও রহিয়াছে। ইহারা মানুষের মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটাইয়া থাকে। সুতরাং বিশেষ পরীক্ষা পূর্ব্বক উহা রন্ধন করা উচিত। পূর্ব্বে বিষাক্ত ছত্রাক নির্ণয় করিবার কয়েকটী উপায় উল্লেখ করিয়াছি।

যে সকল ছত্রাক বিচিত্র বর্ণ, দুর্গন্ধযুক্ত অথবা যাহাদের গাত্র হইতে রস নির্গত হয় তাহা সর্ব্বদা পরিত্যজ্য। রন্ধন সময়ে যদি রৌপ্য নির্ম্মিত চামচ বিবর্ণ হইয়া যায় তাহা হইলে ছত্রাক বিষাক্ত বুঝিতে হইবে। ছত্রাক যে কোন উজ্জ্বল বর্ণের হইলে তাহা যে বিষাক্ত হইবে ইহা সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের ক্যানথারেলাস কিবা-রিয়াস নামক (cantharellus cibarius) ছত্রাকের বর্ণ পীত। সেখানকার অধিবাসীরা ইহাদের খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। ছত্রাকের গীলের বর্ণ শ্বেত হইলেও তাহা আহার্য্য বলিয়া জানা গিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের এ্যামানিটপ্‌সিস ভ্যাজিনাটার (Amanitopsis vaginata) নাম করা যায়।

বৃক্ষবাসী ছত্রাকের মধ্যে বৃটেনের ওস্‌টার অর্থাৎ শুক্তি ছত্রাক যেমন দেখিতে সুন্দর তেমনি মুখরোচক। ইহারা আকারে ঝিনুকের ন্যায় এবং বৃক্ষের গাত্রদেশে সুন্দররূপে সজ্জিত থাকে। মৃগশৃঙ্গ ছত্রাক (stag's horn) বিষাক্ত না হইলেও খাদ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য নহে। ইহাদের দেহ অনমনীয়। বৎসরের প্রায় সকল সময়েই পুরাতন কাঠের উপর দেখা যায়। ডাঁটার রং কাল এবং লম্বায় প্রায় দুই ইঞ্চি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ফ্যালাস বংশের

বৃক্ষবাসী ছত্রাক—এই শ্রেণীর ছত্রাক বিচিত্র বর্ণের। (দক্ষিণে) জুর কর্ণ—মানুষের কানের ন্যায় দেখিতে ; পুরাতন গাছে ইহারা প্রচুর পরিমাণে জন্মায়।

দুর্গন্ধময় ছত্রাকের টুপি কুঞ্চিত। ইহাদের কোন গিল থাকে না। কুঞ্চিত টুপি সবুজ বর্ণ ও একপ্রকার দুর্গন্ধ আঠাযুক্ত। ইহাদের বীজরেণুগুলি আঠায় আট্‌কাইয়া থাকে। বৃক্ষবাসী ছত্রাক শ্রেণীর সংখ্যা অনেক। তাহাদের মধ্যে কয়েক শ্রেণী সত্য সত্যই সুন্দর। কয়েক জাতীয় ছত্রাক বৃক্ষের সর্ব্ব দেহ আক্রমণ করিয়া অল্পদিনের মধ্যে তাহাদের মৃত্যু ঘটায়। বৃক্ষবাসী ছত্রাকের মধ্যে পলিপোরস বংশের ব্রাকেট আকারের ছত্রাকই দর্শনযোগ্য। ট্রেমেল্লা বংশের এক শ্রেণীর ছত্রাক ঠিক মানুষের কানের ন্যায় দেখিতে। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে এই জাতীয় ছত্রাক জুর কর্ণ (Jew's ear) নামে পরিচিত। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে বৃক্ষের পাদদেশে যে শ্রেণীর ছত্রাক জন্মিয়া থাকে তাহারা বৃক্ষের বিশেষ উপকারী বন্ধু। বৃক্ষের নিম্নভাগের ভূমি পাতার আচ্ছাদনে উপযুক্ত আলো ও বৃষ্টির জল হইতে বঞ্চিত হওয়ায় ভূমি অনুর্ব্বর হইয়া পড়ে—বিশেষ করিয়া নাইট্রোজনের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এই শ্রেণীর ছত্রাক কিছু পরিমাণে নাইট্রোজন সরবরাহ করিয়া ভূমির অনুর্ব্বতা দূর করে। কি রাসায়নিক উপায়ে ইহারা এই কার্য্য সমাধান করে তাহা বৈজ্ঞানিকদের নিকট আজও অজ্ঞাত। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, ভারতবর্ষে প্রায় দুই সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্ব হইতে খাদ্য ও ঔষধরূপে ছত্রাকের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। এমন কি সুশ্রুতেও ইহার বিশেষ বর্ণনা পাওয়া যায়। আমাদের দেশে আহার্য্য ছত্রাকের যথেষ্ট চাহিদা আছে। বর্ত্তমানে শিক্ষিত কৃষি-শিল্পবিদের অভাব নাই। তাঁহারা বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষি-কার্য্য দ্বারা ছত্রাক উৎপাদন করিবার চেষ্টা করিতে পারেন —ইহাতে বিশেষ লাভবান হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

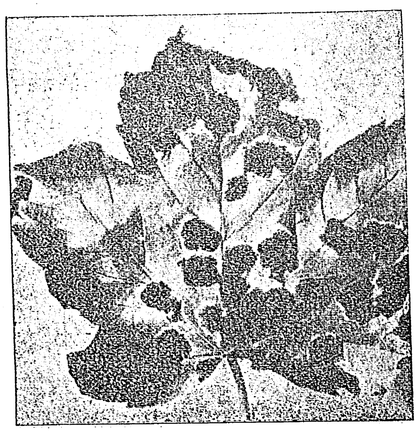

গাছের পাতায় এক জাতীয় ছত্রাক।

সাধু সালবেগ

শ্রীজনরঞ্জন রায়

মা ?

কি বাবা ?

আর আমি বাঁচবো না।

ছি বাছা, এমন কথা কি বল্‌তে আছে।

মৃত্যু আসন্ন বুঝিয়া পুত্র মাতার নিকট এইরূপ খেদ করিতেছিল।

কটক সহরের সন্নিকটে লালবাগ নামক স্থানে মোগল লালবেগের ঘাঁটি। গজপতি বংশের রাজাদের রাজধানী তখন কটকে। কিন্তু রাজপাট পর্য্যুদস্ত হইতেছিল মোগলদের দ্বারা। লালবেগের উৎপাতে উৎকল কাঁপিতে-ছিল। গজপতিদের সঙ্গে তাহার প্রবল যুদ্ধবিগ্রহ হইতেছিল। এই লালবেগের পুত্র সালবেগ। সালবেগই তাহার মাতাকে উপরোক্ত কথাগুলি বলিতেছিল।

তাহার অন্যান্য ভ্রাতাদের অপেক্ষা সালবেগ অধিক যুদ্ধনিপুণ ছিল। একদিন সে-ও পিতার সহিত যুদ্ধে গিয়া সৈন্যগণের পুরোভাগে দাঁড়াইল। তাহার রণ-কৌশলে হিন্দু সৈন্যগণ বিপর্য্যস্ত হইতেছিল। কিন্তু হঠাৎ তরবারির দারুণ আঘাতে তাহার মস্তক হইতে দরবিগলিত রক্তধারা প্রবাহিত হইল। সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। বীর সন্তানকে গৃহে আনিয়া তাহার পিতা উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করিল। কিন্তু তাহার ক্ষত উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। সে দুর্ব্বল ও জীর্ণ হইয়া পড়িল। তাহার পিতা তাহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিল।

সালবেগের মাতার প্রাণে ইহা মর্ম্মন্তুদ হইল। স্বামী কর্ত্তৃক তিনিও উপেক্ষিত, পুত্রও উপেক্ষিত। তাঁহার রূপ-যৌবন ও বিগত, পুত্রও যুদ্ধকার্য্যে অসমর্থ। সুতরাং লালবেগ কিসের মোহে আদর করিবে? কিন্তু একমাত্র সন্তানের জীবন রক্ষার জন্য মাতার ব্যাকুলতা বাড়িতে লাগিল। একদিন পুত্রের নিকট তিনি অকপটে আত্মপরিচয় দিয়া ফেলিলেন। আর তাহার সঙ্গে বলিলেন, নিজ ধর্ম্ম-বিশ্বাসের কথা। সে কথা যেমন করুণ, তেমনিই শিক্ষাপ্রদ। আজ সালবেগের জীবনচরিত অবলম্বনে আমরা সেই রসাস্বাদ করিবার প্রয়াস করিব।

মাতা বলিলেন, তিনি পুত্রের ধর্ম্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধ কথা বলিবেন। কিন্তু পুত্র যদি তাঁহার কথামত কার্য্য করে তবে জীবন ফিরিয়া পাইবে। পুত্র আশ্চর্য্য হইয়া গেল, তথাপি প্রতিজ্ঞা করিল সে মাতার উপদেশ শিরোধার্য্য করিবে। মাতা তখন বলিলেন তিনি ব্রাহ্মণ কন্যা ও বালবিধবা। কটকের সন্নিকটে দান্তমুকুন্দপুর তাঁহার

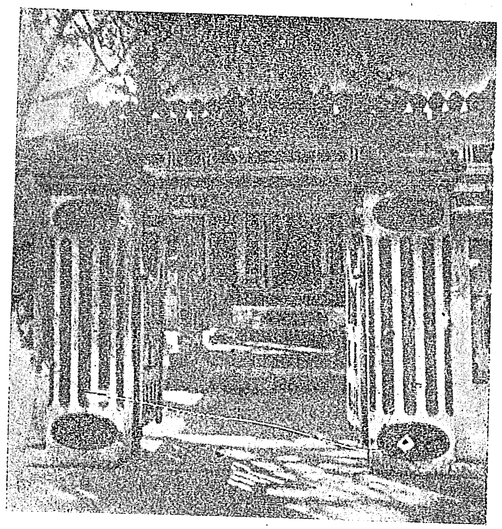

সাধু সালবেগের সমাধি

শ্বশুরালয়। শ্বশুরের ভিটা আগলাইয়া তিনি একাকী অসহায় অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছিলেন। কারণ তাঁহার স্বামীর শোকে তাঁহার শ্বশুর-শাশুড়ী পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি স্নানার্থে নদীতে গিয়াছেন, এমন সময়ে দেখিলেন ঊর্দ্ধশ্বাসে সকলে গ্রামত্যাগ করিতেছে। কারণ লালবেগের সৈন্যদল গ্রামে প্রবেশ করিয়াছিল। তিনি পলাইতে পারিলেন না, যেহেতু লালবেগের সৈন্যদল

তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। স্বয়ং লালবেগও সেখানে আসিয়া পড়িল। তাঁহার রূপ-যৌবনে আকৃষ্ট হইয়া সে তাঁহাকে নিজের ঘোড়ার পিঠে তুলিয়া লইল। তিনি তাহার বহু স্ত্রীর মধ্যে আরও একজন বলিয়া গণ্য হইলেন।

সালবেগকে তিনি বলিলেন, যবন ঔরসে জন্ম হইলেও সে তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব—নয়নের মণি। সে না বাঁচিলে অভাগিনীর আর যে কোনো সম্বল নাই। তাঁহারা আজ অনাথ-অসহায়। কিন্তু তিনি জানেন একজনকে, যিনি অনাথের নাথ। তিনি সেই সর্ব্বেশ্বর, রাধিকার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণসুন্দর হরি। স্বরূপটি তাঁহার এত সুন্দর যে কামদেবও বিমোহিত হন। নীলকান্তমণির সঙ্গেও যে সে রূপের তুলনা হয় না। তাঁহার কুঞ্চিত কেশকলাপে শিখিপুচ্ছ শোভা পায়, কর্ণে মকরকুণ্ডল, প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় নয়নযুগল, কামধনুর ন্যায় ভ্রূযুগ কমনীয়, নাসিকাগ্রে সুন্দর মুক্তাটি দুলিতেছে, দন্তপাতি দাড়িম্ব বীজের অপেক্ষা মনোহর, রক্তিম অধরোষ্ঠে সুধাশ্রাবী মৃদুহাস্য শোভা পাইতেছে। প্রভুর সে সুন্দর মুখমণ্ডল দেখিয়া চন্দ্রমাও লজ্জিত হন। গ্রীবাটি অতীব সুন্দর, গলদেশে মনোমুগ্ধকর বনমালা, আজানুলম্বিত বাহু রত্নালঙ্কারভূষিত, দশাঙ্গুলীতে সুবর্ণ অঙ্গুরীয়, কটীতে পীতবাস, চরণে নূপুর, চরণতলে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদির চিহ্ন, সর্ব্বোপরি তাঁহার সেই মধুর মুরলী সকলের চিত্তাকর্ষণ করিতেছে। ব্রজবনিতাগণ সেই বাঁশীর ধ্বনিতে আত্মহারা হইয়া যায়। মাতা বলিলেন, শেষনাগও প্রভুর রূপ বর্ণনা করিতে পারে না। দেবগণ নিরন্তর সে চরণ ধ্যান করেন, অখিল ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী সে চরণ বুকে ধরিয়া আছেন, ঋষিগণ সর্ব্বদা তাঁহাকে আরাধনা করিতেছেন। পুত্র, আজ হইতে তুমিও একান্তে তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ কর। সব রোগযন্ত্রণা তিনি নিরাময় করিবেন। তাঁর কৃপা ব্যতীত জগতে আর কোনো উপায় নাই। শ্রীকৃষ্ণের নামই যে তাঁর মন্ত্র। আজ হইতে দ্বাদশ দিন তুমি সেই নাম ও রূপ জপধ্যান কর, তোমার অভিলাষ তিনি পূর্ণ করিবেন—ইহাতে সংশয় নাই।

"মাতা বোলইরে তনুজ।
বিশ্বাস সিনা মূল বীজ॥
* * তো মনে সংশয় ন কর।
বিশ্বাসে ভজ বংশীধর॥"

—দার্ঢ্যতা ভক্তি, ২য় ভাঃ, ১৭ অ।

সেই দিন হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সালবেগও চক্ষু মুদ্রিত করিল। সে মাতাকে বলিল—মা, স্বহস্তে আমার চোখ বাঁধিয়া দাও! ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিল—প্রভু, কৃপা করিতে বিলম্ব করিও না, বিলম্ব করিলে মাতাপুত্রে মরিয়া যাইব দেব।

"মো আর্ত্ত খণ্ড দেবরাজ।
বিলম্বে নাহুঁ আউ কাজ॥
নিশ্চে মরিবু মাএ পোএ।
হত্যা হোইবু তুম্ভ পাএ॥
এ মন্ত দ্বাদশ দিবস।
আসি হোইলা যহুঁ শেষ॥
মরিবা কথা কলে মূল।
তাহা জানিলে আদি মূল॥"

—দাঃ ভং

দ্বাদশ দিন কিন্তু গতপ্রায়। ভক্তের কাতরতায় ভক্তপ্রাণ থাকিতে পারিলেন না। ভক্তকে দর্শন দিয়া তিনি নিজ পদরজ বিভূতি প্রদান করতঃ অন্তর্দ্ধান হইলেন।

"বেগে তু উঠরে কুমর।
ছাড় সকল চিন্তা তোর॥
ধর এ বিভূতি মুঠাএ।
লগাই দিঅ তোর ঘাএ॥
* * *
প্রভুঙ্ক কলা দরশন
হরি হোইলে অন্তর্দ্ধান॥

—দাঃ ভঃ

দ্বাদশ রাত্রি প্রভাতে সালবেগ দেখিলেন তাঁহার সমস্ত যন্ত্রণা প্রশমিত হইয়াছে, ক্ষত শুষ্ক হইয়া গিয়াছে—আছে কেবল ক্ষতচিহ্ন। শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিয়াই মাতাকে তিনি বলিলেন—মাগো মা, তোমার কথাই যে সত্য, পরম সত্য। প্রাণ যখন পাইলাম, তখন বিদায় দাও মা—সেই প্রাণারামের সন্ধানে যাই।

"দেখে তা ঘাআ নাহি কিছি।
কেবল চিহ্ন মাত্র অছি॥
* * *
মাতাঙ্কু বোইলা লো শুন।
তো কথা হোইলা প্রমাণ॥
* * *
মুইঁ সন্ন্যাসী হোইবই।
সংসার সুখ তেজিবই॥"

—দাঃ ভঃ

পুত্র মাতার চরণে প্রণাম করিলেন, ডোর কৌপীন চীরবসন সম্বল করিয়া শ্রীক্ষেত্রে গমন করিলেন।

"এমন্ত কহি বস্ত্র চিরি।
ডোর কৌপূনি আশ্রে করি॥
মাতাঙ্কু দণ্ডবৎ কলা।
শুন গো জননী বোইলা॥
* * *
এমন্ত করি অনুকূল।
করি চলিলা নীলাচল॥
প্রবেশ হেলা ক্ষেত্রবরে।
সাধু বৈষ্ণবঙ্ক সঙ্গরে॥
কেতেহেঁ দিন তহুঁ রহি।
প্রতিমামান ত দেখই॥
শ্রীজগন্নাথ দর্শন।
করিন চলিলা দক্ষিণ॥"

দাঃ ভঃ

পঞ্চক্রোশী পুরীধামে সাধু-সন্ন্যাসীগণের সঙ্গে দেবায়তন-সকল দেখিতে দেখিতে শ্রীমন্দিরের নিকট আসিতে লাগিলেন। এই অকিঞ্চন বৈষ্ণব নিজেকে মুসলমান কুলোদ্ভব জানিয়া চিরাচরিত প্রথামত নিশ্চয় জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করেন নাই। রথের ও স্নানযাত্রার সময়ে প্রভুকে দর্শন করিয়া মনোভিলাষ তৃপ্ত করিয়াছেন। পুরীতে গুণ্ডিচার পথপার্শ্বে বসিয়া রৌদ্রাতপ উপেক্ষা করিয়া একান্তে শ্রীকৃষ্ণ ভজনধ্যানে তিনি জীবন অতিবাহিত করেন। এই সিদ্ধ বৈষ্ণবের সমাধি স্থান পুরীধামের একটি অবশ্য দর্শনযোগ্য পীঠ। তিনি যেখানে সাধনা করিতেন সেইখানেই তাঁহাকে সমাহিত করা হইয়াছিল। অদ্যাপিও জগন্নাথদেবের রথ আদর্শ ভক্তের সমাধির অদূরে অপেক্ষা করে এবং প্রভুর প্রসাদি মাল্য এই সমাধির উপর অর্পিত হইলে রথ অগ্রসর হইয়া থাকে।

লোকমুখে মহাত্মা সালবেগ রচিত অনেক ভক্তিগাথা সুপ্রচলিত আছে। এখানে তাহার একটি লিখিত হইল।

"আহে নীল শৈল প্রবল মর্ত্ত বারণ।
মু আর্ত্ত নলিনী বনকু কর দলন॥
পজরাজ ডাক দেলা গ্রাহ যুদ্ধ বেলন।
চক্রপেয়ী নক্রনাশী কৃপা কল আপন॥
দ্রৌপদী যে চিন্তা কলে কুরুসভা তলেন।
কটি চন্দ্র দেই তাঙ্ক লজ্জা কল বারণ॥
হরিণী কি ঘোর বনে পড়িথিলা কষণ (১)।
ডাকিলা মাত্রক হরি রক্ষা কল আপন॥
রাবণর ভাই বিভীষণ গলা শরণ।
কেতে কেতে বিপত্তিরু রক্ষু অছু আপন॥
অজামিল ডাক দেলা জীব যিবা বেলন (২)।
কেড়ে বড় পাপী গলা বৈকুণ্ঠ ভবন॥
কহে সালবেগ হীন জাতিরে মু দমন (৩)।
শ্রীরঙ্গা চরণতলে রথ মোরে শরণ॥"

পুরীতে এইরূপে দুইটি বৈষ্ণব মুসলমানের সমাধি আছে। একটি সাধু সালবেগের, অন্যটি হরিদাস ঠাকুরের। সালবেগ অবশ্যই হরিদাস ঠাকুরের পূর্ব্ববর্ত্তী। তিনি চৈতন্যদেবের সমকালের বা পরবর্ত্তী কালের নহেন। কারণ তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় চৈতন্য সম্প্রদায়ভুক্ত হইতেন এবং চৈতন্য সম্প্রদায়ের কোনো-না-কোনো গ্রন্থে তাঁহার নাম পাওয়া যাইত। আমরা যতদূর জানি তাহাতে ঐরূপ কোথাও তাঁহার উল্লেখ নাই। কিন্তু সাধু সালবেগ "দার্ঢ্যতা ভক্তি" নামক উড়িয়া গ্রন্থে অমর হইয়া আছেন। উড়িষ্যার ঘরে ঘরে পূতচরিতময় এই গ্রন্থ বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে পঠিত হয়। সালবেগের সমাধি লুপ্তপ্রায় হইতে বসিয়াছিল।

(১) কষণ=কষ্ট।
(২) জীব যিবা বেদন=মৃত্যুর পূর্ব্বে।
(৩) দমন=যবন।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ভাস্কর মহাপাত্র এই সমাধির উপর ক্ষুদ্র একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়ায় ইহার অস্তিত্ব রক্ষিত হইয়াছে। এখানে সেই মন্দিরের একখানি আলোক চিত্র দেওয়া হইল। তবে সালবেগের সমাধির বৈষ্ণব মতে কোনোরূপ সেবার ব্যবস্থা দেখিলাম না। তিনি চৈতন্যভক্ত হইলে অবশ্যই সে ব্যবস্থা থাকিত। কারণ বেশী দিনের কথা নয়—সম্ভবতঃ ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে হরিদাস ঠাকুরের সমাজের দুর্দ্দশা দেখিয়া জনৈক বৈষ্ণবপ্রবর (৪) তথাকার সেবা পূজার সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন জানিতে পারিলাম। পুরীর অন্যতম এই মুসলমান-সাধু সালবেগের সমাধির সেবার জন্যও আমরা বৈষ্ণব সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। "দার্ঢ্যতা ভক্তি" গ্রন্থে উল্লেখ আছে—সালবেগ সাধনবলে চর্ম্ম চক্ষে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ দর্শন করেন। সুতরাং তিনি বৈষ্ণব জগতের পূজ্যপাদ ব্যক্তি। দার্ঢ্যতাভক্তিকার শ্রদ্ধাষ্পদ রামচন্দ্র শর্ম্মা লিখিয়াছেন—

"জীবন্তে শ্রীনন্দ কহ্বাই।
দেখিলা চর্ম্মনেত্রে চাহি ৪
তা গতি মুক্তি যেবা হেউ।
তাহা জানিবে মহাবাহু (৫)॥
এ দার্ঢ্যভক্তি রসামৃত।
সুজনে এথেঁ দিঅ চিত্ত॥
* * *
কহই বিপ্র রামচন্দ্র।
মো প্রভু বৃন্দাবনচন্দ্র॥"

(৪) সংকীর্ত্তন ধুরন্ধর শ্রীযুক্ত রামদাস বাবাজী মহাশয়।
(৫) মহাবাহু=জগন্নাথদেব।

তোমারে দিয়েছি ব্যথা—

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ

তোমারে দিয়েছি ব্যথা, মর্ম্মে-মর্ম্মে করি অনুতাপ ;
অশ্রুর উৎসার জাগে উদ্বেলিত হৃদয়ের তলে,
আঁখিযুগ শুষ্ক রাখি। জানি না ত কি যে অভিশাপ
বহিতেছি চিরদিন ; চিরদিন এ অন্তর জ্বলে।

প্রথম মিলন হ'তে হৃদয়ের ছিনিমিনি খেলা !
কত বার হারিলাম, কত বার মুছিলাম আঁখি !
সহিতে পারি না তবু ! দিবানিশি, ভোর সন্ধ্যাবেলা
হয়ে গেল একাকার—অশ্রুবাষ্পে মেঘছায়া আঁকি।

কখনো সমুদ্রসম ছুটে যাই বাসনা-অধীর,
বাধা পাই শুষ্ক তটে, ফিরে আসি অতৃপ্ত-তিয়াস ;
উদাসীন হ'তে চাই, অন্তর সে নাহি মানে থির,
উন্মুখ আগ্রহভরে খুঁজি তব ব্যগ্র বাহুপাশ।

দুর্ব্বল এ হিয়া ল'য়ে কি করিব ? কারে আর দিব ?
সহিতে পারিবে জ্বালা ? হয় ত জ্বলিবে আজীবন।
তুমিও সহিবে, আর বুক বাঁধি আমিও সহিব,
কি করিব ? ভাঙে বুক, ছিন্ন তবু না হয় বন্ধন।

মুমূর্ষু পৃথিবী

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিত অংশের সংক্ষিপ্ত কাহিনী)

সত্যেন সেনের আপনার বলতে সংসারে বিশেষ কেউ ছিল না। মৃত্যুকালে তার বাবা বেশ কিছু টাকার কোম্পানীর কাগজ রেখে যান। তার কতক টাকা সে নিজের জন্যে ব্যয় করে, বাকীটা জামিন রেখে সিটি ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের পদে বহাল হয়।

বন্ধুবান্ধবের সংসর্গে পড়ে সত্যেন অতি অল্প দিনের মধ্যেই ঘোড়দৌড় ও জুয়া খেলায় অত্যন্ত আসক্ত হয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে অতি-আধুনিক আভিজাত্যের সঙ্গেও তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় জন্মে গেল। সাধারণ রঙ্গালয়ে যে সব আধুনিকারা প্রাচ্য নৃত্যকলার রস পরিবেশনে পাশ্চাত্য বীভৎসতার পরাকাষ্ঠা দেখায় সত্যেন তাদের একনিষ্ঠ ভক্ত। চালচলন ও পোষাক পরিচ্ছদে সে সর্ব্বদাই নিজের অবস্থা লঙ্ঘন ক'রে চলে। বন্ধু বান্ধবীদের নিয়ে প্রায়ই সাহেবী হোটেলে ডিনার খায়। ক্রমে তার ঋণ বৃদ্ধি হয়ে চরম সীমায় দাঁড়াল। মাসিক আয় যখন সে ব্যয় সঙ্কুলানের পক্ষে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হয়ে দাঁড়াল তখন সত্যেন অতি- মাত্রায় ঝুঁকে পড়ল ঘোড় দৌড়ের মাঠের দিকে। ফলে বাজারে দেনা বেড়ে গেল, অগত্যা আপিসের তহবিল তস্রুপ ছাড়া আর গত্যন্তর রইল না। সত্যেন আশা করে, ঘোড় দৌড়ে এক দিন হঠাৎ অনেক টাকা জিতে রাতারাতি ব্যাঙ্কের টাকা পূরণ ক'রে রাখবে। কিন্তু ঘটল অন্য রকম। নিকাশে তহবিল তস্রুপি ধরা পড়ে গেল। বিচারে তার চাকরি গেল, জামিনের টাকা বাজেয়াপ্ত হল, আর দু বছরের কারাদণ্ড হ'ল তার সঙ্গে ফাউ।

জেল থেকে বেরিয়ে সত্যেন সম্পূর্ণ বেকার হয়ে পড়ল। পরিচিত ও বন্ধু-মহলে আর সে মুখ দেখাতে পারে না। একজন বাল্যবন্ধুর সাহায্যে দু-একদিন অতি কষ্টে কাটল। কিন্তু সেও অত্যন্ত দরিদ্র, কাজেই সত্যেন নিতান্ত নিরুপায় হয়ে পড়ল। দিনকয়েক অনশনক্লিষ্ট হয়ে পথে পথে ঘুরেও সত্যেন চাকরি জোগাড় করতে পারল না। কুলীগিরি করবার চেষ্টাও সে করল, কিন্তু জুটল না। শেষে একটি ভিখারী মেয়ের অনুগ্রহে সত্যেন একটু আশ্রয় পেল। তখন অনন্যোপায় হয়ে তাকে পেটের দায়ে ভিক্ষাবৃত্তিই অবলম্বন করতে হ'ল।

ভিখারীদের বস্তিতে বাস ক'রে ও ভিখিরী জীবনের মর্ম্মান্তিক দৃশ্য দেখে সত্যেন এই সর্বহারাদের সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করল তাতে পৃথিবীর উপর তার অন্তর বিদ্রোহ ক'রে উঠল। সারাদিন রৌদ্র ও বৃষ্টিতে কেঁদে কেঁদেও এরা পেট ভরে খেতে পায় না। এদের নিয়েও লোকে ব্যবসা করে, সুস্থ সবলকায় মানুষকে পেটের দায়ে কুৎসিত বিকলাঙ্গ করে। গুণ্ডারা কত অসহায় শিশুকে এনে অন্ধ করে ভিখিরী তৈরি করে। মানুষের নিঃস্বতার সুযোগ নিয়ে লেলিহান মানবের ক্ষুধা সর্বগ্রাসী আগুনের মত পৃথিবীর নিভৃত কন্দরে তিলে তিলে মনুষ্যত্বকে ধ্বংস ক'রে চলেছে—আর পৃথিবীর বাইরে চলেছে শত উৎসবের আনন্দ কোলাহল, প্রাচুর্যের ছড়াছড়ি। পেটের দায়ে পথচারিণী কুষ্ঠরোগী ও কুৎসিত ব্যাধিগ্রস্ত ভিখারীর কাছেও দেহ বিক্রয় করে এক টুকরা বাসি রুটির বিনিময়ে।

সত্যেন গান গেয়ে গেয়ে ভিক্ষা করে। ভিখারিণী অতসী পরিচালিত করে তার জীবন। সত্যেনকে সে নিজের ভিক্ষার সম্বল নিঃশেষে দিয়ে একটি একতারা কিনে দিয়েছে।

অতসী ও তার অন্ধ পিতা যে ঘরখানিতে বাস করে তার পাশের অপরিসর ঘরখানিতে থাকে সত্যেন। ভিখিরী সত্যেনের নতুন নামকরণ হয়েছে—দীনু। ঘরের ভাড়া দৈনিক মিটিয়ে দিতে হয়, অতসী তার অন্ধ বাপের হাত ধরে ভিক্ষা করে, দিনান্তে একবার তাদের রান্না হয়। সত্যেন অতসীর কাছেই খায়, অতসী ও সত্যেন সম্পর্কে বস্তির অন্যান্য ভিখিরীরা ঈর্ষান্বিত। ভিক্ষায় বেরিয়ে সত্যেন কত রকমের ভিখারী দেখে। দিনে যারা ভিক্ষা করে, রাত্রে তারা করে গুণ্ডামি ; ফুটপাথে শুয়ে ভিখারীরা শীত গ্রীষ্ম সমান ভাবে যাপন করে। তারই মধ্যে চলে মদ ব্যভিচার। কাঙ্গালী বিদায়ের যে সব দৃশ্য সত্যেন স্বচক্ষে দেখেছে, তাতে সে আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। ডাষ্টবিন থেকে পচা ভাত কুড়িয়ে খেতে দেখে সে শিউরে ওঠে।

পরিচিত পল্লীতে ভিক্ষা করতে সত্যেন খুব কমই যায়। ভিক্ষা করতে গিয়ে দক্ষিণাঞ্চলের কোন শহরতলীতে সত্যেন একদিন স্যর সি-কে-রায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হয়। স্যর সি-কে-র একমাত্র কন্যা ব্রততী সত্যেনের গান শুনে মুগ্ধ হন। তিনি মাঝে মাঝে এসে গান শোনাতে বললেন ও বেশী পয়সা ভিক্ষা দিলেন।

ব্রততী অতি-আধুনিক অভিজাত সম্প্রদায়ের মেয়ে। প্রাচ্য নৃত্যে সে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। স্যর সি-কে-র একমাত্র উত্তরাধিকারিণী ব্রততীকে ঘিরে নায়ক ও বান্ধবীর ভিড়। কিন্তু ব্রততী ক্রমেই ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল সেই অভিজাত সম্প্রদায়ের কৃত্রিমতাপূর্ণ

মিথ্যা আচরণে। ব্রততীর মনে হয়, তাদের আগাগোড়া যেন রাংতা মোড়া। ব্রততীর মা নেই, তিনি ছিলেন পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থ কন্যা; ব্রততীর মনে সুপ্ত মানবতা উদ্‌গ্রীব হয়ে জেগে উঠতে চায়।

সত্যেনের মুখে গ্রাম্য বাউলের গান শুনতে ব্রততী ভালবাসে। সত্যেন মাঝে মাঝে তাকে গান শুনিয়ে ভিক্ষা নিয়ে যায়। সত্যেনের কাছে অবসর সময়ে ব্রততী ভিখিরীদের জীবনকাহিনী শোনে। তার কোমল চিত্ত ক্রমে পরিচিত হয় ভিখারী-জগতের সঙ্গে। মানুষের বেদনায় সে মর্মাহত হয়ে পড়ে। সত্যেনের চালচলনে ব্রততী প্রথম থেকেই বুঝেছিল যে ভিখিরী হলেও সে কোন ভদ্রবংশজাত, অবস্থার ফেরে ভিখিরী হয়েছে।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অতসীর শরীরটা সত্যি অসুস্থ। তবু মাথায় পটি বেঁধে উনুনে ফুঁ দিতে হয়। ভিজে খড়-কুটো একগুণ জলে ত দশগুণ জ্বালায় তীব্র ধোঁয়ার প্রাচুর্য্যে। চোখ দুটো লাল হ'য়ে ওঠে: কপালের শিরাদুটো দপ্ দপ্ করে, মনে হয় ছিঁড়ে যাবে বুঝি হঠাৎ কখন।

সন্ধ্যা উৎরে গেছে। ঘরের ভিতর একলাটি অন্ধকারে ব'সে উপেন গুন্‌গুন্ সুরে গান করে; গান ঠিক নয়, একটা করুণ আবৃত্তি। অতীত জীবনের শবদেহটা নিয়ে হয় ত আপন মনে করে তার পোষ্টমর্টেম। গায়ের রুক্ষ চামড়ার মাঝে মাঝে বাতাসের যে স্পর্শ লাগে, তাতে কখন কখন মনে হয় বাইরের জগতে বুঝি নেমেছে এবার রাত্রের ঘন অন্ধকার, বাতাসের চেয়ে নিজের নিশ্বাসই যেন হ'য়ে উঠেছে উষ্ণতর।

ভাত হ'য়ে এলো: কিন্তু দীনু তখনও ফিরল না দেখে অতসী ক্রমেই উদ্বিগ্ন হ'য়ে ওঠে। কখন সূর্য্য ডুবে গেছে, তবুও ফিরল না। এত দেরী কোন দিনই হয় না ওর। —হয় ত সাধ্‌তে সাধ্‌তে অনেক দূরে গিয়ে প'ড়েছে আজ: না-হয়……। বাকীটুকু ভাব্‌তে মাথাটা ওর কেমন যেন পাক খেয়ে যায়। ভাব্‌তে পারে না। হয় ত সেদিনের মত মাথা ঘুরে প'ড়ে গেছে রাস্তার পাথরে; কপালটা কেটে চুঁইয়ে চুঁইয়ে গড়াচ্ছে রক্ত। অতসীর বুকের ভিতরটা শির্ শির্ ক'রে ওঠে। ভাতের ফেনটুকু ভালভাবে ঝরানোও হয় না। আন্‌মনে গলিটার দিকে চেয়ে থাক্‌তে থাক্‌তে কখন ভুলে যায় ভাতের কথা।

অন্য দিন এইটুকু সময়ের ভিতরেই অতসী অন্তত দশ-বার এ-ঘর ও-ঘর করে, কিন্তু আজ আর একটি বারও ওঠে নি উনুন ছেড়ে।

ওর প্রাত্যহিক জীবনে এইটুকু ব্যতিক্রমও উপেনের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। চোখ নেই, তবুও অতসীর সম্পর্কে অনুভূতির প্রখরতা যেন অদ্ভুত। হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে দরজার সাম্‌নে এসে দাঁড়ায়—"মাথাটা কি বড্ড বেশী ধ'রেছে মা?"

"না ত।"—অতসী তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে। হয় ত খিদে পেয়েছে ওর বাবার।

"আজ আর না-ই বা রাঁধ্‌তিস মা! চালগুলো বদল দিয়ে দোকান থেকে মুড়ি-মুড়্‌কি আন্‌লেও রাতটা কেটে যেত।"

"তা হোক্ বাবা, দিনান্তে একবার বই ত নয়। ওই একমুঠো ভাত ফোটাতে কোন কষ্টই হয় না আমার।"—হাঁড়িটা একপাশে সরিয়ে রেখে অতসী উপেনের জন্যে জায়গা পরিষ্কার ক'রতে লাগ্‌ল।

দীনুর ঘর অন্ধকার দেখেই বোধ হয় গন্নাকাটী বারবার এসে উঁকি মারে দরজার ফাঁক দিয়ে। অতসী ইচ্ছা ক'রেই কোন কথা বলে না। পদ্মকে যেন কোনরকমেই সইতে পারে না ও। দীনুর কথা নিয়ে রাতদিন যে খোঁচা দে দেয় ওকে, তাতে অতসীর আপাদমস্তক জ্বলে ওঠে। তবুও অতসী মুখ বুঁজে সয়ে' যায় তার সেই ছোটলোকপনা। আগে পদ্মকে দেখে হ'ত ওর ভয়; এখন হয় ঘেন্না।

"দীনু কি এখনও ফেরে নি অতসী?"—উপেন কাশ খাড়া ক'রে পাশের ঘরের শব্দ শুন্‌বার চেষ্টা করে।—"রাত বুঝি বেশী হয় নি এখনো?"

—"রাত? না।"—কি ব'ল্‌তে গিয়ে অতসী থেমে যায়; উপেনের মুখের ভাবটা লক্ষ্য ক'রবার চেষ্টা করে, তারপর গলিটার দিকে আর একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে বলে—"ন'টা বেজেছে বোধ হয়।"

—"তা হোক্। সারাটা দিন ঘুরে' ঘুরে' হয় ত ঘুমিয়ে প'ড়েছে কোম্পানীর বাগানে। আসবে; ঘুম ভাঙ্‌লে আপনি আস্‌বে মা।"

উপেনের কথাগুলো শুনে' অতসী যেন হঠাৎ কেমন বিব্রত হ'য়ে পড়ে। দীনুর সম্পর্কে ওর যে দুর্ব্বলতাটুকু নিজের কাছেও পরিষ্কার ছিল না, সেটা যে অন্ধ বাপের চোখেও এতখানি ধরা প'ড়েছে সে কথা অতসী ভাব্‌তে পারে নি।

কি ভাব্‌তে ভাব্‌তে অতসী অন্যমনস্কভাবেই জবাব দিয়ে বসে—"আপনি সে আস্‌বে না বাবা; আসেও নি কোন দিন। মন যদি না থাকে তার, কারো মুখ তাকিয়েই সে কর্‌বে না কোন কাজ।"—অতসী ভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে। কিছুই ওর ভাল লাগে না আজ; কথা ব'ল্‌তেও কেমন একটা বিরক্তি যেন চেপে বসে বুকের ওপর।

দীনুর দেরী দেখে, অতসী ক্রমেই উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠ্‌ছিল। ছেঁড়া একখানা শালপাতায় দু'মুঠো ভাত উপেনের সাম্‌নে ধ'রে দিয়ে তেমনি অন্যমনস্কভাবে সে উঠে গেল ঘরে।—আস্‌বে না, আজ আর নিশ্চয়ই আস্‌বে না ফিরে। আর কেনই বা আস্‌বে! ওরা ভিখিরী, ভিখিরীদের বস্তিতে এ কয়টা দিন যে ছিল দীনু, সেও হয় ত অতসীদের ওপর দয়া ক'রে।

অতসী ভাবে: বস্তির ওই ভিখিরীগুলো, রাস্তার ওই হাভাতে ক্যাঙলাগুলো—ওদের কারো সঙ্গে যেন দীনুর এতটুকু মিল নেই। দীনু যেন অন্য দেশের মানুষ! পেটে ভাত নেই, না খেয়ে দিনের পর দিন পথে পথে ঘুরে বেড়াবে, তাও ভাল; তবুও এতটুকু ছোট হবে না ও কারো কাছে। অতসী কত দিন দেখেছে, দীনু যা বলে, যা ভাবে, ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুখপানে তাকিয়ে থেকেও বোঝে না তার বিন্দুবিসর্গ।

—"অতসী!"

অতসী চম্‌কে ওঠে—"তোমাকে কি আর একমুঠো ভাত দেবো বাবা?"

"না মা, ভাত আর লাগ্‌বে না আমার। গলার ভিতরটা যেন দিন দিন কেমন শুকিয়ে আস্‌ছে রে; খেতে ইচ্ছে করে না। তবু না খেলে নয় মা, তাই"—কথা বলা হয় না। কণ্ঠস্বর ভারী হ'য়ে আসে। বুক ঠেলে উঠ্‌তে চায় হিক্কা।—সেই ভাত, আজও মুখে তুল্‌তে হয় প্রতিটি দিন!

—"কি যেন ব'ল্‌ছিলাম রে? ও হাঁ! তুই-ও না-হয় খেয়ে নে মা, দীনুর হয় ত আস্‌তে দেরীই হবে আজ।"—বিলম্বিত দীর্ঘশ্বাসটা রোধ ক'রে উপেন উঠে প'ড়ল।

ওদিকের ঘরগুলো এর মধ্যেই নিশুতি হ'য়ে প'ড়েছে; শুধু প্রদীপ জ্বলে রাঁধি বোষ্টুমির ঘরে। পদ্মর গলার আওয়াজ আর শোনা যায় না; ওদের খাওয়া-দাওয়া গিটে গেছে অনেক আগে। মাণিক পেয়াদা আর গোলাম কি নিয়ে যেন তর্কাতর্কি করে। বিলিতি-খরসান আর গাঁজা-পোড়ার উগ্র গন্ধ মাঝে মাঝে বাতাসটাকে ঝাঁঝাল ক'রে তোলে।

দশটা বেজে গেল, তবুও দেখা নেই দীনুর। সারা বস্তিতে থমথম করে মৃত্যুর ছায়া। ভাতের হাঁড়িটা তখনও তেমনি পড়ে আছে উনুনের ধারে। অতসী খায় নি, হয় ত খাবেও না আজ। মাথার যন্ত্রণা আরও বেড়ে উঠেছে। তলগড়ে আঁচলটা বিছিয়ে মাথাগুঁজে পড়ে' ছিল এতক্ষণ। দীনু যে আস্‌বে না আর ফিরে, সে কথা কিছুক্ষণ আগেও যেন ঠিক বিশ্বাস হয় নি। কিন্তু এখন আর ও অবিশ্বাস ক'রতে সাহস করে না।

মনটা অস্বস্তিতে তোলপাড় করে। দীনু যে পালাবে এক দিন, ঠিক এমনি ক'রেই পালাবে তা ও জান্‌ত! কিন্তু একটিবার, শুধু একটিবার মাত্র ব'লে যেতে তার কি বাধা ছিল? অতসী ত রাখ্‌ত না তাকে আট্‌কে। কেনই বা যাবে সে আট্‌কাতে? যা থাক্‌বার নয়, তা থাকে না; তবুও ত জানাত দুটো কথা! ভিক্ষে চেয়ে নিত সে, দীনুর কাছে যে কথা কোন দিন মুখফুটে ব'ল্‌বার সাহস হয় নি ওর, আজ অন্তত যাবার বেলায় চাইত ও সেই ভিক্ষে।—অতসী কান্নায় ভেঙে পড়ে।

উপেন তখনো ঘুমোয় নি। অতসী পা-টিপে টিপে দীনুর ঘরের সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াল। শিকলটা বাইরে থেকে তেমনি আট্‌কানো; দীনু আসে নি। আস্তে দরজাটা খুলে ঘরের ভিতর গিয়ে ও একবার দাঁড়ায়; চোখ দুটো বড় ক'রে দেখ্‌বার চেষ্টা করে—সেই অন্ধকারে কোথাও কেউ ঘুমিয়ে আছে কি-না! কান পেতে শোনে শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ।

না। নেই, কেউ নেই ঘরে। আসে নি দীনু; আস্‌বে না আর। অতসীর রাগ হয় পদ্মর ওপর। ওই গন্নাকাটীই পুড়িয়েছে ওর কপাল: ওর শোলার ঘরে দিয়েছে ও টিকের আগুন।—সশব্দে দরজাটা বন্ধ ক'রে অতসী শুয়ে প'ড়ল মেঝেয়; ছেঁড়া আঁচলটুকু বিছিয়ে হাতে

মাথা দিয়ে পড়ে' পড়ে' ভাবে আকাশপাতাল। চোখে জল আসে। দীনুকে চায় নি সে কোন দিনও ওর জীবনে। আপনা-আপনি এসে উঠেছিল দীনু ওর খেয়াঘাটে; আবার আপনি চ'লে গেছে কোন্ জোয়ারের মুখে।

তা যাক্। অতসী আর ভয় করে না। আবার হয় ত ভাগাড়ের মাংসের মত ওকে নিয়ে কাড়াকাড়ি ক'রবে খেঁকি কুকুরগুলো। ওর মুখে, বুকে—সারা গায়ে ঘেয়ো কুকুরের নিশ্বাস ফঁস্ ফঁস্ ক'রবে রাত্রিদিন।

—তিনটে মাস তবুও নিশ্চিন্তে ছিল ওরা একই জায়গায় আস্তানা গেড়ে। দীনুর শক্ত লম্বা চেহারাটা দেখে, হাতের চওড়া কব্জিদুটোর দিকে চেয়ে, হয় ত মাণিক-পেয়াদার মনেও হ'ত ভয়। নইলে, নইলে অনেক আগেই ছেড়ে চ'লে যেতে হ'ত এই বস্তি। তেমনি ক'রেই ত কেটেছে ওদের পূরোপুরি চারটে বছর।

—"অতসী!" –ওর বাবা ডাকে।

অতসী একবার ভাব্‌ল সাড়া দেবে না। কথা ব'ল্‌তে, এমন কি, সাড়া দিতেও ওর কেমন শৈথিল্য আসে। আবার পরক্ষণেই মনে হয়, এখুনি হয় ত বুড়ো হাতড়ে হাতড়ে উঠে আস্‌বে বিছানা ছেড়ে; অন্ধকারে হুমড়ি খেয়ে প'ড়বে কোথায় ঠোক্কর লেগে।

—"দীনু কি এখনো আসে নি মা?"

এবার আর অতসী উত্তর না দিয়ে পারে না;—"আজ আর আস্‌বে না বাবা।"—ওইটুকু ব'লেই কথা ওর থামে না; আপনমনে বিড়বিড় করে—"আজ কেন! কোন দিনই আস্‌বে না সে, আস্‌বে না আর ফিরে।"—শরীরটা টান ক'রে ছড়িয়ে দেয় মাটির ওপর।

বুড়ো বোধ হয় তখনও ব'লছিল ওকে শুনিয়ে—"গোটা গোটা উপোস ক'রে সারা শহর ভিখ্ মেগে বেড়ানো কি সহজ রে! রাতের উপোসে পাহাড় ভেঙে পড়ে। কাল সকালে আবার ফিরতে হবে পাঁচ বাড়ী সেধে।"

অতসী নির্ব্বাক্ হ'য়ে শোনে। চোখে ঘুম নেই, আস্তে আস্তে নেমে আসে খুব হাল্‌কা একটু তন্দ্রা। স্বপ্ন নয়, কল্পনা; ওর অবসন্ন চেতনা ছাপিয়ে ভেসে ওঠে অতীত বাস্তবের বিচ্ছিন্ন টুক্‌রো: 'মাথাটা দু'হাতে চেপে ধ'রে দীনু কাঁদে; কপাল ব'য়ে গড়ায় রক্তের ধারা। কেটে গেছে! বাঁ-দিকের কপাল—ভ্রূর ওপরটা প্রায় চার-আঙুল লম্বা হ'য়ে কেটে গেছে পাথরের চোট লেগে। —উঃ!

অতসী আঁৎকে ওঠে, অবসাদগ্রস্ত স্নায়ুগুলো ওর হঠাৎ চন্‌চন্ ক'রে ওঠে পর্য্যাপ্ত রক্তপ্রবাহে। দীনু! দীনু কাঁদে অন্ধকার পথের একপাশে ব'সে।

—না না; দীনু কে? কে ওর? ওরই মত একটা হা-ঘরে' কাঙাল। শুধু' পথের আলাপ বই ত নয়! সেই ছাতাওয়ালা, মুদির দোকানের খোট্টা ছোঁড়াটা—ওদেরই মতন সে-ও এসে জুটেছে ওর জীবনে। তা ছাড়া আর কি?

তবু পারল না। চেষ্টা ক'রেও অতসী পারল না মনের লাগামটা শক্ত ক'রে ধ'রতে। ধড়ফড়িয়ে উঠে ব'স্‌ল।—কিন্তু রাত হ'য়েছে তখন অনেক। সারা বস্তি অচেতন হ'য়ে পড়েছে। একলা বাইরে বেরোতেও ওর ভয় করে।

চৌকাঠ ধ'রে কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থেকে অতসী ত্রস্তপদে এগিয়ে গেল পদ্মর ঘরের দিকে। ওর যত রাগ, যত অভিমান নিমেষে উবে গেল।—হয় ত জানে পদ্ম! দীনুর কথা ও নিজে পারে না সব সময় বুঝ্‌তে, কিন্তু পদ্ম বোঝে। সে ওর চেয়ে অনেক বেশী চালাক।

পদ্ম ঘুমচ্ছে। মনে হ'ল, ডাকে; চীৎকার ক'রে ডাকে ওর দরজায় ঘা দিয়ে। কিন্তু পারে না। স্থাণুর মত দরজার সাম্‌নে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার ধীরে ধীরে অতসী ফিরে এলো নিজের ঘরে।—ওর বাবা তখন ঘুমিয়েছে।

অতসী অস্থির হ'য়ে উঠ্‌ল। পাগলের মত চারিদিকে চায়; কিন্তু কোথাও পায় না খুঁজে তার মনের এক তৃণ অবলম্বন। সারাটা বস্তি যেন দুপুর রাতের ঘন অন্ধকারে শাঁ শাঁ করে। কপালের পটিটা ছিঁড়ে ফেলে, রুক্ষ চুলগুলো জড়িয়ে নিয়ে, এলোমেলো পায়ে এবার সে এগিয়ে চল্‌ল গলির দিকে।—পায়ের শব্দে কুকুরটার ঘুম ভেঙে যায়, ঝিঁঝিঁ পোকাগুলো পাখার ঝাপ্‌টা দিয়ে উড়ে যায় এ-পাশ হ'তে ও-পাশে।

* * * *

তিন দিন সমানে পথে পথে ঘুরে অতসী আবার ফিরিয়ে এনেছে দীনুকে। ফিরিয়ে এনেছে সত্যি, কিন্তু আগেকার সেই দীনু যেন এই তিনটি দিনেই নিঃশেষে হারিয়ে

গেছে মহানগরীর প্রশস্ত রাজপথে। এখন আর সে ভিখিরী নয়। ভিখিরী যে কোন দিন ছিল সে, সে-কথা আজ স্পষ্ট ক'রে ভাব্‌তেও যেন দীনুর ধাঁধা লাগে।

অতসী যখন ভিক্ষে-করা চালের অগ্রভাগ থেকে ফেন-মাখা ভাতের দলাটা ওর সাম্‌নে ধ'রে দেয়, দীনু বিকৃতের মত হাসে; ওর মুখ পানে চেয়ে হাসির ঝোঁকটা নিমেষে কাটিয়ে নিয়ে বলে—"দাও, পেটের দায়ে মানুষের কাছে ভিখ্ মেগে নেওয়া পিণ্ডির ভাগ দিয়ে জ্যান্তের সৎকার করি।"

অতসী থতমত খেয়ে যায়। বিব্রত দৃষ্টিতে দীনুর মুখপানে চেয়ে ভাবে, কি উত্তর দেবে ওর কথার।—ভাতগুলো গ'লে পাঁক হ'য়ে গেছে। সেই কখন নামিয়েছে ওই ফেনসুদ্ধ ভাত!

ও কি ব'ল্‌তে চায়। কিন্তু দীনু ওর মুখের কথা নিমেষে কেড়ে নিয়ে আবার বলে' ওঠে—"আমরা কি, জানো? প্রেতাত্মা! মানুষের সংসারে বায়ুচারী নিরাশ্রয় অপদেবতা আমরা। হা-পিত্যেশ ক'রে চেয়ে থাকি ওদের মুখপানে, কতক্ষণে ঝরবে এক ফোঁটা করুণা ওদের দরকারের অঞ্জলি ছাপিয়ে। সেই দয়া, ওদের সেই এক ফোঁটা দয়া নিয়েই আমরা বেঁচে থাকি, আমাদের আত্মার সৎকার হয় অতসী, সৎকার হয়।"

অতসী বোঝে না। ওর মনে হয়, দীনুর কষ্ট হ'চ্ছে। ওই অখাদ্য আর হয় ত ও পারছে না সইতে। পারবেই বা কেমন ক'রে? এমনি কাঙালের ঘরে ত জন্মায় নি ও।—কান্না আসে, নিজের অসহায়তার কথা ভেবে অতসীর কান্না আসে। নিতান্ত কুণ্ঠিত হ'য়ে বলে—"পাঁচমিশিলি চা'ল কি-না, তাই ভাতগুলো অমন দলা পাকিয়ে যায়।"

অতসীর বেদনার্ত্ত মুখখানার দিকে চেয়ে দীনু অপ্রস্তুত হ'য়ে পড়ে। বুঝ্‌তে ওর দেরী হয় না যে, অতসী ব্যথিত হ'য়েছে। কথাটা বেশ পরিষ্কার ক'রে অতসীকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে বলে—"না রে পাগ্‌লি। আমি তা ব'ল্‌ছি না। ব'ল্‌ছি—পশু-পক্ষী, এমন কি তার চেয়েও নিকৃষ্ট—শেয়াল কুকুরগুলোরও বাঁচ্‌বার অধিকার মানুষের চেয়ে বেশী। ওরা ভিক্ষে করে না, পেটের দায়ে একজন আর-এক জনের কাছে পাতে না হাত।"—দীনু হাসে, খুব জোরে হো হো শব্দে হেসে ওঠে। পরম তৃপ্তির সঙ্গে ভাতের গ্রাসটা গলাধঃকরণ ক'রে আবার বলে—"ভগবানের সঙ্গে একবার দেখা হ'লে, তাঁর শাসন-দণ্ডটা নিতাম ছিনিয়ে। নরকের বন্দীগুলোকে মুক্ত ক'রে এনে ছেড়ে দিতাম মানুষের সমাজে। আগুন জ্বলে' উঠ্‌ত, দেখ্‌তে দেখ্‌তে আগুন জ্বলে' উঠ্‌ত ওই প্রাসাদগুলোয়।"—দীনু হাসে, আবার তেমনি জোরে হেসে ওঠে অতসীর মুখপানে চেয়ে।

অতসী বিমূঢ় দৃষ্টিতে চায়। বোঝে না; ওর কথার বিন্দুবিসর্গও প্রবেশ করে না ওর মগজে। একটু ইতস্তত ক'রে জবাব দেয়—"তুমি পুরুষ মানুষ, তুমি পার না এর উপায় ক'রতে? আমার বাবা অন্ধ, তাই আমরা ভিক্ষে করি।"

"পারি অতসী, পারি। এক নিমেষে পারি ওদের সুখে আগুন জ্বালিয়ে দিতে। ওদের ওই পালঙ্কের এক এক টুক্‌রো কাঠ সেই আগুনে একটু একটু ক'রে পুড়বে চিরকাল ধ'রে। কিন্তু কেন করি না জানো? করি না এই ভেবে যে, ওদের কান্নায় তোমাদের পাঁজরার হাড় এক একখানা ক'রে ঝরে' পড়বে পথের ধূলোয়। আকাশের বুক চিরে অসংখ্য বাজ ভেঙে প'ড়বে মানুষের মাথায়।"

—"তা পড়ে পড়ুক। তাই কর দীনু, তাই কর। আর চাই না বাঁচ্‌তে। কি হ'বে এমনি ক'রে বেঁচে? তার চেয়ে একসঙ্গে সবাই মিলে মরাই ভাল। তা বাজ প'ড়েই হোক আর ব্যামোতে ভুগেই হোক। না, ভুগে ভুগে মরার চেয়ে হঠকারি মরা ঢের ভাল।"—অতসী উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে। ওর মনে হয়, এতক্ষণে দীনুর কথার ও দিয়েছে একটা মানানসই উত্তর। এত কষ্টের ভিতরেও ওর মন যেন ভ'রে ওঠে অপরিসীম তৃপ্তিতে। মুখখানা উজ্জ্বল হয়, চোখ দুটো জ্বল্ জ্বল্ ক'রে ওঠে আনন্দে।

দীনু খাওয়ার কথা ভুলে যায়; নিতান্ত স্বপ্নাবিষ্টের মতই দু হাত দিয়ে চেপে ধ'রতে চায় অতসীর মুখখানা।

অতসী যেন চোখে-মুখে কথা বলে—"আমরা চাই না বাঁচ্‌তে। তুমি বাঁচ দীনু, তুমি বেঁচে ওঠ ওই ওদের মত জোর ক'রে।"

বাইরের জগৎটা নিমেষে মুছে যায় চোখের সম্মুখ থেকে। অতসীর বড় বড় চোখ দুটো এবার জড়িয়ে আসে তন্দ্রায়; রক্তহীন পাণ্ডুর ঠোঁট দুখানা কাঁপে।

হঠাৎ দীনু ছিট্‌কে পিছিয়ে যায়। মুহূর্ত্তে নিজেকে সংযত ক'রে নিয়ে গম্ভীর স্বরে বলে—"ভূত দেখেছ অতসী? প্রেত!—কঙ্কাল? দেখেছ কখনো? চামড়া নেই, মাংস নেই; শুধু হাড়! হাড়ে হাড়ে গাঁট-বাঁধা মস্ত শরীরটা নিয়ে হাত বাড়ায় লোকের দরজায় দরজায়। সেই কঙ্কালের পেটের ভিতর জ্বল্‌ছে আগুন, রাত্রিদিন দাউ দাউ ক'রে জ্বলে। আগে পাকস্থলী, তারপর ফুসফুস—হৃৎপিণ্ড সব দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছাই হ'য়ে যায় পুড়ে; শেষে—শেষে চোখের কোটর দিয়ে উঁকি মারে তার শিখা! দপ্‌ দপ্‌ করে, অন্ধকারে পেত্তার মত ঘুরে বেড়ায় সেই দৃষ্টি।—ভাত। নর্দ্দমায় নর্দ্দমায় খুঁজে মরে একমুঠো পচা ভাত!"

অতসী ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে ওঠে। সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে এ-দিক ও-দিক চেয়ে দীনুর গা-ঘেঁষে ব'স্‌বার চেষ্টা করে। তবুও যেন ভয় ওর কম্‌তে চায় না। ওর মনে হয়, দীনু বোধহয় দেখেছে কিছু আশেপাশে।

অতসীর মনের অবস্থাটুকু বুঝ্‌বার মত প্রকৃতিস্থতা বোধহয় দীনুর তখন ছিল না। ওর চোখের সাম্‌নে যেন সত্যি ভেসে উঠেছিল আর একটা স্বতন্ত্র জগৎ। তেমনি হাত নেড়ে নেড়ে আপন মনে ব'লে—"দেখ নি? ওই দেখ। তোমার চারপাশে আর্ত্তনাদ ক'রে ছুটে বেড়াচ্ছে তারা। ডানে, বাঁয়ে, সাম্‌নে, পিছনে—খট্‌খট্‌ করে সেই লম্বা লম্বা হাড়গুলো। গায়ে গায়ে ঠোকা লেগে চকমকির মত ছোটে আগুনের ফুল্‌কি।"

সর্ব্বাঙ্গ বিকল হ'য়ে আসে। অতসী ভয়ে আর চাইতে পারে না চোখ মিলে। মনে হয়, সত্যি বুঝি ওকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে অম্‌নি সব ছায়ামূর্ত্তি।—আরও সরে' বসে; একবারে দীনুর গায়ে গা দিয়ে।

দীনু খিলখিল ক'রে হাসে—"ওরাও মানুষ ছিল অতসী, একদিন ওদেরই মত ছিল মানুষ। আজ!—আজ আশ্রয় নিয়েছে তোমাদের এই আস্তাকুঁড়ে এসে। রাস্তার ওই ডাষ্টবিনের ধারে, ফুটপাথে, গলিতে—তোমাদের এই বস্তির ঘরে ঘরে—প্রেতাত্মা, মানুষের প্রেতাত্মা সব।" কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে দীনুর মুখ-চোখ, ওর দৃষ্টি কেমন অস্বাভাবিক হ'য়ে ওঠে।

অতসী শিউরে উঠ্‌ল। প্রাণপণ শক্তিতে দীনুর হাতখানা চেপে ধ'রে হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল ভয়ে।

উপেনের ঘুম তখনো বোধহয় গাঢ় হয় নি। অতসীর চীৎকার শুনে সে চম্‌কে উঠে ব'স্‌ল।—"ভয় পেয়েছিস্‌ মা? অতসী!"

দীনুর হাতখানা আরও একটু শক্ত ক'রে ধ'রে অতসী কম্পিতকণ্ঠে উত্তর দেয়—"না বাবা।" কিন্তু ওর সর্ব্বশরীর তখনও থর্‌থর্‌ ক'রে কাঁপে।

অতসীর অবস্থাটা এতক্ষণে সম্পূর্ণ উপলব্ধি ক'রে দীনু অত্যন্ত অপ্রতিভ হ'য়ে পড়ে। হতভম্বের মত কিছুক্ষণ ওর মুখপানে চেয়ে থেকে, আস্তে আস্তে সান্‌কিখানা আবার টেনে নেয় কোলের কাছে।

পদ্ম তখন এসে দাঁড়িয়েছে, ঠিক ওদের সাম্‌নে। কাটা ঠোঁটখানা যেন বিস্ফারিত হ'য়ে উঠেছে অদ্ভুত একটা হাসিতে।

ক্রমশঃ

মুসোলিনীর দিগ্বিজয়

শ্রীসুধাংশুকুমার বসু এম-এ

প্রায় দু হাজার বছর আগে খৃষ্টীয় সভ্যতার জন্মের পূর্বে রোমকে কেন্দ্র ক'রে যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল বহু শতাব্দীর অন্তরালেও তার গৌরব-কাহিনী ইতালী—তথা ইউরোপ ভুল্‌তে পারে নি। অগস্‌টাসের আমল থেকে প্রায় চারশ বছর ধ'রে আটলান্টিক থেকে ইউফ্রেটিস পর্যন্ত রোমের যে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল, বিভিন্ন বর্বর জাতির আক্রমণে তা বিধ্বস্ত হয়ে গেলেও তার প্রভাব কিছুমাত্র বিলুপ্ত হয় নি। রোম-সাম্রাজ্য যুগে যুগে ইউরোপের রাষ্ট্রীয় রঙ্গমঞ্চে তার প্রভাব বিস্তার ক'রে এসেছে; অন্ধকারের তিমির ভেদ ক'রে তার প্রদীপ্ত শিখা বহু রাষ্ট্রনায়কের যাত্রাপথ আলোকিত করেছে, কখনও বা মরীচিকার মতো তা কাউকে টেনে নিয়ে গিয়েছে ব্যর্থতার পথে। রোমের প্রেতাত্মা হোলি-রোমান-এম্পায়ার (Holy Roman Empire) রূপে সারা মধ্যযুগে ইউরোপের স্বাভাবিক অগ্রগতি প্রতিহত করেছিল; তার জাতীয় সংস্কৃতিকে করেছিল পঙ্গু। বর্তমান যুগের সাম্রাজ্যবাদীরা সেই প্রাচীন রোমান অধিনায়কদেরই স্বগোত্র। রোমের পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে তারা তাদের বিজয়-কেতন উড়িয়েছে উষর আফ্রিকার মরুভূমিতে, এসিয়ার নদী-বহুল জনপদে, আমেরিকার সুবিশাল প্রান্তরে। অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস এই সাম্রাজ্যবাদীদের বিজয়-গৌরবের কাহিনী।

মনে করা গিয়েছিল, ইউরোপীয় মহাসমর এই সাম্রাজ্য-বিস্তার নীতির শেষ পরিচ্ছেদ; এই মহাযুদ্ধের অবসানে ইউরোপের পররাজ্যলিপ্সার পরিসমাপ্তি ঘট্‌বে। আশা করা গিয়েছিল, ভার্সাই সন্ধি এবং জাতিসঙ্ঘ ইউরোপের প্রাচীন-পন্থী বৈদেশিক নীতির পরিহার এবং নতুন প্রগতিশীল নীতির অনুসরণ সূচনা করছে। বিশেষ ক'রে জাতিসঙ্ঘের প্রাথমিক সাফল্য শান্তিবাদী এবং আন্তর্জাতিক মৈত্রীতে বিশ্বাসী জনগণকে উল্লসিত ক'রে তুলেছিল। কিন্তু ফ্যাসিষ্ট মতবাদের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এই ধারণা অলীক প্রতিপন্ন হয়েছে। পৃথিবীতে শান্তিরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন ফ্যাসিষ্ট অধিনায়কেরা অত্যন্ত রূঢ়ভাবে বিচূর্ণ করেছে। জাপান-জার্মানী-ইতালী যে রকম অপ্রতিহত গতিতে তাদের বিজয়-রথ পরিচালনা করছে—তাতে দেখা যাচ্ছে পুরাতন সাম্রাজ্যবাদ নতুন রূপ নিয়ে পুনর্জন্ম লাভ করেছে। তার তীব্রতা ও বর্বরতা কিছুমাত্র লোপ পায় নি: বরঞ্চ তার নির্লজ্জ উলঙ্গ রূপ পূর্বের থেকে আরও ভয়াবহভাবে আমাদের চোখের সাম্‌নে জেগে উঠ্‌ছে—স্পেনে, চীনে, ইথিওপিয়ায়।

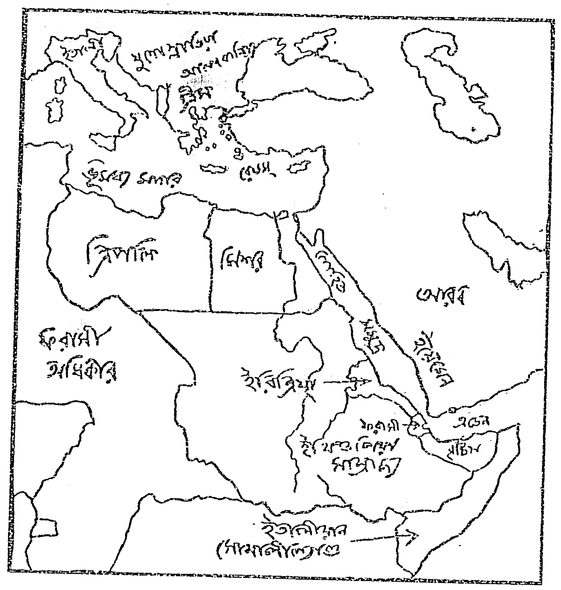

ইতালীর সাম্রাজ্য

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইতালী ছিল কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত—ফরাসী এবং অষ্ট্রিয়ার কবলে ছিল তার কিছু অংশ। শতাব্দীব্যাপী আন্দোলনের ফলে কাভুর-গ্যারিবল্‌ডীর প্রচেষ্টায় ইতালী পেল মুক্তি, পেল রাষ্ট্রীয় ঐক্য। তখন সে তার প্রতিপত্তি ও মর্যাদা-বৃদ্ধি মামলায় পরিসর-বিস্তারের সুযোগ খুঁজ্‌তে লাগ্‌ল। প্রবল শক্তিগুলি এর বহু পূর্বেই আফ্রিকার বিস্তীর্ণ ভূভাগ নিজেদের মধ্যে বাঁটোয়ারা ক'রে নিয়েছে; কাজেই লোলুপ দৃষ্টিতে সেদিকে

তাকালেও ইতালী অভিলাষ-পূরণের বিশেষ কোনও সুবিধা খুঁজে পায় নি। ফ্রান্স একরকম তার মুখের গ্রাস—টিউনিস অধিকার ক'রে নিল ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ইথিওপিয়ার (বর্তমান আবিসিনিয়া) উত্তরে, লোহিত সমুদ্রের তীরে ইরিত্রিয়ায় ইতালী তার প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করলে আফ্রিকায়। সাত বছর পরে (১৮৮৯এ) ইথিওপিয়ার দক্ষিণ-পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হ'লে ইতালীর দ্বিতীয় বিজয়-স্তম্ভ—ইতালীয়ান সোমালীল্যাণ্ডে। এই দুই রাজ্যের মধ্যবর্তী ইথিওপিয়া অধিকার করতে গিয়ে ঘট্‌ল বিপত্তি; নেগাস (সম্রাট্) মেনেলিকের হাতে ইতালীয়ান বাহিনী শোচনীয়রূপে পরাভূত হ'ল ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে আদোয়ার রণক্ষেত্রে; সে পরাজয়ের কলঙ্ক-কালিমা মুছে ফেলা ইতালীর পক্ষে দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। এই আদোয়ার জ্বালাময়ী স্মৃতিই পরবর্তী যুগে ইতালীয়ানদের উদ্দীপিত করেছে ইথিওপিয়া আক্রমণে। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তুরস্কের কবল থেকে ত্রিপলি-বিজয়ও ইতালীর লুপ্ত-গৌরব ফেরাতে পারে নি।

আফ্রিকার কয়েকটি অঞ্চলে প্রাধান্য স্থাপন করলেও সাম্রাজ্য-বিস্তারের যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা ইতালীর ছিল, তা অপরিতৃপ্তই রয়ে গেল। ইতালী তাই বিগত মহাযুদ্ধে মিত্র শক্তিপুঞ্জের সঙ্গে সহযোগিতা করে নতুন রাজ্য-জয়ের প্রত্যাশায় প্রলুব্ধ হয়ে। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে মিত্র শক্তিবর্গের সঙ্গে ইতালীর যে গোপন চুক্তি হয় তার সর্তই ইতালীকে নতুন জনপদ দেওয়া। কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী ছিলেন বিরূপ; ইউরোপের রাষ্ট্রীয় আসরে ইতালীর স্থান তখনও বিশেষ উঁচুতে নয়। তার ফলে যুদ্ধের অবসানে বৃটেন ও ফ্রান্সের তুলনায় ইতালীর অদৃষ্টে জুট্‌ল নিতান্তই ছিটে ফোঁটা। আফ্রিকায় জার্মানীর বিশাল উপনিবেশের অংশ কিছুই মিল্‌ল না; ইউরোপে মিল্‌ল ট্রেন্টিনো, আর দক্ষিণ টাইরেলি যা পূর্বে ছিল অস্ট্রিয়ার অংশ—এবং আড্রিয়াতিক উপকূলে ইস্ত্রিয়া উপদ্বীপ। বলা বাহুল্য, ইতালীর জনসাধারণ এতে তুষ্ট হয় নি। তাদের ব্যর্থ কামনার আবেগ প্রকাশ পেল যখন সেনানী কবি দান্নুন্‌ৎসিও একদল স্বেচ্ছা-সৈনিক নিয়ে রাসলো সন্ধির (১৯ ০) বিরুদ্ধাচরণ করে হঠাৎ ফিউম অধিকার করে বস্‌লেন।

ফ্যাসিস্‌ট্ মতবাদের অভ্যুদয় ইতালীর সাম্রাজ্য-বিস্তার-নীতি পুনরুদ্দীপিত করেছে, তার যে অপরিতৃপ্ত কামনা এতদিন ব্যর্থ হয়ে ফিরছিল, তা সার্থক হবার সুযোগ পেয়েছে মুসোলিনীর নেতৃত্বে। মুসোলিনীর আধিপত্য স্থাপিত হয় ১৯২২ খৃষ্টাব্দে—যখন তাঁর কৃষ্ণ বেশধারী অনুচর-বৃন্দের রোম-অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হ'ল। এই সাফল্যের মূলে ছিল ইতালীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা। রাজনৈতিক পরিমণ্ডল এবং অর্থনৈতিক পরিস্থিতি দুই-ই ছিল তাঁর অনুকূল। বৃটিশ-শাসনতন্ত্রের অনুকরণে পরিকল্পিত পার্লামেণ্টের শাসন-বিধি ইতালীয়ানদের মনোমত হয় নি; কেন না, পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র ইতালীর সমস্যা মেটাতে পারে নি। কাযেই তার বনিয়াদ ইতালীতে মোটেই দৃঢ় হয় নি। গণতন্ত্রী সরকারের 'দোলাচল-চিত্তবৃত্তি' জনসাধারণকে উদ্বিগ্ন এবং বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন করে তুল্‌লে। তাদের অকর্মণ্যতা প্রমাণ হ'ল ঘরে-বাইরে—অর্থনৈতিক সঙ্কট দিনের পর দিন গুরুতর রূপ ধারণ করলে এবং বামপন্থী মনোভাবের প্রসার বেড়ে চলতে লাগল। কিন্তু বামপন্থীদের মধ্যে ছিল অনৈক্য এবং নেতৃত্বের অভাব; তারই সুযোগ নিয়ে মুসোলিনী তাঁর সুসংগঠিত ফ্যাসিস্‌ট্ বাহিনী নিয়ে হানা দিলেন রোমের সিংহদ্বারে। আতঙ্কিত ভিক্টর ইম্যানুয়েল ফ্যাসিস্ট নেতাকে তাঁর প্রধান মন্ত্রীর পদে বরণ ক'রে নিলেন। মুসোলিনী প্রথমে অন্যান্য দলের নেতাদের নিয়ে এক কোয়ালিশন ক্যাবিনেট (মিশ্র মন্ত্রিসভা) গঠন করলেন; তারপর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিতাড়িত ক'রে হয়ে উঠ্‌লেন ইতালীর সার্বভৌম নায়ক (Dictator)। বিশেষ করে সোস্যালিস্ট দলপতি মাত্তেয়ত্তির হত্যাকাণ্ডের পর মুসোলিনীর পথ হ'ল নিষ্কণ্টক। অনেকেই মনে করে এই নৃশংস ব্যাপার মুসোলিনীর হুকুমে না হ'লেও তিনি এজন্য পরোক্ষভাবে দায়ী তা নিঃসন্দেহ। এ ব্যাপার মুসোলিনীর সৌভাগ্য-সূর্যের ওপর ছায়াপাত করলেও ক্ষণস্থায়ী প্রতিপন্ন হ'ল এবং সগৌরবে নিজেকে প্রতি করতে তাঁকে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় নি।

মুসোলিনী-শাসিত ইতালী গণতন্ত্রের আদর্শ বিসর্জন দিয়ে যে নতুন শাসনতন্ত্র গ্রহণ করেছে—তা হচ্ছে সর্ব রাষ্ট্র-তন্ত্র Corpora tive State। রাষ্ট্র এখানে সর্বময়প্রভু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এখানে বিলুপ্ত; ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিনা রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে এখানে সাধারণের জীবন-যাত্রা নিয়ন্ত্রিত

সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার অবশ্য বিলুপ্ত হয় নি এবং উৎপন্ন সম্পদ্ রাষ্ট্রের সম্পত্তি ব'লে গণ্য হয় না। কিন্তু অর্থনৈতিক জীবন অনেকটাই রাষ্ট্র পরিচালিত। সোভিয়েট রুশিয়ার মত ইতালীতেও এক-নায়কত্ব থাক্‌লেও রুশিয়ার সঙ্গে সাদৃশ্য ওখানেই শেষ; কেন না, ফ্যাসিজ্‌মের মূলমন্ত্রই হচ্ছে সাম্যবাদের বিলোপ-সাধন। রুশিয়ার এক-নায়কত্ব হচ্ছে সর্বহারার কর্তৃত্ব (Dictatorship of the Proletariat)। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন ক'রে শ্রেণীবিহীন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। ফ্যাসিজ্‌ম্ এই আদর্শের পরিপন্থী এবং ধনিক সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে অভিলাষী। সাম্যবাদের ভিত্তি-স্বরূপ যে সমস্ত মতবাদ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে ফ্যাসিস্‌ট্ দৃষ্টি-ভঙ্গীতে সে সবই ভ্রান্ত ও অনিষ্টকর প্রতিভাত হয়েছে। অতএব নির্মমভাবে তাদের গতি প্রতিরোধ করা ফ্যাসিজমের উদ্দেশ্য।

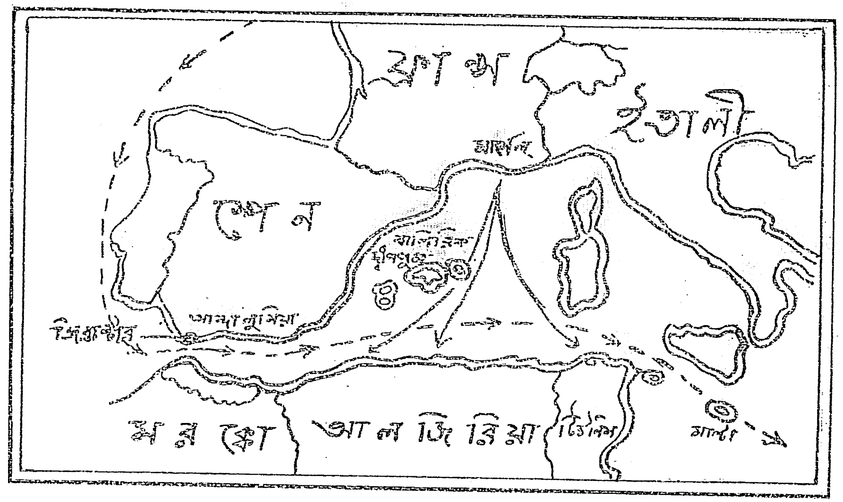

স্পেনের অবস্থান
——→ ফ্রান্সের সঙ্গে তার উপনিবেশের যোগসূত্র
·····→ ভারতের পথ

জনবলে বিশেষ বলীয়ান্ হ'লেও ধনবলে ইতালী অন্যান্য মহাশক্তির তুলনায় হীন। জনসংখ্যা তার বর্তমানে ফ্রান্সকে অতিক্রম করে গেছে বটে, কিন্তু প্রকৃতি-দত্ত সম্পদ তার নিতান্তই অপ্রচুর, যার ফলে বৃটেন ফ্রান্স জার্মানীর তুলনায় শিল্পকলা বিশেষ প্রসার লাভ করে-নি। ইতালীর বহু অঞ্চল শৈলসঙ্কুল ও বন্ধুর;—কাজেই কৃষিকার্যের অনুপযোগী। কয়লা এবং লোহা যা বর্তমানকালে আর্থিক উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য তা এখানে নেই বললেই চলে। এর ফলে ইতালীর পক্ষে শিল্প গড়ে তোলা সম্ভবপর নয়, যদি না সে বিদেশ থেকে প্রচুর কাঁচামাল পায়। রবার, টিন, অভ্র, তামা, তুলো, পেট্রল—ইতালীতে এ সবেরই অভাব। কাজেই ইতালীর দারিদ্র্য দূর করে তাকে আত্মনির্ভরশীল করতে হ'লে চাই নতুন অঞ্চলে অধিকার বিস্তার—যেখানে এই সমস্ত পণ্য-সম্ভার পর্যাপ্ত পরিমাণে মিলবে। শুধু তাই নয়, ইতালীর জনসংখ্যা যে রকম দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে তার অতিরিক্ত অধিবাসীদের বসবাসের জন্য নতুন অঞ্চল নিতান্তই প্রয়োজন—নয় ত আর্থিক অবনতি অনিবার্য। মহাসমরের পূর্বে চোদ্দ বছরে প্রায় সাড়েআশী লক্ষ ইতালীয়ান তাদের মাতৃভূমি পরিত্যাগ করে বিদেশবাসী হয়। বর্তমান বিশ্বব্যাপী অর্থসঙ্কট এই বিদেশ-গমন বন্ধ করেছে। ইতালীর এমন কোন উপনিবেশ নেই যেখানে এই জনপ্রবাহের আশ্রয় মিলতে পারে। ইতালী তাই চায় নতুন সাম্রাজ্য—পুরাতন রোম-সাম্রাজ্যের পুনর্জন্ম—যা' তার অর্থনৈতিক সঙ্কটের অবসান ঘটাবে।

মুসোলিনীর দিগ্বিজয়ের উদ্দেশ্য কতকটা অর্থনৈতিক, কতকটা রাষ্ট্রনৈতিক, কতকটা বা সামরিক। অর্থনৈতিক দিক থেকে কাঁচা মাল সরবরাহ করার উৎস ইতালীর প্রয়োজন; বাড়্‌তি প্রজাবৃন্দের আস্তানাও একটা চাই; সবচেয়ে বড় কথা, রাষ্ট্রীয় আসরে প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন উপনিবেশ। বৃটেন ও ফ্রান্সের কথা ছেড়ে দিলেও বেলজিয়ম-হল্যাণ্ড-পর্তুগালের মত স্বল্পায়তন রাষ্ট্রগুলিরও রয়েছে সাগর-পারে বিস্তীর্ণ উপনিবেশ;

ইতালীর মত মহাশক্তির তা না থাক্‌লে মানহানি ঘট্‌বার কথাই। ইতালী তাই তার কলঙ্ক মোচন কর্‌বার জন্যে বিশেষ ব্যগ্র হয়ে পড়েছে। সামরিক প্রয়োজনও তুচ্ছ নয়; কেন না, প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলি যদি ইতালীর পদানত হয় তাহলে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা তার পক্ষে সহজসাধ্য হবে।

সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে ফ্যাসিজ্‌মের আত্মরক্ষার উপায়। সর্বহারা জনসাধারণের ওপর ফ্যাসিষ্ট মতবাদ আধিপত্য বিস্তার করেছে অনেক প্রলোভনে ভুলিয়ে। ফ্যাসিষ্ট ধুরন্ধরেরা অন্নহীনদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তাদের ক্ষুধার জ্বালা মেটাবার, কর্মহীনদের সান্ত্বনা দিয়েছেন তাদের জীবিকার সংস্থান ক'রে দেবার; ব্যবসায়ীদের আশ্বাস দিয়েছেন তাদের মূলধন জোগাবার। সংক্ষেপে তাঁরা ধূলির পৃথিবীতে সোনার স্বর্গ-রচনার স্বপ্ন দেখিয়েছেন জনসাধারণকে। তারই মোহে পড়ে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের দুর্বলতায় বীতশ্রদ্ধ কর্মহীন, অন্নহীন সর্বহারার দল ভিড় জমিয়েছে মুসোলিনীর পতাকার নীচে। ইতালীর অবস্থা খানিকটা ফিরেছে ফ্যাসিষ্ট আমলে তা অস্বীকার করা যায় না, কিন্তু তার বহু সমস্যার সমাধান আজও ভবিষ্যতের গর্ভে রয়ে গেছে এবং তাদের সম্পূর্ণভাবে মেটানো মুসোলিনীর পন্থায় অসাধ্য। ফ্যাসিজ্‌মের এই ব্যর্থতা গোপন কর্‌বার জন্যই নতুন ক'রে বিংশ-শতাব্দীতে রোম-সাম্রাজ্যের পত্তন কর্‌তে হয়েছে।

মুসোলিনীর প্রতিপত্তি ও প্রভাব নির্ভর করে তাঁর জনপ্রিয়তার ওপর—আর সেই জনপ্রিয়তার ভিত্তি হচ্ছে তাঁর কর্মকুশলতা, তাঁর নীতির সাফল্য। যদি তাঁর কর্মপন্থা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় তা হ'লে অসন্তোষের আগুন উঠ্‌বে জ্বলে, উদ্যত-ফণা সর্পের মত জেগে উঠ্‌বে বিদ্রোহীদল; তাসের প্রাসাদের মতই ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্রতন্ত্র পথের ধূলায় লুটিয়ে পড়্‌বে। তাঁর ওপরে প্রকৃতিপুঞ্জের শ্রদ্ধা অবিচলিত রাখ্‌বার প্রকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে সমর-অভিযান। বিগত যুগের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখিয়ে জনসাধারণকে মোহগ্রস্ত করে রাখ্‌তে পার্‌লে তাঁর আভ্যন্তরীণ নীতির বিফলতার দিকে আর কারুর নজর পড়্‌বে না। যুদ্ধের মাদকতায় উত্তেজিত জনমণ্ডলী তাদের অভাব ভুলে থাক্‌বে—

অগ্নি-শিখা হবে অন্তর্হিত; আর মুসোলিনীর আধিপত্য থাক্‌বে অটুট। অতএব সুরু হ'ল মুসোলিনীর দিগ্বিজয়! ইথিওপিয়া-অধিকার; তারপর স্পেন-অভিযান এবং তারও পরে আলবেনিয়া-গ্রাস।

ইতালীয়ান বিজয়-অভিযানের প্রথম বলি হ'ল ইথিওপিয়া বা আবিসিনিয়া। খনিজ-সম্পদ সম্বন্ধে খ্যাতি থাক্‌লেও ইথিওপিয়ার পর্বতমালা তার স্বাধীনতা অব্যাহত রেখেছিল। তার ঊষরভূমি ইউরোপীয় উপনিবেশের উপযোগী নয়; এরই ফলে অন্যান্য জাতির লুব্ধ দৃষ্টি তাকে এড়িয়ে চলেছিল। তার উপরে ফ্রান্স-বৃটেন-ইতালীর পরস্পরবিরোধী স্বার্থ তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখ্‌তে সহায়তা করেছিল এবং ইথিওপিয়ার জাতিসঙ্ঘের সদস্য পদ লাভ তারই প্রকাশ। মুসোলিনীর উদ্যত বজ্র গিয়ে পড়্‌ল প্রথম ইথিওপিয়ার ওপর, তার কারণ হচ্ছে আফ্রিকায় সেই ছিল একমাত্র নিরাপদ আক্রমণের ক্ষেত্র। তার ওপরে ইতালী একবার ও দেশ জয় কর্‌তে গিয়ে পরাজয় বরণ কর্‌তে বাধ্য হয়েছিল। কাজেই পূর্ব-অপমানের প্রতিশোধ-স্পৃহা সহজেই ইতালীয়ানদের উত্তেজিত ক'রে তুল্‌বে। হাইলে সেলাশী অনেকটা জাতি-সঙ্ঘের সাহায্য প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু এর পূর্বেই জাপানের মাঞ্চুরিয়া-অভিযান লীগের দুর্বলতা প্রমাণ করেছিল; কাজেই জাপানের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে মুসোলিনী জাতি-সঙ্ঘকে উপেক্ষা করে ইথিওপিয়া আক্রমণে মন দিলেন। কিন্তু যে বৃটেনের প্রভাবে জাতি-সঙ্ঘ জাপানের বেলায় ছিল নিষ্ক্রিয়, সেই বৃটেনের নেতৃত্বে জাতি-সঙ্ঘ এবার সক্রিয় হয়ে উঠ্‌ল এবং মুসোলিনীর অভিযান নিষ্ফল হবার উপক্রম হ'ল। বৃটেনের ইথিওপিয়া সম্বন্ধে এতটা উৎকণ্ঠা অবশ্য বৃটিশ-স্বার্থ বজায় রাখ্‌বার জন্য। উত্তর ইথিওপিয়াস্থিত টানা হ্রদ থেকে জলপ্রবাহ এসে পুষ্ট করে নীল নদকে। ইথিওপিয়া ইতালীর কবলে এসে পড়্‌লে সেখানে বাঁধ-রচনা করে তারা অনায়াসে জলস্রোতের গতি ফিরিয়ে বৃটেনের স্বার্থহানি ঘটাতে পারে। অতএব জাতি-সঙ্ঘের মৌলিক চুক্তি (Covenant) অনুযায়ী জাতি-সঙ্ঘের সদস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার অজুহাতে ইতালীর ওপর আর্থিক চাপ প্রয়োগ (Sanctions) করা হ'ল। কিন্তু তা ব্যর্থ হ'ল ফ্রান্সের ঔদাসীন্যে। ইতালীকে পেট্রোল সরবরাহ বন্ধ করা যেতে পারত এবং তা হ'লে ইথিওপিয়ার স্বাতন্ত্র্য

বজায় থাক্‌ত। কিন্তু কার্যত তা ঘট্‌ল না। বিমান-বহর, বিষাক্ত গ্যাস ও যন্ত্রচালিত বাহিনী দুরধিগম্য ইথিওপিয়া সহজেই জয় ক'রে ফেল্‌লে। আদ্দিস্ আবাবার পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইথিওপিয়ার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হ'ল। হাইলে সেলাশী হলেন রাজ্যচ্যুত; ইতালীর অধিপতি পেলেন—ইথিওপিয়া-সম্রাট্ আখ্যা। বিংশ শতাব্দীতে প্রাচীন রোমের প্রেতাত্মা জেগে উঠ্‌ল আবিসিনিয়ার দুর্গম প্রান্তরে।

নবযৌবনের সীজারের দৃষ্টি এবার ফির্‌ল—ইউরোপের দিকে। ভূমধ্য-সাগর হচ্ছে ইতালীয়ানদের More Nostrum "আমাদের সাগর;" কিন্তু তা পরিণত হয়েছে বৃটিশ হ্রদে। কেন না, এটি ভারত-সাম্রাজ্যের দ্বার রূপে গণ্য হয়ে থাকে। "আমাদের সমুদ্রে" ইতালীর একচ্ছত্র অধিকার-বিস্তার হ'ল মুসোলিনীর সঙ্কল্প। ইথিওপিয়া বিজয় এক হিসাবে ব্যর্থ হয়েছে, কেন না স্বাধীনতা-প্রিয় ইথিওপিয়ার অধিবাসীরা ইতালীর কর্তৃত্ব নির্বিবাদে মেনে নেয় নি। দুর্ধর্ষ হাব্‌সীরা আজও গরিলা-যুদ্ধ চালিয়ে চলেছে। বস্তুত কয়েকটি শহরে এবং তারই চতুঃসীমানায় ইতালীর অধিকার সীমাবদ্ধ। যে সোনার হরিণের পেছনে তিনি ছুটেছিলেন তা মরীচিকা হলেও 'দুচের' (Duce) একটি উদ্দেশ্য সফল হয়েছে কেন না, ইথিওপিয়া তাঁকে লোহিত-সমুদ্রের চাবিকাঠি এনে দিয়েছে, ওপারে ইয়েমেনের সঙ্গে ইতালী বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ। কাজেই যুদ্ধ বাধ্‌লে বৃটেনের বাণিজ্য-পথ-নিয়ন্ত্রণ তার পক্ষে সুকঠিন হবে না। ইতালী তাই 'ইস্‌লাম-রক্ষক' আখ্যা নিয়ে লোহিত সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চলে তাঁর প্রভাব-বিস্তার কর্‌তে ব্যস্ত; তা হ'লে লোহিত সমুদ্র তার মুঠির মধ্যে এসে পড়্‌বে।

ইথিওপিয়ার পর স্পেনের ভাগ্যাকাশে দুর্দিনের কালো মেঘ ঘনিয়ে এলো। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে সেখানে সুরু হ'ল এক নিদারুণ অন্তর্বিপ্লব: বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থীদের মধ্যে এক প্রচণ্ড সংঘাত। সাম্যবাদের উচ্ছেদ কামনায় অভিজাতসম্প্রদায়, পুরোহিতমণ্ডলী ও সেনানীবর্গ ধনিক-তন্ত্রের কর্তৃত্ব বজায় রাখ্‌বার জন্য গণতন্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা কর্‌লে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে। এই ঘরোয়া বিবাদের সুযোগ নিয়ে দুই ফ্যাসিষ্ট নেতা এলেন দক্ষিণপন্থীদের সহায়তা কর্‌তে। নিরপেক্ষতার ভাণ ক'রে গণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলি রইল উদাসীন; প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলির পথ হ'ল প্রশস্ত। ফলে মাদ্রিদের পতনের (১৯৩৯) সঙ্গে সঙ্গে স্পেনে হ'ল গণতন্ত্রের সমাধি—বাজ্‌ল ফ্যাসিজ্‌মের বিজয়-ডঙ্কা। শুধু যে স্পেন ফ্যাসিজ্‌মের প্রভাবে এসে পড়্‌ল তাই নয়, ব্যালিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ এল ইতালীর হাতে। বৃটেন ও ফ্রান্স একযোগে চেষ্টা করলে রুশিয়ার সহায়তায় স্পেনকে অনায়াসে বাঁচানো যেতে পারত—ফ্রাঙ্কোর পতন ছিল অনিবার্য। কিন্তু সাম্যবাদী জুজুর ভয়ে কম্পমান বৃটেন ও ফ্রান্সের শাসক-সম্প্রদায় কর্‌ল নিরপেক্ষতার প্রহসন এবং ইতালীর হাতে তুলে দিল নিজেদের মরণ-কাঠি।

স্পেন হচ্ছে বর্তমানে বৃটেন এবং ফ্রান্সকে বিপন্ন কর্‌বার সবচেয়ে সুবিধাজনক কেন্দ্র। ব্যালিয়ারিক দ্বীপ-পুঞ্জ থেকে অনায়াসে ছিন্ন করা যাবে ফ্রান্সের সঙ্গে তার উত্তর-আফ্রিকার উপনিবেশগুলির যোগ-সূত্র—যুদ্ধের সময় এরা ফ্রান্সের প্রধান সহায়—রোধ করা যাবে বৃটেনের ভারত-গমনের পথ। উত্তর-স্পেন থেকে অক্লেশে দক্ষিণ ফ্রান্স আক্রমণ করা চল্‌বে বিমানপথে। আন্দালুসিয়া এবং স্প্যানিশ্ মরক্কো ভূমধ্য-সাগরের ঘাঁটি আগ্‌লে রাখ্‌লে জিব্রাল্‌টার হবে শক্তিহীন। ওদিকে ইয়েমেন-ইথিওপিয়া যোগাযোগ হ'লে লোহিতসাগর হবে দুষ্প্রবেশ্য। তার ওপরে স্পেন হাতে থাক্‌লে ইতালী-জার্মানী ডুব-জাহাজের অত্যাচারে বিরোধী-দেশগুলিকে বিপর্যস্ত করে তুল্‌বে বিস্কে উপসাগরে এবং ভূমধ্যসাগরে। কাজেই স্পেন অভিযানের সাফল্য গণতন্ত্রী রাজ্যগুলিকে করেছে সঙ্কটাপন্ন এবং ইতালীকে করেছে উল্লসিত।

মুসোলিনীর তৃতীয় অভিযান—আদ্রিয়াতিক উপকূলে আলবেনিয়ায়। এটি একটি নিতান্ত ক্ষুদ্র বল্‌কান রাজ্য; জনসংখ্যা দশলক্ষের বেশী নয় এবং তার অধিকাংশই মুসলমান। জীবনযাত্রা নিতান্তই সরল এবং এরা ইউরোপের দরিদ্রতম জাতি বলেই পরিগণিত। পশুচারণই এদের প্রধান অবলম্বন হলেও এরা প্রায়ই নিরামিষাশী। বহুকাল আলবেনিয়া ছিল তুরস্কের অধীনে। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন ক'রে আলবেনিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে; প্রিন্স্ উইলিয়ম হ'লেন রাজপদে অভিষিক্ত। মহাসমরের পর ইতালীর সহায়তায় গণতন্ত্র স্থাপিত হ'ল—কিন্তু

অন্তর্বিপ্লব মিটল না। যুগোশ্লাভিয়া এবং ইতালীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চল্‌ল এখানে প্রভাব বিস্তার নিয়ে। সাম্যবাদী ফ্যান্ নোলিকে বিতাড়িত করে আমেদ জোগু হলেন রাষ্ট-নায়ক (১৯২৫ খৃষ্টাব্দে) যুগোশ্লাভিয়ার সাহায্যে। তারপর গণতন্ত্রে জলাঞ্জলি দিয়ে হ'লেন ইতালীর সহযোগিতায় রাজা প্রথম জোগ। আলবেনিয়া এর পর থেকে বরাবরই ইতালীর আশ্রিত-রাজ্য বলে গণ্য হয়ে এসেছে। সুতরাং এ দেশে আধিপত্য স্থাপন কর্‌তে মুসোলিনীর কিছুমাত্র কষ্ট হয় নি। ইতালীয়ান অভিযানের সূচনাতেই রাজা জোগ সিংহাসন পরিত্যাগ ক'রে আশ্রয় নিলেন গ্রীসে। বিনা রক্ত পাতে আলবেনিয়া ইতালীর কুক্ষীগত হ'ল।

আপাতদৃষ্টিতে এই দরিদ্র দেশটিতে লোভনীয় কিছুই নেই। তার পণ্যসম্ভার কিছুমাত্র মূল্যবান্ নয়। তার উৎপন্ন ফসল এখানকার লাখ দশেক অধিবাসীর আহার্য জোগায়—এই মাত্র। কিছু পেট্রল হয় ত মিল্‌তে পারে; কিন্তু তা এত নীচুদরের জিনিষ যে মজুরী পোষায় না। সুস্পষ্ট রূপেই বোঝা যাচ্ছে, আর্থিক লাভ এ অভিযানের উদ্দেশ্য নয়;—উদ্দেশ্য হচ্ছে আদ্রিয়াতিকে ইতালীর একচ্ছত্র প্রাধান্য স্থাপন করা। আলবেনিয়া দখলের ফলে আদ্রিয়াতিক এল ইতালীর কবলে, ফলে যুগোশ্লাভিয়ার সমুদ্রদ্বার রইল ইতালীর হাতে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রীসের সীমান্তে এসে পড়্‌ল ইতালী। এবার গ্রীসের ওপর চাপ দেওয়া চল্‌বে অনায়াসে, যুগোশ্লাভিয়া আস্‌তে বাধ্য হবে ইতালীর প্রভাবে এবং ভূমধ্যসাগরের ওপর অধিকারটা হবে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত। More Nostrum (Our Sea) 'আমাদের সমুদ্র' সত্যই ইতালীয়ান লীলাভূমিতে পরিণত হবে।

মনে হচ্ছে, গ্রীস এবং যুগোশ্লাভিয়ার দুর্দিন ঘনিয়ে আস্‌ছে। যদিও বর্তমানে ইতালী এবং জার্মানী মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ তবুও ভবিষ্যতের কথা কে বল্‌তে পারে? জার্মানী যে রকম দেশের পর দেশ অধিকার করে শক্তি বৃদ্ধি কর্‌ছে তাতে মুসোলিনীর আশঙ্কার সঞ্চার হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। কাজেই ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে ইতালী চাইছে রাজ্য-বিস্তার—বল্‌কান্ উপদ্বীপে—যাতে সে জার্মানীর সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিতে পারে। তা হ'লে প্রীতিতে না হোক ভয়ে অন্তত জার্মানী তার মিতালী চাইবে। নইলে জার্মানী হয় ত ইতালীকেই পদানত করে ফেল্‌বে—তাকে জার্মানীর করদ রাজ্যে পরিণত কর্‌বে। সেই পরিণামের শঙ্কায় ইতালী তার দৃষ্টি দিচ্ছে আশে-পাশে রাজ্য-বিস্তারের আশায়। অতএব অচিরেই যদি গ্রীস এবং যুগোশ্লাভিয়া মুসোলিনীর রোম-সাম্রাজ্যের অংশ বলে গণ্য হয় তাতে বিস্মিত হবার বিশেষ কিছুই নেই।

কেন ঘুম ভাঙালে না ?

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

তুমি যে আসিয়াছিলে কাল রাত্রে; বিষণ্ণ প্রভাতে
তাহারি নিবিড় ছায়া পড়িয়াছে এ মনোদর্পণে,
সমস্ত রাতের ক্লান্তি রেখে গেলে বেদনার সাথে
ফিরিয়া গিয়াছ তুমি নতমুখে অতি সন্তর্পণে।

কাল রাত্রে জ্যোৎস্না ছিল, মেঘমুক্ত নির্ম্মল আকাশ
গন্ধদীপ জ্বালা ছিল সারা রাত্রি বাতায়ন তলে,
মঞ্জরিত মল্লিকার মর্ম্মরিত সুরভি নিঃশ্বাস
সারা রাত্রি শুনিয়াছি ব্যথাতুর নয়নের জলে।

সন্ধ্যা মালতীর বনে কাল ছিল রঙের উৎসব
উতলা মনের কোনে রাঙা হয়ে ফুটেছিল আশা,
প্রমত্ত মাধবী তার অন্তরের সুগন্ধ বৈভব
দুই হাতে বিলাইয়া মৌন মুখে জাগাইল ভাষা।

নিশুতি রাত্রির মোহে জেগে ছিনু কাল সারা রাতি
নয়ন-পল্লব ছেয়ে নেমেছিল স্বপ্নের জড়িমা
বন-বীথিকার মন পরিশ্রান্ত, ছিল নাক সাথী
কুসুম-আস্তীর্ণ পথ, সে পথের ছিল নাক সীমা।

না জানি কখন ঘুম নেমে এল ক্লান্ত আঁখিপাতে,
গন্ধ-দীপ নিবে গেল, উবে গেল কুসুম-সৌরভ
তুমি কি আসিয়াছিলে তখনি সবার অসাক্ষাতে?
শুনিতে পাওনি তুমি দখিনার ব্যথিত নিঃশ্বাস?

আজি প্রভাতের আলো ম্লান হ'ল মেঘের ছায়ায়
কুসুম ঝরিয়া গেল তোমার পথের দুই ধারে,
ইন্দ্রধনু রচেছিনু হায় বন্ধু, কাহার মায়ায়
স্বপন ভাঙ্গিয়া গেল —নিরাশায় চাহি বারে বারে।

কেন ফিরে গেলে প্রিয়—প্রিয়তম তোমারি সকাশে
এ মোর বাসর-সজ্জা দীপান্বিতা উজল ভবন,
উতলা নিশীথ রাত্রি জেগে ছিল পরম আশ্বাসে
সুগন্ধ-বিধুর বনে মেতেছিল দখিনা পবন।

দুয়ার ছিল না বন্ধ, আমি শুধু অচেতন ঘুমে
মুক্ত বাতায়ন তলে সুখসুপ্ত জ্যোৎস্নার জোয়ার
কেন ভাঙিলে না ঘুম, হে নিঠুর, অকৃপণ চুমে
রজনীগন্ধার মালা সে যে প্রিয় একান্ত তোমার।

অসীমের সীমা

শ্রীশরদিন্দু সেনগুপ্ত

(কথানাট্য)

বাণীর ঘর। ছোট একটা লিখিবার টেবিল, খান দুই চেয়ার। মেহগেনি পালিশ করা সেকেলে ধরণের একটা জবড়জঙ্ ড্রেসিং-টেবিল। খাটটাও একটু পুরানো আমলের; ফুলতোলা একটা বেড্‌স্প্রেড্ দিয়া ছোট বিছানাটি ঢাকা। দেয়ালে একটা বিলাতি কুকুরের ছবি—তার নীচে ছোট একটা ক্যালেণ্ডার ঝুলিতেছে: দেখিলেই বোঝা যায়, তারিখ দেখিবার প্রয়োজনে সেটা টাঙানো হয় নাই—কুকুরের ছবিটাই মুখ্য, তারিখ দেখাটা গৌণ! এপাশের দেয়ালে দুখানি অয়েলপেণ্টিং—দুখানাই ল্যাণ্ড্‌স্কেপ্—ছবির চেয়ে ফ্রেমের ঐশ্বর্য্যই চোখে বেশি পড়ে। ল্যাণ্ড্‌স্কেপ্ দুখানির মাঝখানে বাণীর বাবা আর মার একসঙ্গে বাঁধানো একটা ছবি একটু উঁচু করিয়া টাঙানো। খানিকটা নীচে সমবয়সী পাঁচটি মেয়ের একটা গ্রুপ ফটো; সবারই পরণে কন্‌ভোকেশন গাউন ও টুপি। ইহাদের মধ্যে বাণী সেনকেও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।

ঘরের ওপাশের দেয়াল ঘেঁসিয়া কোণের দিকে একটা আলমারি, তার পাশে একটা আলনা, অন্য দিকে মাঝারি একটা টেবিল, তাহার উপর কয়েকখানি বই সাজানো, কয়েকটা বই ছড়ানো। একটা চকোলেট্ রং-এর উলের বাণ্ডিল, অর্দ্ধসমাপ্ত একটা স্কার্ফ্, তাহাতে দুটি বুনিবার কাঁটা বেঁধানো।

শীতের বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। বাণী ঘরে আসিল—হাতে কয়েকখানি খাতা, সঙ্গে তার বন্ধু উমা। উমাকে কোথায় যেন দেখিয়াছি মনে হইতেছে!...বাণীদের গ্রুপ ফটোর মধ্যে ওই মেয়েটিই ত বাণীর কাঁধে হাত রাখিয়া বসিয়াছে। ঘরে ঢুকিয়া বাণী টেবিলের উপর হাতের খাতাগুলি রাখিল—আর ব্লাউসের সঙ্গে ক্লিপে আঁটা কলমটি খুলিয়া রাখিল লিখিবার টেবিলের উপর। হাতের মুঠিতে ছোট রুমালটাও সেইখানেই স্থান পাইল। উমা আসিয়া বাণীর বিছানায় বসিল—বাণী একটা চেয়ারে—সেখান হইতে ড্রেসিং টেবিলের আর্শীতে তাহার ছায়া পড়িয়াছে। বাণী মাঝে মাঝে চকিতে এক-একবার আয়নায় প্রতিফলিত নিজের মুখখানি দেখিয়া লইতেছে। শ্যামবর্ণা হইলেও চোখের দীপ্তিতে, মুখের লাবণ্যে, অঙ্গের স্বাস্থ্য, সৌষ্ঠব ও কমনীয়তায় তাহাকে অপূর্ব্ব মনে হয়। সে-ই প্রথম কথা কহিল—

বাণী। তাই ভাবছি, আজ এলে কি বলবো!.. এসে অবধি আমার সঙ্গে একরকম কোন কথাই হয়নি—পুনা যাওয়া অবধি এমনি ক'রেই যদি চলে, আমি বেঁচে যাই।

উমা নিরুত্তর

বাণী। সেদিন একবার একটু আভাস দিয়েছিল, আমি তাড়াতাড়ি কথাটাকে ঘুরিয়ে দিলাম।

উমা। ঘুরিয়ে দিলি?...সত্যি কথাটাকে এড়িয়ে গেলি বল্।

বাণী হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল; অর্থাৎ সে এত সীরিয়াস্ যে উমাকে পর্য্যন্ত 'তুমি' করিয়া বলিতে সুরু করিল

যা তোমরা মনে কর!...মিছিমিছি অপ্রিয় প্রসঙ্গ কারই বা ভাল লাগে? তোমাদের কথা ঢের শোনা গেছে। মামাবাবু হেসে উড়িয়ে দিলেন, মামীমা আমার কোন কথা কানেই তুললেন না!...আমিও তেমনি তোমাদের দেখিয়ে দেব যে যত সাধারণ তোমরা আমাকে ভাবো আমি তা নই!

উমা। এই অহঙ্কারেই তুই গেলি! কিন্তু বিশ্বজিৎ চৌধুরীও কিছু সাধারণ ছেলে নয়। এটুকু অসাধারণত্ব তোর না থাকলে এত মেয়ে থাকতে বাণী সেনকেই বা সে এতখানি ভালবাসবে কেন?...কিন্তু কা'কেই বা এ-সব বলা?

বাণী। সবই বোঝা গেছে তোমাদের!...অনাথা হ'লে যা হয় আর কি!...আমার মা-বাবা বেঁচে থাকলে

উমা। কি বললি তুই!...অনাথা?...ছি, ছি, বাণী, —মামীমা-মামাবাবু শুনলে কি মনে করবেন?...অত অধঃপতন হয়েছে তোর! দেবতার মত মামা, দেবীর মত মামীমা—'বাণী' 'বাণী' ক'রে অস্থির—তোর একটু বাধলো না?...ছিঃ...

বাণী চেয়ার হইতে উঠিয়া উমার পাশে বসিল

বাণী। সত্যিই কি আমি তাই বলেছি নাকি? মাপ কর্ ভাই!...তোরাই ত আমায় বলাস এসব কথা!...

বাণীর চোখে জল

উমা। মামাবাবুকে আজই আমি ব'লে দেব মৃত্যুঞ্জয়, পশুপতি এদের যেন আর এ-বাড়ীতে ঢুকতে না দেন।···

বাণী। কেন শুনি?

উমা। কেন আবার কি? ওরাই ত তোর মাথা খেয়েছে। বাণীদি!·· দেবী বাণীদি! ধ্যানী বাণীদি!··· একটা ছেলে ত সেদিন তোকে প্রণাম পর্য্যন্ত করতে গিয়েছিল! মজা হচ্ছে যে তুই এ-গুলো খুব উপভোগ করিস—মনে করিস যে এমন একটা কিছু তুই হয়েছিস যার জন্যে এগুলো তোর প্রাপ্য!···

বাণীর মুহূর্ত্তকাল আগেকার চোখের জল অন্তর্হিত হইয়াছে। চোখে-মুখে একটা চাপা হাসি।···দেখিতে দেখিতে সেই ক্ষীণ হাসিটুকু যেন কুটিল হইয়া উঠিল

বাণী। এসব কথা যত কম বলিস্ ততই ভাল। একথা আমি এই প্রথম শুনছি না—বহুবার শুনেছি। কিন্তু তোর মুখ থেকেও যে শুনতে হ'বে—ভাবিনি!·· দেখছি তুই-ও আমাকে হিংসে করিস্। আমাকে সম্মান করে, সমীহ করে, ভক্তি করে—অনেকেরই এটা সহ্য হয় না—আমি তা জানি। আজ জানলাম তুইও সেই দলে।···

উমা। চমৎকার!···তোর দর্প আজ তোকেও ছাড়িয়ে গেল বাণী!···

বাণীর মামীমা ঘরে ঢুকিলেন। তাঁর পরণে চওড়া লালপাড় শাড়ী—উজ্জ্বল তাঁর বর্ণ। কপালে প্রকাণ্ড সিঁদুরের ফোঁটা। তাঁর সমস্ত মুখখানি ভরিয়া যেন হাসি ছড়াইয়া আছে

উমা। দেখুন মামীমা, বাণী কি বলছে!···আমি নাকি ওকে হিংসে করি!···

যেন পরিহাস করিয়াই বলিয়াছে—বাণী এমনি একটা নির্লিপ্ত হাসি টানিয়া আনিল

বাণী। করিস্-ই ত!···হিংসে করলে বলবো না?··

মামীমা। বেশ করেছিস বলেছিস।···এখন দু'জনে যা মুখ-হাত ধুয়ে নে। তোদের মামা ব'সে আছেন একসঙ্গে চা খাবেন ব'লে।···আর উমি, তুই আজ রাত্তিরে এখানেই খেয়ে যাবি। আমি তোদের ওখানে খবর পাঠাচ্ছি।···

উমা। (ব্যস্তভাবে) না, না, মামীমা—সে আর একদিন হ'বে। প্রায়ই ত' খেয়ে যাচ্ছি। আজ চা খেয়েই আমি চ'লে যাবো!···

বাণী। ইস্!···ওমনি ওঁর গেলেই হ'ল কি-না!

উমা। তুই আমার সঙ্গে কথা বলিস না। আমি তোকে হিংসে করি!···বাড়ীতে পেয়ে যে অপমান করে, তার সঙ্গে আমি কথা কই না।

বাণী। (উমাকে জড়াইয়া ধরিল) সত্যি তুই রাগ করেছিস্?···

উমা। (একটু কঠিন সুরে) না, ছাড়্!···

মামীমা। মান-অভিমান ঝগড়া-ঝাঁটি পরে করিস্। এখন শীগগির আয়, উনি ব'সে আছেন।··

বাণীর ঘর শূন্য পড়িয়া রহিল। জানালা দিয়া শীতের গোধূলির সোনালী আলোর আভা দেয়ালে পড়িয়াছে। মালী আসিয়া একগুচ্ছ বিচিত্র বর্ণের গন্ধহীন ফুল ফুলদানীতে রাখিয়া গেল।··একটু পরে তুষার-শীতল অন্ধকার নামিয়া আসিল—নিস্তব্ধতা যেন কথা কহিতে উঠিতেছে। প্রায় আধঘণ্টা পরে সহসা স্নিগ্ধ নীলাভ আলোয় ঘরখানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ইলেক্‌ট্রিক্ সুইচ হইতে বাণীর হাত নামিয়া আসিতেছে—উমাও ঘরে আসিয়াছে। বিছানায় বসিতেই বোধ হয় উমার ভাল লাগে—বাণী ড্রেসিং-টেবিলের সামনে একমুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া উমার পাশে আসিয়া বসিল

উমা। আমার লজ্জা নেই তাই বলছি—বিশ্বজিৎ-এর ঋণ তুই এ-জীবনে শুধতে পারবি না।···মনে কর্ আই-এ ক্লাশের কথা, কার জন্যে তুই অত ভাল নম্বর পেয়েছিলি? আজ তুই হয়তো বলবি—মামাবাবুর জন্যে। কিন্তু সেদিন এই বাণীই বিশ্বজিৎ চৌধুরীর প্রশংসায় শতমুখ হ'য়ে উঠতো। মামাবাবুর পাণ্ডিত্য তোর কাছে বিদ্যা লাগতো—কিন্তু বিশ্বজিৎ-এর জ্ঞান তোর কাছে কত লোভনীয় ছিল তা তুই-ই কতবার স্বীকার করেছিস।

বাণী। পরীক্ষায় ভাল ফল করাটাই তখন জীবনে সবচেয়ে বড় জিনিষ ছিল। আজ আর তা মনে করি না। যে-জীবনের স্বাদ আমি পেয়েছি—ভাল ছাত্রী হবার মোহ তার কাছে তুচ্ছ হ'য়ে গেছে। ঠিক সেই জন্যেই তখন যা মনে করতাম এখন তা মনে করি না!···ওসব কথা এখন তাই মনেও হয় না।

উমা। কিন্তু আমি মনে করিয়ে দেব।···এম্-এ পরীক্ষায় বিশ্বজিৎ যখন হিষ্ট্রিতে ফার্ষ্ট হ'ল—তুই বলেছিলি —ও মামাবাবুর মুখ রেখেছে!···তারপর আমার কাছে

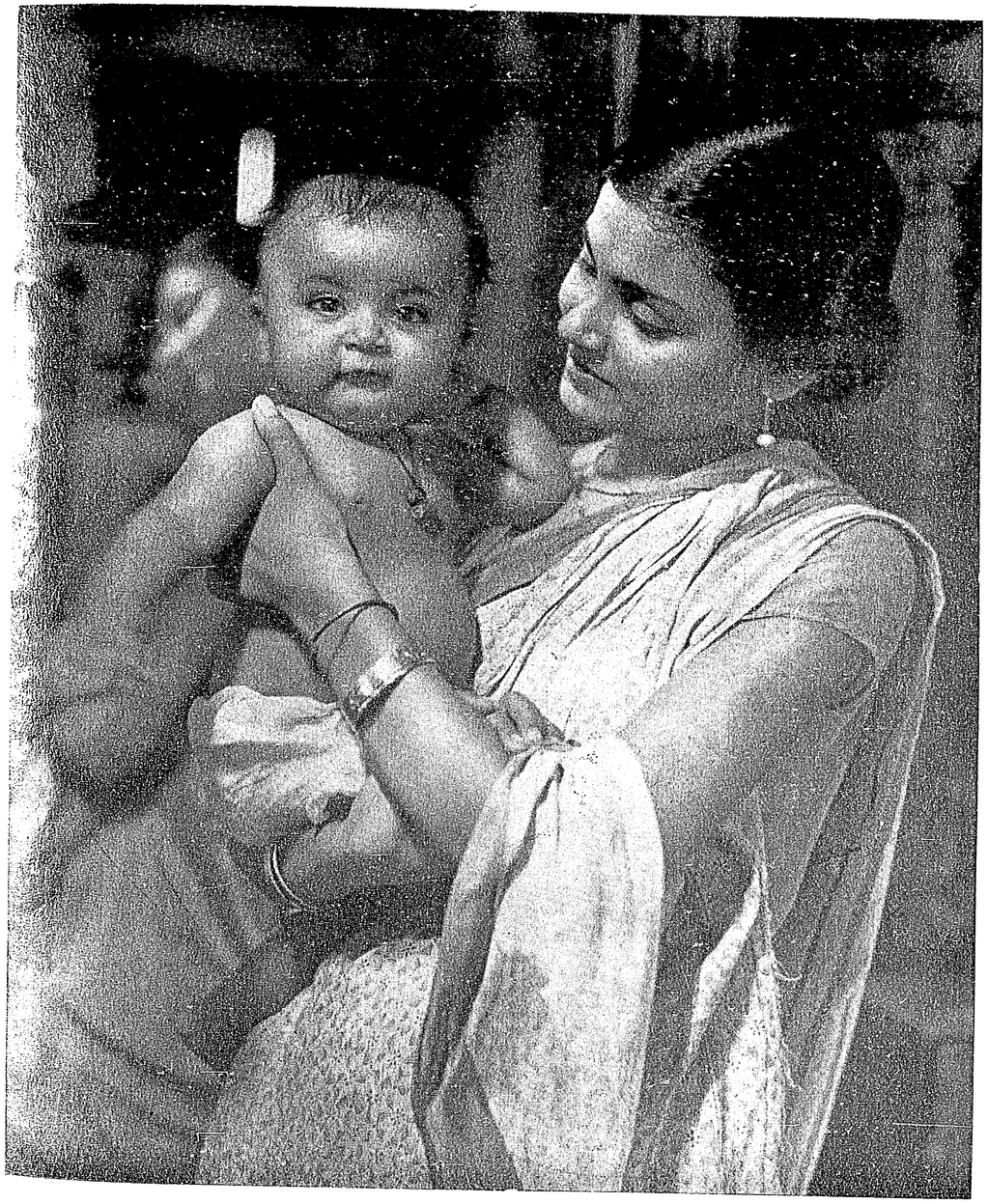

সব দেবতার আদরের ধন,
নিত্য কালের তুই পুরাতন —রবীন্দ্রনাথ

শিল্পী—নরেন্দ্র বসু, বেলিয়াঘাটা

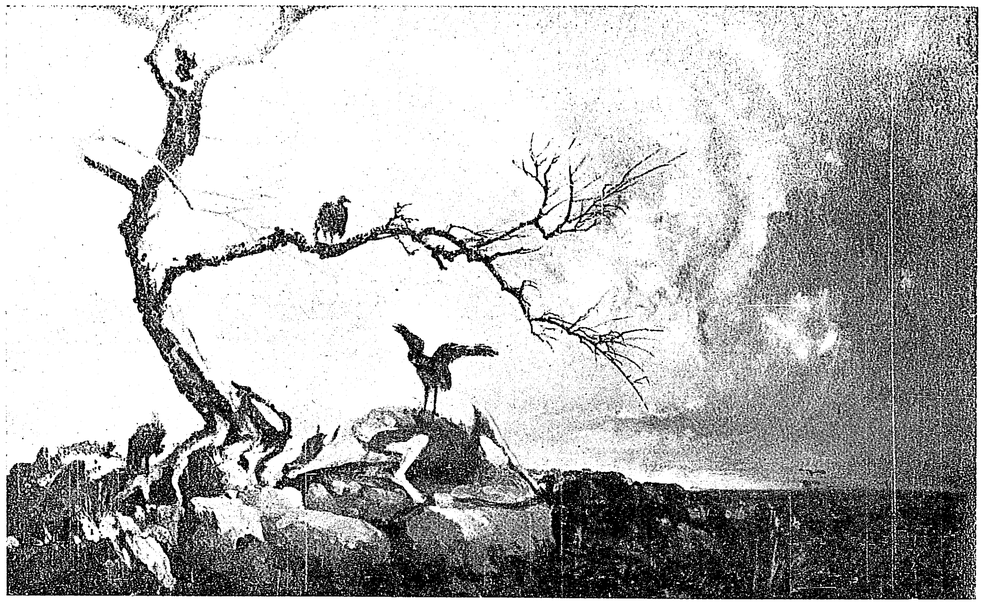

শকুনির স্বর্গ

শিল্পী—শ্রীদেবপ্রসাদ রায়চৌধুরী
প্রিন্সিপাল, মাদ্রাজ আর্টস্কুল

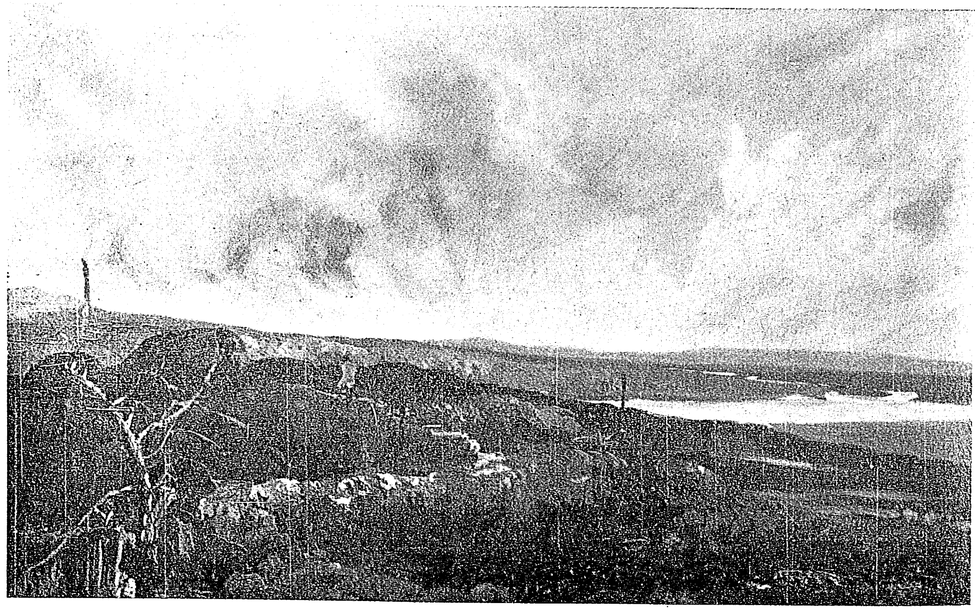

ঝড়ের পূর্ব্বে

শিল্পী—শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরী, মাদ্রাজ

কাছে মুখ এনে বলেছিলি—'বিশ্বজিৎ আমার বিশ্ব !...' কি হারাতে বসেছিস্ তুই নিজেই তা জানিস্ না !...

বাণী। তুই বুঝবি না উমা, কত বড় আমার দায়িত্ব, কত আমার কাজ !...হ্যাঁ, একদিন বলেছিলাম—বিশ্বজিৎ আমার 'বিশ্ব'। তখন তাই ছিল। তার প্রশংসায় মামাবাবু মুখর হ'য়ে উঠতেন। বি-এ পরীক্ষায় সে একটা মাঝারি সেকেণ্ড্ ক্লাশ অনার্স্ পেয়েছিল—কিন্তু এম্-এতে সে ফার্ষ্ট হ'ল ! পরিচিতদের মধ্যে কেউ কোন কৃতিত্ব দেখালে আনন্দ হয়—আমারও হয়েছিল।

উমা। শুধুই আনন্দ ?...আর কিছু নয় ?...

বাণী। আবার কি !...আর এতে ওর চেয়ে মামাবাবুর কৃতিত্বই ঢের বেশী !...মাঝারি সেকেণ্ড্ ক্লাশ অনার্স্ পাওয়া আর পাস্-কোর্স্-এ পাশ করা প্রায় একই ! তার চেয়ে বরং ডিষ্টিংশনে পাশ করা ঢের শক্ত।...সেই ছেলেকে ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট করানো—এ শুধু মামাবাবুই পারেন।...

উমা। তাঁর আরো ছাত্র ছিল, তারা সবাই তলিয়ে গেছে। তারপর লণ্ডন ইউনিভার্সিটির পি-এইচ্ ডি !... সেখানে ত মামাবাবু ছিলেন না !...কিন্তু কৃতিত্বের কথাই যদি বললি—সেটা হয় ত আর কারও নয়—তোর !...

বাণী। আমার ?

উমা। হাঁ, তোরই !...তুই ছিলি তার প্রেরণা।...সে জানত তোকে পেতে হ'লে গুরুর কৃপা চাই। মামাবাবুকে তুষ্ট না করলে ঈপ্সিত বরলাভ হ'বে না !...সে বুঝেছিল, তাঁর তুষ্টি আপন শিষ্যের কীর্ত্তিতে !...বাণী, ভুল করবি, ভয়ানক ভুল করবি !...এই মোহ ক দিনের ?...এই ত ছ-সাত মাস পরে এম্-এ দিবি—তারপর ? এসব কত দিন টিঁকবে !...কয়েকটা হুজুগপ্রিয় ছেলেমেয়ে আজ মাতামাতি করছে, তোকে দেবী বানাচ্ছে, পূজো করছে। (একটু থামিয়া) কিন্তু বিসর্জ্জনেরও আর দেরী নেই।... সেদিন কোথায় থাকবে তোর 'শক্তি-সঙ্ঘ' !...

বাণী। শক্তি-সঙ্ঘ আমার প্রাণ !...যদি জানতিস্ একে আমি কত ভালবাসি—এ আমার কত বিনিদ্র রাত্রির কল্পনার রূপ !...

উমা। সব জানি। কিন্তু একটু ভুল হ'ল ; সঙ্ঘ তোর প্রাণ নয়, তুইই তার প্রাণ। সমস্ত দেহমনের উত্তাপ দিয়ে তুই একে বাঁচিয়ে রেখেছিস্।...আমি তোকে বলছি—তুই আজ চ'লে আয়, দেখি কোথায় থাকে এই প্রতিষ্ঠান ! ওই মৃত্যুঞ্জয় পশুপতি ওরা কি তোর আদর্শের কথা বোঝে মনে করিস্ ? ওদের কথা শুনে বুঝিস্ না, ওরা কত অন্তঃসারশূন্য—কত হাল্‌কা !...সঙ্ঘের কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশনে তোর সমস্ত প্রস্তাবে ওরা সায় দেয়। অতসী, মণিকা, শান্তা—এরা ত কোন কথাই বলে না !... 'বাণীদি বলেছেন'—সুতরাং এর ওপর আর কোন কথাই চলতে পারে না !...

বাণীর ঠোঁটের কোণে বিদ্যুৎ-এর মত হাসি খেলিয়া গেল—উমা চুপ করিল

বাণী। আচ্ছা, আজ হঠাৎ তুই এত উঠে-প'ড়ে লাগলি কেন বল্ ত ?...

উমা। আর যে সময় নেই বাণী—আর সময় নেই !... আমার মন বলছে তোর চেতনা ফিরে আসবে, তোর মোহ ভাঙ্‌বে।...

বাণী। এ আমার মোহ নয়—আমি অচেতনও নই !... তুই যেন মরিয়া হ'য়ে কথা বলতে সুরু করলি !...

উমা। প্রতিটি মুহূর্ত্ত কাটছে আর বিশ্বজিৎ এগিয়ে আসছে। আর একঘণ্টার মধ্যেই সে এসে পড়বে।... বাণী, অনেক দিন আগেকার সত্য যে আজও মিথ্যে হ'য়ে যায় নি, আমি তা জানি।...আমি তোকে দেবী ভাবি না, কিন্তু ভালবাসি—তাই তোকে আমি জানি ! ..

ঘরের বাহিরে জুতার শব্দ শোনা গেল। বাণীর মামা—প্রোফেসার মজুমদার—বাহির হইতে উমাকে ডাকিতে ডাকিতে ঘরে ঢুকিলেন। বাণী ও উমা উঠিয়া দাঁড়াইল। ..চাইনীজ্‌দের মত পীতাভ তাঁর বর্ণ, প্রকাণ্ড চওড়া কপাল, মাথার অবিন্যস্ত কেশ বিরল হইয়া আসিয়াছে। তাঁর গায়ে অতি সাধারণ ফ্লানেল্-এর শার্ট—গলা হইতে বুকের এবং হাতের সব কটি বোতাম আঁটা। পায়ে ব্রাউন চামড়ার চটি

মামা। উঠে পড়লে কেন, বোস, বোস !...উমা, তারা এসেছে।...

উমা। কারা মামাবাবু ?...

মামা। পশুপতি আর মৃত্যুঞ্জয়।...জানো ত তোমার মামীমা আজ নিজে সব রান্না করছেন ;—বললাম, ওদের তোমার রান্নার নমুনা কিছু পাঠিয়ে দাও, তা উনি একেবারে তেড়ে এলেন !...বিশ্ব না খেলে কারুরই কিছু

ছোঁবার জো নেই, সে না আসতে আধখানা ফ্রাই-ও আমরা পাবো না !···তা যাই বলি না কেন, বিশ্বকে খাইয়ে কিন্তু আনন্দ হয় ।···

উমা। বিলেত যাবার আগে এখানে একদিন ওঁর খাওয়া দেখেছিলাম—পাঞ্জাবীর ডানহাতের আস্তিন তুলে খাওয়া আরম্ভ করার ভঙ্গীটা আমার এখনো মনে আছে—ঠিক যেন লড়াই করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন !

বাণী। আচ্ছা, আমি তা হ'লে একটু নীচে যাচ্ছি। চ্যারিটির টিকিট বিক্রী আরম্ভ হ'য়ে গেছে, অথচ কাজ কিছুই এগোয় নি, আজই সব প্ল্যান শেষ ক'রে ফেলতে হ'বে কি-না !···আমার একটু দেরী হ'তে পারে ।···

মামা। দেরী হ'বে ?···কত দেরী ?···

বাণী। কত আর ?···ঘণ্টাখানেক ।···

মামা। একঘণ্টা !···কেন ?···দেখ, ওদের বরঞ্চ কাল আসতে ব'লে দাও। বিশ্বর আসার সময় হ'য়ে এলো যে !···

বাণী। বা-রে !···যে খুশী আসুক না, তাই ব'লে আমার কাজ বন্ধ থাকবে নাকি ?···

বাণীর কথায় কেমন একটা আবদারের সুর ! সে চলিয়া গেল। তাহাকে কি একটা বলিতে গিয়া মামাবাবুর আর বলা হইল না। সহসা তাঁহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, উমার দিকে চাহিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন

মামা। লজ্জা পেয়েছে, না ?···তাই অমন ক'রে পালিয়ে গেল !···

উমা নিরুত্তর

মামা। (একটু শঙ্কিত কণ্ঠে) কি হয়েছে উমা ?

উমা। ও বিয়ে করবে না বলছে ।···

মামা। ওঃ, এই কথা !···সে ত আমাদেরও বলেছে। ···তুমি বুঝছ না, এসব মনের কথা নয় !···তুমি ভেবো না, এ-রকম সবাই বলে।

উমা। আমিও তাই ভেবেছিলাম, কিন্তু ওর জনসেবার সৌখীন আদর্শ আজ এত বড় হ'য়ে উঠেছে যে আর কোন চিন্তাকেই ও ঠাঁই দেবে না।

মামা। পাগল আর কি !

উমা। তবু বিশ্বজিৎ এখানে থাকলে কি করত বলা যায় না ! কিন্তু তাঁর পুনা কলেজে কাজ হওয়ায় যতটা সহজ আপনারা মনে করছেন, ঠিক তা নয় !···

মামা। কি মুস্কিল !···সেখানে প্রস্‌পেক্টস্ কত বেশি ! ···পাঁচ বছরের মধ্যেই সে হেড্ অফ্ দি ডিপার্টমেণ্ট্ হ'বে !···সঙ্ঘ !···সঙ্ঘ—না ছাই—যত সব হুজুগ আর ফাঁকা কথার ঝড় ! (একটু চুপ করিয়া অপেক্ষাকৃত নীচু গলায়) বিশ্ব আমার কত প্রিয় বাণী তা জানে, আর আমিও জানি সে বাণীরও কত প্রিয়, কত শ্রদ্ধার !···ও যেদিন বিলেত চ'লে গেল, বাণীকে আমি সেদিন কাঁদতে দেখেছি ।···উমা, আমরা বুড়ো হয়েছি, কিন্তু চিরদিন বুড়ো ছিলাম না ।··· যে কাঁদায় নারীর মন তাকেই চায় !

ভৃত্য দীনবন্ধু প্রবেশ করিল

দীন। বিশ্ব-দাদাবাবু এয়েছেন—মা খবর দিতে বললেন।

মামা। (বিরক্তভাবে) 'বিশ্ব-দাদাবাবু !' 'বিশ্ব-দাদা-বাবু !'···বিশ্রী শোনায় দীনবন্ধু !···কেন, শুধু 'দাদাবাবু' বলতে পারিস্ না ?···বাড়ীতে কি পঞ্চাশটা দাদাবাবু আছে নাকি ?···দিদিমণি এখনও লাইব্রেরী ঘরে ?···

দীন। আজ্ঞে !

মামা। (অন্যমনস্কভাবে) কেন ?···ও—আচ্ছা তুই যা।

দীনবন্ধু তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ কাহারো মুখে কথা নাই।···একটা ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছে। উমা উঠিয়া কাঁচের শার্সিগুলি বন্ধ করিয়া দিল

মামা। (অনেকটা আপনমনে) পশুপতি আর মৃত্যুঞ্জয় !···চমৎকার নাম ! 'পশু' আর 'মৃত্যু' ! দুইই মানুষের বর্জ্জনীয়। নাঃ, বাণীকে আমি বারণ ক'রে দেব। সে ত এমন ছিল না। তুমি হয় ত ঠিকই বলছ উমা !··· গেল হপ্তায় বিশ্বজিৎ কলকাতা পৌঁছেচে, এর মধ্যে দুদিন এখানে এলো—রোজই মনে হয়েছে বাণী যেন নিজেকে কেমন আড়াল ক'রে যাচ্ছে !···

উমা। অই ত ভাবছিলাম, আপনার চোখে কি এই পড়েনি ?···আপনি ঠিকই দেখেছেন, বাণী নিজে এ-কথা আমায় বলেছে।

মামা। কিন্তু তাই বা কি ক'রে হ'বে ? সে ত অত সহজে নিভে যাবার ছেলে নয় !

বাণী ঘরে আসিল। মামাবাবুও উমার দিকে একটু সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া টেবিলের এলোমেলো বইগুলি গুছাইতে লাগিল

বাণী। ছাত্রের প্রশংসা ত তোমাদের মুখে ধরে না। আটটার মধ্যে আসবার কথা—সাড়ে আটটা বাজতে চলল ! তোমরা ব'লে তাই এত আগ্রহ ক'রে ব'সে থাক !

উমা ও মামাবাবু পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন

মামা। তার জন্যে আর কেউ যে আগ্রহ ক'রে ব'সে থাকার নেই। কিন্তু তোর মামী যে সন্ধ্যে থেকে রান্নাঘরে ঢুকেছেন—একবার দেখেও এলি না !

বাণী। ইচ্ছে ক'রেই যাই নি ! অত কি !

উমা। বাড়ীতে কে এল, কে যাচ্ছে—এত সব দেখবার সময় কোথায় ?···তারপর শক্তি-সঙ্ঘের নতুন খবর কি ? কত টাকার টিকিট বিক্রী হ'ল ?

বাণী। শুধু বিজ্ঞপ করতেই পারিস্ ।···মৃত্যুঞ্জয় আর পশুপতি সারাদিন কি ঘোরাটাই ঘুরছে ! আজই ত প্রায় দেড়শো টাকার টিকিট শেষ হ'য়ে গেছে ! মৃত্যুঞ্জয় বললে, গাড়ীটাকে সকাল থেকে একটু রেষ্ট্ দিইনি বাণীদি ! সঙ্ঘের জন্যে ওরা যা করছে উমা !···আমাদের কাজ যদি এ-রকমভাবে এগোতে থাকে, যে-কোন রিলিফ-ওয়ার্কে আমরা স্বাধীন ইউনিট্ পাঠাতে পারব।

মামা। কেন, মিলে-মিশে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও ত কাজ করা যায়। কো-অপারেশন হ'লেই শক্তি বাড়ে ! ছোট একটা স্বাধীন ইউনিট কতটুকু কাজ করতে পারবে ?

বাণী। যতটুকু পারে ! কিন্তু তা ব'লে বড় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে আমাদের চাপা দিয়ে রাখতে চাই না।

উমা। তোর সঙ্ঘ থেকে তুই যে আজ বড় হ'য়ে উঠেছিস এই সত্যটা তুই নিজেই প্রমাণ করলি ! তোর জন্যেই সঙ্ঘ, তুই সঙ্ঘের ন'স্ !···

বাণী। অন্যের কর্ম্মপদ্ধতিতে আমরা বিশ্বাস করি না, আমাদের একটা স্বাতন্ত্র্য আছে। দেশের বড় প্রতিষ্ঠানের আদর্শের সঙ্গে আমাদের আদর্শের প্রভেদ আছে, সুতরাং নিছক কো-অপারেশন-এর খাতিরে আমরা নিজেদের বৈশিষ্ট্য বিসর্জ্জন দিতে পারি না !·· তাই যদি করব, তবে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান গড়লাম কেন—সেই সব মহাসমিতিতে যোগ দিলেই পারতাম। আমি চাই সবাই আমাদের সঙ্ঘের বৈশিষ্ট্য ও অভিনবত্ব জানুক, আমাদের কর্ম্মপদ্ধতি যাদের প্রাণে সাড়া জাগাবে তারা আমাদের কাজে যোগ দিক। ছোট ছোট সঙ্ঘের সম্মিলনে যে অস্বাভাবিক মহাসঙ্ঘ গঠিত হয় তার মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য্য !···এই গৃহ-বিবাদ বাইরে আত্মপ্রকাশ করতে বেশি সময় নেয় না। ইতিহাস থেকে এর অনেক প্রমাণ আমি দিতে পারি।

মামা। তুই ত দিব্যি বক্তৃতা দিতে পারিস দেখছি !

বাণী। আমি যা বুঝি তাই বলতে চেষ্টা করি। কেউ মেনে নেয় ভাল—না মানে তা'র সঙ্গেও আমার বিবাদ নেই। আদর্শ—তর্ক ক'রে বোঝাবার জিনিষ নয়। এই ত দেখ না, যুক্ত-পরিবার-প্রথার বিরুদ্ধে আমাদের কয়েকটা যুক্তি আছে, কিন্তু প্রচার করার মত শক্তি ও সামর্থ্য এখনো হয়নি—উপযুক্ত শক্তি সঞ্চিত না হ'তেই যারা কাজ আরম্ভ করে নিজেদের তারা শুধু দুর্ব্বল ক'রে ফেলে !···

মামা। আমাকে ত কই কোন দিন তোদের মেম্বার হ'তে বলিস নি !

বাণী। সঙ্ঘের নিয়ম অনুসারে তুমি সভ্য হ'বার অনুপযুক্ত।

মামা। বিশ্বকে মেম্বার করেছিস্ ?

বাণী। সে-ও বোধ হয় উপযুক্ত নয় !···

উমা। চলুন, আমরা নীচে যাই ।···বিশ্বজিৎ অনেকক্ষণ এসেছে।

তাঁহারা বাণীর ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। মামাবাবুর শেষ কথাটির রেশ যেন তখনও সমস্ত ঘরখানিতে ভাসিয়া ফিরিতেছে। একটু পরে উমা আবার ঘরে ঢুকিল

বাণী। ফিরে এলি যে বড় !···

উমা। তোকে একবার দেখতে এলাম। বিশ্বজিৎকে নীচে গিয়েই আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু প্রকাণ্ড একটা ভুল করবার ঠিক আগে মানুষকে কেমন দেখায় দেখছি !

বাণী। কিসের ভুল ?

উমা। বিশ্বজিৎকে ভুল বোঝানোর ভুল !··· 'পরমারাধ্যা বাণীদি', 'সীমাহীন বাণীদি', 'চির-স্নেহময়ী বাণীদি' আত্মপ্রবঞ্চনা করছেন, এর চেয়ে অধিকতর দর্শনীয় বস্তু আর কি হ'তে পারে ?

বাণী। না-রে, আত্মপ্রবঞ্চনা করতে যাব কেন?··· ভাল আমি বাসি উমা—তাকে কি না-ভালবেসে পারা যায়? কিন্তু ভালবাসলেই কি বিয়ে করতে হ'বে?··· তুই-ও ত তাকে কত ভালবাসিস্ !···সে-কথা থাক—কি হয়েছে জানিস্—তুই আমাকে ভালবাসিস্ ব'লে আমার সুখের কথাটাই ভাবছিস্, আর আমি ভাবছি আমার আদর্শের কথা! বিয়েটাও একটা আদর্শ। কিন্তু সবার জীবনের উদ্দেশ্য ত এক হ'তে পারে না ভাই! (অনেকটা যেন আত্মসমাহিত ভাবে) দিনের পর দিন মহত্তর এবং বৃহত্তর আদর্শের দিকে মানুষের মন ছুটে চলে। অনেক দিন আগে—যখন জীবনে বিশ্বজিৎ আসে নি—তখন আমার আদর্শ ছিল, মামীমা-মামাবাবুর সেবা করবো, যতদিন বাঁচব তাঁদের কাছে থাকব, তাঁদের সুখই হ'বে আমার সুখ, আমার গৌরব!···তারপর এল বিশ্বজিৎ।··· সে এল অপরিচয়ের অন্ধকার থেকে আমার জীবনকে আলোকিত ক'রে।···মামাবাবুর কাছে কত ছেলে এসেছে, কিন্তু তাকে দেখে, তার সান্নিধ্যে এসে মনে হ'ল এমনটি আর দেখিনি! আদর্শ সেদিন রূপান্তরিত হ'ল।···মনে হ'ল, (একটু থামিয়া) কি মনে হ'ল তুই তা জানিস্। তারপর সে বিলেত চ'লে গেল। একদিন শক্তি-সঙ্ঘের স্বপ্ন দেখলাম! সেই শক্তি-সঙ্ঘ আজ রূপ নিয়েছে—এর চেয়ে বড় আর কিছুই মনে হয় না।·· মূলে কিন্তু আমাদের সেই চিরন্তন ধর্ম্ম—সেবা!···মামা-মামীমার সেবায় তৃপ্তি হ'ল না—এল প্রেম। নারীর প্রেম ত সেবারই নামান্তর!···সেই অতৃপ্ত সেবার আকাঙ্ক্ষাই আজ বহুর মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে চাইছে!···

উমা। কিন্তু বিবাহিত জীবনেও ত জনসেবা করা যায়!

বাণী। যায়, কিন্তু বহু ত্রুটি থাকে। বিয়ের কতকগুলি বিশেষ দায়িত্ব আছে—কর্ত্তব্য আছে। দুদিক বজায় রাখতে গিয়ে কোনটাই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় না।···না উমা, এসব তর্কের জিনিষ নয়।···আজ তাকে বলব; সে কি আমায় ভুল বুঝতে পারে?

উমা। জানি না—কিন্তু যদি সে তোর কথাই মেনে নেয়!···থাক্—অনেক রূঢ় কথা আজ তোকে বলেছি, আর আমার কিছুই বলবার নেই!

উমা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।··বাণী উঠিয়া বন্ধ কাঁচের জানালা আবার খুলিয়া দিল—এক ঝলক শীতল বাতাসে তাহার সুন্দর চূর্ণকুন্তল দুলিতে লাগিল। জানালার ওপারের অন্ধকার পটভূমিকা হইতে রাজপথের বিশীর্ণ আলোক তাহার কমনীয় মুখখানিতে রেখায় রেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে!···

বিশ্বজিৎ ঘরে ঢুকিল। তাহার গায়ে ঢিলে হাতার সাদা সার্জ্জ-এর পাঞ্জাবী—বাঁ কাঁধের উপর একটা সাদা শাল অবিন্যস্তভাবে ঝুলে রহিয়াছে। স্বাস্থ্য-সমুন্নত অবয়বে তাহার স্নিগ্ধ-শ্যামল বর্ণটিই সুন্দর মানাইয়াছে। সে ঘরে ঢুকিতেই বাণী জানালার পাশ হইতে হাসিমুখে আগাইয়া আসিল

বাণী। বসুন।

বিশ্বজিৎ। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা লাগাচ্ছ ত?···শীতের সময় প্রায়ই ত তোমার আবার টন্‌সিল ফোলে!···এতটুকু সাবধান যদি হ'বে!···এখনো ছেলেমানুষী গেল না?···

বাণী। যত দিন ছেলেমানুষ থাকতে পারি, বুড়ো হ'তে গেলেই ত ফুরিয়ে গেল! কিন্তু আপনি ছাড়া আর কেউ আমাকে ছেলেমানুষ ভাবে না, সবাই আমাকে ভয় করে।···

বিশ্বজিৎ। আমিও ত' তোমাকে ভীষণ ভয় করি!··· হ্যাঁ, উমা বলছিল বটে—ষ্টুডেণ্ট্ মহলে তুমি নাকি মস্তবড় লীডার হয়েছ—কী একটা সঙ্ঘ গড়েছ বলল—সত্যি নাকি?

বাণী। (একটু গম্ভীর-মুখে) লীডার হবার যোগ্যতা কোথায় আমার; আর একা কোন প্রতিষ্ঠান গড়বার শক্তিও আমার নেই। সাধ্যমত সবাই কিছু ভাল কাজ এবং বড় কাজ করতে চেষ্টা করে, আমরাও করছি এতে কারো ক্ষতি করছি না ত!

বিশ্বজিৎ। এই দেখ, তুমি রাগ ক'রে বসলে! সত্যি বাণী, তুমি এখনও ছেলেমানুষই আছ।···কাদের নিয়ে তোমার সঙ্ঘ, কি তার কাজ কিছুই আমি জানি না;—এই দু দিন এলাম, কই এক দিনও ত তুমি আমায় কিছু বল নি! উমা যা বলেছে তাই শুধু বললাম—এতেই তুমি রাগ করলে!

বাণী। বা-রে, রাগ করলাম কখন? সঙ্ঘের কথা আপনাকে বলিনি, বলবার মত কিছু নয় তাই!

বিশ্বজিৎ। থাক, বলবার মত যখন নয়, শুনতে চাই না।

বাণী। না, না, আপনি ভুল বুঝবেন না···

ঘরের নিস্তব্ধতা ক্রমেই অস্বস্তিকর মনে হইতেছে। বিশ্বজিৎ-এর মুখে চিন্তার ছায়া পড়িয়াছে

বিশ্বজিৎ। এবার এম-এ এগজামিন কবে?

বাণী। জুলাই-এর মাঝামাঝি।

বিশ্বজিৎ। এখনো প্রায় ছ মাস আছে, কেমন হ'বে আশা করছ?

বাণী। শুনলে আপনি রাগ করবেন—কিছুই তৈরী হয়নি!···ক মাস ত বই ছুঁতেই পারিনি।

বিশ্বজিৎ। অবিশ্যি এম-এ পাশ করাটা এমন কিছু মহৎ কাজ নয় যে এগজামিন তোমায় দিতেই হবে।··· তবে এখন আর ইস্কুলের ছাত্রী নও, যা করবে ভাল ক'রে করাই উচিত। তারপর তোমার মামার কত বড় আকাঙ্ক্ষা, তোমাকে দিয়ে তাঁর কত আশা!···টেনে-টুনে একটা সেকেণ্ড ক্লাশ পাওয়া যে তোমাকে মানায় না এটা ত বোঝ!···

আবার সেই অসহনীয় নিস্তব্ধতা। বিশ্বজিৎ ঘড়ি দেখিল—প্রায় ন'টা বাজে

বিশ্বজিৎ। আমি কালই পুনা রওনা হচ্ছি,—অগাষ্ট মাসেই কি তবে ছুটি নেব?

বাণী। ছুটি নেবেন?

বিশ্বজিৎ। ছেলেমানুষী রাখো!

বিশ্বজিৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। পকেট হইতে ছোট মখমলের কৌটা বাহির করিয়া খুলিতেই প্ল্যাটিনাম্ ব্যাণ্ড, বিদ্যুৎ-এর মত ঝলসিয়া উঠিল। ···সে বাণীর দিকে আগাইয়া গেল।···বাণীর সমস্ত শক্তি কে যেন হরণ করিয়াছে!·· দীপ্তিহীন চোখে সে বিশ্বজিৎ-এর দিকে চাহিয়া আছে।··· ডান হাতখানি তুলিয়া বিশ্বজিৎ বাণীর অনামিকায় আংটি পরাইয়া দিল। বিবশমুখে বাণী কি যেন বলিতে গেল—বলা হইল না। হাতখানি রাখিয়া প্রশান্ত পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে বিশ্বজিৎ বাণীর মুখের দিকে চাহিল

বাণী। এ কি করলেন?

বিশ্বজিৎ। আংটি পরিয়ে দিলাম।

বাণী। কেন এমন করলেন?···কেন···

পরম তৃপ্তিতে বিশ্বজিৎ-এর সমস্ত মুখখানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। সে ধীরে ধীরে দেয়ালের কাছে আগাইয়া গিয়া বাণীর বাবা-মা'র যুগল ফটোখানির দিকে চাহিয়া রহিল

বিশ্বজিৎ। (বাণীর দিকে মুখ ফিরাইয়া) মনে হচ্ছে, ওঁরা হাসছেন!···

বাণী নিজের অজ্ঞাতেই যেন সেদিকে চোখ ফিরাইল; অদম্য অশ্রুতে তাহার দুই চোখ ভরিয়া গিয়াছে

বিশ্বজিৎ। আমি নীচে যাচ্ছি, তুমিও আর বেশী দেরী ক'রো না।

বিশ্বজিৎ স্মিতমুখে বাহির হইয়া গেল। একটু পরেই উমা ঘরে ঢুকিল; শঙ্কিত তাহার দৃষ্টি, মন্থর তাহার চলিবার ভঙ্গী।···বাণীর হাতের আঙ্গুলে তাহার চোখ পড়িল—প্ল্যাটিনামের আংটির দীপ্তি যেন উমার দুই চোখে প্রতিফলিত হইয়াছে;—সে বাণীর চোখের দিকে চাহিল। নিমেষের মধ্যে এ কি পরিবর্ত্তন বাণীর!···সে নববধূর ভঙ্গীতে নতমুখে বসিয়া আছে

উমা। ভারি শুনতে ইচ্ছে করছে সে কি বলল···

বাণী। কিছুই সে বলেনি—উমা, আমি মুখ দেখাব কেমন ক'রে!

উমা। দেখাবি না;—দু হাতে মুখ ঢেকে রাখবি, সবার চোখ পড়বে আংটির ওপর—আংটির আড়ালে তোর মুখ লুকিয়ে থাকবে!···

বাণী। ব'লে গেল, অগাষ্টে ছুটি নিয়ে আসবে।··· উমা, ভেবেছিলাম সহস্র প্রশ্ন উঠবে, সহস্র যুক্তি নিয়ে আমি তাই প্রস্তুত হ'য়ে ছিলাম। কিন্তু এ কি হ'ল!···

উমা। পরশপাথর শুধু ছোঁয়া দিয়ে যায়···

বাণী। তোরই জিত হ'ল উমা···

উমার মুখে সহসা বেদনা বিষাদের ছায়া পড়িল; কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল

উমা। হ'লই ত!···(বাণীর হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল) কিন্তু রাত সাড়ে ন'টা বাজে—শীগ্‌গির নীচে চল্।

বাণীর ঘর আবার শূন্য পড়িয়া রহিল। খোলা জানালা দিয়া কোথা হইতে একটা পথহারা প্রজাপতি আসিয়া ঘরময় উড়িয়া বেড়াইতেছে; ক্লান্ত হইয়া সে ফুলদানীর উপর বসিল।···কিন্তু শুধু বর্ণের ঐশ্বর্য্য ভাল লাগে না—আবার উড়িল। বাণীদের গ্রুপ্ ফটোটার চারিপাশে ঘুরিতে ঘুরিতে বাণীর ছবিখানিই বুঝি তাহাকে আকৃষ্ট করিল!···শ্রান্ত প্রজাপতি বর্ণময় বিচিত্র পাখায় শুধু বাণীর মুখখানি আড়াল করিয়া বসিয়া রহিল।

ঘাত প্রতিঘাত

শ্রীকালীপ্রসন্ন দাশ এম-এ

৩০

ঠাকুর হরদাসের সঙ্গে আলোচনার পর কেমন একটা দ্বিধার আন্দোলনে বিমানের চিত্ত বেশ একটু বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সাম্যবাদের যে আদর্শ সে গ্রহণ করিয়াছিল, আন্তরিক একটা বিশ্বাস তাহার ছিল ইহা অপেক্ষা মানবত্বের উচ্চতর আদর্শ আর কিছু হইতে পারে না; এই আদর্শ ধরিয়া চলিবার, চলিয়া মানবসমাজকে তাহার নূতন ছাঁচে গড়িয়া তুলিবার অধিকার তরুণ সম্প্রদায়েরই আছে। ইহার ভাবে সে বিভোর হইয়া থাকিত, নির্ভীক আগ্রহে ইহার সব কথা প্রচার করিত, ইহার পন্থা অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিত। কঠিন কি সব সমস্যা তাহার ফলে উপস্থিত হইতে পারে, মনেই বড় উঠিত না, কখনও কিছু উঠিলেও আমল দিতে চাহিত না, ভাবিত, নির্ভীক্ উচ্ছ্বাসে নিঃসৃত তরুণদের বাণীর সম্মুখে খড়-কুটার মতই সব উড়িয়া যাইবে। কেন যাইবে না? কেন লোকে সহজ এই সত্যটা বুঝিবে না? বুঝিয়া কেন ইহার পথে চলিবে না? ইহার বিরুদ্ধে চক্ষুখোলাকে কি বলিতে পারে? আর কি বলিবার থাকিতে পারে? অন্ধ প্রাচীন যদি চক্ষু খুলিয়া না দেখে, এই নবারুণ ভাতির সম্মুখে তাহার তামস জাল বিস্তার করিয়া দাঁড়াইতে চায়, তরুণের এই আলোকাভিমুখ অগ্রগামী উদ্দাম অভিযান সে জালকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিবে; আজ সেই প্রাচীনই লুপ্ত অতীতের তমিস্র গহ্বরে চিরতরে ডুবিয়া যাইবে। কিন্তু যে সব প্রশ্ন সেদিন ঠাকুর হরদাস তুলিলেন, তাহারই কথায় তাহাকে ঠকাইয়া তাহার অতি আদরে পোষিত আদর্শবাদের লঘুত্ব অসারত্ব অসামাঞ্জস্য কেবল নহে—বিষময় ফল কি হইতে পারে ও হইতেছে; যেভাবে সব যেন চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন, তাহাতে তাহার ভাবুকতায় অতি তীব্র একটা আঘাত গিয়া লাগিল! মধুর মোহে যে স্বপ্নজাল সে রচনা করিয়াছিল, তাহা টুটিয়া গিয়া বাস্তব জীবনের কঠোর সব সত্য তাহার সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়া পড়িল। প্রথম আজ তাহার মনে হইল, এ সব সমস্যা অতি সহজ ও উপেক্ষা করিয়া চলিবার মত সমস্যা নহে; তাহার আদর্শবাদের পথ সত্যই কেবল কোমল মধুরস্পর্শ ফুলের পথ নহে, তীব্র বিষমুখ অনেক কাঁটাও তাহার মধ্যে রহিয়াছে। যতই তরতাজা আজ মনে হউক, ফুলের সব পাপড়িগুলি সহজেই শুকাইয়া উড়িয়া যাইতে পারে, কিন্তু কাঁটাগুলি অত সহজে শুকাইয়া উড়িয়া যাইবার নহে; আর সেই সব কাঁটায় বিদ্ধ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া পথের ধূলোয় লুটাইবে, সত্যই তাহারা তেমন নহে, যত বা যেমন নাকি তাহাদের সব লেডী কম্‌রেড---যেমন সুকুমার লুটায় নাই, কেবল ফুলের পাপড়িগুলির উপর দিয়া হালকা পায়ে স্ফূর্ত্তিতে নাচিয়া খেলিয়াই চলিয়া গিয়াছে; আর সেই কাঁটায় বিঁধিয়া ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত দেহে লুটাইতেছে অভাগী ফুল্লরা! এমন কত সুকুমারই এইভাবে এড়াইয়া যাইতে পারে, আর কত ফুল্লরাই কাঁটায় বিঁধিয়া পথে লুটাইতে পারে। আর এই সব ফুল্লরাই ত দেশের মা—তাহার মা যেমন ছিলেন, যেমন সব মা গ্রামাঞ্চল ভরিয়া ঘরে ঘরে সে দেখিতে পায়, তেমনই সব মা—অন্তত তেমনই মা হইতে পারিত যদি—নদি—এই 'যদি'র কথাটা মনে হইতেই বিমান যেন কেমন ছট ফট করিয়া উঠিল। এই 'যদি'র সত্যটাকেই কি আজ তাহাকে মানিয়া লইতে হইবে? তাই যদি হয়, তাহারই সম্মুখে যদি মাথা নোয়াইতে হয়—এই 'যদি'র কড়াবিধির বাঁধনে বাঁধা না পড়িলে কোনও তরুণীর মাতৃত্ব যদি না মর্য্যাদা পায়, তবে—তবে তাহাদের এই সাম্যবাদের সবুজ ধারার, অবাধ গতিমুক্ত জীবন ত অতি দুদিনের, অতি অসার একটা স্বপ্নবিলাস মাত্র—আর সে বিলাস-বিভ্রম বিষকুম্ভের মুখে একটুখানি পয়ঃফেন মাত্র!—

কিন্তু সত্য কি তাই! এই যে সব কথা এতদিন শুনিতেছে, কত যে রস-কল্পনার ভাবরস সে আগ্রহে পান করিয়াছে, মোহন সবুজের কত যে মোহন বাণী ভাববিভোর হইয়া সে প্রচার করিয়াছে, সব কি সত্য এই অসার! এমনই বিষকুম্ভের মুখাবরণ পয়ঃফেন মাত্র! মাতৃত্ব? মাতৃত্ব যদি অনিবার্য্যই হয়, এই গণ্ডীর বাহিরে কোনও তরুণীর মাতৃত্ব মর্য্যাদা কি পাইতেই পারে না! কেন পাইবে না? ধূসর জীর্ণ প্রাচীন সমাজ দিবে না? কিন্তু তাহাদের সবুজ সমাজ—কেন দিবে না? কি বলিয়া অস্বীকার করিতে পারে? কিন্তু কোথায় সে সমাজ? ঠাকুর বলিয়াছেন, নাই!—সত্যই কি নাই? তবে তাহারা কী করিতেছে?—কোথায় তাহাদের ভাবধারা লইয়া বিচরণ করিতেছে। তাহারাই কি নারী? কাহাদের লইয়া নূতন একটা সবুজ সমাজ কি লক্ষণে প্রাচীন সমাজ হইতে পৃথক হইয়া দাঁড়াইয়াছে? সত্যই কি তাহাদের সমাজ একটা নাই?—কেবল ভুয়া কতকগুলি কথার ফুৎকার করিয়াই কতকগুলি ছোকরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। না না, দেখিতে হইবে সত্য কিছু, কল্যাণ কিছু তাহাদের সবুজ-পথে আছে কি-না, বাস্তবতায় তাহার ভাবধারা সার্থক কোথাও হইয়াছে কি-না, সত্য হইয়া কোনও সবুজ সমাজ দেখা দিয়াছে কি-না, আর তরুণীর এই মাতৃত্ব সত্যই সে সমাজে মর্য্যাদা পায় কি-না—দেখিতে তাহাকে হইবে!

কিন্তু তবু—তবু—সেই তরুণী মা। সন্তান যাকে মা বলিয়া ডাকিবে, মা বলিয়া যাহার মুখপানে চাহিবে, শ্রদ্ধায় যাহার স্মৃতি মনে ধরিয়া রাখিবে, যেমন চোখে সে তার মাকে ডাকিয়াছে, মার স্মৃতি মনে ধরিয়া রাখিয়াছে, তেমনই মা! ধিক! এই মা কি নাই? তা কি হইতে পারে?

ঠাকুর বলিয়াছেন স্ত্রী যেমন তার স্বামীর নর্ম্মসখী, তেমনই সহধর্ম্মিণী। কিন্তু বন্ধনমুক্তা এই সব তরুণী তরুণ-কমরেডের নর্ম্মসখী মাত্র, সহধর্ম্মিণী ত নয়। ধর্ম্ম কোথায় যে সহধর্ম্মিণী হইবে। পিতার সহধর্ম্মিণী নয় এমন মায়ের পানে সন্তান মুখ তুলিয়া কখনও চাহিতে পারে? সন্তান যে 'মা'তে দেখে পিতার কেবল সহধর্ম্মিণীরই রূপ, নর্ম্মসখী রূপের একটু আভাসও ত কোনও সন্তানের সম্মুখে কখনও ভাসিয়া ওঠে না। আর এই সব তরুণী তাহাদের তরুণ-কমরেডের নর্ম্মসখী মাত্র—বন্ধনমুক্তা সকল ধর্ম্মের অতীতা নর্ম্মসখী মাত্র! না, নর্ম্মসখীও ঠিক নয়, নর্ম্মসখিত্বেরও স্থায়ী একটা প্রীতির যোগ, দরদের বাঁধন, একটা অন্তরতার সমতা আছে, আর বন্ধনমুক্ত এই সব কমরেড পরস্পর দুদিনের ভোগসহচর—সত্যই কেবল ভোগসহচর—আর কিছু নয়—আর এই সম্বন্ধ হইতে যে মাতৃত্ব—সে মাতৃত্ব মাতাকে লজ্জা দেয়, সন্তানকে লজ্জা দেয়, বিরূপবক্র মুখে লোক সমাজে ধিক্কৃত হয়। হাঁ, ধিক্কৃত হয় বটে, লজ্জাও দেয় বটে, কিন্তু কেন হয়? কেন দেয়? সত্যই যদি হইতে পারে, হিতে পারে, লুপ্তপ্রায় জীর্ণ প্রাচীনতার একান্তবর্জ্জনীয় একটা কুসংস্কারের প্রভাব মাত্র না হইয়া সত্যই যদি চিরন্তন কোনও ন্যায়যুক্তি ইহার পিছনে থাকে, তবে তাহাদের সবুজবাদের, সাম্যবাদের, স্বচ্ছন্দগতি মানবতা-বাদের সার্থকতা কি? সাম্যবাদী রুশ-সমাজ নাকি এই ধিক্কারকে এই লজ্জাকে আইনের বলে নিরসন করিতে চাহিতেছে। কিন্তু পারিতেছে কি? পারিবে কি? আবার তখন মনে পড়িল, তার নিজের মাকে—মনে পড়িল ঠাকুর যখন হঠাৎ সেই আলোচনা-প্রসঙ্গে তার মার কথা তুলিয়াছিলেন, দারুণ লজ্জায় কেবল সে মর্ম্মে মরিয়া গিয়াছিল!—মা—মা—তার সেই মা—তার পিতার সহধর্ম্মিণী, পিতৃগৃহের মর্য্যাদাবতী গৃহিণী, মাতৃত্বের গৃহিণীত্বের পূর্ণ গৌরবে গৌরবিনী। সে যে সত্যকার মর্য্যাদা, সত্যকার গৌরব, আর সেই মর্য্যাদার, সেই গৌরবের যে অনুভূতির স্মৃতি তার প্রাণে জাগিয়া রহিয়াছে, সে যে সত্যকারই একটা অনুভূতি। ধিক তার এই সবুজবাদ—সাম্যবাদ—স্বচ্ছন্দগতি—মানবতাবাদ—সন্তানের চক্ষে সন্তানের স্মৃতিতে মাকে যা এমন হীন করিয়া তোলে, মার নামে সন্তানের মাথা এমন হেঁট করায়, 'মা' তাকে তার রসনাকে স্তব্ধ করিয়া দেয়।

কিন্তু ঐ ফুল্লরা আজ যে তার মাতৃত্বের সম্ভাবনায় সকলের ধিক্কারে নিজের চিরভরা লজ্জায় গ্লানিতে কোথায় গিয়া মুখ লুকাইয়াছে, তার প্রতি, হায়ও কত যে এমন ফুল্লরা এই ধিক্কার এই গ্লানিতে মুখ লুকাইতে বাধ্য হইতেছে, তাহাদের প্রতি কোনও কর্ত্তব্য কি তাহাদের নাই! তাহাদের এই সবুজবাদের সাম্যবাদেরই ফলে আজ এই দুর্গতি তাহাদের, নারী বলিয়াই এই দুর্গতি তাহাদের, আজ পুরুষ-তাহাদের কার কি হইতেছে! আজ এই সবুজবাদ, সাম্যবাদ বর্জ্জন তাহারা করিলেও, এই ফুল্লরাকে, আর এইরূপ সব ফুল্লরাকে এই কলঙ্কপঙ্ক হইতে উদ্ধার না করিয়া তাহারা কি তা পারে?

রাত্রি ভরিয়া এইরূপ অনেক কথাই বিমান ভাবিল। পর দিনই সন্ধ্যায় এই সব দলের অগ্রণী কতিপয় যুবককে লইয়া এক বৈঠকে বসিল। বিমান তাহার সব কথা পাড়িল। শক্ত কথাই বটে! কিন্তু তাহারা কি করিতে পারে? তবে কর্ত্তব্য যদি তাহাদের কিছু থাকে—

সত্যেন্ তখন কহিল, "এ সব হ'চ্ছে আমাদের লেডী-কমরেডদের problem (সমস্যা), তাঁরা নিজেরাই solve (সমাধান) ক'রে নিন না?"

অক্ষয় বলিয়া উঠিল, "হাঁ, ঠিক কথা বলেছ সত্যেন্, তাঁদেরই problem solve, ক'রেও তাঁদেরই নিতে হবে। হস্তক্ষেপ ক'র্‌তে যাব, সে অধিকারই বা আমাদের কি আছে!"

"অধিকার কি আছে—তার মানে?"

বিমানের এই প্রশ্নের উত্তরে অক্ষয় কহিল, "তার মানে অধিকার নাই। থাক্‌তে পারে না।"

"কেন?"

"কেন—তার কারণ এটা সাম্যবাদের যুগ, তাঁরা আমরা সব সমান। সমান অধিকার তাঁরা দাবী ক'র্‌ছেন, তাঁদের কোনও সমস্যায়—যত কঠিনই তা হ'ক—হস্তক্ষেপ ক'রতে যাব কি দাবীতে? অমনি তাঁরা ব'ল্‌বেন, ব'ল্‌তে বেশ পারেনও—অনধিকার চর্চ্চা ক'রতে কেন তোমরা আস্‌ছ?"

বরেন্ কহিল, "হাঁ, বড় একটা insult (অপমান) ব'লেও তাঁরা এটাকে মনে ক'রতে পারেন। ক'র্‌তে গেলে এইটেই তাঁদের বুঝ্‌তে দেওয়া হবে, তাঁদের সমস্যা তাঁরা সমাধান ক'র্‌তে পারছেন না, আমাদের সহায়তা চাই, অর্থাৎ তাঁরা হীন, নারীজাতি—পুরুষের protection (পরিরক্ষণ) ব্যতীত তাঁদের চলে না। সাম্যবাদের মূলেই কুঠারাঘাত! —আর সঙ্গে সঙ্গে নারীত্বের প্রতি এই অসম্মান—না, সাম্যের মর্য্যাদায় উপলব্ধি ক'রেছেন, তাতে আপনাদের প্রতিষ্ঠিত ক'রেছেন, কি ক'র্‌তে চাইছেন, এমন কোনও নারীই এটা ক্ষমা ক'রতে পারেন না!"

সত্যেন্ কহিল, "ঠিক কথা।—এই নতুন সব আইনসভায় আর তার নির্ব্বাচনে ত' লেডীদের জন্যে ভোটের কি আসনের পৃথক্ আর বিশেষ বন্দোবস্তের কথা যে হ'চ্ছে, তাঁরা আপত্তি ক'র্‌ছেন। সোজা চ'ল্‌ছেন, না, ওসব অনুগ্রহ আমরা চাই না।—সমান ভোটে আসন লাভে সমান প্রতিযোগিতার অধিকারই আমরা চাই।"

একটু হাসিয়া যতীন তখন কহিল, "ও সব বড় বড় কথা, যাই বল দাদা, এঁরাও যেই যা বলুন, এই সত্যিটা ত ভুল্‌লে চ'ল্‌বে না, এসব বিপদে তাঁরাই পড়েন, আমরা পড়ি না। আর যখন পড়েন,—"

বরেন্ বলিয়া উঠিল, "They should boldly face it (সাহস ক'রে তার সম্মুখীন হ'য়েই তাঁদের দাঁড়াতে হবে।) বিপদ! বিপদ ব'লেই কেন তাঁরা এটাকে গণনা ক'রবেন! তাঁদের natural lot (স্বাভাবিক ভাগ্য) এই, পুরুষ কেউ ভাগ নিতেও পারে না।—নিজেদেরই শক্ত হ'য়ে দাঁড়াতে হবে, লোককে দেখাতে হবে, natureএর এই obstruction (প্রকৃতির এই বিধান) exclusively (পৃথক্‌ভাবে কেবল) তাঁদের সঙ্গেই হ'লেও, তাঁদের পক্ষে সেটা লজ্জার কথা কি বিপদের কথা কিছু নয়!"

TIGHT BINDING

যতীন্ উত্তর করিল, "কিন্তু সেটা পারছেন না যে তাঁরা। কেউ বা সময় থাকতে চম্পটীর Secret Chamberএ (গুপ্তগৃহে) গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছেন, কোনও মতে যিনি পারছেন, উদ্ধার পেয়ে আস্ছেন, কেউ বা একদম ঘর ছেড়ে কোথায় যে গিয়ে লুকোচ্ছেন, পাত্তাই আর পাওয়া যায় না।"

বিমান কহিল, "তাই ত ব'লছিলাম, এই সব বিপদে যারা প'ড়ছেন, রক্ষা নিজেদের করতে পারছেনই না দেখ্ছি, তাদের পেছনে আমাদের গিয়ে দাঁড়াতেই হবে, উদ্ধারেরও একটা চেষ্টা করতেই হবে।"

অক্ষয় কহিলেন, "কি ক'র্বে? কি ক'রে ক'র্বে? কি অধিকারেই বা ক'র্বে? তাহ'লে ব'ল্তে চাও, সত্যই তাঁরা অবলা জাতি, আর সবল পুরুষ আমাদের নিয়ে protectionএর (রক্ষার) ভার তাঁদের নিতে হবে!"

"কথার ছলে আসল প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে চাইছ অক্ষয়—তাঁরা অবলা, সুতরাং সবল আমাদের—রক্ষা গিয়ে তাঁদের ক'র্তে হবে, এ কথাই হ'চ্ছে না। তবে এই সত্যটা স্পষ্ট আমরা এখন দেখ্তে পাচ্ছি, এই একটা বিপদ কেবল তাঁদেরই ঘট্ছে, আমাদের ঘট্ছে না। আর ঘট্ছে তার কারণ সাধারণ সমাজ বিবাহ ব্যতীত তরুণ-তরুণীর মিলনকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে না, কোনও তরুণীর এই মাতৃত্বকে মর্য্যাদা না দিয়ে লজ্জা দেয়, না, কলঙ্কিনী ব'লে সর্ব্বত্রই তাঁরা নিন্দিত আর বর্জ্জিত হন, পিতামাতার গৃহেও একটু স্থান তাঁদের হয় না—স্থান কেউ দিতে সাহসও করেন না, ক'র্লে সমাজে তাঁরাও নিন্দিত আর বর্জ্জিত হন্। আর ব'ল্তে কি, নিজেরাও তাঁরা তাঁদের কন্যাকে কলঙ্কিনী ব'লে ঘৃণার চক্ষে দেখেন, সংস্পর্শেই থাক্তে চান না।—অথচ এটা দেখ্তে পাচ্ছি, পুরুষ যারা তাঁদের এই অবস্থার জন্য দায়ী, গায়ে তাদের আঁচড়টি লাগে না, জানাশুনো হ'লেও কেউ তাদের কিছু বলে না। একটু নিন্দে বা দণ্ড কেউ তাদের কিছু দেয় না, সমান মর্য্যাদায় লোকসমাজে তারা চলাফেরা করে, বিবাহ ক'রেও খাসা এক একজন সামাজিক গৃহস্থ হ'য়েও বসে। আর অভাগী এই সব মেয়েরা এই মাতৃত্বের অপরাধে একদম ভেসে যায়! সাম্যবাদী আর সবুজবাদী সত্যি যদি আমরা হই, তবে ব্যবহারের এই বৈষম্যকে আমাদের দূর ক'র্তে হবে। তরুণতরুণীর মিলনে স্বাধীনতাই যদি কাম্য হয়, বিবাহ-বন্ধনের প্রয়োজন যদি আমরা স্বীকার না করি, তবে সঙ্গে সঙ্গে এই নীতিও সমাজে আমাদের প্রতিষ্ঠা ক'র্তে হবে, এই সব মিলনে পুরুষের পিতৃত্ব যদি লজ্জা না পায়, দণ্ডনীয় না হয়, নারীর মাতৃত্ব লজ্জা পাবে না, দণ্ডনীয় হবে না!"

হাতে তালি দিয়া বিনোদ বলিয়া উঠিল, "ব্রাভো! ব্রাভো! খাসা ব'ল্লে দাদা!—বক্তিমেতে তোমার কাছে কেউ আমরা দাঁড়াতে পারি না। সভায় হ'লে 'হিয়ার' 'হিয়ারে' উঁচু একটা 'চিয়ার'ও (Cheer) উঠত, বিশেষ লেডী-কমরেডের সব মধুরোজ্জ্বল হাসিমুখে চটাপট তালিও প'ড়ত তাদের সব কোমল করপল্লবে। তবে কি-না কেউ ডুব দিয়ে জল খায়, একাদশীর বাবাও টের পায় না—আবার কেউ অতল জলে ডুবেও ফোঁটাটি তলাতে পারে না, ভেসে উঠ্লেই ধরা পড়ে!—পুরুষদের এই যে একটা position of advantage (সুবিধের স্থান) র'য়েছে—"

"তার advantage (সুযোগ) তাদের নেওয়া উচিত নয়, লেডী-কমরেডদের বঞ্চিত ক'রে, সত্য যদি সাম্যবাদী তাঁরা হয়। ধরা পড়েন ব'লেই এই যে লাঞ্ছিত তাঁরা হ'চ্ছেন লোকসমাজে, আমাদের দেখ্তে হবে সেটা যাতে তাঁরা না হন।"

সত্যেন্ কহিল, "আমাদের—মানে?—কেবল পুরুষ আমাদের? লেডীদের কি ক'র্বার কিছু নেই? সাম্যবাদী হ'য়ে বাইরে এসে আমাদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন, সমান পায়ে তাল ঠুকে ব'ল্ছেন, আর এই লাঞ্ছনা থেকে তাঁদের উদ্ধারের দায়টা কেবল আমাদের ঘাড়ে ফেলেই স'রে দাঁড়াবেন?—হাঁ, এই যে একটা position of advantage আমাদের র'য়েছে, এটা 'নেচারের (natureএর) দেওয়া, জোর ক'রে কি ফাঁকি দিয়ে তাঁদের থেকে আমরা কেড়ে নিইনি? সাম্যবাদী হ'য়ে সমান আসরে যদি এসে নেমেছেন, এ দায়টা সামলাতে তাঁদের যা করা দরকার, তাও তাঁরা করুন। হাঁ, আমরা কম্রেড, দরকার মত তাঁদের সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু initiative (কাজের সূচনায় দায়িত্ব) আগে তাঁদেরই নিতে হবে!"

"কিন্তু তাঁরা ত পারছেন না—সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার—সামাজিক মতিগতি, তার সব prejudice (কুসংস্কারের প্রভাব), এখনও যে রকম আছে তাতে ক'রে পারাও বড় সহজ নয়।"

সত্যেন উত্তরে কহিল, "আমাদের পক্ষেই-বা সহজ তবে হবে কিসে? সমাজ যাকে ব'লছ সেটা কি আমাদের হাতের পুতুল—যা হুকুম করব তাই অমনিই ক'র্বে?"

"কিন্তু এই যে একটা position of advantage আমরা occupy ক'রে আছি—"

"আছি সেটা 'নেচার' (nature) বনিয়ে রেখেছেন, তাই আছি। সে positionটা ত আমরা তাঁদের ইচ্ছে ক'র্লেই অম্নি দিতে পারি না।"

"এই positionটা ঠিক দিতে পারিনা, তবে এতে ক'রে সামাজিক লাঞ্ছনা দণ্ড এড়িয়ে যাবার যে সুযোগ আমাদের ঘট্ছে, সেটা তাঁদেরও দিতে হবে।"

বরেন্ কহিল, "নিন না তাঁরা সেই সুযোগ, নিতে যে পার্ছেন না সেটা তাঁদের দুর্ব্বলতা, সাহসের অভাব। কেন, তাঁরা—এই তথাকথিত বিপদটায় ত অনেকেই এসে প'ড়ছেন—একটা combination (বাঁধা দল) নিজেরা ক'রে, সমাজ যে লজ্জা দিতে চাইছে, সাহস ক'রে লজ্জা না পেয়ে মুখ তুলে তার সম্মুখীন হ'য়ে দাঁড়ান না? উচ্চকণ্ঠে সমাজকে বলুন না, এই যে মাতৃত্ব আমরা লাভ ক'রছি, এটা প্রকৃতির বিধান, স্বভাবেরই সহজ গতি, লজ্জা পাবার আমাদের কিছু নাই, লজ্জা দেবার তোমরা কে?—হাঁ, তখন আমরা গিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াতে পারি, লজ্জা যারা দিতে আসে, লাঠি মেরে তাদের মাথাও ভাঙ্গতে পারি।"

যতীন্ কহিল "কটা লাঠি মেরে কটা মাথা ভাঙ্গবে দাদা? সমাজ ত

দুটি-চারটি লোকের একটা মেলা নয়? কতকগুলি ছোকরাছুকরী যতই চ্যাঁচামেচি ক'রে আমরা বেড়াই, আর হোমরা-চোমরা নেতারা সভায় এসে দুটো-চারটে ব্যক্তিমে যাই ক'রে যায়—সমাজ তার বিরাট বিশাল, দেহটা নিয়ে দেশ জুড়ে র'য়েছে—প্রকাণ্ড এক Liveathan? দেশের আইনও তাদের পক্ষে,সে আইন এই মাতৃত্বকে কোনও মর্য্যাদা দেয় না তা নয়, লজ্জাই বরং দিচ্ছে।"

টেবিলটি চাপড়াইয়া অক্ষয় কহিল "চাই আমাদের এই আইনগুলো একদম বদ্‌লে দেওয়া—সাম্যবাদী রুশদেশে যেমন দিয়েছে।—সেখানে মাতৃত্ব মাত্রই সমান মর্য্যাদা পায়, সন্তান মাত্রই সমান অধিকার ভোগী ষ্টেটের প্রজা। এমনধারা অবস্থাও হ'য়েছে, কলেজের তরুণ ছাত্রছাত্রীরা যদি প্রেমে মিলিত হ'য়ে সন্তান তারা চায় কোনও বাধা নাই! কলেজের সব বাড়ীতেই creche (ক্রেশ—শিশু পালন স্থান) আছে, তরুণী মায়েরা শিশুদের সেখানে রেখে চলে যায়।—আবার সম্ভাবনা ঘটলেও মাতৃত্বের দায়িত্ব যদি কোনও নারী না নিতে চায়, ষ্টেটেরই সব clinic (ডাক্তারী কেন্দ্র) আছে, চাইলেই সরকারী ডাক্তারেরা মুক্ত ক'রে তাদের দিতে বাধ্য।—কোনও বান্ধবীর (secret chamberএ গিয়ে) লুকিয়ে দায় এড়াতে কারও হয় না!"

বরেন্ কহিল, "বেশ ত? লেডীরা সব ভোট্ পাচ্ছেন, কৌন্সিল এসেম্বলীতে যাচ্ছেন, এম্নি সব আইন ক'রে নিন না। আমরা তাঁদের পিছনে আছি।"

বিমান কহিল, "আগুতে গিয়ে দাঁড়াতে পার না তাঁদের চালিয়ে নিতে?"

"কোন্ অধিকারে, কি দাবীতে নেব? আমাদের আগুয়ানী সর্দ্দারী তাঁরা স্বীকার ক'র্বেন কেন? অপমান ব'লে প্রত্যাখ্যানই বরং ক'রবেন।"

"তাঁরা ত ভাব্ছেন না এসব কিছু। অন্ততঃ বাত্লে আমরা দিতে পারি এই ভাবে অগ্রসর তাঁরা হ'ন। কিন্তু—এই সব আইন-কানুন কদ্দিনে হবে—আবার এই সব আইন-কানুনে সায় দেবে—এর পক্ষে ভোট দেবে—এত বড় একটা revolutionary change of mentality (মনোভাবের বিপ্লবাত্মক পরিবর্ত্তন) দেশের লোকের কদ্দিনে হবে—হবেই কি-না কেউ ব'ল্তে পারে না, তা সে যা হ'ক, যদ্দিন না হয়, তদ্দিন—যারা এই বিপদে গিয়ে প'ড়ছেন, তাঁদের কি হবে?"

অক্ষয় কহিল, "Transition stageএ (পরিবর্ত্তনের যুগটায়) এসব বিপদ-আপদে প'ড়ে কিছু দুঃখ কারও কারও পেতেই হবে।

একটি নিশ্বাস ছাড়িয়া বিমান কহিল, "কিন্তু এই দুঃখটা যে প'ড়ছে কেবল মেয়েদেরই ভাগে।"

"না দাদা! কোনও উপায় নাই। তাদের মাতৃত্বের দায়টা ত ব্যাটাছেলে আমরা নিতে পারি না, সমাজের mentality দুদিনে বদ্‌লে দিতে পারছি না।"

"তাহ'লে এই সাম্যবাদ সবুজবাদ একদম আমাদের ত্যাগ করা উচিত?" "কে ত্যাগ ক'র্বে দাদা? তুমি আমি আজ ত্যাগ ক'রলেও সবাই ত্যাগ ক'র্বে কি? মেয়েরাই ত্যাগ ক'র্বে কি!—ঢেউএর ওপর ঢেউ আস্ছে রুশিয়া থেকে, আমেরিকা থেকে—ক'জনে সামলাবে দাদা?"

"তা হ'লে একটি প্রস্তাব আমার আছে।"

"বল।"

"বড় একটা সভা ক'রতে চাই। নেতাদের সবাইকে ডেকে লেডী লিডার যাঁরা আছেন সবাইকে এনে, সেই সভায় এই একটা প্রস্তাব তুল্তে চাই—"

"কি?"

"এই সমস্যাটার কথা তাঁরা বিবেচনা করুন। যদি সাম্যবাদী তাঁরা হ'ন তবে আমাদের তরুণী-কমরেড যাঁরা এইভাবে বিপন্ন হ'চ্ছেন—না হ'ন তার একটা ব্যবস্থা করুন।"

"কি ক'রে ক'রবেন?"

"তাঁরা ঘোষণা করুন, এই মাতৃত্ব সমাজে মর্য্যাদা পাবে, এই মর্য্যাদা অন্তত তাঁরা তাদের দেবেন।"

"দেখ!"

"একা আমি কি দেখ্‌ব। তোমাদের সহযোগিতা চাই, তাই না তোমাদের ডেকেছি।"

যতীন কহিল, "ডেকেছ বেশ ক'রেছ। আলোচনা একটা হ'ল ভাল। কথাটা ভাবা যাবে। কিন্তু সভা-টভা—who will go and bell the cat (বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধ্‌তে কে যাবে)? নেতারা সব হেসে উড়িয়ে দেবেন। লেডীরা শিউরে উঠবেন—রেগে-মেগে কেউ-বা দূর্ দূর্ ক'রে তাড়িয়ে দেবেন। আর সভা যদি একটা ক'র্তেও পার, 'শেম শেমের সম্ভাষণ কেবল পেয়ে নয়, জুতো খেয়েই আস্‌তে হবে।—"

"কিন্তু তবু চেষ্টা একটা—ক'রে একবার দেখ্‌তে পার—বেশ ত, যাও না নিজেই একবার ঐ সুকেশবাবুর কাছে; রতনবাবু, নিতাইবাবু, রমেশবাবু, মিসেস্ আচার্জ্জি, মিস্ চাকলাদার, লেডী হোম—এঁদের কাছেও বরং একবার যেতে পার। দেখ এঁরা কি বলেন?—যদি encouragement (উৎসাহ) কিছু পাও, বেশ এসে জানিও, দেখা যাবে কি করা যায়?"

"তাহ'লে একাই আমাকে যেতে হবে? তোমরা কেউ জোর দিতে আমার সঙ্গে যাবে না।"

সত্যেন কহিল, "একা তোমার মুখে যে জোর আছে, আমরা মনে করি তাই আপাততঃ যথেষ্ট, কি বলহে সবাই?"

"ঠিক! ঠিক।" সমস্বরে সকলের মুখেই ধ্বনি উঠিল।

যতীন কহিল, "আপাতত কেবল একটু sound করা (মনের ভাবটা একটু বুঝে নেওয়া) বই ত নয়, দল বল নিয়ে যাবার কোনও দরকার দেখ্‌ছি না। বড় একটা সভা-টভা যদি হয়, তখন তোমার পেছনে আমরা থাকব—এটা জেনো।"

বিনোদ কহিল, "তাহ'লে এখন মধুরেণ সমাপয়েৎ হ'লে ভাল হয় না! তোমার বাড়ীতে আমরা 'গেষ্ট' বরেন, একটু চা টা কিছু জোগাড় কর না?"

"বেশ, চল, পাশেই রেস্তরাঁয় তবে যাওয়া যাক্।"

সকলে উঠিয়া কলরব করিতে করিতে বাহির হইল। বিমান যারপর নাই মনভাঙ্গা হইয়াই তখন পড়িয়াছিল, এই প্রমোদ-ভোজে গিয়া যোগ দিতে পারিল না, বিদায় লইয়া চলিয়া আসিল। (ক্রমশঃ)

মিউনিসিপাল বিল—

মৌলবী ফজলুল হকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি কলিকাতা মিউনিসিপাল বিল বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে গৃহীত হইবার পর ব্যবস্থাপক সভায় অকস্মাৎ খোঁড়া হইয়া গিয়াছে। হক মন্ত্রীমণ্ডলের বিধানে এই বিলে মুসলমানের সদস্য সংখ্যা বাড়াইয়া ১৮ হইতে ২২ করা হইল। কারণ যেহেতু তাহারা কলিকাতার লোকসংখ্যার শতকরা ২৪, সেহেতু তাহারা সদস্য সংখ্যার শতকরা ২৪ পাইবার অধিকারী। ইউরোপীয়েরা সংখ্যায় অত্যল্প হইলেও যেহেতু তাহারা কর্পোরেশন ট্যাক্সের শতকরা ১২ ভাগ দিয়া থাকে, সেহেতু তাহারা আসন সংখ্যার শতকরা ১৫ পাইবার অধিকারী। কেবল হিন্দুদের বেলাতেই তাহাদের জনসংখ্যা অথবা ট্যাক্সের পরিমাণ কিছুই ধরা হইল না। তাহারা কলিকাতার জনসংখ্যার শতকরা ৭০ এবং কর্পোরেশন ট্যাক্সের শতকরা ৮০ ভাগ দিয়া থাকে। তত্রাচ তাহাদের সদস্য সংখ্যা ৪৬ হইতে একটিমাত্র বাড়াইয়া ৪৭ করা হইল। কার্য্যত এই ৪৭টি আসনের মধ্যেও হিন্দুরা মাত্র ৪৫টি আসন দখল করিতে পারিবে। কেন যে হিন্দুদের সম্বন্ধে এই অবিচার করা হইল ঢাকার নবাব অথবা হক সাহেব তাহার সন্তোষজনক কোনো কৈফিয়ৎই দিলেন না। খাজা স্যার নাজিমুদ্দিন কেবল বলিয়াছেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়া হিন্দুরা যদি এইটুকু স্বার্থত্যাগ না করিতে পারে তাহা হইলে তাহাদের জীবনই বৃথা।

বহু জনসভায় হিন্দুরা ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে। এক শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সভাতেই ত্রিশ হাজারের উপর লোক সমাগম হইয়াছিল। কিন্তু হক সাহেব তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সততার সহিত ঘোষণা করিলেন যে, এই বিলের বিধানে হিন্দুরা বিক্ষুব্ধ হওয়া দূরে থাক, হক মন্ত্রীমণ্ডলকে দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছে। তিনি হিন্দুর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করেন নাই। কংগ্রেসীরাই প্রভাব হ্রাসের আশঙ্কায় সভা করিয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু তাঁহারা যতই করুন, বিল পাস হইবেই।

হিন্দু মন্ত্রীগণের মনোভাব—

বাঙ্গলার মন্ত্রীসভায় যে কয়জন আছেন, তাঁহাদের মন বলিয়া কোনো পদার্থ নাই, সুতরাং মনোভাবেরও বালাই নাই। তাহা ছাড়া তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের মন্ত্রীদ্বয় ছাড়া অপর সকল হিন্দু মন্ত্রীই কোনো না কোনো বিশেষ নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত। চারিদিকে এত যে গোলযোগ, এত যে বিক্ষোভ চলিতেছে, সকল কিছুর দিকে চক্ষু বন্ধ করিয়া তাঁহারা প্রাণপণে চাকুরী আঁকড়িয়া পড়িয়া আছেন। জনসভায়, সংবাদপত্রে এবং আইন সভায় তাঁহাদিগকে পুনঃ পুনঃ চাকুরীর মমতা ত্যাগ করিবার চাপ দেওয়া হইলেও তাঁহারা নির্ব্বিকার। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার "ব্যক্তিগতভাবে" স্বীকার করিয়াছেন যে, এই বিলে হিন্দুদের উপর যে অবিচার করা হইয়াছে তাহাতে আর ভুল নাই। কিন্তু "সরকারী ভাবে" ইহা জানাইয়া দিয়াছেন যে, এখনও চাকুরী ত্যাগ করার মত ঘনীভূত অবস্থা হয় নাই। ঘনীভূত অবস্থা বলিতে তিনি কি বুঝিয়াছেন জানি না। তাঁহার কথায় মনে হয়, অপমান একেবারে চরমে না উঠিলে তিনি চাকুরী ছাড়িবেন না। তপশীলভুক্ত মন্ত্রীদের তো কথাই নাই। তাঁহারা কার্য্যতঃ হিন্দুদের সংস্রব ত্যাগ করিয়াছেন বলিলেই হয়। নূতন বিলে তাঁহাদের সম্প্রদায়ের জন্য ৬টি আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পাছে সাধারণ নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে "আসল" তপশীলভুক্ত যাইতে না পারে, সেজন্য ইহারই মধ্যে ৩টি আসন মনোনীত করার ব্যবস্থাও হইয়াছে।

ব্যবস্থাপক সভার কীর্ত্তি—

ইতিমধ্যে বিলটি ব্যবস্থাপক সভায় আসিতেই অকস্মাৎ সব উলট-পালট হইয়া গেল। খান সাহেব আবদুল হাদি চৌধুরী প্রস্তাব করিলেন, মনোনীত আসন সংখ্যা ৮ হইতে

কমাইয়া ৪ করা হউক। প্রস্তাবটি ২১-২০ ভোটে গৃহীত হইয়া গেল। সরকার পক্ষ এই অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক পরাজয়ের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহারা ফাঁপরে পড়িলেন। খান সাহেব তাঁহার সংশোধন প্রস্তাবের সঙ্গে আরও সুপারিশ করেন যে, অবশিষ্ট চারিটি আসনের মধ্যে ৩টি সাধারণ নির্ব্বাচন-কেন্দ্রে তপশীলভুক্তদের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখিলে এবং ১টি মুসলমানদের জন্য রাখিলে ভাল হয়। অত্যন্ত নিরীহ প্রস্তাব। আপাতদৃষ্টিতে ইহাতে বিলের কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। তপশীলভুক্তদের জন্য সেই ৬টি আসনই রহিল, মুসলমানদের আর একটি আসন বাড়িল। কিন্তু বিলের আসল হুলটিই কাটা যাইতে দেখিয়া মন্ত্রীমণ্ডল ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তপশীল সমান থাকিলেই বা কি, আর মুসলমানের সদস্য সংখ্যা বাড়িলেই বা কি—হিন্দুর সর্ব্বনাশ সাধনের মূল যে উদ্দেশ্য তাহাই যদি ব্যর্থ হইয়া যায় তবে আর রহিল কি! এই সংশোধন প্রস্তাব মন্ত্রীমণ্ডল কি ভাবে গ্রহণ করিবেন তাহাই দেখিবার বিষয়।

চাকুরীর হার নির্দ্ধারণ—

কিন্তু শুধু কলিকাতা কর্পোরেশনের গতি করিলেই হইবে না। সরকারী চাকুরীরও একটা সুব্যবস্থা করিতে হইবে। ইতিপূর্ব্বেই হক সাহেব তাহার জনৈক বন্ধুকে "গোপনীয় পত্রে" লিখিয়াছিলেন, সরকারী হিন্দু কর্ম্মচারীদের কৃতঘ্নতার ও বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি এবং তাঁহার মুসলীম মন্ত্রীমণ্ডল অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন। পরে এজন্য দুঃখ প্রকাশ এবং ত্রুটি স্বীকার করিলেও তাঁহার গূঢ় উদ্দেশ্যের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। মুসলমানদের জন্য শতকরা পঞ্চাশটি চাকুরী নির্দ্দিষ্ট করার উদ্দেশ্যে তিনি এক সম্মেলন আহ্বান করেন। কংগ্রেস সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার ঊর্দ্ধে। হক সাহেবের ক্রমবর্দ্ধমান উৎকট সাম্প্রদায়িকতায় বিরক্ত হইয়া পরিষদের কংগ্রেসী দলের নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু সম্মেলনে যোগদান করিতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু কোয়ালিশন দলের সমর্থনে ও শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদীর পৃষ্ঠপোষকতায় বলীয়ান হক সাহেব দমিলেন না। হিন্দু জনসভায় এই ব্যবহার তীব্র প্রতিবাদ উঠিল। বিশিষ্ট হিন্দু-জননায়কগণ ইহার অন্যায্যতা, অসঙ্গতি ও অনিষ্টকারিতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য বহু যুক্তি প্রদর্শন করিলেন। একটি জনসভায় স্থির হইল, বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজের নেতৃত্বে একদল হিন্দু প্রতিনিধি এই অন্যায় ব্যবস্থার প্রতিবাদে বাঙ্গলার গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

এই সিদ্ধান্তে হক সাহেবের টনক নড়িল। নিজের এবং নিজের সহযোগীদের সম্বন্ধে এটুকু বুঝিবার মত বুদ্ধি তাঁহার আছে যে, 'টিনের দেবতা' দেবতা নয়। শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়া যেটুকু শক্তি তাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাহার দৌড় বেশী নয়। গভর্ণর এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলে যদি তিনি যুক্তির পথে চলেন এবং এ সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যে মত তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন যদি তাহার পরিবর্ত্তন না হইয়া থাকে, তাহা হইলে "settled fact" unsettled হইবার সমূহ আশঙ্কা আছে। তিনি তাঁহার মন্ত্রীসভার মুসলমান সদস্যগণের পক্ষ হইতে গভর্ণরের নিকট মেমোরাণ্ডাম পাঠাইলেন যে, এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার তাঁহার নাই। মন্ত্রীসভার অভিমতই তাঁহার পক্ষে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। মন্ত্রীসভার অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার পৃথক এক মেমোরাণ্ডামে জানাইলেন, সংখ্যা-লঘিষ্ঠদের অধিকার রক্ষার জন্য হস্তক্ষেপ করার শুধু যে গভর্ণরের অধিকার আছে তাহাই নয়, তাহা Instrument of Instruction-এ তাঁহার অন্যতম কর্ত্তব্য বলিয়াই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, তাঁহার নেতা হক সাহেব এবং অন্যান্য সহকর্ম্মীগণ সকলেই উদারহৃদয় সুবিবেচক লোক। সুতরাং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্তোষজনক আপোষ একটা নিশ্চয়ই হইয়া যাইবে। এক কথায়, তিনি থাকিতে হিন্দুদের ভয়ের কোন কারণ নাই।

হক সাহেবের যুক্তি—

নলিনীবাবু এ সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা মোটামুটি এইরূপঃ যেখানে বৎসরে মাত্র ৩০০ হইতে ৩৫০ জন মুসলমান ছাত্র বি-এ, বি-এস্‌সি পাস করে সেখানে মুসলমানের চাকুরীর হার শতকরা ৪৫-এর বেশী করার কোন অর্থ হয় না। টেকনিকাল চাকুরীতে মুসলমান কর্ম্মচারীর শতকরা হার ৩৩½এর বেশী করা চলিতে পারে না। পুলিস সাব-ইন্সপেক্টার ও সাব-রেজিষ্ট্রারের চাকুরীতে

বর্ত্তমানে যথাক্রমে শতকরা ৫০ ও ৪৬ জন মুসলমান চাকুরীয়া আছে। উহা ঠিকই আছে। অন্যান্য বিভাগে মুসলমানের চাকুরীর হার তিনি শতকরা ৪৫ করিতে প্রস্তুত, যদিও তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ইহার দ্বারা চাকুরীর efficiency নষ্ট হইবে। মফঃস্বলে চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজসাহী বিভাগে "নির্দ্দিষ্ট কয়েক বৎসরের জন্য" ৫০ দেওয়া যাইতে পারে। প্রেসিডেন্সি বিভাগে ৪০ ও বর্দ্ধমান বিভাগে ৩৩½ দেওয়া যাইতে আরে। তিনি আরও বলিয়াছেন, এই শতকরা হার কেবল চাকুরী দিবার সময়ই অবলম্বিত হইবে। প্রোমোশনের ক্ষেত্রে ইহা প্রযুক্ত হইতে পারিবে না।

হক সাহেব এবং অন্যান্য সহকর্ম্মীগণের ঔদার্য্য ও সুবিবেচনার গুণ-গান করিয়া নলিনীবাবু হিন্দুসমাজকে যে ভরসাই দিয়া থাকুন, হক সাহেব তাঁহার সঙ্কল্পে এতটুকুও বিচলিত হন নাই। নলিনীবাবুর প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য করিয়া তিনি জানাইয়াছেন, ও সব হইবে না। ভারতীয় সিভিল সার্ভিস ছাড়া প্রত্যেকটি সরকারী বিভাগে মুসলমানদের জন্য ৫৫ চাকুরী নির্দ্দিষ্ট রাখিতে হইবে। চাকুরীর ক্ষেত্রে "efficiency" বা যোগ্যতার প্রশ্ন তিনি একেবারেই উড়াইয়া দিয়াছেন। একটা "minimum qualification" থাকিলেই হইল। তাঁহার বৃহত্তম যুক্তি এই যে :

"We find that the population in Bengal consists of a little over 54 per cent. of Mussalmans; and almost the entire bulk of the agriculturists comes from that community. Such being the case, Government should not be manned by people who are not capable of evincing that sympathy which is likely to foster the aspirations of the bulk of the agriculturists of the Province and of the majority of its populatiou. The land must be administered by persons who are in entire sympathy with the bulk of the population."

অর্থাৎ বাঙ্গলার জনসংখ্যার শতকরা ৫৪ যখন মুসলমান, তখন তাহাদিগকে ৫৫টি চাকুরী দিতেই হইবে। এই ৫৪টির অধিকাংশই কৃষক। মুসলমান ছাড়া কে তাহাদের স্বার্থরক্ষা করিতে পারে?

যুক্তির বাহাদুরী—

এই যুক্তির বাহাদুরী আছে সন্দেহ নাই। প্রথমত যেখানে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের সংখ্যাধিক্য, সেখানে সেই সম্প্রদায়ের কর্ম্মচারী ছাড়া তাহাদের স্বার্থরক্ষা অসম্ভব, ইহাই যদি হক সাহেবের নীতি হয়, তাহা হইলে আমরা তাঁহাকে এবং তাঁহার স্বসম্প্রদায়ের বিভিন্ন প্রদেশবাসীকে প্রশ্ন করি যে, সেই নীতি কি ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও অবলম্বিত হইবে? যদি হয়, তাহা হইলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে মুসলমানের চাকুরীর অবস্থা কিরূপ হইবে?

আরও একটা কথা। এই কথাটার উপর লাট দরবারে হিন্দু প্রতিনিধিগণও জোর দিয়াছেন। যদি ইহাই সাব্যস্ত হয় যে, হিন্দু কর্ম্মচারী ছাড়া হিন্দুর স্বার্থ কিম্বা মুসলমান কর্ম্মচারী ছাড়া মুসলমান স্বার্থ রক্ষিত হইবার আশা নাই, তাহা হইলে ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদের তল্পী গুটাইতে হয়। তাহারা আর কাহার স্বার্থরক্ষা করিবার জন্য থাকিবে? হক সাহেবের সমর্থনকারী শ্বেতাঙ্গদল কিম্বা বাঙ্গলার গভর্ণর এই নীতি কতখানি সমর্থন করিতে পারিবেন জানিতে ইচ্ছা হয়।

হিন্দুদের দাবী—

বাঙ্গলা দেশে হিন্দুরা সংখ্যালঘিষ্ঠ। তথাপি তাহাদের কোনো নির্দ্দিষ্ট দাবী নাই। তাহারা সাম্প্রদায়িকতাকে জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়াই মনে করে। কি চাকুরীর হার নির্ণয়ে, কি সদস্যসংখ্যা নির্ণয়ে, কোন দিন তাহারা সাম্প্রদায়িকতার ধূয়া তোলে নাই। এমন কি, এই বাঙ্গলা দেশে সংখ্যালঘিষ্ঠ হইয়াও তাহারা যুক্ত নির্ব্বাচনেরই পক্ষপাতী। কিন্তু হকসাহেব তাঁহার আত্মঘাতী এবং জাতীয় স্বার্থহানিকর সাম্প্রদায়িক কার্য্যকলাপের দ্বারা হিন্দুদের মনেও সাম্প্রদায়িকতার বিষ সংক্রামিত করিবার চেষ্টায় আছেন।

চাকুরীর ক্ষেত্রেও হিন্দুরা সাম্প্রদায়িক হারাহারি চাহে না। তাহারা যোগ্যতাকেই চাকুরী প্রদানের একমাত্র মাপকাঠি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাই ইহার একমাত্র সমাধান। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা যদি না থাকে, তাহা হইলে কে বলিতে পারে

আত্মীয়স্বজন ও পোষ্যবর্গের দাবী মিটাইয়া প্রসাদের কণিকা-মাত্র বৃহত্তর মুসলমান সমাজের মধ্যে বিতরিত হইবে না? বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় বলিয়াছিলেন, যদি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়, অর্থাৎ বৃহত্তর মুসলমান সমাজের যদি সত্যসত্যই উপকৃত হইবার নিশ্চয়তা থাকে, তাহা হইলে তিনি মুসলমানদের জন্য আরও বেশী চাকুরীর হার সমর্থন করিতে প্রস্তুত আছেন। এই একটা কথায় শরৎবাবু যে মনোভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতেই বোঝা যায়, তিনি সাম্প্রদায়িক তুচ্ছতার কতখানি ঊর্দ্ধে অবস্থিত। কিন্তু তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই, ইহাতে nepotism অর্থাৎ স্বজন প্রতিপালনের আশঙ্কা দূর হইলেও efficiency নষ্ট হইবার আশঙ্কা দূর হইবে না। জাতীয় স্বার্থের দিক দিয়া effciencyর যোগ্যতা কম নয়।

পৃথক নির্ব্বাচন ব্যবস্থা—

কলীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র দাস পৃথক নির্ব্বাচন ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে যুক্ত নির্ব্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের বিতর্ক তুলিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, এক শ্রেণীর মুসলমান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উপায় হিসাবে পৃথক নির্ব্বাচন ব্যবস্থার অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছেন। ব্যক্তিগত আপাত স্বার্থের প্রলোভন বড় সহজ নয়। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ফলে হিন্দু সমাজ দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। যে সকল সম্প্রদায় ইতিপূর্ব্বে নিজেদের অনুন্নত বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত হন নাই, লাভের সম্ভাবনায় তাঁহারাও শেষ পর্য্যন্ত লাভের লোভে অনুন্নতের খাতায় নাম লিখাইতে দ্বিধা করিলেন না।

এই মনোভাব এখন মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রসারিত হইতেছে। শিয়া-সুন্নী বিরোধ উত্তরোত্তর প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। শিয়ারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নী সম্প্রদায়ের নিকট হইতে সুবিচারের সম্ভাবনা নাই দেখিয়া এখন পৃথক নির্ব্বাচন দাবী করিতেছেন। মুসলমান সম্প্রদায়ে মোমিনদের সংখ্যা অনেক। মুসলমান সম্প্রদায়ে তাঁহাদের সামাজিক অবস্থা অনেকটা হিন্দু সম্প্রদায়ের অনুন্নতদের মতই। বিহার ও বাঙ্গলায় তাঁহাদের পর পর যে কয়টি সম্মেলন হইয়া গেল, সর্ব্বত্রই তাঁহারা পৃথক নির্ব্বাচন দাবী করিয়াছেন।

যাঁহারা হিন্দুসমাজে দুইটি পৃথক সম্প্রদায়-ব্যবস্থা সমর্থন করেন, ন্যায় ও যুক্তির দিক দিয়া তাঁহারা শিয়া ও মোমিনদের দাবী কখনই উপেক্ষা করিতে পারেন না। বিধান দিবার ভারও যখন তৃতীয় পক্ষের হাতে এবং বিরোধ সৃষ্টির সাহায্যে সাম্রাজ্য রক্ষাই যখন তাহাদের নীতি, তখন এই দাবী প্রবলতর হইবে তাহারা কি ব্যবস্থা করিবে কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় নাই। সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতৃবর্গ নিজেদের স্বার্থলোভ সঙ্কুচিত করিয়া দৃষ্টি আরও প্রসারিত করিলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন, পৃথক নির্ব্বাচন-ব্যবস্থা জাতিকে ধীরে ধীরে এবং অজ্ঞাতসারে কোথায় ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে।

ইতিহাস সংস্কার—

যুক্তপ্রদেশ সরকার সম্প্রতি ভারতবর্ষের ইতিহাস (পাঠ্য পুস্তক) সংশোধন ও সংস্কারের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের দেশে সুসম্বদ্ধ ইতিহাস বলিয়া কিছু ছিল না। বর্ত্তমান ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রধানত ইংরেজ ঐতিহাসিকদেরই রচনা। এদেশে ইংরেজ রাজত্ব যে ভগবানের বিধানে ভারতের কল্যাণ কল্পেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ইতিহাসের সাহায্যে সে কথা নানভাবে নানা স্থানে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। তরলমতি বালকগণকে ইংরেজের মহিমা উপলব্ধি করাইবার লোভে সর্ব্বত্র তাঁহারা ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষা করেন নাই। সেগুলির সংশোধন যে প্রয়োজন তাহাতে আর ভুল নাই।

দৃষ্টান্তস্বরূপ অন্ধকূপ হত্যার উল্লেখ করা যাইতে পারে। অন্ধকূপ হত্যা যে অলীক এবং নিছক কপোল-কল্পনা তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলার ইতিহাসের পাঠ্য-পুস্তকে তাহার সংশোধন এখনও হয় নাই। তৎপরিবর্ত্তে ঔরঙ্গজীব ও আফজল খাঁর হত্যা সম্বন্ধে ইতিহাস সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক কারণে যেভাবে সংশোধিত হইয়াছে তাহাতে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই। ইংরেজ চটাইবার সাহস হয় নাই, কিন্তু অন্যত্র নাচার শিক্ষকেরা জানিয়া-শুনিয়াও ছাত্রদের ভুল শিক্ষা দিতেছেন, আর ছাত্রেরা চোখ বুজিয়া তাহাই গলাধঃকরণ করিয়া পরীক্ষা পাস করিতেছে।

ইতিহাস—উপন্যাস নহে। রাজনৈতিক আগ্রহে অন্ধ হইয়া যুক্তপ্রদেশ সরকার সে কথা যেন বিস্মৃত না হন ইহাই

আমাদের অনুরোধ। ভারতের মহিমা প্রচার অন্য বহুভাবে করা যাইতে পারে। কিন্তু সেই মহিমা প্রচারের জন্য সত্যের বিকৃতি সাধনের প্রশ্রয় দিতে আমরা প্রস্তুত নই। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যে জ্ঞান তাহাই জাতির কল্যাণ সাধন করিতে পারে।

রাজকোট—

রাজকোটের সমস্যা ধীরে ধীরে থিতাইয়া আসিতেছে। কূটনৈতিক যুদ্ধে দরবার শ্রীবীরবলের নিকট পরাজয়ের পর মহাত্মাজি অকস্মাৎ স্যার ম্যরিস গায়ারের রায় প্রত্যাখ্যান করিয়া নূতন চাল চালিলেন। এই চালের পরে সমস্ত সমস্যাটির সমাধান-ভার বিনা সর্ত্তে ঠাকুর সাহেব এবং তাঁহার সচিব শ্রীবীরবলের হাতে গিয়া পড়িল। রাজকোটের প্রজাবৃন্দের দাবী মিটানো অথবা না-মিটানো সম্পূর্ণভাবে ঠাকুর সাহেবের সদিচ্ছার উপর তিনি ছাড়িয়া দিলেন। এত বড় একটা সংগ্রামের এই প্রকার পরিণতিতে স্বয়ং জওহরলাল পর্য্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, মহাত্মার নীতি তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

মহাত্মার "আত্মসমর্পণের" (?) পর দরবার শ্রীবীরবল তাঁহার সম্বন্ধে যে সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন তাহার মধ্যে খানিকটা মাতব্বরী ছিল এবং শ্লেষও ছিল। কিন্তু দেখিতে দেখিতে হাওয়া আশ্চর্য্যরূপে হাল্কা হইয়া গেল। যবনিকার অন্তরালে কোথায় কি যেন ঘটিল, বোঝা গেল না। দরবারের দিন ঠাকুর সাহেব নিজে তাঁহাকে সসম্মানে সম্বর্দ্ধনা করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইলেন, নিজে গাড়ী করিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিতে ও পৌঁছাইয়া দিতে লাগিলেন এবং দরবার বীরবল ভক্তিগদগদ ভাষায় জানাইলেন, মহাত্মাকে তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন। সত্যই তিনি ঠাকুর সাহেবের পিতার মত।

জানা না গেলেও বোঝা যাইতেছে, কি যেন একটা কোথাও হইয়াছে। শাসন-সংস্কার দিতে ঠাকুর সাহেব সম্মত হইয়াছেন। সেজন্য একটা কমিটিও গঠিত হইয়াছে। দরবার বীরবল সেই কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হন। পরে এজেন্সির নির্দ্দেশে তিনি কমিটির সভাপতিত্ব এবং সদস্যপদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই গান্ধী-নীতির অভ্রান্ততা ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন, "মহাত্মাজি ভুল করিতে পারেন না।" শাসন-সংস্কার কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে তখন বোঝা যাইবে মহাত্মাজি ভুল করিয়াছেন কি না। তবে পর পর কয়েকটি "Himlayan blunder"-এর পর তিনি যে ভুল করিতে পারেন না, ভুল করা যে তাঁহার পক্ষে অসম্ভব, তাহা স্বীকার করা যায় না।

দেশীয় রাজ্য—

ভারতের ছোট-বড় বহুসংখ্যক দেশীয় রাজ্যের প্রায় সমস্তগুলিতেই প্রজা-আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এই বিংশ শতাব্দীতেও দেশীয় রাজ্যে যে শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহা মধ্যযুগীয় শাসন-ব্যবস্থা। রাজাই এখানে সর্ব্বেসর্ব্বা, তাঁহার আদেশই আইন। প্রজার তাহাতে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার নাই। এই শাসন-ব্যবস্থা-সংস্কারের জন্যই প্রজা-আন্দোলন।

কংগ্রেসের এতকালের নীতি ছিল দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা হইবে না। কিন্তু আজ প্রজা-ফেডারেশনের সম্মুখে প্রজা-আন্দোলন যখন প্রবল হইয়া উঠিল এবং দমননীতি মাত্রা ছাড়াইয়া গেল তখন কংগ্রেস স্থির থাকিতে পারিলেন না। নীতির আংশিক পরিবর্ত্তন হইল। কিন্তু সে পরিবর্ত্তন কার্য্যকরী হইবার পূর্ব্বেই মহাত্মাজি দেশীয় রাজ্যসমূহে সত্যাগ্রহ স্থগিদ রাখিবার নির্দ্দেশ দিয়া স্বয়ং রাজকোট সংগ্রাম পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন।

পণ্ডিত জওহরলাল সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, দেশীয় রাজ্যে সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখা হইয়াছে মাত্র। কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যের কথা ভুলেন নাই। তালচেরের বহু সহস্র প্রজা আঙ্গুলের জঙ্গলে কেহ অনাহারে, কেহ অর্দ্ধাহারে শীতাতপ সহ্য করিতেছে। শেঠ যমুনালাল বাজাজ এখনও জয়পুরের কারাগারে। অন্যত্রও অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। কিন্তু রাজকোটের অভিজ্ঞতার পরে মহাত্মাজি অহিংসা ও সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে দেশীয় রাজ্যের সমস্যা-সমাধানে সংগ্রাম অপেক্ষা আবেদন নিবেদন এবং আপোষের উপরই জোর দেওয়া হইয়াছে। রাজকোটে তিনি যেভাবে তাঁহার অনশনের মধ্যেও 'জবরদস্তি' এবং সাধারণ আবহাওয়ার মধ্যে হিংসা আবিষ্কার করিয়া সঙ্কুচিত হইয়াছেন, তাহাতে বিশ্বাস করিতে ভয় হয় না যে, অচিরে দেশীয় রাজ্যে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিবার কোন সঙ্কল্প তাঁহার আছে।

পণ্ডিত জওহরলাল অহিংসার ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তাঁহার সহিত একমত নহেন। বোম্বায়ের সাংবাদিক সম্মেলনে (অবশ্য অন্য প্রসঙ্গে) অহিংসার যে ব্যাখ্যা তিনি করিয়াছেন তাহা অনেকটা শিথিল। তিনি বলিয়াছেন, "No, the creed of non-violence has nothing to do with defence from external invasion." অর্থাৎ তাঁহার কাছে অহিংসা creed নয়, policy মাত্র। তাঁহার মতে কংগ্রেসের কার্য্য পরিচালনায় মহাত্মার কথাই শেষ কথা। যে আবহাওয়ায় তিনি সত্যাগ্রহ পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে পারেন বলিয়া ভরসা দিয়াছেন, অদূর ভবিষ্যতে দেশীয় রাজ্যে কেন, বৃটিশ ভারতেও সেই নিষ্কলঙ্ক এবং পবিত্র আবহাওয়ার সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে করিতে সাহস হয়না।

এসিয়াটিক বিল—

দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্য আর এক ধাপ উপরে উঠিল। ইউনিয়ন পার্লামেণ্টে এসিয়াটিক বিলের শেষ আলোচনা হইয়া গেল। স্বরাষ্ট্রসচিব বলিয়াছেন, "ভারতীয়দের জন্য নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলে" ভারতীয়েরা যত খুশি সম্পত্তি করুক তাঁহার তাহাতে আপত্তি নাই। এই আইনের ফলে বাণিজ্য-ব্যাপারেও তাহাদের কোন অসুবিধা হইবে না। তবে "There must be some control so that they will not take a way the opportunities of every white man to trade." অর্থাৎ ইউরোপীয় বণিকদের স্বার্থ ষোল আনার উপর আঠার আনা বজায় রাখিয়া এবং তাহাদের অঞ্চল ত্যাগ করিয়া তাহারা পরমানন্দে বাণিজ্যও করিতে পারিবে। এক কথায়, প্রভু-ভৃত্যের মধুর সম্পর্ক বংশপরম্পরায় বজায় রাখিয়া যাহাতে তাহারা সুখে-স্বচ্ছন্দে "একত্র" বাস করিতে পারে তাহারই জন্য এই ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার ও ইউনিয়ন সরকারের মধ্যে যে কেপটাউন চুক্তি হয়, তাহার একটা সর্ত্ত এই ছিল যে, ভারতীয়দের সম্বন্ধে কোন আইন প্রণয়ন করিতে হইলে সে বিষয়ে এজেণ্ট-জেনারলের সম্মতি লইতে হইবে। বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে সে সর্ত্ত পালিত হয় নাই। ইউরোপীয় দলের নেতা ডঃ মালান ইহার কৈফিয়ৎ স্বরূপ তাঁহার বক্তৃতায় বলেন, বর্ত্তমান আইন মাত্র পাঁচ বৎসরের জন্য সাময়িকভাবে বিধিবদ্ধ হইল। কেপটাউন চুক্তিরও একটা অভিনব ভাষ্য রচনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন, উহার অর্থ এই নয় যে ইউনিয়ন পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ভারত সরকারের দয়ার উপর সমর্পণ করিয়াছেন।

ভারতীয়দের উপর এই অন্যায়ের প্রতিবাদে মিঃ হফমেয়ার মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিয়াছেন। বর্ণবিদ্বেষ বর্জ্জন করিয়া সমস্যাটিকে সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকার স্বার্থের দিক হইতে আলোচনা করিয়া তিনি ইহার শোচনীয় পরিণাম সম্বন্ধে শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়কে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। প্রত্যেক সুবিধাজনক অঞ্চল হইতে ভারতীয়গণকে বিতাড়িত করার যে প্রতিক্রিয়া ভারতীয়দের মধ্যে দেখা দিবে তাহার ফল শ্বেতাঙ্গদের পক্ষে কখনই শুভ হইবে না।

মিঃ হফমেয়ার অরণ্যে রোদন করিয়াছেন। কিন্তু প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ও নীরবে এই অপমান গ্রহণ করিবে না। জোহানবার্গে ইহার প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করা যায় কি না, সে সম্বন্ধে তাহারা এক সম্মেলন আহ্বান করিয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্ত অ-শ্বেতকায় জাতিদের লইয়া শ্বেতকায়দের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইবার আয়োজনও চলিতেছে। মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহের প্রস্তাব সমর্থন করেন। অত্যাচার সত্যসত্যই এমন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে যে, স্যার সৈয়দ রেজা আলীর মত নরমপন্থীও সত্যাগ্রহের যৌক্তিকতা স্বীকার না করিয়া পারেন নাই। ভারত সরকার এ সম্বন্ধে কি নীতি অবলম্বন করিবেন জানি না। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে যখন মহাত্মাজি দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ পরিচালনা করিতেছিলেন, তখন তদানীন্তন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের একটা ভ্রূকুটিতেই দক্ষিণ আফ্রিকার গবর্ণমেণ্ট আপোষ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের বিপদ—

১৯৩৬-৩৭ খৃষ্টাব্দ অপেক্ষা ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দে ভারতের বস্ত্রশিল্পের অবস্থা নানা কারণে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। শেষোক্ত বৎসরে এ দেশের কলসমূহে অধিক কাপড় প্রস্তুত হইয়াছিল, বিদেশে ভারতীয় কাপড় অধিক পরিমাণে রপ্তানি

হইয়াছিল ও বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে কাপড়ের আমদানিও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাইয়াছিল। ১৯৩৭-৩৮ খৃষ্টাব্দের অবস্থা দেখিয়া মনে হইয়াছিল যে, ভারতবর্ষ অদূর ভবিষ্যতে বস্ত্রের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হইবে। কিন্তু ১৯৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাতে এই শিল্পের ভবিষ্যত সম্বন্ধে এখন অনেকেই সন্দিহান হইয়াছেন—(১) ঐ সময়ে ভারতে আমদানি বৃটীশ বস্ত্রের শুল্ক প্রথমে সরকারী নির্দ্দেশ দ্বারা ও পরে ইঙ্গ-ভারত বাণিজ্যচুক্তি দ্বারা দুইবার কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে, (২) চীন-জাপান যুদ্ধের অনেকটা অবসান হওয়ায় জাপান পুনরায় ভারতের ভিতরে ও বাহিরে ভারতীয় বস্ত্রের সহিত প্রবল প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়াছে, (৩) বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানি করা তূলার উপর শুল্ক বৃদ্ধির ফলে ভারতের বাজারে ইংলণ্ড ও জাপানের পক্ষে প্রতিযোগিতা করা সহজ হইয়াছেও (৪) দেশের অভ্যন্তরে কাপড়ের কলগুলিতে শ্রমিক ধর্ম্মঘটের ফলে ও অন্যান্য কারণে ভারতীয় কাপড়ের কলগুলির খরচ অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এইরূপ সঙ্কট উপস্থিত হওয়ায় গভর্ণমেণ্টকে নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে—আমেরিকার সস্তা তূলার সাহায্যপুষ্ট কাপড়ের কলে উৎপন্ন বস্ত্র ভারতে আমদানি হইলে তাহার উপর এবং যদি তাহা সম্ভব না হয় তবে ভারতে বিদেশ হইতে আমদানি সমস্ত বস্ত্র ও সূতার উপর আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করা হউক। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট ল্যাঙ্কাসায়ারের ক্ষতি করিয়া ঐরূপ কোন ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া মনে হয় না। এ অবস্থায় দেশবাসীকে বিদেশী কাপড় সম্পূর্ণভাবে বয়কট করিতে হইবে। বস্ত্রশিল্পের এই নূতন বিপদ উপস্থিত হওয়ায় বিদেশী বস্ত্রের বয়কটের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতের সকল প্রদেশের কাপড়ের কলওয়ালা সমিতিগুলিকে এখন এ বিষয়ে সংঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতে হইবে। নচেৎ তাঁহাদের আত্মরক্ষার আর কোন উপায় নাই।

পাটচাষীদের দুরবস্থা—

কিছুদিন হইতে কলিকাতার বাজারে পাটের দর বাড়িয়াছে বটে, কিন্তু আগামী জুলাই মাসে নূতন পাট বাজারে উপস্থিত হইলে তাহা যে কম মূল্যে বিক্রীত হইবে, অনেকেই এখন হইতে তাহার সূচনা দেখিয়া শঙ্কিত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে পাটকলসমূহের গুদামে প্রচুর চট মজুত আছে, ওদিকে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে চটের চাহিদা কমিয়া গিয়াছে এবং যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় চটেরও আর কোন অর্ডার আসিতেছে না—এই সকল কারণ বিবেচনা করিয়াই পাটের দর কমিবার সম্ভাবনা দেখা যায়। তাহার উপর কলিকাতার ফাটকা বাজারের বাহিরে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে সরবরাহের সর্ত্তে যে পাট ক্রয় করা হইতেছে, তাহার মূল্য ফাটকা বাজারের দর অপেক্ষা গাঁট প্রতি সাত-আট টাকা কম। এই ব্যাপার দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা যায় যে, পাটচাষীদিগকে ফাঁকি দিয়া কম মূল্যে তাহাদের নিকট হইতে পাট ক্রয় করিবার জন্যই ব্যবসায়ীরা এই ভাবে কাজ করিতেছে। এ বিষয়ে কিন্তু গভর্ণমেণ্ট একেবারে নীরব—অথচ গত নভেম্বর মাসে বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিয়াছেন—"ফাটকা বাজারের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে এবং শীঘ্রই গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে বিধি ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।" তাহার পর সাত-আট মাস হইয়া গেল, এখনও এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্ট কিছু করেন নাই। অথচ পাটের দালালগণ দরিদ্র চাষীদিগকে ঠকাইবার জন্য এখন হইতে সকল ব্যবস্থা স্থির করিয়া রাখিয়াছে। এখনও সময় আছে—যাহাতে নূতন পাটের দর না কমে, গভর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা করুন।

ইলেকট্রিক কোম্পানী ও গভর্ণমেণ্ট—

গত বৎসর কলিকাতা কর্পোরেশনের সহিত যখন কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনের চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয় তখন কলিকাতা কর্পোরেশন কলিকাতায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট ঐ প্রস্তাবে সম্মতি না দিয়া ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীকে আরও দশ বৎসর ব্যবসা চালাইবার সুযোগ করিয়া দেন। বলা বাহুল্য, উক্ত কোম্পানী সম্পূর্ণ ভাবে বিদেশী এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পর্কে উক্ত কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার থাকায় কলিকাতাবাসীকে অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্য দিয়া বিদ্যুৎ ক্রয় করিতে হয়। সম্প্রতি আবার জানা গিয়াছে, ইলেকট্রিক কোম্পানী বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদনে জানাইয়াছেন, বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট যদি বহু দিনের জন্য চুক্তি পত্রে আবদ্ধ হইতে রাজী হন

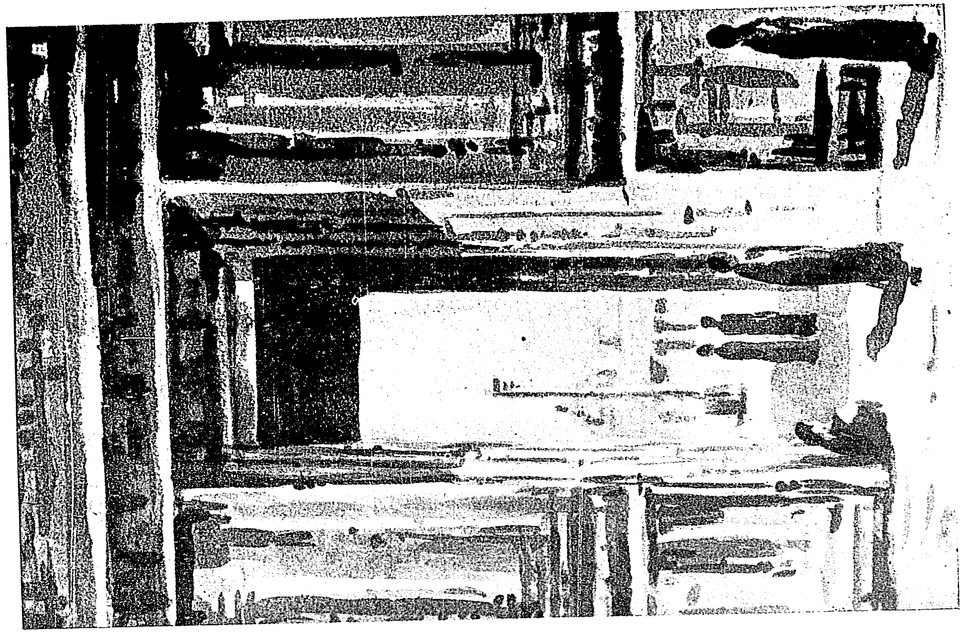

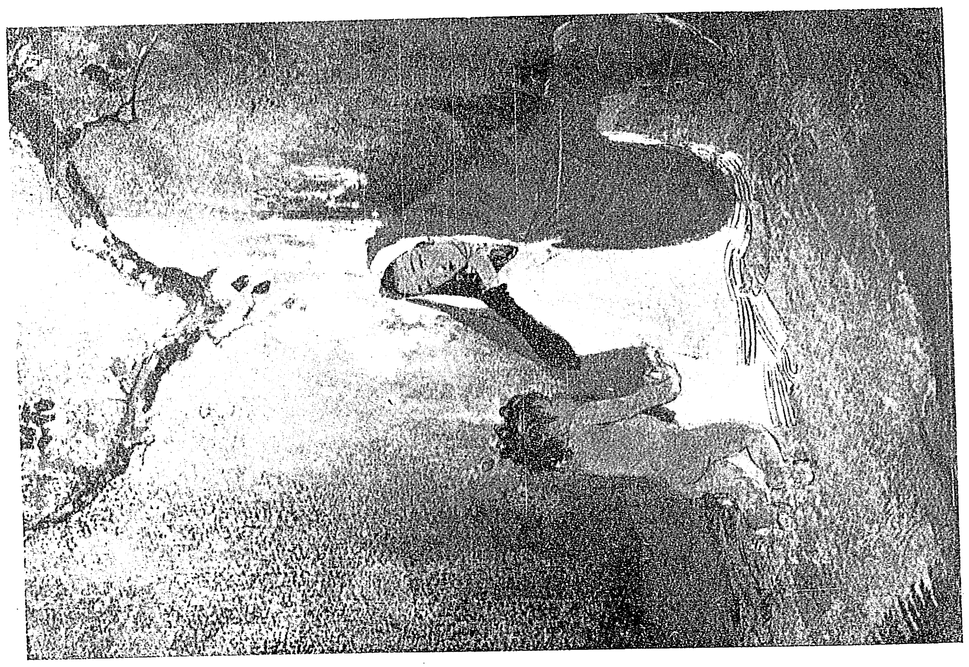

তাহা হইলে উক্ত কোম্পানী বাঙ্গলার সর্ব্বত্র বিদ্যুৎ সরবরাহের ভার লইতে রাজী আছেন। গত বৎসর যেভাবে গভর্ণমেণ্ট উক্ত কোম্পানীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহাতে মনে হয় কোম্পানীর এই প্রস্তাবেও হয় ত গভর্ণমেণ্ট সম্মত হইবেন। কিন্তু বাঙ্গলার মফঃস্বলে বহুস্থানে দেশীয় লোকের চেষ্টায় ও অর্থে অনেকগুলি বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানী গঠিত হইয়া কাজ করিতেছে; ভবিষ্যতেও ঐরূপ আরও অনেক দেশীয় কোম্পানী গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীকে সমগ্র বঙ্গদেশে বিদ্যুৎ সরবরাহের ভার দিলে ঐ সকল ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলারই ব্যবস্থা করা হইবে। একটি বিদেশী কোম্পানীকে ঐরূপ একচেটিয়া অধিকার দেওয়ার কারণ বুঝিতে আমরা অসমর্থ।

বাঙ্গলার রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ—

গত কয়েক বৎসর হইতে বাঙ্গলা দেশে রাস্তাঘাট নির্ম্মাণের জন্য বার্ষিক প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইতেছে। পেট্রল ট্যাক্স ও মোটর ট্যাক্সের দরুণ প্রাপ্ত টাকা হইতেই ঐ কাজ চলিতেছে। কিন্তু ঐ কাজের কোন ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত না হওয়ায় সে জন্য বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট রাস্তাঘাটের একটি পরিকল্পনা স্থির করিবার উদ্দেশ্যে একজন বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই বিশেষজ্ঞ কর্ম্মচারীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে জানা যায়—(১) বাঙ্গলা দেশের মধ্য দিয়া যানবাহন চলাচলের সুবিধা, (২) বিভিন্ন জেলার প্রধান শহরগুলিকে পরস্পরের সহিত যুক্ত করা, (৩) প্রত্যেক জেলার ভিতরে যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থা ও (৪) রেল ষ্টেশন ও ষ্টীমার ঘাটগুলিতে মালপত্র প্রেরণের সুবিধা—এই চারি প্রকার প্রয়োজন অনুসারে তিনি চারি প্রকার পথ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা দিয়াছেন। এ জন্য বাঙ্গলা দেশে তিনি মোট নয় হাজার মাইল নূতন পথ করিতে উপদেশ দিয়াছেন ও সে জন্য ৩৯ কোটি হইতে ৫৬ কোটি টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ করিয়াছেন। তাহা ছাড়া ঐ সকল পথ মেরামতের জন্য বার্ষিক এককোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া তিনি অনুমান করেন। বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট যদি ঐ ব্যবস্থামত বৎসরে ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন, তাহা হইলে সমস্ত রাস্তা নির্ম্মাণ শেষ হইতে দেড়শত বৎসর সময় লাগিবে। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের অর্থসচিব একটি পরিকল্পনা করিয়াছেন ও দশ বৎসরে যাহাতে উক্ত ৯ হাজার মাইল নূতন পথ নির্ম্মিত হয়, সে জন্য বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টকে ঋণদ্বারা অর্থসংগ্রহ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। আগামী চারি বৎসরে যাহাতে এ বাবদে সাড়ে তিন কোটি টাকা ব্যয় হয়, অর্থসচিব সেরূপ ব্যবস্থায়ও অগ্রসর হইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত রাজনীতিক কারণেই এ দেশে সকল নূতন পথ প্রস্তুত করা হইয়াছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এখন নূতন পথ নির্ম্মাণ করিলে তদ্দ্বারা দেশবাসী প্রকৃতই উপকৃত হইবে। অর্থসচিবের এই পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হইলে তিনি ধন্য-বাদার্হই হইবেন। তবে গভর্ণমেণ্টের অধিকাংশ পরিকল্পনাই কার্য্যে পরিণত না হইয়া কাগজে-কলমেই থাকিয়া যায়।

জহরলালের সংশয়—

পণ্ডিত জহরলাল নেহরু সম্প্রতি লক্ষ্ণৌয়ের 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' পত্রে এক প্রবন্ধ লিখিয়া গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন—"ত্রিপুরী কংগ্রেসে যে সব কাণ্ড ঘটিয়াছে, পন্থ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া নির্ব্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে যে ভাবে অপমান করা হইয়াছে, দেশবাসী তাহাতে ক্ষুব্ধ ও মর্ম্মাহত হইয়াছে। তারপর কলিকাতায় সুভাষচন্দ্রকে রাষ্ট্রপতির আসন হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য দক্ষিণপন্থী বিশিষ্ট নেতারা যে সব অসাধু উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার মধ্য দিয়া তাঁহাদের প্রতিহিংসামূলক প্রবৃত্তিই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।" নেতাদের মধ্যে যে অবিশ্বাস, সন্দেহ ও ক্ষুদ্রাশয়তা তিনি ত্রিপুরীতে লক্ষ্য করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইয়াছে। জহরলাল আশা করিয়া-ছিলেন যে, এই অবিশ্বাস ও সন্দেহের ফলে কংগ্রেসের মধ্যে যে ভেদবিভেদ দেখা দিয়াছে কলিকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে পরস্পরের সহযোগিতায় তাহার পরিসমাপ্তি হইবে। কিন্তু দক্ষিণপন্থী নেতাদের প্রতিহিংসা-পরায়ণ মনোভাব, অশোভন জিদ ও ঔদ্ধত্যের ফলে তাহা সম্ভবপর হয় নাই। সুভাষচন্দ্র ঐক্য ও মিলনের জন্য শেষ পর্য্যন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

সর্ব্বশেষে জহরলাল বলিয়াছেন—গান্ধীজির আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া বর্ত্তমান অবস্থায় কংগ্রেসের মধ্যে

কাজ করা তাঁহার ন্যায় ব্যক্তিদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। তিনটি উপায় তাঁহাদের সম্মুখে আছে—(১) চিন্তাহীনভাবে আত্মসমর্পণ, (২) বিরোধিতা ও (৩) কর্ম্মহীনতা। পণ্ডিত জহরলালের মতে বর্ত্তমানে এই তিন উপায়ের কোনটিই অবলম্বন করা সঙ্গত নহে। চিন্তাহীন-ভাবে কোন আদর্শ বা কর্ম্মনীতির নিকট আত্মসমর্পণ করিলে মানসিক পক্ষাঘাত হইবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়ত, উহার বিরোধিতা করিলে কংগ্রেসে ভেদ ও বিভেদ বাড়িবে ও (৩) কর্ম্মহীনতার পথ অবলম্বন করিলে ধ্বংস সুনিশ্চিত।

জহরলাল এখন তবে কি করিবেন? ত্রিশঙ্কুর মত থাকা ত আর কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। তাঁহার ভবিষ্যত কার্য্য-পদ্ধতি জানিবার জন্য দেশবাসী উৎসুক হইয়া আছে।

কর্পোরেশনের উপ নির্ব্বাচন—

কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত সনৎকুমার রায় চৌধুরী কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর পদ ত্যাগ করায় তাঁহার স্থানে ১৮নং ওয়ার্ড হইতে কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীযুত প্রফুল্লকুমার দত্ত বিপুল ভোটাধিক্যে কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কলিকাতার হিন্দু সমাজে কংগ্রেসের প্রভাব কিরূপ তাহা নির্ব্বাচন ফল হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়।

রাষ্ট্র বিজ্ঞান সম্মিলন—

আগামী ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে লাহোরে ভারতীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্মিলনের যে দ্বিতীয় অধিবেশন হইবে তাহাতে সভাপতিত্ব করিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব মিণ্টো অধ্যাপক ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীযুত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। প্রমথবাবু প্রবীণ কর্ম্মী—শুধু অধ্যাপক হিসাবে নহে, নানা প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মী হিসাবেও কলিকাতায় তাঁহার খ্যাতি আছে। এবার রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্মিলনে নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা হইবে—(১) রাজনীতির বর্ত্তমান ধারা, (২) ভারতে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের কার্য্যক্রম ও (৩) আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ ও কার্য্য।

প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলন—

এবার খুলনা জেলায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের অধিবেশন হইবে। সে জন্য খুলনায় সম্প্রতি এক জনসভায় যে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে, আচার্য্য সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাহার সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছেন। আচার্য্য রায় মহাশয় এই পরিণত বয়সে অসুস্থ শরীর লইয়াও যে এই গুরু কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা খুলনাবাসীর পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহার নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মিলন সর্ব্বাংশে সাফল্য মণ্ডিত হইবে।

প্রতিভাবান ছাত্র—

নোয়াখালি অরুণচন্দ্র হাইস্কুলের শিক্ষক বিক্রমপুর ফেগুনাসার নিবাসী শ্রীযুত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীমান অরুণচন্দ্র এবার কলিকাতা সেণ্ট পল্‌স কলেজ

অরুণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

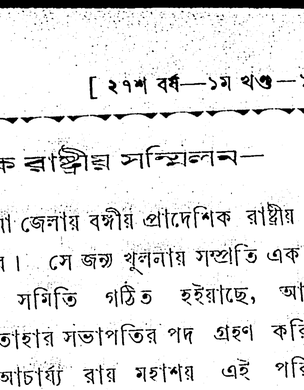

হইতে আই-এ পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। অরুণচন্দ্রের অগ্রজ মণি... সিটি কলেজের অধ্যাপক। আমরা শ্রীমানের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

প্রধানমন্ত্রী-পুত্রের দণ্ড—

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার খাঁ সাহেব কংগ্রেস পক্ষের লোক। তাঁহার পুত্র ওবেদুল্লা খাঁ একস্থানে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন করায় তাঁহাকে

গ্রেপ্তার করা হয় ও বিচারে তাঁহার ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। ঘটনাটি সত্যই অসাধারণ। ঐ সম্পর্কে ওবেদুল্লার গ্রেপ্তারের পর আরও তিনশত লোক ধৃত হইয়াছেন। কাজেই তাঁহারা যে একযোগে গভর্ণমেণ্টের একটি অন্যায় ব্যবস্থার প্রতীকারপ্রার্থী—তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। এ অবস্থায় ওবেদুল্লাকে সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান না করিয়া তাঁহাদের অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া তাহার প্রতীকার করিলেই বোধহয় শোভন হইত। কংগ্রেস মন্ত্রী-মণ্ডল কি এ বিষয়ে কিছু করিতে অসমর্থ?

সঙ্গীতজ্ঞা বালিকা—

কুমারী বিজন ঘোষ দস্তিদারের (কালী) নাম কলিকাতার সঙ্গীতজ্ঞ সমাজে সুপরিচিত। ইনি কয়েক-খানি রেকর্ডের সাহায্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারি-কুলাম অনুযায়ী সঙ্গীতের যে প্রাথমিক শিক্ষা দান

বিজনবালা ঘোষ দস্তিদার

করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ অভিনব ও সুন্দর। কুমারী বিজনবালা বহু সঙ্গীত সম্মিলনীতে উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছেন। প্রার্থনা করি, বিজনবালার সঙ্গীত সাধনা জয়যুক্ত হউক।

কংগ্রেসে সংস্কার—

কংগ্রেসের সদস্য সংগ্রহ ব্যাপারে অনাচার ও কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র পরিবর্ত্তন সম্পর্কে কলিকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনে সে সাব কমিটী গঠিত হইয়া-ছিল, জুন মাসের প্রথমেই বোম্বায়ে তাহার এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। অনাচার দূর করা সর্ব্বতোভাবে প্রয়ো-জনীয়, তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। একদল স্বার্থান্ধ লোক যাহাতে কংগ্রেসে প্রবেশ করিয়া কংগ্রেস তাহাদের কুক্ষীগত করিতে না পারে, সে বিষয়ে ব্যবস্থা থাকা বিশেষ দরকার। কিন্তু শুধু আইনের বাঁধাবাঁধি করিলে ত সুফল ফলিবেনা—লোক যাহাতে অনাচারী না হয়, সেজন্য দেশের সর্ব্বত্র প্রচার কার্য্য পরিচালন প্রয়োজন। ব্যক্তি বা দল বিশেষের হাতে পড়িয়া কংগ্রেসের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইলে, তাহা বাস্তবিকই সকলের পক্ষে বিশেষ পরিতাপের বিষয় হয়।

উলেমা সম্মিলন—

কলিকাতায় মৌলানা ওবেদুল্লা সিন্ধীর সভাপতিত্বে বঙ্গীয় উলেমা সম্মিলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রথম দিন সভায় বেশী গণ্ডগোল হয় নাই। দ্বিতীয় দিন লীগপন্থীরা সভায় যাইয়া এরূপ গণ্ডগোল সৃষ্টি করে যে পুলিস তাহা থামাইতে না পারিয়া শেষ পর্য্যন্ত সভা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। উলেমাগণ ধর্ম্মপ্রচারক এবং জাতীয়তাবাদী—আর লীগ-পন্থীরা জাতীয়তার বিরোধী ও ধর্ম্মের বিরোধী। পুলিস না থাকিলে দ্বিতীয় দিনে সভায় মুসলমানে মুসলমানে যে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইত, তাহা সুনিশ্চিত। লীগপন্থীরা শুধু হিন্দুদের সভায় যাইয়া গণ্ডগোল করিয়াই সন্তুষ্ট হয় না—সর্ব্বত্রই এখন তাহারা গণ্ডগোল করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এক শ্রেণীর মুসলমানকে তাহাদের নেতারা সকল প্রগতির বিরোধী করিয়া তুলিতেছে—শেষ পর্য্যন্ত তাহারা কি প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। লীগ কি ক্রমে গুণ্ডার দলে পরিণত হইবে?

TIGHT BINDING

আষাঢ়ে

কাদের নওয়াজ

রিম্ ঝিম্ ঝরে নীর,
ওরু ওরু গরজন্,
দুরু দুরু হিয়া মোর,
উড়ু উড়ু তনু-মন।
পল্বলে পাথারে,
বালিহাঁস সাঁতারে,
দল্পিঁপী দীঘি-নীরে
দল্মলি চলে ওই,
অশথ্-তলার হাটে
জল করে থই থই।

২

হর্দ্দম থম্ থম্
গম্-গম্ শুনি রব,
ভরিয়াছে নদী নালা
খাল্-বিল আজি সব,
পাকে আম, জামরুল,
কেয়াফুল বেয়াকুল
ডাকে দেয়া, নাচে কেকা,
একা একা লাগে আজ ;
কদম কাঁটালে-চাঁপা
ফুটিতেছে বন-মাঝ।

৩

ঝমর্ ঝমাৎ ঝম্
বাজায়ে পায়েতে মল্,
কে ঐ তড়িৎ-গতি
আলোকিয়া নভোতল ;
আসিল আষাঢ়ে আজি,
সিক্ত অলক-রাজি,
নিঙাড়ি নিঙাড়ি নভে,
ঢালিছে কাজল জল,
পিচ্কারী দেয় সে যে,
লয়ে যূথী পরিমল।

৪

সোনার বাংলা দেশ,
আষাঢ় সেথায় ওই,—
এসেছে অতিথি বেশে,
তার সে রভস কই ?
সোনার সে ক্ষেত নাই,
খ্যাঁক্-শিয়ালীরা তাই,—
ডাকিতেছে ঝোপে ঝাড়ে,
সাঁঝেতে চাষার গান—
শুনিলে 'আইল্'-পথে
মশা শুধু ধরে তান।

৫

আষাঢ়ের মেঘ হেরি,
গগনেরি আঙিনায়,—
মনে পড়ে 'রামগিরি'
'অবন্তী' 'অলকা'য়।
সব চেয়ে মনে পড়ে,
বাঙালীর ঘরে ঘরে,
কাঙালী বাড়িছে আর
বাড়িতেছে রোগ-শোক,
আষাঢ়ে দীনতা-সরে
সাঁতারে যে সব লোক।

সিল্কের পাঞ্জাবী

শ্রীবামাদাস চট্টোপাধ্যায়

পর্দ্দার আড়াল থেকে সরমার হাসির শব্দ শুন্লাম—উচ্ছ্বসিত হাসি। অনেকদিন এমন হ'য়েছে—আফিস থেকে ক্লান্ত অবসন্ন হ'য়ে বাড়ী ফিরেছি ; কিন্তু তা'র হাসিমুখ দেখবামাত্র হাতমুখ ধোয়া ও চা জলখাবারের প্রয়োজনীয়তা ভুলে গেছি এবং চিত্তের অবসাদ, শরীরের ক্লান্তি—সব তা'র হাসির লহরে ভেসে গেছে। কিন্তু আমার অবর্ত্তমানে হাসি কেন!—পর্দ্দা সরা'বার জন্য হাত বাড়াতেই মনে হ'ল পাগল না হ'লে কেউ কখনও একলা বসে বসে হাসে না ; হয়ত আর কোন মহিলা বন্ধু অথবা প্রতিবেশিনী এসেছেন। আস্তে আস্তে অন্য ঘরে চ'লে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ কানে এল সরমার কথা—"আপনি আমাকে ভালবাসেন না তাই—" সঙ্গে সঙ্গে একটি শব্দ এল—"হুঁ!" ও "ফুঃ" এ দু'টির মাঝামাঝি শব্দ। কোন কথার পর এরূপ শব্দ উচ্চারণ ক'রলে কথাটা যে নেহাৎ বাজে তাই বোঝাবার চেষ্টা করা হয়। এই শব্দটি কিন্তু আমার মাথায় খাণ্ডব বনের আগুন জেলে দিল। শব্দটি কোন পুরুষ মানুষের কণ্ঠনিঃসৃত—এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। সরমা ও একজন পুরুষ মানুষ পর্দ্দার আড়ালে!—হাসির লহর ও ভালবাসার কথা! মাথা ঘুরতে লাগল ও বোধ হয় ঘুরতে ঘুরতেই চক্ষু সমেত পর্দ্দার পাশের ফাঁকটুকুর দিকে ঝুঁকে পড়ল। চোখে পড়ল সরমার সুরচিত, অনাবৃত খোঁপা ও তা'র ওপর কতকগুলো মোটা ও ফর্সা আঙ্গুল। আঙ্গুলগুলোর আর একটু ওপরে কব্জির কাছে সিল্কের পাঞ্জাবীর আস্তিন। এইটুকু দেখবার পরই চোখদুটো জবাব দিল ও আমি বারান্দা হ'তে একেবারে সিঁড়ির নীচে উপস্থিত হ'লাম। হন্ হন্ ক'রে নেমে আসি নাই। সিন্ধু বিজয়ের সময় মহম্মদ্ বিন্ কাশিম যেমন অতিকায় গুল্তির সাহায্যে দরায়ুসের দুর্গে প্রস্তর নিক্ষেপ ক'রেছিলেন, আমাকেও বোধ হয় এই রকম একটা গুলতির সাহায্যে কেহ নীচে ফেলে দিল। আরও দূরে প'ড়তাম, যদি না চাকরটা সামনে প'ড়ত। সম্বিত সামলে মুখটাকে যতদূর সম্ভব অপ্রিয়দর্শন ক'রে, জিজ্ঞাসা ক'রলাম—"কা'কে বাড়ীতে ঢুকিয়েছিস্?" সে বল্লে—"আজ্ঞে, বৌরাণী তাঁকে নিজে হাত ধ'রে নিয়ে গেলেন যে—"

* * * *

অনেকক্ষণ পার্কে ঘুরপাক খাবার পর ক্লান্তিবোধ ক'রে নিস্তেজভাবে একটা বেঞ্চিতে ব'সে পড়লাম। বায়োস্কোপের ছবির মত আমাদের বিবাহিত জীবনযাত্রার এক একটি দৃশ্য একের পর এক মস্তিষ্কের পর্দ্দায় আসতে লাগল। কালও ব'লেছিল—"হ্যাঁগা! আমরা বুড়ো বুড়ী হ'য়ে গেলেও কি পরস্পরকে এমনিই ভালবাসব?" তা'র সে সময়কার মুখ দেখ্লে পৃথিবীর সবচেয়ে দিগ্গজ মনস্তত্ত্ববিশারদও বলতে পারত না যে এই নারী কখনও বিশ্বাসঘাতিনী হ'তে পারে। যাক্, এমন ক'রে বসে কোন লাভ নাই। এর একটা হেস্ত নেস্ত করা দরকার। পুনরায় বাড়ীর দরজায় ফিরে এলাম। মাথা তুলে দেখি, বারান্দার ওপর সরমা ও সে। সরমার মুখটা রাস্তার দিকেই ছিল, কিন্তু আমার দিকে দৃষ্টি প'ড়বার ফুর্সৎ তা'র কোথায়! মুখ চোখ তা'র আনন্দে উদ্ভাসিত, হাতে তা'র পানের থালা। সেই ফর্সা ও মোটা আঙ্গুলগুলো থালা হ'তে দুটি পান তুলে নিল। পান আমরা দুজনেই খাই না, বাড়ীতেও থাকে না। তবে এর জন্য পান এল কোত্থেকে! নিরীহপ্রকৃতির মানুষ ব'লে আমার একটা সুনাম (?) আছে। কিন্তু এ দৃশ্য দেখার পর আর তা' বজায় রাখা সম্ভব হ'ল না। 'লোকটার আঙ্গুলগুলো যথেষ্ট মোটা'—একথা ভুলে গিয়ে নিরস্ত্র অবস্থায় সিঁড়ির ওপর দ্রুতবেগে উঠ্তে লাগলাম। আয়ান ঘোষ এসে প'ড়বার পূর্ব্বমুহূর্ত্তেই শ্রীরাধাও শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে নতজানু হ'য়েছিলেন ; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শ্যামও শ্যামা হ'য়েছিলেন। সরমাকেও দেখ্লাম হঠাৎ লোকটার সম্মুখে নতজানু হ'য়েছে। কিন্তু লোকটার সিল্কের পাঞ্জাবী অন্তর্হিত হওয়ার বা তা'র মুষ্টির মধ্যে অসির আবির্ভাব হওয়ার কোন লক্ষণই দেখ্লাম না। বরং ফর্সা মোটা আঙ্গুলগুলো আবার সরমার অনাবৃত খোঁপার দিকে এগিয়ে গেল ; কিন্তু বোধহয় আমার জুতোর আওয়াজ পেয়ে আর স্পর্শ ক'রবার ফুর্সৎ পেল' না। বেশ প্রসন্নবদনে আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল'। সরমা নতজানু অবস্থাতেই মাথার কাপড়টা টেনে নিল'। বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত সিল্কের পাঞ্জাবী ও মিহি ধুতি পরার বিরুদ্ধে আন্দোলন ক'রব মনস্থ ক'রে আমিও সরমার পাশে নতজানু হ'য়ে বোকার মত শ্বশুর-মশায়কে প্রণাম ক'রলাম।

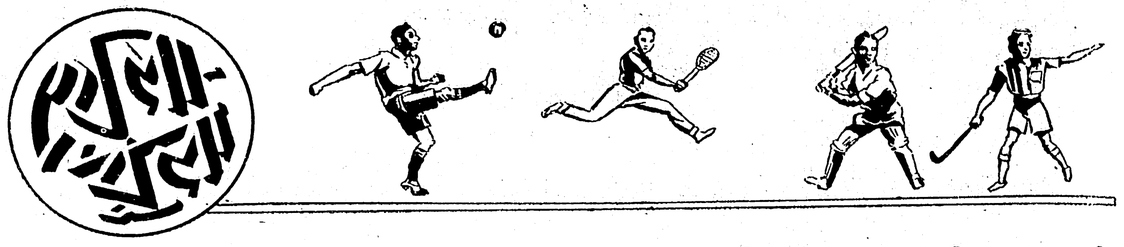

আন্তর্জ্জাতিক ফুটবল ঃ

বার্ষিক ইণ্টার-ন্যাসনাল-ভারতীয় বনাম ইউরোপীয় লীগ ক্লাবের খেলায় উভয় পক্ষে দু'টি করে গোল হওয়ায় খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়। টসে ইউরোপীয় দলের ক্যাপ্‌টেন জয়ী হওয়ায় তারা বিজয়ী বলে গণ্য হয়েছে। খেলার গুণানুসারে তাদেরই জয়ী হবার কথা। খেলারম্ভের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়। মাঠ পিছিল থাকায় নন্দী ব্যতীত সকল ভারতীয় খেলোয়াড় বুট পরে নামে। ইউরোপীয় দলের ক্যাপ্‌টেন মোন্‌রো না নামায়, জি কার্ভে অধিনায়কত্ব করেন। ইউরোপীয় দল বেশ ভালই খেলেছেন, মাঠ তাদের পক্ষে সুবিধাজনক ছিল। ভারতীয় দলের খেলা ভাল হয় নি। ফরওয়ার্ডে সাবু প্রভৃতি কারো খেলা উচ্চাঙ্গের হয় নি, এমন কি করুণা ভট্টাচার্য্যের খেলাও তার নামোচিত হয় নি। হাফ ব্যাকে নূরমহম্মদ ও শেষার্দ্ধে বেণীপ্রসাদের খেলা কথঞ্চিৎ ভাল হয়েছিল। ব্যাকে প্রমোদ দাশগুপ্ত শ্রেষ্ঠ। কে দত্তের দোষে প্রথম গোল হয়।

কে ভট্টাচার্য্য (ক্যাপ্‌টেন)

জি কার্ভে (ক্যাপ্‌টেন)

ইউরোপীয়দের ফরওয়ার্ডে জে মিলসের সেণ্টারগুলি নিখুঁত হয়েছে। কিংসলি ও আর লামস্‌ডেন গোলে বেশ তৎপরতার সঙ্গে সট করেছে। তারা দু' জনে একটি করে গোল দিয়েছে। ক্যাপটেন কার্ভের খেলা ভাল হয় নি, রে বেশ ভাল খেলেছে। গোলে রাসেল কয়েকটি ভাল সট রক্ষা করেছিল।

রেফারিং অত্যন্ত খারাপ হয়েছে। ভারতীয়দের দু'টি গোলই অফ্‌সাইড থেকে হয়। প্রথমটি এত পরিষ্কার অফ্‌সাইড ছিল যে তা রেফারির চক্ষে না পড়াই আশ্চর্য্য।

ক্রমশই এই খেলাটিতে দর্শক সমাগম কমে যাচ্ছে। সাধারণের আগ্রহ আর এই রকম আন্তর্জ্জাতিক খেলাতে নেই বলে মনে হয়। মাত্র ৩০৯৩৲ টাকার টিকিট বিক্রয় হয়েছে।

কে দত্ত

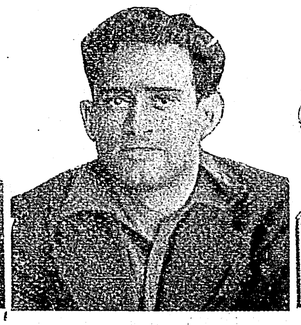

বেণীপ্রসাদ

কিংসলি

নুর মহম্মদ

রাজার জন্মদিন ছুটির দিনে এই খেলাটি স্থির করায় যে ভুল হয়েছিল তা' বেশ প্রমাণিত হয়েছে। শনিবারে হলে ইহা অপেক্ষা অধিক দর্শক সমাগত হতো বলে মনে হয়। মফঃস্বলের লোকে এই খেলা দেখবার জন্য বাড়ী থেকে কলিকাতায় আসতে ইচ্ছা করে নি।

আই এফ এর সভাপতি নিকলস্ বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন যে তিনি এবার চ্যারিটি লব্ধ অর্থ প্রাপ্তিতে রেকর্ড স্থাপন করতে ইচ্ছা করেন এবং এই মহদুদ্দেশে সকলের সাহায্য আশা করেন। কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক দর্শনীয় ম্যাচগুলিকে চ্যারিটি না করলে বিশেষ সুবিধা হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু এও দেখবার বিষয়, যে ঐরূপ করতে সেই সকল ক্লাব মেম্বারদের প্রতি অন্যায় করা হয়। ক্যালকাটা ক্লাবের সভ্যরা বিশেষ বিশেষ খেলা বিনা মূল্যে দেখবার সৌভাগ্য পায়, আর অন্য ক্লাবগুলি তাদেরই খেলায় অর্থ ব্যয় করতে বাধ্য হয়, চ্যারিটির খাতিরে। ইষ্টবেঙ্গল বা মোহনবাগানের মহমেডানদের সঙ্গে খেলা চ্যারিটি করলে যথেষ্ট অর্থাগম হবে ইহা সুনিশ্চিত, কিন্তু তাতে ঐ ক্লাবদের সভ্যদের প্রতি অবিচার করা হবে না কি ?

লীগ খেলা ঃ

মহমেডান স্পোর্টিং ২-০ গোলে ইষ্ট বেঙ্গলের কাছে এবার প্রথম পরাজয় স্বীকার করেছে। খেলায় ইষ্ট বেঙ্গল সকল বিভাগেই উৎকর্ষতা প্রদর্শন করেছিল। পূর্ব্ববারের

মুর্গেশ

আব্বাস

মতন এবারও মুর্গেশ প্রথমার্দ্ধেই আহত হয়ে মাঠ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়, আর খেলতে পারে নাই। এমন কি এখনও পর্য্যন্ত খেলতে পারছেনা। মহমেডানদের সঙ্গে খেলায় জয়ী হলেই বিজয়ী দলের খেলোয়াড় আহত এবং রেফারি ও লাইন্সম্যানদের প্রাণ বাঁচান দায় হয় কেন ? রেফারি গিবসন ও লাইন্সম্যান সুশীল ঘোষ ও জে চক্রবর্ত্তীকে পুলিস পাহারায় বাড়ী পাঠাতে হয়েছিল, পুলিসের সম্মুখেই তাদের গাড়ীতে ইট পড়েছে। সংবাদপত্র মারফৎ জানা গেলো, কয়েকজন গ্রেপ্তারও হয়েছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাদের বিচার ফল বের হয় নি, হয়তো হবেও না। গতবারের গোলযোগের পরেও ফলাফল বের হয় নি। মহমেডানদের পরবর্ত্তী হার হয় নবাগত রেঞ্জার্সদের কাছে ২-১ গোলে। নবাগতদের কাছে তাদের হার এই প্রথম নয়, পূর্ব্ব-নবাগত পুলিসের নিকটও তারা ৪-৩ ও ৫-১ গোলে হেরেছিল। তারা এখন চতুর্থ স্থানে আছে।

এবার মোহনবাগান প্রথম থেকেই ভাল খেলছে এবং ১২টা খেলে ১৯ পয়েণ্ট করে প্রথম আছে, রেঞ্জার্স ১৮ করে দ্বিতীয় এবং ইষ্ট বেঙ্গল ও মহমেডান ১৬ করে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। মোহনবাগানের প্রথম পরাজয় ঘটেছে

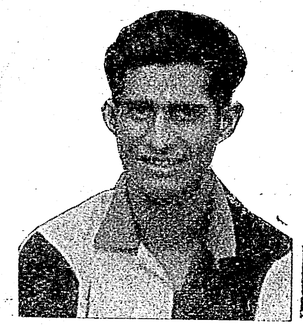

এস মিত্র

মোহিনী ব্যানার্জ্জী

ভবানীপুরের কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে। মোহনবাগানের ফরওয়ার্ডরা অনেকগুলি সুযোগ নষ্ট করে। প্রথম দু একটা ম্যাচে তাদের ফরওয়ার্ড, বিশেষ ল্যাংচা ও মোহিনীতে যেরূপ নিখুঁত আদান-প্রদান দেখিয়েছিল, সে খেলা ক্রমশই ম্লান হয়ে যাচ্ছে। ভালো খেলবো এবং জিত্‌বো এই মনোভাব নিয়ে খেলতে নামা উচিত। হার হবে, বিপক্ষ বড়ই দুর্দ্দান্ত, গোড়া থেকেই যদি এই ধারণা মনে বদ্ধমূল হয়ে যায় তবে কখনই খেলা উচ্চাঙ্গের হয় না। মোহনবাগানের প্রত্যেক খেলোয়াড়েরই এবার বিশেষ প্রাণপণ করে প্রতি খেলায় চেষ্টা করা উচিত, যাতে তারা এবার লীগ জয়ী হতে

পারে। অতীতে বহুবার তারা হেলায় লীগ হারিয়েছে। এ সুবর্ণসুযোগ ত্যাগ করলে নিকট ভবিষ্যতে আর সুযোগ আসবে না। হাফ ব্যাকে বেণী খুব উচ্চাঙ্গের খেলা খেলছে,

প্রেমলাল

প্রেমলাল সব দিন সমানভাবে না খেলতে পারলেও অদম্য উৎসাহী ও পরিশ্রমী। রাইট হাফ এখনও উপযুক্ত পাওয়া যায় নি। বিমল দু' একদিন খেলছে, কিন্তু পূর্ব্ব যোগ্যতানুযায়ী নয়। ব্যাকে দরবারী ও পরিতোষ চক্রবর্ত্তী মন্দ নয়। পরিতোষের একটা দোষ, যে সে বড় এগিয়ে খেলে, সময়মত ফিরে আসতে পারেনা। হাফ ব্যাকের আগে গিয়ে খেলবার কোন দরকার মনে হয়না। মাঝে মাঝে মারাত্মক মিস্ কিক্‌ও করে। গোলে কে দত্ত বেশ বিশ্বাসী ও নির্ভরশীল।

ইষ্টবেঙ্গল মুর্গেশ ও লক্ষ্মী-নারায়ণকে আনিয়ে উন্নতি করেছে। দুর্ভাগ্যবশতঃ মুর্গেশ আহত হয়ে খেলতে পারছে না। হাফ ব্যাকে নন্দি ও বেবি গুহ বেশ দক্ষতার সঙ্গে খেলছে। ব্যাকে পি দাশগুপ্ত সব দিন ভাল না খেললেও নির্ভরযোগ্য, আর মজুমদার জল কাদাতেও মন্দ খেলে না। গোলে ডি সেন বেশ নির্ভরশীল। ইষ্টবেঙ্গল লীগ পেতে বিশেষ চেষ্টা করবে।

ইষ্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়গণ। লীগখেলায় মহামেডান স্পোর্টিংকে দু' গোলে পরাজিত করেছে

ইউরোপীয়দের মধ্যে নবাগত রেঞ্জার্সই এবার বিপুল উদ্যমে লীগ পাবার জন্যে চেষ্টা করছে। তাদের পাবার খুব আশা আছে; তারাই এখন মোহনবাগানের নিকট প্রতিদ্বন্দ্বী। মোহনবাগানের সঙ্গে তাদের দ্বিতীয় খেলায় বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে। নামবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা চল্‌বে, ক্যালকাটা, এরিয়ান্স ও পুলিসে। দেখা যাক, কে কৃতকার্য্য হয়। ক্যালকাটা যদি আবার নামে তো আই এফ এরই বিপদ ঘটবে। কোন ছুঁতায় তাদের প্রথম বিভাগে রাখবে তা' ভাবতে হবে—না হ'লে খেলার জৌলুষ চলে যাবে যে! ক্যালকাটা মোহনবাগানের সঙ্গে যেরূপ গায়ের জোরে খেলেছিল, সেরকম খেলা কিন্তু একদিনও আর খেলতে পারে নি। তাদের নূতন Oxford Blue সেণ্টার ফরওয়ার্ড কিংসলি বেশ খেলে।

কালীঘাট প্রথম আরম্ভ করেছিল বেশ ভাল, কিন্তু ক্রমশই নেমে যাচ্ছে জনের মৃত্যুর পর। জোসেফ প্রথম দিকে সুন্দর ক্রীড়া চাতুর্য্য দেখিয়েছিল।

রুল নম্বর ৩৩ ঃ

মহীশূর ফুটবল এসোসিয়েশন রুল নং ৩৩ অনুসারে তাদের প্রদেশের পনের জন বিভিন্ন খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে বাঙ্গলার বিভিন্ন ক্লাবে খেলবার জন্য প্রতিবাদ করে আই এফ একে পত্র দেন। আই এফ এর সভাপতি ২৫শে মে তারিখের সভাতে জানান যে মহীশূর এসোসিয়েশনকে টেলিগ্রাফ করা হয়েছে ঐ সকল খেলোয়াড়দের স্বাক্ষরিত রেজিষ্ট্রেশন ফর্ম্ম ও আবশ্যকীয় কাগজপত্র পাঠাতে। একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেছেন আই এফ এ। সেই কমিটি গত ৭ই জুন তারিখে প্রথম সভা করেন 'ক্যামেরায়'। কোন সংবাদ সাধারণে তাঁরা প্রকাশ করেন নি। গতিক

দেখে অনুমান হয়, যে আই এফ এ রুল ৩৩কে নানা অজুহাতে এ বৎসরও ধামা-চাপা দেবেন, কার্য্যকরী হবে না। সেদিনও বাঙ্গালোর থেকে খেলোয়াড় এসে খেলায় যোগ দিয়েছে। যে সকল ক্লাব এই সকল খেলোয়াড়-দের খেলাচ্ছে, তাদের কর্ম্মকর্ত্তা-দের আই এফ এতে যে বিশেষ প্রতিপত্তি আছে, তা' বোঝা যায়।

প্রথম আই এফ এ রুল ৩৩এর interpretation চাই-লেন এ আই এফ এফ এর কাছে। তাঁরা স্পষ্টভাবে জানালেন যে, খেলোয়াড় যে প্রদেশের habitual resident সেই প্রদেশের হয়েই তাকে খেলতে হবে, তার কোন option থাকবে না কোন্ প্রদেশ হয়ে সে খেলবে। এর পরেও আই এফ এর এই রুল সম্বন্ধে মতানৈক্য হওয়ার কোন কারণ দেখা যায় না। সম্ভবতঃ আই এফ এর বিচারের ক্ষমতাও নেই, তা' যদি হয় তবে তাঁরা যে সকল খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়েছে, তাদের সংক্রান্ত

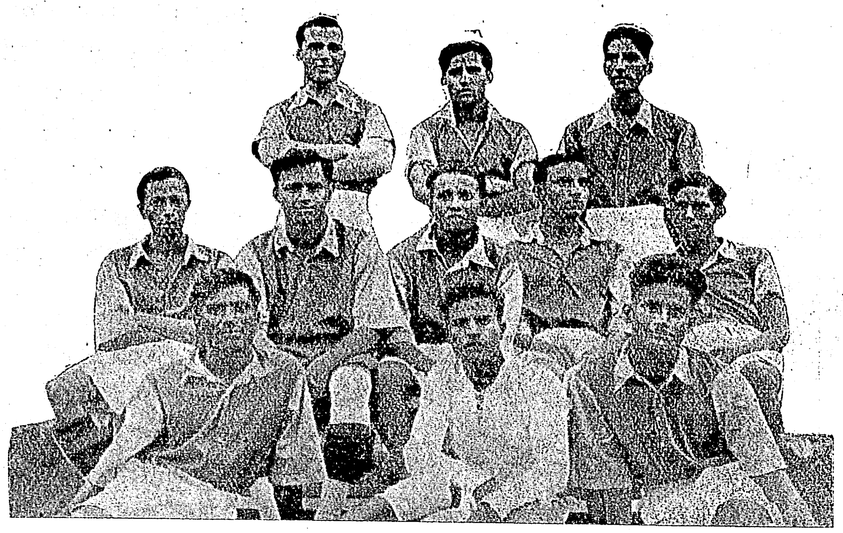

কালীঘাট ক্লাবের খেলোয়াড়গণ

কাগজপত্র এ আই এফ এফ একে পাঠিয়ে দিয়ে তাঁদের আদেশ চান না? অনর্থক বিলম্ব করে সময় কাটানই বোধ হয় ইচ্ছা। যদি লীগ খেলার শেষাশেষি বা পরে এ আই এফ এফ কর্ত্তৃক ঐ সকল খেলোয়াড়দের বাঙ্গলায় খেলা নামঞ্জুর হয় এবং তারা দোষী বলে গণ্য হয়ে শাস্তি পায়, তা'হলে সেই দলের সঙ্গে খেলার ফলাফলগুলি কি রকমে ধর্ত্তব্য হবে? আইন হ'লো, কিন্তু যে অন্যায় বন্ধের জন্য হ'লো তার কোনই প্রতিকার হ'লো না!

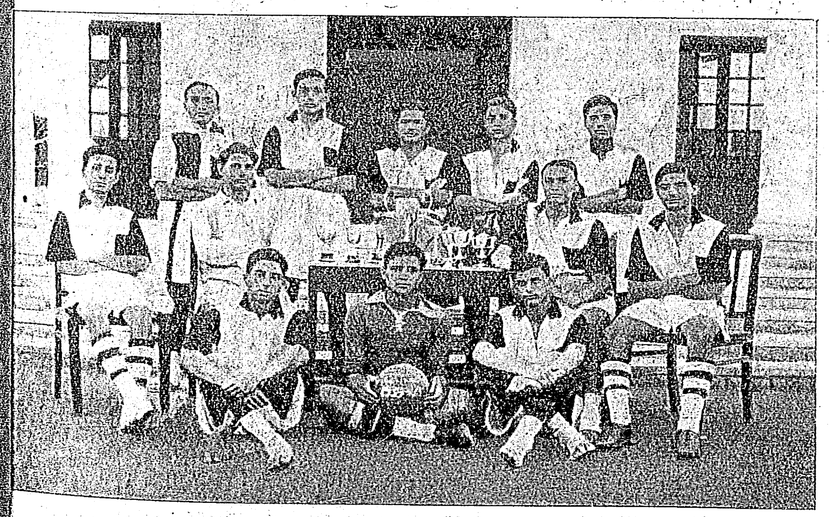

দিল্লী প্রভিন্সিয়েল ইণ্টার স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতার বিজেতা রাইসিনা বেঙ্গলী হাইস্কুলের ছাত্রবৃন্দ

দ্বিতীয় বিভাগ—

দ্বিতীয় বিভাগে প্রথম স্থানে র'য়েচে জর্জ্জ টেলিগ্রাফ এবং দ্বিতীয় স্থানে স্পোর্টিং ইউনিয়ান। তাদের মধ্যে তফাৎ এক পয়েণ্টের। স্পোর্টিং বহুদিন আগে প্রথম বিভাগে খেলতো। আশা হয়, তারা আবার প্রথম বিভাগে স্থান ক'রে নিতে পারবে।

বিশিষ্ট খেলোয়াড়দ্বয়ের মৃত্যু ঃ

ইষ্টবেঙ্গলের বিখ্যাত গোলরক্ষক মণি তালুকদার এবং

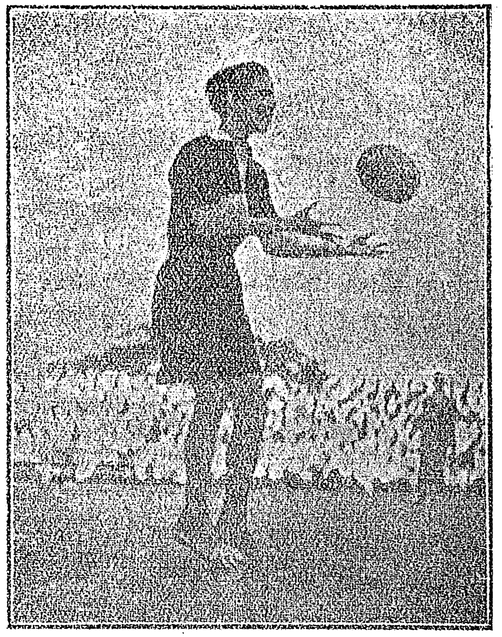

তালুকদার

কালীঘাটের খ্যাতনামা ফুটবল খেলোয়াড় জন ইহলোক ত্যাগ ক'রেচেন। তালুকদার ছয়বার আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় স্থান পেয়েছিলেন এবং জনও একাধিকবার প্রতিনিধিমূলক খেলায় যোগদান করবার সৌভাগ্য অর্জ্জন ক'রেছিলেন। তালুকদার বহুদিন যাবৎ দুরারোগ্য রোগে ভুগেছেন, কিন্তু জনের মৃত্যু অত্যন্ত আকস্মিক, তাই আরো বেদনাদায়ক।

জন

লাব্রি সাফি ঃ

ইংলণ্ডের বড় বড় টেনিস-সমালোচকদের মতে ফ্রয়েড-পেরীর পর সাফির মত টেনিস খেলোয়াড় ইংলণ্ডে দেখা যায়নি। অষ্টিনের চেয়েও নাকি তাঁর খেলা অনেক উচ্চস্তরের। ডেলি-এক্সপ্রেসে রোগার্স লিখেছেন, সাফি ইংলণ্ডে তাঁর সমসাময়িক সব খেলোয়াড়দের হারাতে সক্ষম হয়েচেন অবশ্য অষ্টিনের সঙ্গে তাঁর এখনো খেলা হয়নি তবে রোগার্সের বিশ্বাস সাফি নিশ্চয় অষ্টিনকে হারাতে পারবে।

প্রথমবিভাগ লীগের ফলাফল ঃ

	খেলা	জয়	ড্র	হার	পক্ষে	বি	পয়েন্ট
মোহন বাগান	১২	৮	৩	১	১৭	৫	১৯
রেঞ্জার্স	১২	৯	০	৩	২৩	৯	১৮
ইষ্টবেঙ্গল	১২	৬	৪	২	১৬	৬	১৬
মহমেডান	১২	৬	৪	২	১৮	৯	১৬
কাষ্টমস	১২	৫	৩	৪	১৫	১৩	১৩
কালীঘাট	১০	৪	৪	২	১২	৮	১২
ই বি আর	১১	৫	২	৪	১৪	১০	১২
ক্যামারোনিয়ন	১২	৩	৩	৬	৮	১৩	৯
ভবানীপুর	১১	৩	৩	৫	৯	১৬	৯
এরিয়ান	১২	৩	২	৭	৯	১২	৮
পুলিশ	১২	৩	২	৭	১২	২০	৮
বর্ডার রেজিমেণ্ট	১২	২	২	৮	১৫	২৩	৬
ক্যালকাটা	১২	১	৪	৭	১৪	২৩	৬

১১ই জুন পর্য্যন্ত

আন্তর্জাতিক ফুটবল ঃ

ইংলণ্ড বনাম রুমানিয়া ঃ

আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলায় ইংলণ্ড ২-০ গোলে রুমানিয়াকে পরাজিত করেছে। দর্শক সংখ্যা হ'য়েছিল চল্লিশ হাজার। খেলা আরম্ভের আট মিনিটে ইংলণ্ডের গুল্‌ডন প্রথম গোল দেন। বিশ্রামের আট মিনিট পূর্ব্বে ওয়েলস দলের শেষ গোলটি করেন। ইংলণ্ড গোল দেবার বহু সুযোগ নষ্ট করেছিল।

জার্ম্মাণি বনাম আয়ার ঃ

উভয় পক্ষেই একটি ক'রে গোল হওয়ায় খেলা ড্র হয়।

হাঙ্গেরি—২, আয়ার- ২ ঃ—খেলা ড্র ;

ফ্রান্স—২, ওয়েল্স—০ ঃ—ফ্রান্স ২-০ গোলে বিজয়ী।

ইটালী—২, ইংলণ্ড—২ ঃ—খেলা ড্র।

হারপেণ্ডেন টেনিস টুর্ণি ঃ

গাউস মহম্মদ ৩-৬, ৭-৫, ৬-২ গেমে বাট্‌লারকে ফাইনালে পরাজিত ক'রে বিজয়ী হয়েছেন। কিন্তু ডবলস্ ফাই-

গাউস মহম্মদ সাবুর

নালে, বাট্‌লার ও কোম্বে ৮-৬, ১১-৯ গেমে গাউস মহম্মদ ও সাবুরকে পরাজিত করেছেন।

হারলিংহাম টুর্ণি ঃ

হারলিংহাম টুর্ণির ফাইনালে গাউস মহম্মদ ৩-৬, ৭-৫, ৩-৬ গেমে ডিলোফোর্ডের নিকট পরাজিত হ'য়েছেন।

ডেভিস কাপ ঃ

দ্বিতীয় রাউণ্ডে গ্রেট বৃটেন ৩-২ ম্যাচে নিউজিল্যাণ্ডকে পরাজিত করেছে।

তৃতীয় রাউণ্ডে হেয়ার (গ্রেট বৃটেন) ৬-২, ৬-৩, ৩-৬, ১৪-১২ গেমে ডেসত্রিমোঁকে (ফ্রান্স) পরাজিত করেন।

ফ্রান্স ৩-০ ম্যাচে চীনকে পরাজিত করেছে।

আসডেয়ান টীমের ক্যাপটেন লর্ড লুইস মাউণ্টব্যাটেন পোলো ফাইনালে বিজয়ী হয়ে হুইট্‌নে কাপ নিচ্ছেন

জার্ম্মাণি ২-১ ম্যাচে পোলাণ্ডকে পরাজিত করেছে।

জার্ম্মাণি ৩-০ ম্যাচে বৃটেনকে পরাজিত ক'রেচে।

কুস্তি প্রতিযোগিতা ঃ

জুন মাসের মধ্যভাগে দিল্লীতে ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের সম্মিলিতভাবে এক কুস্তী প্রতিযোগিতা হবে। ভারতীয় কুস্তিগীরদের ব্যবস্থার ভার নিয়েচেন ফেলিনো কোয়াগলিয়া। নিম্নলিখিত ইউরোপীয়ান কুস্তিগীররা যোগদান করবেন ;—ভন ক্রেমার, মাইকেল গিল, কিং কং,

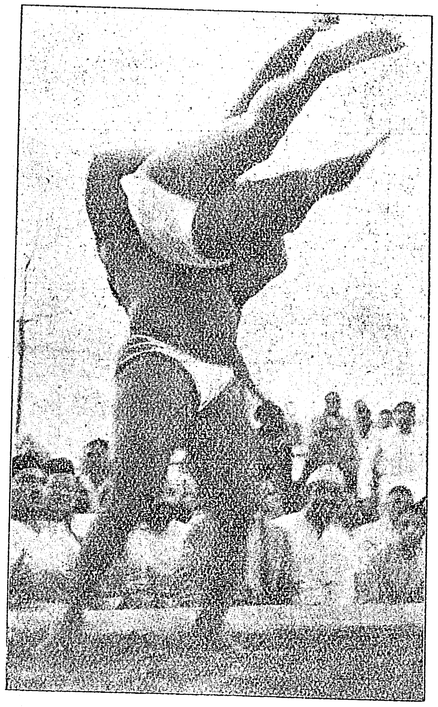

চ্যাম্পিয়ান হরবন্ সিং দিল্লী কুস্তি প্রতিযোগিতায় তার প্রতিদ্বন্দ্বী জুলানদারের সর্দ্দার খাঁকে ভূতলশায়ী করছেন

জেজি গোল্ডসটেগ, টোনি লামারো, কোরেস্কেঞ্জি, কন্সেল, চার্লস ড্যাগলেন।

অল্ বেঙ্গল ইণ্টার স্কুল বক্সিং টুর্ণামেণ্ট ঃ

এই বৎসর বাঙ্গলার তরুণ উদীয়মান মুষ্টিযোদ্ধা শ্রীযুত

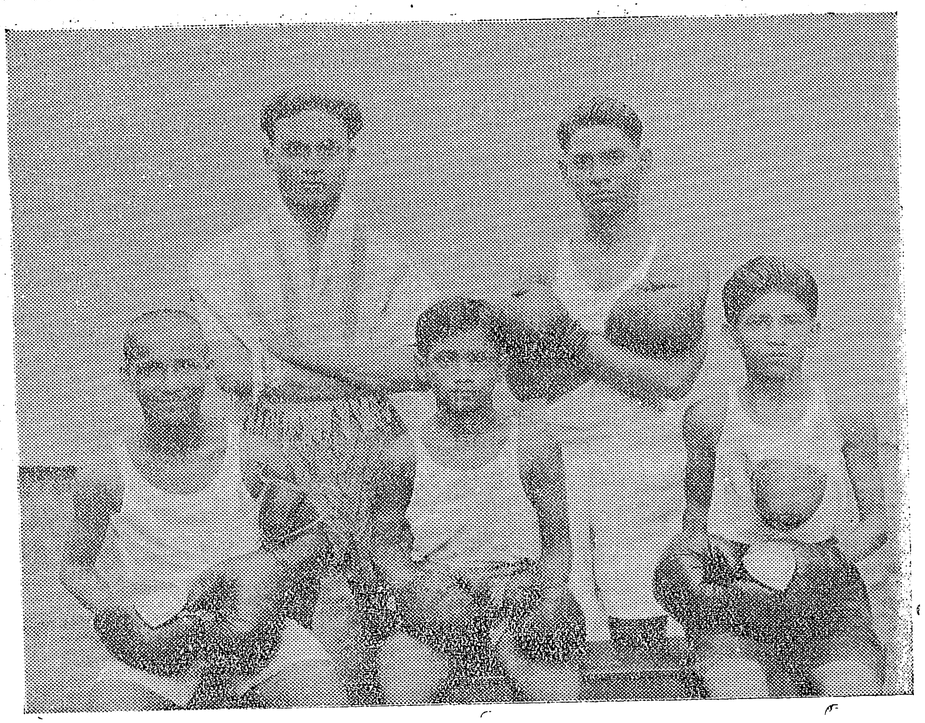

দাঁড়িয়ে (বাম থেকে) ব্রজেন্ রায়, বি লাল্ ; ব'সে (বাম থেকে) সন্তোষ চ্যাটার্জ্জী (ব্যাণ্টাম্ ওয়েট্ চ্যাম্পিয়ান্), সুবোধ সেনগুপ্ত, ও সুশীল সেনগুপ্ত (ফ্লাই ওয়েট্ চ্যাম্পিয়ান্)

ব্রজেন্ রায়ের শিক্ষাধীনে কলিকাতার আর্ব্বান্ ইনষ্টিটিউসন হ'তে চারজন ছাত্র অল্‌বেঙ্গল ইণ্টার স্কুল বক্সিং টুর্ণামেণ্টে (এস্ ও পি সি পরিচালিত) যোগদান করেছিল। তাদের মধ্যে দু'জন বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়ে ফাইন্যালে বিজয়ী হয় এবং একজন সেমিফাইন্যালে পরাজিত হয়েছে।

ইউনাইটেড কিংডাম প্রফেসান্যাল বিলিয়ার্ডস্ চ্যাম্পিয়ানসিপ ঃ

জো ডেভিস টম নিউম্যানকে পরাজিত করে উক্ত চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করেছেন। জো ডেভিস ২১৬০১ ও টম নিউম্যান ১৮৩৪৩ পয়েণ্ট করেছেন।

বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ন ঃ

ভারতের বিলিয়ার্ড এসোসিয়েশনের নিমন্ত্রণে গ্রেটবৃটেনের অবৈতনিক বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ান, কিংস্‌লে কেনারলে সস্ত্রীক কলিকাতায় এসেছেন। তিনি ভারতের সকল প্রধান স[illegible] প্রদর্শনী খেলা খেলবেন।

বোম্বাইয়ে প্রথম খেলায় কিংসলে কেনারলে [illegible] জিমখানা চ্যাম্পিয়ান জি এ পটগাওকারকে (+৩০[illegible]

গ্রেটবৃটেনের অবৈতনিক বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ন কিংস্‌লে কেনারলে

৮৯৭—৪৮৮ পয়েণ্টে পরাজিত করেন ; দ্বিতীয় খেলায় তিনি [illegible] এ ড্ ও য়া র্ড স কে (+৩০) ৭৭৯—৫৭৭ পয়েণ্ট হারাইয়াছেন।

হেনরী লুই ঃ

হেনরী লুই সম্প্রতি চোখের দোষের জন্য লেন হার্ভের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার অনুমতি পান নি। ন্যাশনাল বক্সিং এসোসিয়েশন তাঁকে চক্ষু পরীক্ষা করাবার আদেশ দিয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, লুই যদি সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে না পারেন তাহ'লে পৃথিবীর 'লাইট-হেভি-ওয়েট টাইটেল' তাঁর কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে এবং এই পদটি খালি থাকবে। তবে নিউইয়র্কে জ্যাক হার্ভে ও মেলিজ-বেটিনার যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে তাতে এই শূন্য স্থান পূর্ণ করবার আশা রয়েচে। লুইয়ের পক্ষে খবরটি অত্যন্ত বিপদের। অবশ্য এখন সমস্তই নির্ভর ক'রচে তাঁর চক্ষুর উপর।

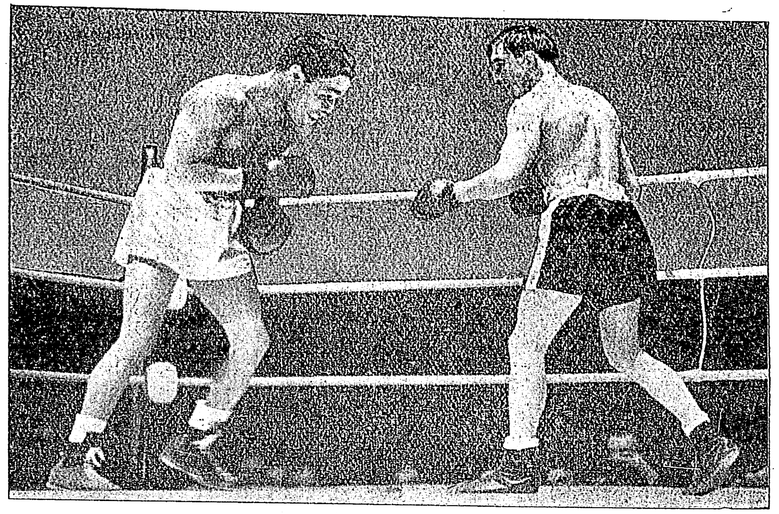

পৃথিবীর ওয়ালটার ওয়েট চ্যাম্পিয়ান আর্ম্মষ্ট্রং বৃটিশ চ্যাম্পিয়ান আরনিক রোডারিককে পয়েণ্টে পরাজিত করে 'পৃথিবীর টাইটেল' পেয়েছেন

টমি-ফার ঃ

৩৫ হাজার দর্শকের সামনে টমি ফার বিখ্যাত নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা লারিগেনকে পরাজিত ক'রেছেন। খেলা ১২ রাউণ্ড হবার কথা ; কিন্তু লারি পঞ্চম রাউণ্ডে ভগ্ন দক্ষিণ হস্ত নিয়ে অবসর গ্রহণ ক'রতে বাধ্য হন। এঁদের দুজনেরই ওজন ১৪ ষ্টোন ৮½ পাউণ্ড। টমি লারির চেয়ে প্রতি বিষয়েই উন্নততর খেলা দেখিয়েছে।

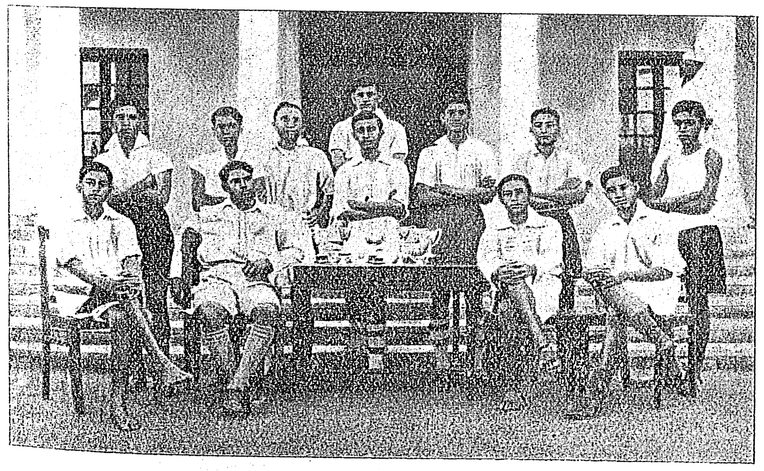

দিল্লী ওয়াই এম সি এ স্পোর্টসের চ্যাম্পিয়ানসিপ কাপ বিজয়ী রাইসিনা বেঙ্গলী হাইস্কুলের ছাত্রবৃন্দ

হাইজাম্পে নূতন রেকর্ড ঃ

ব্রেণ্টউডে কুমারী ডরাথী ওডাম ৫ ফিট ৫'৭৫ ইঞ্চি

লাফিয়ে মেয়েদের পৃথিবীর নূতন রেকর্ড স্থাপন ক'রেচেন। পূর্ব্ববর্ত্তী রেকর্ড ছিল আমেরিকার কুমারী জিন সার্লিও কুমারী ডিডরিক্সন এবং জার্মানীর কুমারী ডোরা রাটজেনের। এঁরা সকলেই ৫ ফিট ৫ ইঞ্চি অতিক্রম ক'রেছিলেন।

বাজের জয়লাভ ঃ

উইমব্লিতে বাজ ১৩-১১, ২-৬, ৬-৪ গেমে, হান্স-নাসেলিনকে হারিয়ে টুর্ণামেণ্ট বিজয়ী হ'য়েচেন। বাজ সর্ব্বসমেত ৫ হাজার পাউণ্ড ও একটি রূপোর কাপ পেয়েচেন। উইমব্লিতেই বাজ 'ইংলিশ প্রফেস্যানাল টুরে' টিলডেনকে ৬-২, ৬-২ গেমে হারান।

ডেভিস কাপ ও ভারতবর্ষ ঃ

ডেভিস কাপের দ্বিতীয় রাউণ্ডে বেলজিয়াম ভারতবর্ষকে ৩-২ ম্যাচে পরাজিত ক'রেচে।

সিঙ্গলসে ঃ

গাউস মহম্মদ (ভারতবর্ষ) ১০-৮, ৬-২ ও ৬-৩ গেমে নাইয়ার্টকে পরাজিত ক'রেন।

লাকরোইক্স (বেলজিয়াম) ৬-২, ৬-২, ৬-৪ গেমে সাবুরকে পরাজিত ক'রেন।

নাইয়ার্ট সাবুরকে পরাজিত ক'রেন ৬-০, ১০-৮, ১-৬ ও ৬-৩ গেমে।

গাউস মহম্মদ লাকরোইক্সের নিকট পরাজিত হন ৬-১, ৬-৪, ৫-৭ ও ৬-৪ গেমে।

ডবলসে ঃ

গাউস ও সাবুর ৬-৪, ৬-১, ৫-৭ ও ৬-৪ গেমে গিলহ্যাণ্ড ও এইণ্ডিকে পরাজিত করেন।

এছাড়া বার্ম্মিংহামের প্রাইয়োরী হোয়াইটসান টুর্ণামেণ্টের তৃতীয় রাউণ্ডে খোসিনকির (চীন) কাছে সাবু ৬-৩, ৬-২ গেমে এবং বাডিনের (রুমানিয়া) কাছে গাউস ৬-৩, ১-৬ ও ৭-৫ গেমে পরাজিত হ'য়েচেন।

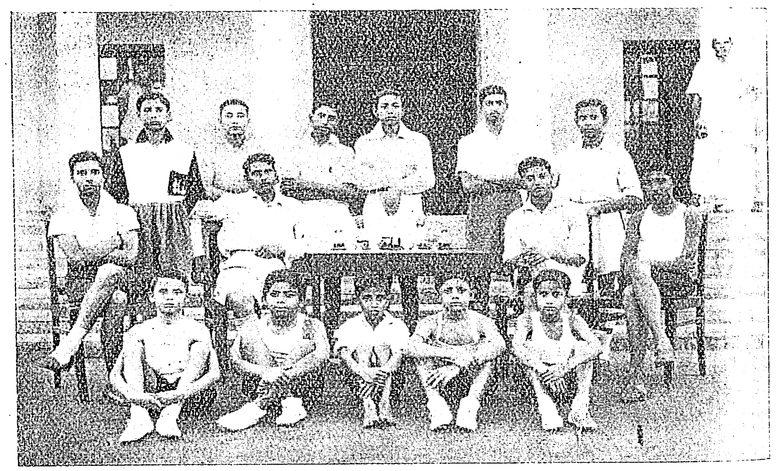

দিল্লী অলিম্পিক প্রতিযোগীতায় চ্যাম্পিয়ানসিপ কাপ বিজয়ী রাইসিনা বেঙ্গলী হাইস্কুলের 'বি' শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ

আন্তর্জাতিক হকি প্রতিযোগিতা ঃ

অনেক নূতন বিষয় আগামী 'হেলসিনকি' অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় গ্রহণ করা হয়েচে, কিন্তু এতকালের পুরাতন ও প্রথম শ্রেণীর প্রতিযোগিতা হকিকে বাদ দেওয়া হ'য়েচে। এটা যদি কর্ত্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাকৃত না হয় তাহ'লে এতে তাঁদের অক্ষমতাই প্রকাশ পায়, আর স্বেচ্ছাকৃত হ'লে, খেলোয়াড়ী মনোভাবের পরিচয় নয়। অবশ্য হকি প্রতিযোগীতা 'হেলসিনকি'তে না হ'লেও বন্ধ থাকবে না; আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনের তত্ত্বাবধানে আমষ্টার্ডামে অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করবার জন্য পৃথিবীর সকল দেশকেই নিমন্ত্রণ করা হ'য়েচে এবং ভারতবর্ষ যাতে এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে সেজন্য তাকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করা হয়েচে। ইণ্ডিয়ান হকি এসোসিয়েশনের গত সাধারণ অধিবেশনে এই প্রতিযোগিতায় যোগদানের প্রস্তাব প্রাথমিক ভাবে গৃহীত হ'য়েচে এবং আগামী জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহে ক'লকাতায় যে সভা হবে তাতে এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে বলে জানা গেছে।

অমরসিংএর কৃতিত্ব ঃ

অমরসিং প্রতি বারের ন্যায় এবারেও ইংলণ্ডে বোলিংয়ে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাচ্চেন। টডরডেনের বিরুদ্ধে খেলে তিনি ২৯ রানে সাত টা উইকেট পান। টডমরডেনের ৬৭ রানে ইনিংস শেষ হয়। লাঙ্কেসায়ার লীগে লোয়ার হাউসের বিরুদ্ধে খেলে তিনি ৪১ রানে ৮ উইকেট পেয়েছেন।

মোহনবাগানের বে-বন্দোবস্ত ঃ

মোহন বাগান ও মহমেডানদের খেলা মোহনবাগান মাঠে হয়। এদিন মোহনবাগানের সভ্যদের প্রবেশদ্বারে বিশেষ নির্য্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল বলে বহু অভিযোগ আমাদের নিকট এসেছে। মোটামুটি তাঁদের অভিযোগ এই ঃ—সভ্যরা পাঁচটার পূর্ব্বে ক্লাব গেটে এলেও কর্ত্তৃপক্ষ মিলিটারী গেটের পাশের গেট দিয়ে হেডওয়ার্ডের গ্যালারীতে প্রবেশ করতে বলেন। সেখানে গেলে দেখা যায় লোকারণ্য, প্রবেশদ্বারের সন্নিকটেও পৌছান সম্ভব নয়। তাঁরা ক্লাব গেটে ফিরে এসে দেখেন, সেখানে তখন প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সংখ্যা বেশী হয়ে এত ভীড় জমেছে এবং মাত্র একটি দ্বার খোলা থাকায় গ্যালারীতে প্রবেশের চেয়েও ব্যাপার দুরূহ হয়েছে। সভ্যরা ভীড়ের চাপে পিশে যাচ্ছে, কিন্তু অন্য দু'টি দ্বার খোলা হচ্ছে না। এরূপ বে-বন্দোবস্তের কারণ কি? কেন তাঁদের প্রথমে ক্লাব গেট থেকে অন্যত্র যেতে বলা হলো? নিজস্ব মাঠে নিজেদের সভ্যদের স্থান না হবার কারণ কি? ক্লাবের যত সংখ্যক মেম্বার আছে, তাঁদের জন্য গ্যালারীতে নিশ্চিত স্থান থাকা উচিৎ, সে স্থান রেখে তবে কর্ত্তৃপক্ষ আত্মীয়স্বজনদের কম্‌প্লিমেণ্ট টিকিট বিতরণ করবেন। সভ্যদের ঢুকতে প্রথমে বাধা দেওয়ায় এবং গেট বন্ধ করায় ক্রমশঃ ভীড় জমে যায়, তাতে মেম্বারদের এবং এমন কি মহিলাদেরও বিশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। তাঁরা জানতে চান, কত জনের বস্‌বার স্থান

নিউ দিল্লী চেমসফোর্ড ক্লাবে রাইসিনা বেঙ্গলী হাইস্কুলের ছাত্রদের কাঠি নৃত্য

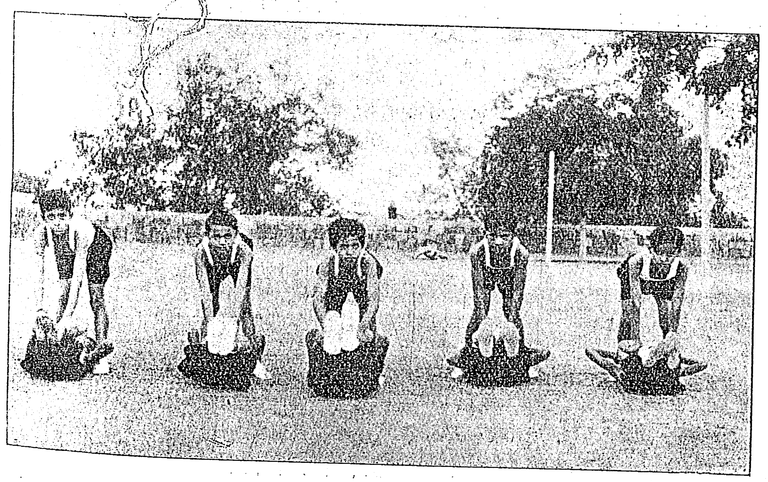

নিউ দিল্লী চেমস্‌ফোর্ড ক্লাবে রাইসিনা বেঙ্গলী হাইস্কুলের ছাত্রদের 'কাট হুইল' কসরৎ

ক্লাবের গ্যালারীতে আছে (ভিজিটিং দলের ব্লক বাদে) এবং উপস্থিত সভ্য সংখ্যাই বা কত ? তা' ছাড়া হেডওয়ার্ডের যে গ্যালারী মূল্য বিনিময়ে লওয়া হয় তাতে কত জন বসতে পারে এবং ঐ জন্য ক্লাবের ব্যয় কত লাগে ? মোহনবাগান-ইষ্টবেঙ্গলের খেলায় কেবলমাত্র কম্‌প্লিমেণ্টারী টিকিটেই হেডওয়ার্ডের ব্লক ভর্ত্তি করা হয়েছিল। সে তবু ভাল ছিল, যাদের বিনামূল্যে টিকিট দেবেন তাদের যেখানে হয় যেতে বলতে পারা যায়, কিন্তু সভ্যদের ক্লাব গ্যালারীতে স্থান না দিয়ে কর্ত্তৃপক্ষের খুসিমত অন্যত্র যেতে বলা সঙ্গত কি ?

আমরা মোহনবাগান কর্ত্তৃপক্ষকে এই সকল অভিযোগের প্রতিকার করতে অনুরোধ করছি। অনুসন্ধানে জানা গেছে, সেদিন সত্যসত্যই সভ্যরা ও মহিলারাও অত্যন্ত লাঞ্ছিত হয়েছেন এবং কর্ত্তৃপক্ষও ইহা স্বীকার করেছেন সংবাদপত্র মারফৎ দুঃখ প্রকাশ করে। কিন্তু শুধু দুঃখ প্রকাশ করলেই প্রতিকার হলো না, যাতে ভবিষ্যতে এরূপ অপ্রিয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়, সেজন্য কর্ত্তৃপক্ষকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। সভ্যদের স্থান নিজস্ব মাঠের গ্যালারীতে সঙ্কুলান না হবার কোন কারণই থাকতে পারে না। স্থান না থাকলে, কর্ত্তৃপক্ষ কিছুদিন পূর্ব্বে শতাধিক নূতন মেম্বর নিতে পারতেন না। তা' হলে বুঝতে হবে যে নিমন্ত্রিত লোকের সংখ্যা এত অধিক হয়েছিল যাতে সভ্যদের বেলায় গেট বন্ধ করতে হয়। স্থানাভাবে গেট বন্ধ করলে, পরে আবার অত সংখ্যক সভ্যদের ঢুকতে দেওয়া যায় কিরূপে ! তবে কি স্থান থাকতেও তাদের অন্যত্র যেতে বলে নাকাল করান হয়েছে ! আশা করি, কর্ত্তৃপক্ষ ভবিষ্যতে সভ্যদের সুখ স্বচ্ছন্দতার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিবেন।

সাহিত্য-সংবাদ

নব প্রকাশিত পুস্তকাবলী

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত উপন্যাস "ললিতের ওকালতী"—২৲

শ্রীসুনির্ম্মল বসু প্রণীত ছেলেদের গল্প "রাঙ্গা আমার ভাঙ্গা আসর"—৷৶০

আশালতা দেবী প্রণীত উপন্যাস "দুরন্ত যৌবন"—১৷৷০

শ্রীবিনরেন্দ্রপ্রসাদ বাগচী প্রণীত "হিন্দুস্ত্রীলোকগণের সম্পত্তিতে অধিকার বিষয়ক আইন"—১৲

শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায় প্রণীত ছেলেদের উপন্যাস "এল্ ডোর‍্যাডোর বন্দী"—১৲

শ্রীমৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ছেলেদের জন্য "দুর্গম পথে"—৷৶০

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত শিশুপাঠ্য পুস্তক "হর্ষবর্দ্ধনের হর্ষধ্বনি"—৷৷০

শ্রীশশধর দত্ত প্রণীত উপন্যাস "আধুনিক সমাজ"—২৷৷০

শ্রীবরেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত গল্প পুস্তক "বৃহত্তর সম্ভাবনা"—১৲

শ্রীরাইমোহন সাহার উপন্যাস 'প্রথম প্রশ্ন'—১৲

শ্রীবিজনকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত শিশুপাঠ্য "গল্প শোন"—।০

শ্রীগৌতম সেন প্রণীত উপন্যাস "প্রিয়া ও মানসী"—১৷৷০

ডাঃ বিমলচন্দ্র পাল প্রণীত রোমাঞ্চ গ্রন্থ "সাকো পাঞ্জা"—১৲

শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী প্রণীত উপন্যাস "পূর্ণিমা"—১।০

শ্রীকালীপদ সিদ্ধান্ত শাস্ত্রী সম্পাদিত হলায়ুধ প্রণীত "কবি রহস্যম্"—৷৶০

বিশ্বনাথ চৌধুরী প্রণীত উপন্যাস "সাপ আর মেয়ে"—১।০

শ্রীরবিদাস সাহা রায় প্রণীত কবিতা পুস্তক "জয় যাত্রা"—৷৷০

শ্রীমৎ স্বামী অভয়ানন্দ ব্রহ্মচারী প্রণীত "বৈষ্ণব সিদ্ধান্তসার সুধাকর"—৷৷০

শ্রীপ্রভাতসমীর রায় প্রণীত কবিতা পুস্তক "মন-মঞ্জর"—১৲

শ্রীলীলাময় দে প্রণীত গল্প পুস্তক "অমিতাভের উচ্ছৃঙ্খলতা"—১৲

এম্ এন রায় প্রণীত "Our Problems"—২৷৷০

শ্রীবিমানবিহারী মজুমদার প্রণীত "শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান"—১৲

শ্রীপুলকেশ দে সরকার প্রণীত "The Black Prince of Wardha"—৷৷০

সম্পাদক

শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ ‖ শ্রীসুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

Printed & Published by Gobindapada Bhattacharjya for Messrs Gurudas Chatterjea & Sons, at the Bharatvarsha Ptg. Works 203-1-1, Cornwallis Street, Calcutta

শ্রীযুক্ত ভূদেবকুমার সেনগুপ্ত কালরাত্রি ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

COLOURED ILLUSTRATION